মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩০৪ সাল। | ১ম সংখ্যা

নব-বর্ষ।

বিমল জ্যোৎস্নাময়ী মধুর যামিনী।
জ্যোছনা মাখিয়া গায় ছুটিছে তটিনী॥
বহিছে মলয় বায়
দোলাইয়া লতিকায়;
সেজেছে মোহন সাজে প্রকৃতি জননী॥

ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়।
অনিমিখ্ নয়নেতে কার্‌পানে চায়॥
কানন করিয়া আলা
ফুটিয়াছে ফুলবালা,
সোহাগেতে ঢলি ঢলি সুবাস ছড়ায়।

আবেশে কোকিল ঢলে কোকিলার গায়।
কুহু স্বরে বনস্থলী কভু বা কাঁপায়॥
স্বরে মন মেতে উঠে

।শ পোহায় গে।

।জি অনন্তে পায় লয় ॥

ত শোক কত হাসি

কত অশ্রু কত বাঁশী;

।লের কুটিল স্রোতে সব ভেসে যায় ॥

উঠিছে চৌদিকে আজি আনন্দের রোল।

বাজিছে হরষ-বাঁশি আজি অবিরল ॥

ভাসায়ে আকাশ্ ধরা

ছুটিছে সুধার ধারা

নবীন যৌবন ভরে বিশ্ব ঢল ঢল ॥

এসেছ কি নববর্ষ এসেছ আবার।

এই লও উপহার প্রীতির সম্ভার ॥

বৈশাখী রৌদ্রের চেলী

একটু, একটু মেলি

দেখাও দেখাও, দেখি তোমার ভিতর ॥

সম্মুখেতে আছে জানি যুগ যুগান্তর।

আসে যায় নর নারী বাধে খেলাঘর ॥

দূর করে আবরণ

কর দেখি উন্মোচন,

কত হাসি কত গান এনেছ এবার;

অথবা হে ভবিষ্যত সব অন্ধকার ॥

এস এস নববর্ষ করি আবাহন।

বাঙ্গালী হৃদয়ে তুমি আদরের ধন ॥

তোমার নূতন হাসি

মোরা বড় ভালবাসি

তাই আনন্দে তোমায় করি আবাহন।

তনে আজ মহা-সম্মিলন

শঙ্করাচার্য্য।

"পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ আমরা দুইটী "যুগ" দেখিতে পাই। প্রথম, যখন জগতপূজ্য শাক্যসিংহ সামাজিক ও নৈতিক তুমুল আন্দোলন তুলিয়া ভারতের জর্জ্জরিত দেহে নূতন ধর্ম্মমত সঞ্চারিত করিলেন। দ্বিতীয়, যখন অসাধারণ ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া তৎকালিক উৎশৃঙ্খল সমাজকে অভিনবভাবে সংগঠিত করিলেন।

——যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন সুপ্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষে ইতিহাস লেখার চলন্ ছিল না; সুতরাং এই দুইটী মহাপুরুষ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, দুই চারি খানি গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত। খৃষ্ট জন্মিবার ছয়শত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে শাক্যসিংহ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। তিনি কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধধনের একমাত্র পুত্র। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না, ভোগবিলাস চরিতার্থের সকল উপায়ই তাঁহার করায়ত্ত ছিল—তিনি তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, জগদ্বাসীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইল, বিচীমালা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তিনি অস্থির, অধীর হইলেন। ভোগলিপ্সা চরণে দলিয়া, রাজসিংহাসন চরণে ঠেলিয়া, পিতামাতার মায়াডোর তৎসঙ্গে প্রিয়তমা গোপার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া জীবের কল্যাণ সাধনার্থে গভীর আঁধার রজনীতে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শত শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শত শত প্রলোভন পদ দলিত করিয়া সিদ্ধার্থ যথার্থই সিদ্ধ হইলেন। সর্ব্বজীবে দয়া বুদ্ধের মূলমন্ত্র, এবং নির্ব্বাণই বৌদ্ধধর্ম্মের সারলক্ষ্য। বুদ্ধ যখন প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ

ছিল, তৎপরে ক্রমশঃ ইহার অধঃপতন আরম্ভ হইলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ বেদে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম এখানে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিল না; কারণ ভারতবর্ষে পূজিত ও সম্মানিত হইতে হইলে এই দুইটীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে সভ্যতার গতিরোধ হইল; আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। আলোকের পর অন্ধকার ও অন্ধকারের পরই আলো ইহাই বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং ভারতে ও এ নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটিল না। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব প্রযত্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এই হিন্দুধর্ম্ম সেই সনাতন পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম নহে অপবিত্র এবং বিকারগ্রস্থ। তাঁহারা নূতন দেব দেবীর সৃষ্টি করিলেন, সর্ব্ব প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ সাধন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। যদিও ব্রাহ্মণগণ পুনরায় বিলুপ্ত আধিপত্য লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে প্রচার আরম্ভ করিলেন বটে কিন্তু ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিতে আরম্ভ হইল। কুসংস্কার ও অজ্ঞানতায় দেশ ছাইয়া ফেলিল, আর্য্য সমাজের শিরায় শিরায় এই ভয়ানক বিষ প্রবেশ করিয়া সমাজকে বিকৃত করিল, উৎসন্নে যাইবার লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হইল।

এই দুর্নীতির স্রোত ফিরাইতে হইলে একটী প্রবল শক্তির আবশ্যক। কোন মহাপুরুষ কোন ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। যথাকালে (in the fullness of time) শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। যখনি কোন জাতির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে, যখনি সঞ্জীবনীসুধা সঞ্চারণের নিমিত্ত কোন এক মহাশক্তির প্রয়োজন হয়, তখন সেই জাতির মধ্যে একটী মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া স্বকীয় অদ্ভুত ঐশী শক্তি বলে নবজীবন সঞ্চারিত করেন। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন ব্রাহ্মণের আধিপত্যকালে হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যাইতেছিল, তখন বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রবল পরাক্রমে সে স্রোতের গতিরোধ করিয়া অন্য সুপথে তাহার গতি ফিরাইয়া দিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোপের অসহনীয় অত্যাচারে ও অন্যায় ক্ষমতা পরিচালনায় ক্যাথলিক ধর্ম্মে যখন নানা প্রকার দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া ধীরে

ধীরে উচ্ছেদ সাধন করিতেছিল, তখন মার্টিন লুথার আবির্ভূত হইয়া খৃষ্ট-জগৎকে এক অতি ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। জন নক্স, ল্যাটিমার, ক্র্যানমার, ক্যালভিন্ এবং আরও কত ধর্ম্মবীর স্ব স্ব সত্যমত প্রচার করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের পবিত্র মন্দিরে আত্মবলি দিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির অশেষ কল্যান সাধন করিলেন। সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজ জন্মভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা আবার দেখিতে পাই, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য সকলেই স্বদেশের মঙ্গল সংসাধনের নিমিত্ত যথাকালে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবাসীকে প্রেম ও ভক্তি-নীরে প্লাবিত করিয়া, স্ব স্ব মহান্ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়া সময় পূর্ণ হইলে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াগিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনের পর ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইল তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময়োপযোগী হইয়াছিল কি না। শঙ্করাচার্য্য একজন ঘোর বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী; তিনি বেদান্তসারসূত্র সমুদায় সংকলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে যে সকল দুর্নীতি ও কুসংস্কার প্রবেশ লাভ করিয়া-ছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নূতন ছাঁচে ঢালিয়া, হিন্দুধর্ম্মকে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। অনেকে শঙ্করাচার্য্যকে শৈব বলিয়া মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি শৈবধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন এবং অনেক স্থলে শৈবদিগকে "এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই পরমেশ্বর" এই মত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে জানিতে হইলে তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দগিরি প্রণীত "শঙ্করবিজয়" নামক গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। তাঁহার বাল্যজীবন, তাঁহার শিক্ষা, এবং ধর্ম্মসংস্কারে অবিচলিত উৎ-সাহ সকলই এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েক খানি গ্রন্থ হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়, মাধবাচার্য্য প্রণীত "শঙ্কর দিগ্বিজয়" এবং সদানন্দ প্রণীত "দিগ্বিজয় সার"। শঙ্করাচার্য্য ম্যালেবারের জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি শঙ্করবিজয় প্রদেশে চিদম্বরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের জন্ম সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একদা নারদ ভারতের দুর্দ্দশাবলোকনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া

ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বলিলেন "দেব ! পাপে তো ভারত যায় যায় হইয়াছে, ধ্বংশ অনিবার্য্য এখন এমন কোন উপায় বিধান করুন যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়।" ব্রহ্মা নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি রক্ষার্থে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। মহাদেব একটী অগ্নিশিখার আকার ধারণ করিয়া শঙ্করের ভবিষ্যত জননীর মুখগহ্বর দিয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ও যথা-কালে পুত্ররূপে প্রসূত হইলেন। এই বালকই শঙ্করাচার্য্য। উপরিল্লিখিত পৌরাণিক উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রায় সকল জীবন চরিত রচয়িতাই তাঁহাকে মহাদেবের অবতার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, শঙ্করাচার্য্য একজন পরমেশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করাও বড় কঠিন ব্যাপার। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন তিনি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বলেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, আবার কেহ বলেন যে তিনি খৃষ্ট জন্মিবার ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা হাণ্টার প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন।

শঙ্কর উপনয়নের পর সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই সুকুমার সাহিত্য ও দুরূহ দর্শন বিজ্ঞানে অত্যন্ত পার-দর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, মেধাবী ও অসাধারণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল গুণ একাধারে বর্ত্তমান থাকায় তিনি অল্পসময়ের মধ্যে বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর সংস্কৃতপাঠ সমাপ্ত হইলে পর ক্রমে ক্রমে বহু ছাত্র শিক্ষালাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে তিনি তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদের মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

শঙ্করাচার্য্য যে একজন অদ্বৈতবাদী তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি পরমেশ্বরকে কি ভাবে এবং এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে কোন চক্ষে দেখিতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন "এক-মাত্র ভগবানই নিত্য এবং পরম পদার্থ, তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও নশ্বর। এই

জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টিকর্ত্তার ছায়া মাত্র এবং তাঁহারই মায়াতে এই জগৎ সৃজিত হইয়াছে।" সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই এই সোমার্কগ্রহগণ সমন্বিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইতেছে। সেই পরব্রহ্মই ইহার মূলীভূত কারণ এবং তাঁহাতেই ইহা লীন হইবে। পৃথিবীর অস্তিত্ব "ব্যবহারিক" মাত্র "পরমার্থিক" নহে। যদ্রূপ অন্ধকার রজনীতে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তদ্রূপ এই মায়া মোহাচ্ছন্ন জ্ঞান চক্ষু বিহীন আমাদের নিকট এই ক্ষণভঙ্গুর জগৎ নিত্য ও অবিনশ্বর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। "ব্রহ্ম সত্যং, জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব ন অপরঃ।" প্রকৃত সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তই ব্রহ্ম। তিনিই স্থিতি, জ্ঞান এবং আনন্দ। "সত্যং অনন্তং জ্ঞানং ব্রহ্মঃ" "সচ্চিদানন্দ রূপং"। এই পরব্রহ্মকে আমরা সহজে ধারণায় আনিতে পারি না। তিনি সর্ব্বশক্তি-মান, ইচ্ছাময় ও সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই অর্থাৎ "পরমতত্ত্ব" অবগত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিবে।

ক্রমশঃ বক্তৃতা ও উপদেশাদির দ্বারা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী শিষ্যদিগকে তাঁহারই ধর্ম্মমত অবলম্বন করাইলেন। অত্যন্ত সতর্ক-তার সহিত দৈনিক কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, কিছু দিন পরে শিষ্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। বেদবিগর্হিত কার্য্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে সংশোধন করা, তাঁহার ধর্ম্ম তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া এবং সামাজিক দুর্নীতির মূলচ্ছেদ এই কয়েকটী তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

শঙ্কর কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের জীবনে এরূপ কার্য্য অত্যন্ত অনুদার ও শঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ব্রাহ্মণেরাই সমাজের নেতা ও মুখপত্র ছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগকে সংশোধন করিতে পারিলেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিবে এই ধারণা শঙ্করের হৃদয়ে বলবতী ছিল। এ ধারণা ও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হয় নাই। ও এইরূপে স্বদেশের ও স্বজাতির বহুল কল্যান সাধন করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে

আপনার কর্ত্তব্যই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। কোন পথে যাইবে, কি করিবে ভাবিয়া আকুল হয়। মনের আবেগে ইতস্ততঃ কিছু দিন ছুটাছুটি করিয়া আবার ক্ষান্ত হয়। কর্ণধার বিহীন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় সংসারের অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু যে মহাত্মা ঐ অল্প সময়ের মধ্যে মহান্ শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ন সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—যিনি সংসারের বিপুল তরঙ্গে পতিত হইয়াও অচল অটল ভাবে হিমাচলের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন—যিনি স্বকীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে বিপক্ষের তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন—যিনি স্বকীয় কর্ত্তব্য, স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করিয়া মরণাবধি জীবনের সেই ধ্রুব তারাকে লক্ষ্য করিয়া আপনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—তিনি যথার্থই নরাকারে দেবতা—সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্যকে অনেকে দেবতার আসন প্রদান করেন।

ভালবাসা।

(১)

প্রাণের গভীর কূপে, লুক্কায়িত চুপে চুপে
সঞ্জীবনী সুধারূপে, কে গো তুমি বল না?—
সংসার মুকুট-মণি, প্রেমে ভরা মুখ খানি,
ভুবন মোহিনি ধনি, সুরলোক-ললনা?

(২)

"ভালবাসা" মম নাম, বৈজয়ন্তপুরে ধাম,
জীবের জীবনারাম, স্বরগের নমুনা
ধরাতলে নিপতিত;—জীব প্রাণে প্রবাহিত
ভবেশের পাদপদ্ম—বিগলিত করুণা!

সিপাহী-বিদ্রোহের কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মিরাট এবং দিল্লী।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ১০ই মের সন্ধ্যাকালে মিরাটের দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, খৃষ্টধর্ম্মোপাসকদিগকে প্রার্থনায় যোগ দিবার নিমিত্ত আহ্বানচ্ছলে তথাকার "গির্জ্জাঘর" হইতে আনন্দমধুর ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। আজ সারাদিন অত্যন্ত গরম গিয়াছে, রৌদ্রের তাপ এত হইয়াছিল যে একবার বাহিরে যাইলে সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া যাইবার মত বোধ হইতেছিল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় বাতাস বহিতেছিল। ক্রমশঃ যখন সাঁজের রবি ধীরে ধীরে অসীম শূন্যে মিশায়ে গেল, ক্রমশঃ যখন পূর্ব্ব গগনে চাঁদখানি তারার মালা পরিয়া হাসিতে হাসিতে দেখা দিল, তখন মিরাটের ইংরাজ অধিবাসীরা স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া ধর্ম্ম-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কে জানে ইঁহাদিগের অদৃষ্টে কি আছে? কে জানে যে এই ঘণ্টাধ্বনিই তাহাদিগকে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সাবধান বাক্য প্রচার করিতেছে? কে জানে আর কত অভিনব ব্যাপার ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে নিহিত রহিয়াছে?

কিরূপে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল?

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে মিরাটের সেনা-নিবাসই সর্ব্ব বলে বলীয়ান। এখানে ২,২০০ শত ইংরাজ সৈন্য ছিল ও দেশীয় সৈন্য সংখ্যায় ৩,০০০ সহস্র। যদ্যপি হ্যাভ্‌লক্, লরেন্স, অথবা আউট্‌র‍্যামের মত একজন বিচক্ষণ সেনাপতি এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বিদ্রোহ কখনই ঘটিত না, কিম্বা যদি ঘটিত তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহা দমন হইত সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে মিরাটে ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন বৃদ্ধ ইংরাজ সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্থৈর্য্য ও সাহস তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না, যুদ্ধের নামে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিত; কেবল "বয়সের খাতিরে" তিনি এই উচ্চ পদ ভোগ করিতেছিলেন নচেৎ সেনাপতির কোন গুণই তাঁহার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৫ই মে সন্ধ্যাকালে পরদিনের প্রাতঃকালীন "প্যারেডের" নিমিত্ত সৈন্যগণের মধ্যে "টোটা" দেওয়া হইলে পর তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহীদলের ৮৫ জন সৈন্য তাহা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিল। যে নূতন "টোটার" প্রচলন করিয়া ইংরাজ রাজ জাতি নাশ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন ভাবিয়া হিন্দু মুসলমান ব্যাকুল হইতেছিল, ইহা তাহা নহে। ঐ তারিখে যে "টোটা" দেওয়া হয় তাহা পূর্ব্বে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তিও করে নাই। দেশীয় সৈন্যের মধ্যে যে কয়েক জন "টোটা" গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিল তাহাদিগকে "কোর্টমার্সাল্" দ্বারা বিচার করাইয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ৯ই তারিখে প্রাতঃকালে মিরাটে ইংরাজ ও দেশীয় যতগুলি সৈন্য ছিল সকলকে "প্যারেড" ভূমিতে একত্রীকৃত করা হইয়াছিল। সিপাহীদিগের মুখে বিলক্ষণ পরিমাণে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল—কিন্তু ইংরাজ-সৈন্যের বীরবেশ দেখিয়া কার্য্যে কোনরূপ ক্রটি দেখাইতে তাহাদের সাহস হইল না। ৮৫ জন বিদ্রোহী সিপাহীকে মধ্যস্থলে দাড় করান হইল। একে একে তাহাদের "ইউনিফরম্" খুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইল; ইংরাজ ও সিপাহী স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য-বিদ্রোহীদিগকে নিদারুণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল—সিপাহীগণ ইহাদিগকে ধর্ম্মবীর জ্ঞানে অন্তরে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।

"প্যারেড" শেষ হইল। বিদ্রোহী সিপাহী কয়েকটীকে স্থানীয় জেলে পাঠান হইল। রাত্রে সিপাহী-সৈন্য মাত্রেরই নিদ্রা হইল না। সকলের হৃদয়ে বিষম প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কি করিলে এই অত্যাচারের যথার্থ প্রতিশোধ দেওয়া হইবে এই মন্ত্রণায় তাহারা সারারাত্রি যাপন করিল। বিদ্রোহের ধার্য্যদিন (৩১শে তারিখ) পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ইহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরদিন (১০ই মে) রবিবার। আজ সাহেব মাত্রেই নিরস্ত্র অবস্থায় গির্জ্জায় আসিবেন—সুতরাং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। যে আনন্দ-মধুর ঘণ্টাধ্বনি আজ ইংরাজদিগকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত গির্জ্জায় আহ্বান করিতেছিল তাহাই আবার সিপাহীগণকে বিদ্রোহী হইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিল।

প্রথম সংঘর্ষণ।

সন্ধ্যার অতি অল্পক্ষণ পরেই "প্যারেড" ভূমির চতুর্দ্দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠিল। তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহীদল তাহাদের স্ব স্ব আবাস স্থান হইতে বহির্গত হইয়া উলঙ্গ কৃপান হস্তে কারাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিল ও ক্ষণকালের মধ্যেই কারারুদ্ধ ৮৫ জন সিপাহীকে দ্বার ভগ্ন করিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। একাদশ ও বিংশতি সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদল সত্বরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ১১ সংখ্যক পদাতিক দলের কর্ণেল ফিনিসের নিকট জনৈক ইংরাজ সার্জ্জেণ্ট আসিয়া বলিল, "মহাশয়, সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে, যদি প্রাণের মায়া থাকে তাহা হইলে শীঘ্র পলায়ন করুন।" ফিনিস সহজে ভীত হইবার লোক নহেন—তিনি এই দুর্ঘটনার সংবাদে অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া অশ্বারোহণে বিদ্রোহীগণের সম্মুখীন হইলেন; অপরাপর জনকয়েক ইংরাজ-কর্ম্মচারীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। কিয়ৎকালের জন্য অনুনয় বিনয় দ্বারা সিপাহী-দিগকে বিরত রাখা হইল। রাস্তার অপরদিকে বিংশতি সংখ্যক পদাতিক দলকেও জনকয়েক ইংরাজ কর্ম্মচারী মিলিয়া নানা প্রকার বুঝাইয়া ক্ষান্ত রাখিল।

কুড়িজন মাত্র ইংরাজ বিদ্রোহমত্ত ২০০০ সহস্র সিপাহীকে ভুলাইয়া আর কতক্ষণ রাখিবেন? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহারা আশা করিতেছিলেন, অনতিবিলম্বেই "ক্যাণ্টনমেণ্ট" হইতে ইংরাজ-সৈন্য কামান ইত্যাদি লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে কিন্তু কোথায় বা কি? সৈন্যাধ্যক্ষ তৎকালে হয়তো সুকোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়া নিদ্রায় বিভোর অথবা ভীতিগ্রস্থ হইয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ফিনিস্ যখন দেখিলেন সিপাহীদিগকে আর আঁটিয়া রাখিবার উপায় নাই, তখন সেস্থান ত্যাগ করিয়া অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের সাহায্যার্থে গমন করিলেন। বিংশতি সংখ্যক "রেজিমেণ্টের" সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইবার পুন-রায় চেষ্টা করিলেন—তৎক্ষণাৎ বন্দুকের শব্দ হইল—ফিনিস্ দারুণ আঘাত পাইয়া অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এইবার "সিপাহী-বিদ্রোহ" যথার্থই আরম্ভ হইল।

রজনীতে দুর্ঘটনা।

বিংশতি সংখ্যকের বিকট ভৈরব কোলাহল শ্রবণ করিয়া একাদশ সংখ্যক সেনাদল অধিকতর উত্তেজিত হইল। কিন্তু ইহারা স্বদলের "অফিসার"দিগকে প্রাণে না মারিয়া উত্তম মধ্যম কিল চড় দিয়া ছাড়িয়া দিল। অপরদিকে প্রথমোক্ত সেনাদল, যে ইংরাজকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহীরা সকল "বাংলা" গুলিকেই অগ্নি প্রদান করিল। বহু "বাজে" লোক আসিয়া বিদ্রোহীগণের সহিত যোগ দিল। এই রাত্রে যে সকল ইংরাজ কোন গতিকে ব্রিটিস সেনা নিবাসে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারাই নিরাপদ হইয়াছিলেন —অবশিষ্ট সকলকে সিপাহীরা হত্যা করিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, কেহই নিষ্কৃতি পাইলেন না। মেমদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া পরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল—ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে লইয়া উচ্চে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ভূমিয়ে বন্দুকের "বেয়নেট্" কিম্বা তরবারি উত্তোলন করিল, তাহারা তদুপরি নিপতিত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই সমুদায় পাশবিক অত্যাচার ২২০০ ইংরাজ-সৈন্যের অতি নিকটে সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারা ক্রোধে দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পীড়ন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল, জেনারল্ হেউইট অতি বিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই অসময়ে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছিল। "চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে" হেউইটের তাহাই হইল। সিপাহীরা ক্রমে অদৃশ্য হইল। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিদ্রোহ দমনের সকল উপায় হেউইটের করায়ত্ত ছিল। তিনি মনে করিলে বিদ্রোহীগণের অনুসরণ করিয়া সকলকেই নিহত করিতে পারিতেন। "ক্যারাবাইনিয়ার্স" দলের জন কয়েক সাহসী "অফিসার" হেউইটের নিকট বিদ্রোহীদিগকে অনুসরণ করিবে বলিয়া জানাইল—কিন্তু হেউইট আজ্ঞা দিতে সাহসী হইলেন না, এমন কি দিল্লীতে বিদ্রোহের সংবাদটা দিবার কথাও তাঁহার খেয়াল্ হইল না। সহস্র ব্রিটীস-সৈন্য নিকটে থাকা সত্ত্বেও মিরাটের "বাংলায়" যে সকল দুর্বৃত্ত বিদ্রোহীরা ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেছিল, তাহাদিগকে নিহত করিবার তিনি কোন চেষ্টা দেখিলেন না। হেউইট্

যুদ্ধের প্রতীক্ষায় ব্রিটীস-রেজিমেণ্ট লইয়া সারারাত্রি "প্যারেড" ভূমিতে বসিয়া রহিলেন, এ দিকে মিরাটে রক্তের নদী বহিল। পরদিন প্রাতঃকালে মিরাটের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। আজ মিরাট কৃতান্তের পানভূমির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হেউইট্ কোন গতিকে ইংরাজ স্ত্রী পুরুষদিগের মৃতদেহ গুলি একত্রিত করিয়া আপনার শেষ কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিলেন।

একজনের ভুলে কত অনিষ্টপাত হইতে পারে হেউইটের জীবনে আজ আমরা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিতেছি। হেউইটের পরিবর্ত্তে যদি নিকোলসান্, নীল্, কিম্বা লরেন্স মিরাটের সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন তাহা হইলে অকারণে এতগুলি ইংরাজকে প্রাণ হারাইতে হইত না। হেউইট্ মহা ভুল করিয়াছেন সত্য, মিরাটে বিদ্রোহ দমনের কোন চেষ্টাই করেন নাই সত্য কিন্তু যখন সিপাহীগণ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল, তখনও যদ্যপি তিনি ইহার প্রতিবিধান করিবার কোন চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তো ব্যাপার এতদূর গড়াইত না, তাহা হইলে তো দিল্লীর ইংরাজ অধিবাসীরা আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিতেন কিন্তু যিনি একটী ভুল করিয়াছেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটী করিবেন এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

দিল্লীতে দুর্ঘটনা।

মিরাট হইতে দিল্লী ৩৮ মাইল। ব্রিটীস-রাজের পক্ষে দিল্লী আজ বড় ভয়ঙ্কর স্থান। মোগল বাদসাহের একজন বংশধর এখনও দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদেই প্রায় ১২,০০০ মুসলমান থাকিত। বিশেষ কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকার নিমিত্ত দিল্লীর অভ্যন্তরে ব্রিটীস-সৈন্য রাখা হইত না, সহরের বাহিরেও ঐরূপ।

পরদিন প্রাতঃকালে তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহীদল অন্যান্য বিদ্রোহী দলের সর্ব্বাগ্রে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে যে কয়েকটী ইংরাজকে দেখিতে পাইল তাহাদিগকে হত্যা করিয়া দিল্লীর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "আমরা মিরাটের সকল ইংরাজকে হত্যা করিয়াছি এবং সেই অভিপ্রায়ে আজ আবার দিল্লীতে আসিয়াছি।" এই সংবাদে দিল্লীর বৃদ্ধ নৃপতি প্রথমতঃ বিচলিত হইলেন। তিনি বিদ্রোহীগণের সহিত যোগ দিবেন কি না ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলেন,

ইতিমধ্যে দ্বার-রক্ষক দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল; বিদ্রোহীগণ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া যেজন কয়েক ইংরাজ ও মেম্‌কে দেখিতে পাইল সকলকে বিনষ্ট করিল। দিল্লীর "ব্যাঙ্ক" লুট করিল ও "ব্যাঙ্কে"র কর্ম্মচারী ম্যানেজার প্রভৃতিকে সপরিবারে হত্যা করিল। "দিল্লী-গেজেট" যে কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত তাহার অবস্থাও ঐরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। কম্পোজিটারগণ যে সময়ে মিরাটের বিদ্রোহ সংক্রান্ত লিখিত ঘটনা "কম্পোজ" করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে জন কয়েক সিপাহী ছাপাখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল। সিপাহীরা সে দিবস রাস্তাতে যে সকল ইংরাজকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাদিগকেই নৃশংস ভাবে নষ্ট করিল—এমন কি ছোট ছোট শিশুদিগকে দেখিয়াও তাহাদের কঠোর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দিল্লীতে ব্রিটীস-সৈন্য আদৌ ছিল না। তিনটী সিপাহী "রেজিমেণ্ট" ছিল। এই তিন দলের ইংরাজ অধ্যক্ষেরা খুবই আশা করিয়াছিলেন—মিরাটের ব্রিটীস-রেজিমেণ্ট নিশ্চয়ই বিদ্রোহীগণের পশ্চাদনুসরণ করিবে এবং এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া তাঁহারা দিল্লীর সিপাহীদিগকে অনুনয় বিনয় দ্বারা যতক্ষণ সম্ভব শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিপাহীদল তাঁহাদের বাক্যে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া নগর রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইল কিন্তু যখন বিদ্রোহীদল ক্রমশঃ সম্মুখীন হইতে লাগিল, তখন ৫৪ সংখ্যক সিপাহী-রেজিমেণ্ট বিদ্রোহীগণকে বাধা দিবার কোনরূপ প্রয়াস পাইল না, অধিকন্তু স্বদলের কর্ণেল রিপ্‌লেকে হত্যা করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাঁচজন "অফিসার"কে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। ৭৪ সংখ্যক দলের কর্ণেল বিধিমতে আপনার অধীনস্থ সিপাহীদিগকে বুঝাইলেন। তাহারও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনের জন্য অগ্রগামী হইল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীগণকে বাধা প্রদান করিল। প্রায় বেলা তিনটার সময় উইলোবি দিল্লীর বারুদ-খানায় অগ্নি নিক্ষেপ করিলেন, সমগ্র দিল্লী কম্পান্বিত করিয়া সহসা একটা বিকট ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই অদূরে বন্দুকের চড়বড় শব্দ হইতে লাগিল, ৭৫ সংখ্যক সিপাহীদল তাহাদের কর্ণেল এ্যাবটকে এই বন্দুকের শব্দের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ৩৮ সংখ্যক সিপাহীদল তাহাদের ইংরাজ "অফিসার" দিগকে গুলি করিয়া মারি-

তেছে। এ্যাবট্ ৭৪ সংখ্যক "রেজিমেণ্ট" হইতে একদল সৈন্য তাহাদিগের সাহায্যার্থে পাঠাইলেন কিন্তু তাহারা বেশীদূর যাইতে না যাইতেই দলস্থিত "অফিসার"দিগের উপর গুলি চালাইল। দুইজন ধরাশায়ী হইলেন, অবশিষ্ট জন কয়েক প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বেই ৭৪ সংখ্যক সিপাহীদল এ্যাবট্ সাহেবকে বলিল "যতক্ষণ সম্ভব আমরা আপনাকে রক্ষা করিয়াছি কিন্তু আর অধিকক্ষণ পারিব না, আপনি শীঘ্র পথ দেখুন।" এ্যাবট্ তাহাদিগকে বুঝাইবার বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি হইতে লাগিল, এ্যাবট্ গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া তাহাদিগের নিকট নিশান গুলি চাহিলেন এবং নিজ রেজিমেণ্টের নিশান সমুদায় সংগ্রহ করিয়া একজন মাত্র "অফিসার" সঙ্গে লইয়া মিরাটের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয় বিভাগ যোগ।

ভগবানের পিতৃত্ব ও প্রকৃতির মাতৃত্ব—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—
ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মত্ব—গুণাতীত কে?—ভগবানই
ব্রহ্মের ও একান্ত সুখের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীভগবান কহিলেন—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান কহি পুনরায়,
মুনিগণ জানি যাহা সুখে মোক্ষ পায়। ১
হেন জ্ঞানাশ্রয়ে পায় স্বরূপত্ব যারা,
উৎপত্তি-প্রলয়-দুঃখে মুক্ত হয় তারা। ২
ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি সে গর্ভাধান স্থান,
চিদাভাস-গর্ভ তাহে আমি করি দান;
ব্রহ্মাদি সমস্ত ভূত সেই গর্ভজাত। ৩
স্থাবর জঙ্গম আদি যাহা উৎপাদিত,

সকলের মাতৃরূপা প্রকৃতি আমার;
পিতা আমি করি তাহে গর্ভের সঞ্চার। ৪
সত্ত্ব রজঃ আর তমঃ এই গুণত্রয়;
প্রকৃতি হইতে তারা হইয়া উদয়,
দেহস্থ চিদংশ সেই দেহীকে পাইয়া,
ঊর্ণানাভ সম ঘেরে মোহসূত্র দিয়া। ৫
দীপ্তিযুত সত্ত্বগুণ দেহীকে ধরিয়া,
বদ্ধ করে সুখাশক্তি জ্ঞানাশক্তি দিয়া। ৬
রজগুণ কর্ম্মসূত্রে অতি চমৎকার,
জড়ায় দেহস্থ সেই চিদংশ আমার। ৭
অজ্ঞান সম্ভূত তমঃ ভ্রান্তি জনমিয়া,
বান্ধে মোরে নিদ্রালস্য মূঢ়তাদি দিয়া। ৮
সত্ত্বগুণে সুখী, রজঃ কর্ম্মযুত করে,
তমঃ জ্ঞানাচ্ছন্ন করি মূঢ়তা সঞ্চারে। ৯
রজঃ-তমো হ্রাস করি সত্ত্বোদয় হয়;
সত্ত্ব-তমো হ্রাস করি রজর উদয়;
সত্ত্ব-রজো হ্রাস করি তমঃ সমুদিত,
জীবভাগ্য অনুসারে হ'তেছে নিয়ত। ১০
জ্ঞানের প্রকাশ দেহে হতেছে যখন,
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত জানিবে তখন। ১১
কর্ম্মারম্ভ, লোভ স্পৃহা, প্রবৃত্তি-উদয়
হইলে জানিবে রজঃ বর্দ্ধিত নিশ্চয়। ১২
অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহন,
তমোবৃদ্ধি হলে হয় হে কুরুনন্দন। ১৩
সত্ত্ববৃদ্ধি হলে মৃত্যু লয়ে যায় তাকে,
প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে। ১৪
রজোগুণ বৃদ্ধি হ'লে মৃত্যু হয় যার,
কর্ম্মাসক্ত নরলোকে জন্ম হয় তার।

তমোগুণ বৃদ্ধি হলে মৃত্যু যদি হয়,
পশ্বাদির কুলে জন্ম হয় ধনঞ্জয়। ১৫
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলে শুদ্ধ সুখ যথা,
রাজসিক কর্ম্মে দুঃখ, তামসে মূঢ়তা। ১৬
সত্ত্ব হ'তে জ্ঞান; লোভ রজঃ হতে হয়;
তমো হতে হে ভারত অজ্ঞান উদয়। ১৭
সত্ত্ববান যান ঊর্দ্ধে গন্ধর্ব্বাদি লোকে;
রজোবান নরলোকে মধ্যস্থলে থাকে;
জঘন্য প্রবৃত্তি নিয়া, তামসিক যারা,
আন্ধার নরক পথে অধোগামী তারা। ১৮
যে কেহ বিবেকবান, দেখেন কেবল
গুণরাশি মিলি কর্ম্ম করিছে সকল;—
গুণ ভিন্ন অন্য কেহ কর্ম্ম নাহি করে,
গুণ সাক্ষী মাত্র আত্মা আছে অভ্যন্তরে;
তিনিই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন নিশ্চয়, ১৯
হইয়া ত্রিগুণাতীত চিরানন্দময়। ২০

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে প্রভো, ত্রিগুণাতীত কি বা চিহ্নে হয়?
কি আচার তাঁর? আর কি বা সে উপায়? ২১

শ্রীভগবান কহিলেন—

প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদয়,
বিরক্তি বিদ্বেষ যাঁর কভু নাহি হয়,
অনুদয়ে তার লাগি আকাঙ্ক্ষা না থাকে,
পাণ্ডব, জানিবে বলে গুণাতীত তাঁকে। ২২
সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকেন যে জন,
সুখে দুঃখে বিচলিত কভু নাহি হন;
"আমার কি?—গুণ যত স্বীয় কার্য্যে থাকে,—
হেন জ্ঞান যাঁর, বলে গুণাতীত তাঁকে। ২৩
প্রস্তরে সুবর্ণে লোষ্ট্রে সমজ্ঞান, আর

প্রিয়াপ্রিয় যশঃনিন্দা তুল্যবোধ যার,
সমদুঃখ সুখ, সদা স্বরূপেতে থাকে,
হেন যে ধীমান বলে গুণাতীত তাঁকে। ২৪
মান অপমানে তুল্য, শত্রু শূন্য যিনি,
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, গুণাতীত তিনি। ২৫
যে একান্ত ভক্তিযোগে আরাধে আমায়,
হইয়া ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মভাব পায়। ২৬
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি—ব্রহ্মঘনীভূত;
অব্যয়ের অমৃতের প্রতিষ্ঠা বিদিত।
ঐকান্তিক সুখ যাহা সনাতন ধর্ম্ম,
আমিই প্রতিষ্ঠা তার, এই সার মর্ম্ম। ২৭।

ইতি গুণত্রয় বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "নরকা নাম ভগবান্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রৈলোক্যা আহোস্বিদন্তরাল ইতি॥"

অর্থ—নরক সকল কি দেশ বিশেষ? না ত্রিলোকীর বহির্ভাগে কি অন্তরালে ভূমি ব্যতিরিক্ত কোন স্থানে স্থিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলেন—কোন কোন ঋষির মতে ত্রিলোকীর মধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে এবং জলের উপরে যে স্থানে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া সমাধিমগ্ন আছেন, অথবা যেখানে সূর্য্য তনয় পিতৃরাজ মৃত প্রাণীগণের কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচার করিয়া দণ্ড করিতেছেন, সেই স্থানে নরক সকল আছে। এই সকল নরকের নাম—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সংদংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান,

ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণ ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন, সূচীমুখ।

পাপানুসারে যে ব্যক্তির যে নরকে গতি হয় তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে।

১। তামিস্র নরক—অতিশয় অন্ধকার। পান ভোজন অভাব। অতিশয় দণ্ডতাড়ন। যাহারা পরধন, পরস্ত্রী, পরের পুত্র অপহরণ করে। ২। অন্ধতামিস্র—এই নরকে পড়িলে স্মৃতিভ্রষ্ট ও বুদ্ধি নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার দারা উপভোগ করে। ৩। রৌরব—সর্প অপেক্ষা ক্রূর ভারশৃঙ্গ নামে এক প্রাণী আছে তাহাকে রুরু বলে। তাহা হইতে রৌরব নাম। "এই শরীরই আমি" "এই ধনাদি আমার" এইরূপ অভিমানী ব্যক্তি এবং যে কেবল নিজ আত্মীয়জনকে প্রতিপালন করে এবং প্রাণীহিংসা করে। হিংসিত প্রাণী রুরু হইয়া সেই প্রকারে তাহাকে হিংসা করে। ৪। মহারৌরব—ঐ প্রকার। যে প্রাণী পীড়ন করিয়া আত্মদেহের ভরণপোষণ করে। ৫। কুম্ভীপাক—তপ্ত তৈলে পাক করে। সজীব পশু পক্ষী বধ করিয়া যে মাংস পাক করে। ৬। কালসূত্র—তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমভূমি। অযুত যোজন। ব্রাহ্মণ হিংসক। পশুদেহে যত রোম তত বৎসর ভোগ। ৭। অসিপত্রবন—তালবন। পত্র সকল অসি তুল্য দুইদিকে ধার। স্বধর্ম্মত্যাগী ও পাষণ্ড মতাবলম্বী। ৮। শূকরমুখ—যে রাজা বা রাজপুরুষ অদণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়। আকমাড়া কলের মত অবয়ব নিপীড়িত হয়। ৯। অন্ধকূপ—যে সকল প্রাণীর মনুষ্যরক্ত পানাদিরূপ বৃত্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত তাহাদিগকে যে পীড়া দেয়। যেমন ছারপোকা বা মশা মারা। ঐ সকল প্রাণী হিংসা করে। ১০। কৃমিভোজন—ভক্ষ্য দ্রব্য সকলকে না দিয়া যে আপনি ভোজন করে। যে পঞ্চযজ্ঞ না করে। লক্ষ যোজন কৃমি হইয়া কৃমি ভোজন করে। ১১। সংদংশ—(সাঁড়াশী) চোর বা যে পুরুষ অগম্যা স্ত্রী বা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষ গমন করে। উত্তপ্ত সাঁড়াশী দিয়া দেহ ছিন্ন। ১২। তপ্তশূর্ম্মি—অগ্নিময় লৌহ প্রতিমায় আলিঙ্গন দান ও কশাঘাত। ১৩। বজ্রকণ্টক শাল্মলী—যে পশ্বাদি যোনিতে উপগত হয়। বজ্রতুল্য শাল্মলীর উপর চড়াইয়া টানা। ১৪। বৈতরণী—যে রাজপুরুষ ধর্ম্ম মর্য্যাদকগণের ভেদ করে। বৈতরণী নদী নরক সকলের পরিখা স্বরূপ

তাহাতে পড়ে। ১৫। পূয়োদ—বিষ্ঠা, মূত্র, পূয়, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসাবাহিনী নদীতে পড়িয়া উত্তপ্ত হইতে হয়। অধর্ম্ম জন্য কর্ম্মবিপাক নারী। ১৬। প্রাণরোধ—ঐরূপ যাতনায় জলজন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করে আত্মা-বিমুক্ত ও প্রাণ বিগত হয় না। ১৭। বিশসন—যাহারা দম্ভ করিয়া যজ্ঞে পশু ছেদন করে ও অকাল মৃগয়া করে। যমদূতেরা বান দিয়া বিদ্ধ করে। ১৮। লালাভক্ষ—যাহারা শূদ্রাপতি হইয়া শৌচ, আচার, নিয়ম নষ্ট করে ও লজ্জাহীন হইয়া পশুবৎ আচরণ করে তাহারা বিষ্ঠা, পূয়, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালাপূর্ণ সমুদ্রে পতিত হয় ও ঐ সব ঘৃণিত বস্তু ভোজন করে। দ্বিজ-কুলোদ্ভব যে ব্যক্তি স্ত্রীকে রেতঃ পান করায় সে রেতের নদীতে পড়িয়া রেত পান করে। ১৯। সারমেয়াদন—যে দস্যুবৃত্তি করে, গৃহে অগ্নি দেয়, বিষ দেয়, রাজা বা রাজসেনাগ্রাম কিম্বা সার্থ বিলোপ করে তাহাকে ৭২০টা যমদূত কুকুরে বজ্রতুল্য দংষ্ট্রা দিয়া চর্ব্বণ করে। ২০। অবীকি—যে সাক্ষ্য-দান সময়ে, ক্রয় বিক্রয় কালে, দান সময়ে কোন প্রকার মিথ্যা কহে, যমদূত শত যোজন উচ্চ পর্ব্বত হইতে অধঃশির করিয়া অবীচিসৎ নরকে ফেলিয়া দেয়। (অবীচিসৎ—পাষাণ পৃষ্ঠস্থ তরঙ্গশূন্য জলের ন্যায় প্রকাশ) নরকে নিক্ষিপ্ত হইলে তিল তিল করিয়া শরীর কর্ত্তন হয় তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় না। ২১। অয়ঃপান—সুরাপায়ী। বুকে পা দিয়া অগ্নি সংযোগে দ্রবী-ভূত লৌহ সর্ব্বাঙ্গে সেচন। ২২। ক্ষারকর্দ্দম—যে অধম পুরুষ মহৎ বলিয়া অহঙ্কার করে এবং বিদ্যা, সদাচার, বর্ণ, আশ্রম, তপস্যা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অসম্মান করে, ক্ষার কর্দ্দমময় নরকে অধঃশির হইয়া যাতনা ভোগ। ২৩। রক্ষোগণ ভোজন—প্রাণহিংসাকারী, মনুষ্য ও পশুর মাংস ভোজনকারী। হিংসিত নর ও পশু রাক্ষসমূর্ত্তি ধরিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন করিয়া তাহার শোণিত পান করিয়া নৃত্য করে। ২৪। শূলপ্রোত—বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল ও সূত্রাদিতে বদ্ধ করিয়া ক্রীড়া পূর্ব্বক যাতনা দেয়। যমালয়ে শূল যাতনায় দেহ পোঁতা, কঙ্ক, বটাদি পক্ষী তীক্ষ্ণ তুণ্ডে আঘাত করে। ২৫। দন্দশূক—যে সকল ব্যক্তি উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া লোকের পীড়া জন্মায়। পঞ্চমুখ ও সপ্ত মুখ সর্প সকল মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করে। ২৬। অবটনিরোধন—যাহারা অন্ধকারময় গর্ত্ত, তুষানল ও গুহাদিতে প্রাণীগণকে অবরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়। পরলোকে ঐ ঐ যাতনা ও বিষ সহিত অগ্নি ও ধূম দ্বারা

যাতনা পায়। ২৭। পর্য্যাবর্ত্তন—যে গৃহস্বামী হইয়া অতিথি অভ্যাগত দেখিলে ক্রুদ্ধ হইয়া বক্র দৃষ্টিতে দেখে। বজ্রতুল্য তুণ্ডধারী পক্ষীগণ চক্ষুর্দ্দয় উৎপাটন করে। ২৮। শূচীমুখ—ধনগর্ব্বিত ও ধনব্যয় বিস্তার যাহাদের স্বাস্থ্য নাই ও ধন লইবে বলিয়া গুরুজনের প্রতিও আশঙ্কা করে ও যক্ষের ন্যায় ধন রক্ষা মাত্র করে। যমদূত তন্তুবায়দিগের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়া সূত্র প্রোত করে।

উল্লিখিত ২৮টি প্রধান নরক। শুকদেব বলিয়াছেন "এবং বিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ সহস্রশঃ" অর্থাৎ যমালয়ে উক্তরূপ শত শত সহস্র সহস্র নরক আছে। আরও যে সকল পাপীর উল্লেখ হইল তাহারা পর্য্যায়ক্রমে (পাপানুসারে একটির পর একটি করিয়া) ঐ সকল নরক ভোগ করে।

তথৈব ধর্ম্মানুবর্ত্তিন ইতরত্র ॥ ৪৫

ইহতু পুনর্ভবে তে উভয় শেষাভ্যাং নির্ব্বিশন্তি ॥ ৫স্ক—৪৬

যেরূপ পাপী পাপ অনুসারে নরকগামী হয়, সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী আপন কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা পরলোকে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহাদের ভোগ একেবারে শেষ হয় না। কিন্তু বাকি থাকে। সেই জন্য ঐ সকল ব্যক্তিকে পুনরায় জন্ম লইয়া ভোগের নিমিত্ত মর্ত্তলোকে প্রবেশ করিতে হয়। উঃ কি ভয়ঙ্কর শাসন! এ পিনাল-কোডের কাছে ইংরেজের দণ্ডবিধি আইনের দাঁড়াইবার যো নাই।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৫৮

গীত—মালসী।

রণে জয় জয় বাজনা বাজে।
অসুর বধিতে দশাসুর সাজে ॥ ধ্রু।
রুধিরে তন্ময় হইয়া বিরাজে।
এক মধ্যে মৈষাসুর আর মৃগরাজে ॥
দ্বিজরাজ গোবিন্দ কহে সব রস ভুলি।
এইবার উদ্ধার কর চরণ যুগলি ॥

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

মৎস্যের স্মরণশক্তি।

সম্প্রতি "ন্যাচারল্ সায়ান্স" (Natural Science) পত্রে ফ্রাঙ্কফোর্টের ডাক্তার এডিন্‌গার্ একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, "মৎস্যে পূর্ব্বস্মৃতির ধারণা করিতে সক্ষম কি না এবং সেই ধারণার প্রভাবে তাহারা তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর বিষয় বুঝিতে পারে কি না?" তিনি বলেন উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে মানসিক বৃত্তির তারতম্যের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মস্তিষ্কের কোনও কোনও অংশ মানসিক কার্য্যের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। উচ্চ জীবদিগের মধ্যেই কেবল এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী দেখিলে প্রতীতি হইবে প্রধানতঃ ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া মস্তকের পুরোভাগে, মধ্যে ও পশ্চাতে অবস্থিতি করে। উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে বয়সাধিক্য হইলে ঐ অংশ গুলির বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মৎস্য ও ভেক প্রভৃতি জলজন্তুর মস্তিষ্কে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি বৃদ্ধি সহকারে মস্তিষ্কের পুরোভাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অপর দুইটী অংশ একত্রে জড়াইয়া গিয়া পশ্চাতে ঝুলিয়া পড়ে। মনুষ্যের মস্তিষ্কের পুরোভাগ এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে শেষোক্ত দুই অংশ আদৌ দেখা যায় না। মনুষ্যের মস্তিষ্ক মৎস্যদিগের ন্যায় চোস্ত না হইয়া আক্রোটের সারাংশের ন্যায় কোঁকড়ান ও উঁচুনিচু। এই প্রকারে মস্তিষ্কের উপরিভাগ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলেও তৎসহ সচরাচর উহার আকৃতি বর্দ্ধিত হয় না। মস্তিষ্কের বহির্ভাগের আবরণকে Cortex বলে; ইহা মানসিক ক্ষমতা ও স্মারকতা শক্তির প্রধান আবাসস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; মানব ও অন্যান্য উচ্চ জীবের মস্তিষ্কের বিশেষরূপ পর্য্যালোচনায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে সুতরাং উহাকে একরূপ অভ্রান্ত মত বলা যায়। বিগত কয়েক বৎসর হইতে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা করিয়া বলেন যে মৎস্যের সম্মুখস্থিত মস্তিষ্কে Cortex নাই সুতরাং স্মৃতিশক্তির আবাস ঐ স্থলে হইতে পারে না; অন্য কোনও স্থানে অবশ্যই আছে। ডাক্তার এডিন্‌গার্

বলেন মৎস্যের স্মরণ-শক্তি আছে কি? যদি বল আছে ও ঐ শক্তির ব্যবহার করিতে সক্ষম তাহা হইলে এটী অবশ্য মানিতে হইবে যে মস্তিষ্কের Cortex এ স্মৃতি-শক্তি অবস্থিতি করে এই মত সর্ব্বজীবে প্রযুজ্য নহে অথবা ঐ সিদ্ধান্ত একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হয়। সকলেই জানেন, মৎস্যের স্মরণ-শক্তি আছে, তাহারা লোক চিনিতে পারে এবং শিক্ষা পাইলে পরিচিতের নিকট হইতে খাদ্য লইয়া ভক্ষণ করে, বিশেষতঃ যে স্থানে বিপদের আশঙ্কা তথা হইতে প্রস্থান করে, এবম্বিধ নানা প্রকারে তাহাদের স্মারকতা-শক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তটী কতটা সত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন; এরূপও হইতে পারে যে আমরা অপর জীবে যে সকল বৃত্তি বা শক্তির আরোপ করি তাহা তাহাদের মধ্যে আদৌ নাও থাকিতে পারে। এই সমস্তই বৈজ্ঞানিকদিগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। ডাক্তার এডিন্‌গার্ প্রাণিতত্ত্ববিৎ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদিগের এবিষয়ে মত সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন, দেখা যাউক ফল কিরূপ দাঁড়ায়।

কৃত্রিম আলোক-যন্ত্র।

দুই বৎসর গত হইল বেন্‌হাম্ (Mr. C.E. Benham) সাহেব এই নামে একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। একখানি গোলাকৃতি চাক্তির উপরের অর্দ্ধভাগ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল, বক্রী শ্বেতবর্ণ বৃত্তার্দ্ধের উপর পেনে করিয়া কোনওরূপ বিশেষভাবে চারিটী শ্রেণীতে কয়েকটী বৃত্তাভাস রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ চক্রটী একদিকে ঘুরাইলে উক্ত কাল রেখা গুলির বহির্ভাগ উজ্জল লালবর্ণ ও অভ্যন্তর নীলবর্ণ দেখাইত। মধ্যবর্ত্তি রেখাগুলি রঙ্গীন বলিয়া বোধ হইত কিন্তু উহা কোন্ রং তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না, ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ রং দেখিত। উহা পুনর্ব্বার ভিন্ন মুখে ঘুর্ণিত করিলে রংএরও পরিবর্ত্তণ পরিলক্ষিত হইত। এই যন্ত্রটী কি ও কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অনেকে মাথা ঘামাইয়াও স্থির করিতে পারেন নাই। একজন একরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, অন্যজন তাহা খণ্ডন করিয়া অপর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু পরিশেষে সকলের মতই ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল; এ বিষম সমস্যা—এ ধাঁধার সঠিক উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না।

সম্প্রতি বিড্ওয়েল সাহেব (Mr. Shelford Bidwell) নানারূপ বিশ্লেষণের পর কেবল মাত্র লোহিত ও নীল রং এর কারণ নির্দ্ধারণে সক্ষম হইয়াছেন। বিড্ওয়েল সাহেব একটী বাক্সের পার্শ্বে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত গোলাকার গর্ত্ত করিয়া সাদা কাগজ দিয়া আবৃত করিলেন ও তদুপরি এক ইঞ্চির একের পঁচিশ অংশ চওড়া একটী টিন্ খণ্ড আঁটিলেন, বাক্সের অভ্যন্তরে ৮টী বাতির সমকক্ষ একটী ল্যাম্প রাখিলেন ও উক্ত গর্ত্তটী একটী খড়খড়ির দ্বারা আবদ্ধ করিলেন, উহা আবার শক্ত স্প্রীংএর দ্বারা সংযুক্ত করিলেন যে অল্পায়াসেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই খোলা যাইতে পারে। একটী অন্ধকার ঘরে ঐ বাক্সটী লইয়া গিয়া উহার খড়খড়িটী খুলিবা মাত্র একটী অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। উক্ত শ্বেত চক্রের আকৃতি শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আবার কিছুক্ষণ পরে উহা কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল; সেই মুহূর্ত্তে একটু খুব সূক্ষ্ম লোহিত রেখা সামান্য নীল আভার দ্বারা পরিবৃত হইয়া উক্ত চাক্তির ধারের চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হইল, দেখিতে দেখিতে ঐ নীল আভা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া এক ইঞ্চেরও অধিক স্থান অধিকার করিল, আবার এ কি? ঐ লোহিত রেখা ও নীল আভা হঠাৎ ক্ষীণ হইয়াই কোথায় অদৃশ্য হইল আর দেখা গেল না, ঐ লাল রং উক্ত টিনখণ্ডে বেশী উজ্জল ভাবে দেখা গিয়াছিল।

পুনরায় অন্যভাবে পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এবার আর সে ল্যাম্পটী ব্যবহৃত হইল না। দুইটী বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের সাহায্য লওয়া হইল ও তাহা এরূপভাবে রক্ষিত হইল যে মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্বালাইতে ও নিবাইতে পারা যায়। এইরূপে দুইটী আলো নিবাইয়া দিয়া হঠাৎ ভিতরের আলোটী জ্বালিয়া দেওয়া হইল, তৎপরে বাহিরেরটী জ্বালা হইল, এইরূপ বার বার করিতে করিতে ঐ বাক্সের সেই টিন খণ্ডটুকু যত স্পষ্ট দৃষ্ট হইল ততই কৃষ্ণবর্ণ অদৃশ্য হইয়া লোহিত বর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে যে রংএর তারতম্য 'সহানুভূতিক উত্তেজনার' (Sympathetic excitation) দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। চক্ষুর যে অংশ লোহিত বর্ণ গ্রহণে সক্ষম তাহা লাল বর্ণের আলো দেখিলে চক্ষু-পুত্তলির চতুর্দ্দিক অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে কিন্তু যে শিরাগুলি অন্যান্য রং গ্রহণে সক্ষম তাহারা সে সময়ে ততটা কার্য্যকারী ক্ষমতা প্রকাশ করে না।

অনুরূপ পরীক্ষার দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে। একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একাংশে হঠাৎ আলোক অদৃশ্য হইলে ঐ অংশের চতুর্দ্দিকে একটা সাময়িক নীল রেখা পরিদৃষ্ট হয়। এখানেও সেই সহানুভূতিক উত্তেজনার কার্য্য; তখন চক্ষু পুত্তলীর চতুর্দ্দিকে লোহিত রং গ্রহণের উপযোগী ক্ষমতা নিস্তেজ হইয়া পড়ে সুতরাং একমাত্র সবুজ নীল রং দৃষ্ট হয়। কেন এই সহানুভূতিক উত্তেজনা হয়, এই প্রশ্নের উত্তর অদ্যাপী কেহ দিতে পারেন নাই তবে মহা মহা বৈজ্ঞানিকেরা ঐ তত্ত্বে ঘুরিতেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ল্যাপল্যাণ্ডের বিবাহ-প্রথা।

য়ুরোপ-খণ্ডের উত্তর প্রান্তে বিজন অবস্থানী ও তুষার বিমণ্ডিত শৈলমালায় পরিবেষ্ঠিত ল্যাপল্যাণ্ড প্রদেশের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। এই দেশ আমাদের সূর্য্যদেবের রাজত্বের সীমানার বাহিরে বলিলেও চলে। এখানে আর তাঁহার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিবার যো নাই। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস তো কাছে ঘেঁসিতেই পারেন না আর ছয় মাস উঁকি ঝুঁকি মারেন, তবে সেটা বড় কাজের নয়, সূর্য্যদেবকে এইখানেই হারমানিতে হইয়াছে। এ দেশটা সৃষ্টিছাড়া বলে বোধ হয়। কাক কৃষ্ণবর্ণ সবাই জানেন কিন্তু এদেশে ঠিক তাহার উল্টা—তুষারে শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখানকার শীত যেমন তেমন নয়, খুব মোটা বনাতেও সানায় না। শ্বেত ভল্লুকের চামড়ার কোট সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ল্যাপল্যাণ্ডে সবই নূতন—প্রাকৃতিক নিয়মের যেরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সামাজিক প্রথারও ঠিক সেই রকম হইয়াছে। এদেশের বিবাহ-প্রথা এক অভিনব ব্যাপার। যদি কোনও যুবক কোনও কুমারীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তো কুমারীর আত্মীয় স্বজনের মত লইতে হইবেই কিন্তু তাহা হইলে শুধু চলিবে না। ঘোড়দৌড় সকলে দেখিয়াছেন কিন্তু এখানে যুবকযুবতীর দৌড় (Race) হয়। পাত্র পাত্রীর আত্মীয় কুটুম্বগণ কোনও নির্দ্দিষ্ট ময়দানে সমবেত হন। তাঁহাদের সমক্ষে কুমারীকে দৌড়াইতে বলা হয়। কুমারী নির্দ্দিষ্ট স্থানের

তিন ভাগ পথ গমন করিলে বিবাহার্থী যুবক তাঁহাকে ধরিবার জন্ত দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে তথাকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের স্তায় সুস্থকায়া ও বলিষ্ঠা; কুমারী ইচ্ছা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে না চলিলে তাঁহাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। যুবক প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইতে থাকেন, কুমারী যদি তাঁহার প্রতি মনে মনে আসক্ত হয়েন তবেই যুবকের আশা সফল হইয়া থাকে, তিনি তখন কোনও না কোন ওজর করিয়া মন্থর গতিতে চলেন (Without Atlanta's golden balls to retard her speed) কাজেই যুবক অক্লেশে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিতে পাবেন। কিন্তু কুমারীর মনোগত ভাব অন্তরূপ হইলে বিবাহার্থী যুবকের আশালতা মুকুলিতা হইবার পূর্ব্বেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। কুমারী দ্রুত গতিতে গমন করিয়া, পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপনীত হন; তাহা হইলে সেই খানেই বিবাহের প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি হইল বুঝিতে হইবে। ইহার পরও যদি যুবক পুনরায় ঐ কুমারীকে বিবাহের প্রস্তাব করেন তাহা হইলে উহা একটী গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

শ্যামরাজের স্ফটিক গ্রীষ্মাগার।

এই ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে প্রাণী মাত্রেই গরমে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কাহারও প্রাণে শান্তি নাই, সকলেই একটু আরাম প্রত্যাশী। তাই কোন প্রাণারামদায়ী স্থলের বর্ণনা পাঠ করিলেও প্রাণটা অনেক ঠাণ্ডা হয়।

ফারেটিয়ার (Furetiere) সাহেব শ্যামরাজের নূতন স্ফটিক গ্রীষ্মাগারের বেশ সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীষ্ম-বাটিকার অভ্যন্তরের টেবিল্ চেয়ার প্রভৃতি সমস্ত আসবাবপত্র স্ফটিক নির্ম্মিত। গৃহের মেজে দেওয়াল্ ও ভিতরের ছাদ, এক ইঞ্চ পুরু ও ছয় বর্গফুট পরিমিত বরফ খণ্ডের সমষ্টি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, মিলন স্থান গুলি এক রকম কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ সিমেণ্ট দ্বারা এরূপভাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে, যে তাহার ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই বাটিকার একটী মাত্র দ্বার আছে, তাহা এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিতে পারা যায় যে বিন্দুপরিমাণ জলও তাহাতে দুষ্প্রবেশ্য। একজন চীন শিল্পী এই গ্রীষ্মাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অসহ্য গ্রীষ্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহা এক উপযুক্ত স্থান। বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত বহুমূল্য মর্ম্মর প্রস্তর

নির্ম্মিত একটী কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যস্থলে, এই বাড়ীটী অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তর দৈর্ঘ্যে ২৮ ফিট ও প্রস্থে ১৭ ফিট। এই জলটুঙ্গিটী পনর মিনিটের মধ্যে জলে পরিপূর্ণ ও ঐ সময়ের মধ্যে জল নিঃসৃত করিতে পারা যায়। গৃহস্থিত মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ডের নিম্নে জলাশয়ের সহিত সংযুক্ত একটী ফটক আছে, ঐ ফটকটী খুলিবা মাত্র সমস্ত গৃহ জলে পূর্ণ হইয়া যায়, কিয়ৎকাল পরে জল নিষ্কাশিত করিলে, ঘরটী অত্যন্ত শীতল ও আরামদায়ক হয়। গৃহের চতুর্দ্দিকে সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ ও গৃহের স্নিগ্ধকারী শীতলতা স্থানটী-কে যথার্থই চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করিয়া তুলে।

সহযোগী সাহিত্য।

অধ্যাপক ড্রামণ্ড।

অধ্যাপক ড্রামণ্ডের (Prof. Henry Drumond) কোনও বন্ধু লিখিয়াছেন যে ড্রামণ্ডের মৃত্যুতে জগতের কি মহান্ ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাঁহার বিশেষ পরিচিত বন্ধু ব্যতীত কেহ বলিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম নহেন। ড্রামণ্ড কি প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা তাঁহার লেখনীতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একজন চিন্তাশীল, মানসিক শক্তি সম্পন্ন এবং নিঃস্বার্থ-পর লোক ছিলেন। তাঁহাকে প্রথম দেখিবা মাত্র মনে হইত, যেন তাঁহার মুখোমণ্ডলে কি এক গভীর চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু বহুক্ষণ কথোপকথন করিলে পর, সে ছায়াটী অপসৃত হইয়া প্রফুল্লতা বিকশিত হইত। তাঁহার সহিত যে কোন বিষয়ে কথাবার্ত্তা হউক না কেন, তিনি তাহার ভিতর হইতে এমন সুন্দর সুন্দর ভাবের অবতারণা করিতে পারিতেন, যে লোকে তাহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিত। মনুষ্যবদনে অন্তরের ছবি প্রতিভাত হইয়া থাকে, এইমত অধ্যাপক ড্রামণ্ডের প্রতি প্রযুজ্য হয় না কারণ তাঁহার ছবি দেখিলে তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা ঠিক বুঝা যাইত না! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "হ্যাডো হাউসে"র (Haddo House) বৈঠকখানা ঘরে তাঁহার সহিত যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন আমার মনে হয় নাই যে এই দীর্ঘাকার, সুন্দর কেশবিশিষ্ট, সৈনিক পুরুষের ন্যায় লোকটী "আধ্যাত্মিক জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম" (Natural Law in the

Spiritual World) শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা। গৃহটী আমন্ত্রিত লোকে পরিপূর্ণ ছিল, সকলেই পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে ব্যস্ত সুতরাং যখন ড্রামণ্ড ধীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাহা গৃহকর্ত্রী লেডী গর্ডন ভিন্ন আর কেহই লক্ষ্য করিলেন না। তিনি দ্রুতপদে অধ্যাপকের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার কোটের বোতামের ছিদ্রতে একটী গোলাপফুল পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তাঁহার সহিত আমার আলাপ হওয়ার পর কফি সেবন কালে কথোপকথনচ্ছলে আমাকে বলিলেন 'আমি সম্বাদপত্র সম্পাদকদিগকে কিছু ভয় করি। তাঁহারা ও মার্কিন বাসীরা আমাকে বড়ই লাজুক করিয়া তুলিয়াছেন। আমি যত গোপনে অল্প লোকের সমক্ষে বক্তৃতা করি না কেন পরদিন নিশ্চয়ই তাহা সম্বাদপত্র সমুহে প্রকাশিত হইত তাহা আবার এরূপ দুর্ব্বোধ্য ভাবে হইত, যে সে বক্তৃতা আমার কি না সে বিষয়ে আমারই ঘোর সন্দেহ হইত অন্যে কা কথা'! একদা আমি একটী সামান্য সভায় "জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, সে কথা তারপরে আমার আর মনে ছিল না। কিয়ৎকাল পরে একটী সুইস্ হোটেলে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে কোন ভদ্র-মহিলা আমার হস্তে একখানি পুস্তিকা দিলেন, তাহা পড়িয়াই তো আমি অবাক্, একি! কিছু পূর্ব্বে সেই ক্ষুদ্র সভায় আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাই ঐ পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। ঐ বক্তৃতা প্রকাশ করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে আত্ম-সম্মান রক্ষার্থ ঐ পুস্তিকা খানি সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বক্তৃতাদি সাধারণে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, তবে যখন দেখিলাম যে ষোলটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, আমার বক্তৃতাদীর অনুবাদ হইয়া গিয়াছে, তখন ভাবিলাম যে আর উহা গুপ্ত রাখার কোনও ফল নাই, সকলে যদি উহা পাঠ করিয়া উপকৃত হয় হউক, তাহাতে লাভ বৈ ক্ষতি নাই।" তিনি সর্ব্বদাই কোনও না কোনও গুরুতর বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, সময়ে সময়ে তাহা তাঁহার মুখে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িত, যেন তিনি কল্পনার সাহায্যে কোন্ স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, এবং তথা হইতে আত্মাপরিপোষক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি কখনও কখনও বলিতেন "আমার কার্য্য বহির্জ্জগতে আবদ্ধ নহে, আমি কেবল বক্তৃতা বা ধর্ম্মপ্রচার করিবার

জন্ম জন্ম-গ্রহণ করি নাই, আমার কার্য্য সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত আছে, বিশেষতঃ ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে।" ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, তিনি মনোভাব গোপন করিলেও তাহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িত।

গ্রীষ্মকাল, সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন, পশ্চিম গগণ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, দুই একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, বায়ুর ভরে নাচিতে নাচিতে সূর্য্যের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যের ম্লান আভা তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, হ্যাডো হাউসের উদ্যানে দাঁড়াইয়া আমি প্রকৃতিদেবীর এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, এমন সময় উদ্যানস্থিত ধর্ম্মমন্দির হইতে, অধ্যাপকের মুখ নিঃসৃত সুন্দর ও হৃদয়োন্মাদক ধর্ম্মোপদেশ, আমার কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিয়া, আমাকে উন্মাদ করিয়া দিল, আমি স্মৃতি হারাইলাম জগৎসংসার ভুলিলাম, কোথায় আছি তাহাও মনে পড়িল না।' ভাবিলাম আমি কোন্ স্বপ্নময় রাজ্যে আসিয়াছি, অধ্যাপকের উপদেশাবলি যেন স্বর্গ হইতে মুক্তবৃষ্টির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল—আমি তথায় স্তব্ধ হইয়া রহিলাম—সে দৃশ্য এজন্মে ভুলিব না—সে দিন যে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা আর এজন্মে পাইব না। আজিও এতদিন পরে তাঁহার কথাগুলি আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। সে মহাত্মা আর ইহজগতে নাই। তাঁহার প্রিয় জীবনসঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিলাম—

"জীবনের কার্য্য করি সমাধান
জীবন মুকুট করি জয়
লভিব বিশ্রাম মোরা
সমাধি-মন্দিরে—"

মানচিত্র।

(সমালোচনা।)

আজকাল অনেক বিষয়েই বাঙ্গালী উন্নতি লাভ করিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশের সহিত প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রেও জয়লাভ করিতেছেন, এই সকল দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয় যে, বাঙ্গালী একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বাঙ্গালী সচরাচর অলস, উৎসাহ বা স্ফূর্ত্তি আদৌ নাই, তাহাদের দৈনিক জীবনে নূতনত্ব কিছুই নাই একঘেয়ে (Monotonous) তাহাদের দৈনিক কার্য্য, সেই একই সুরে বাঁধা From blue bed to the brown ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই নিশ্চেষ্ট ও অসাড় জাতির ভিতর হইতে, মধ্যে মধ্যে দুই একজন অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি উত্থিত হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন দেখিলে মনে হয়, বুঝি কালে কবির আক্ষেপোক্তি 'ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি' এই দুরপনেয় কলঙ্ক দূর হইবে।

অধ্যাপক বসু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সভ্যজগৎকে চমকিত করিয়াছেন, অতুলচন্দ্র সিভিল সার্ব্বিসে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া সাহেবদিগকে দেখাইয়াছেন, যে চেষ্টা করিলে বাঙ্গালী প্রতিযোগীতা-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে পারেন, আর দক্ষিণ আমেরিকায় লেপ্টেনাণ্ট সুরেশচন্দ্র অকুতোসাহসের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, জগৎকে দেখাইয়াছেন যে সুশিক্ষা পাইলে, নির্জ্জীব ও দুর্ব্বল বাঙ্গালীও রণরঙ্গে মাতিতে পরাঙ্মুখ নহে। যে শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠার জন্য এককালে ভারত জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ তাহা কোথায়—কালের কুটিল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাই এই দুর্দ্দিনে শিল্পের কথা শুনিলেও প্রাণে আশার সঞ্চার হয় যে, কালে বাঙ্গালী আবার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। তাই কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় শিল্প প্রদর্শনী দেখিয়া, আমাদের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য দেখিলাম, তাহার মধ্যে অনেক গুলি দেখিয়া আমাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল, যে সে গুলি সত্য সত্যই বাঙ্গালী দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে কি না। আমরা বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারে এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছি যে, দেশী কোনও জিনিষ দেখিলেই অমনই

ধরিয়া লই, যে উহা নিশ্চয়ই কোনও না কোনও অংশে বিলাতী অপেক্ষা নিকৃষ্ট—আমাদের চক্ষে Jaundice লাগিয়া আছে যাহা দেশী তাহাই মন্দ যাহা বিলাতী তাহাই ভাল এই আমাদের সচরাচর ধারণা। কিন্তু সে দিন অকস্মাৎ যেন আমাদের Jaundice কাটিয়া গেল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, প্রদর্শনীর অনেক গুলি দ্রব্য বিলাতী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, কোনও কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ, এই সকলের মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তিশালী বংশবাটী নগরীর কৃতি সন্তান বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর কৃত মানচিত্র গুলি যথার্থই দেখিবার জিনিষ। বাঙ্গালীর দ্বারা এরূপ সুন্দর মানচিত্র হওয়া, এক মহা আশ্চর্য্যের বিষয়। একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ উক্ত প্রদর্শনীর দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এদেশে ঐ মানচিত্র গুলি প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চান নাই। তিনি বলিলেন যে "আমি স্বচক্ষে এই মানচিত্র গুলি এদেশে বাঙ্গালী দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে, না দেখিলে, উহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না, আমার ধারণা যে ঐগুলি বিলাত হইতে তৈয়ার করিয়া আনান হইয়াছে।" পাঠক ইহাতেই বুঝিতেছেন, যে মানচিত্র গুলি কেমন উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে লণ্ডনের Royal Geographical Society নামক সভায় দেবেন্দ্র বাবুকে একজন Fellow নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই সম্মানে শুধু যে দেবেন্দ্র বাবু সম্মানিত হইয়াছেন তাহা নহে, ঐ সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্র বাবুর স্বদেশবাসীগণও সম্মানিত হইয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া, এদেশে মানচিত্র ব্যবসায়ের এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মানচিত্র গুলি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। এটা যে আমাদের কথা তাহা কেহ মনে করিবেন না, বঙ্গ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতির ছোটলাট, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়গণ, মোক্ষমুলার, হাণ্টার প্রভৃতি মনীষীগণ ও প্রধান প্রধান সম্বাদ পত্র সমূহ একবাক্যে তাঁহার মানচিত্র গুলির প্রশংসা করিয়াছেন।

সম্প্রতি শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক কোনও ব্যক্তি দেবেন্দ্র বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আবির্ভূত হওয়ায়, ডিরেক্টার মার্টিন মহোদয় ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল ষ্ট্রেহান সাহেবকে (Major General Strahan R.E. Surveyor-General of India) দুই জনের মানচিত্রের সমালোচনা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেবেন্দ্র বাবুর

মানচিত্র গুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। *আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি দেবেন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ এইরূপ শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বঙ্গের মুখ উজ্জল করুন।

মাসিক সাহিত্য।

(সমালোচনা।)

সাহিত্য। মাঘ। ১৩০৩। এ মাসের সাহিত্যের সর্ব্ব-প্রথম প্রবন্ধ বাবু জলধর সেনের 'গঙ্গোত্রীর পথে'। জলধর বাবু খুব সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রবন্ধ গুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক। বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'আকবর ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম' একটী উল্লেখ যোগ্য ও পাঠ্য প্রবন্ধ। 'সুরবালা' উপন্যাস এখনও চলিতেছে। 'বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহে' দুইটী আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। 'সহযোগী সাহিত্যে' 'বুদ্ধের জন্মস্থান' ও নবাবিষ্কৃত 'ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের' বিষয় অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নব্যভারত। চৈত্র ১৩০৩। এবারকার নব্যভারতের প্রথম প্রবন্ধ 'হীরাঝিল' বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এ। নিখিল বাবু হীরাঝিল লিখিতে লিখিতে নবাব সিরাজুদ্দৌলার ছবি বেশ সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী লালা বাবুর জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মন স্বতঃই আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলী দিয়া কঠোর বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করা বড় সোজা কথা নহে। লেখক একস্থানে একটু ভুল করিয়াছেন, লালা বাবুকে 'রাজা বাবু' বলিত না তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহকেই সকলে 'রাজা বাবু' বলিয়া অভিহিত করিত। সম্পাদক লিখিত 'রাজ-গৃহ' এখনও চলিতেছে, ইহাও এবারকার নব্যভারতের একটী উল্লেখযোগ্য ও গবেষনা পূর্ণ প্রবন্ধ।

*Extract from Circular No. 66 issued by Dr. C.A. Martin Director of Public Instruction Bengal, Dated the 15th April, 1897

Major-General Strahan সাহেবের মত—

DHAR'S MAP OF EUROPE—Names neatly and clearly written. Detail neat and not crowded. Hills very sketchy, but not so heavy as to obscure the other details. Colouring and registration of colour stones fairly good. A very creditable map on the whole and worth Rs. 4 as a school map.

CHATTERJEE'S MAP OF EUROPE—Names clumsily and heavily written. Details coarsely shown. Hills clumsily and heavily drawn. England looks like a mountainous country. Colouring patchy in places. A decidedly inferior map to Dhar's.

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সাল। | ২য় সংখ্যা।

মানব-জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি ?*

মানব-জীবনে সত্যসত্যই কোন দায়িত্ব আছে কি ? না, দায়িত্বের ধারণা মানবের কল্পনা মাত্র ? ইহজীবনে যদি কোন গুরুতর কথা চিন্তা করিবার থাকে—তবে সে এই কথা। কারণ দায়িত্বের মত একটা অনতিক্রমনীয় বিধি থাকিলে, মানবকে প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি কার্য্যে—প্রত্যেক চিন্তায় সতর্ক হইতে হইবে। অনুক্ষণ তাহাকে তাহার কার্য্য, বাক্য ও চিন্তার ফলাফল বিচার করিয়া তবে তাহায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কোন গতিকে দিনপাত করিলেই চলিবে না। দিন তো চলিয়া যায়—দিন চলিয়া গিয়া অনন্তে মিশাইয়া যায়। সে দিন আর ফিরিয়া আসে না, আমরাও সে অতীত দিনে ফিরিয়া যাইতে পারি না। দিন গেলেই, দিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ফুরাইয়া যায় ;—থাকে কেবল স্মৃতি, কিন্তু সে স্মৃতি মাত্র। দিন চলিয়া গেলেও, দায়িত্ববাদ অনুসারে, দিনের যে কার্য্য, তাহা দিনের সঙ্গে চলিয়া যায় না। তাহা অবস্থিতি করে, অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাহার বিচার হয়, সেই বিচার অনুসারে আমাদের পাপপুণ্য নির্দ্ধারিত হয় এবং পরিণামে আমাদিগকে সেই পাপপুণ্যের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। ইহারি জন্য

---

* "গতবৎসর, তালতলা লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইল।"

মানব-জীবন;—জীবনের আদ্যন্ত সেই বিচারের ফলাফল;—তদ্ভিন্ন জীবনের অন্য অর্থ নাই—অন্য উদ্দেশ্য নাই। দায়িত্বের ব্যাখ্যা এইরূপ। সুতরাং আমাদের কার্য্যাকার্য্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম—সুখদুঃখ—আমাদের সকলি, এই দায়িত্বে গ্রথিত। এ দায়িত্ব স্বীকার করিলে মানবের মত দায়গ্রস্তজীব আর নাই, অস্বীকার করিলে মানবের মত নিশ্চিন্ত-জীবও আর নাই। অতএব যাহার একটু চিন্তা-শক্তি আছে তাহারি, জীবনের এতবড় গুরুতর কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

যদি বল অত ভাবিবার চিন্তিবার প্রয়োজন কি? শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য করিয়া গেলেই তো হইল। এ কথার উত্তর,—শাস্ত্র "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।" শাস্ত্রের আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, তাহা, অকূল, অতল সমুদ্র বিশেষ। যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, নানা মুনি নানা মত প্রচার করিয়াছেন, শত, সহস্র, অযুত, অসংখ্য মস্তিষ্ক হইতে অনন্ত চিন্তা-প্রবাহ নির্গত হইয়া এক মহা সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে সে সমুদ্রে প্রবেশ করিলে দিশেহারা হইতে হয়, কোন একটা কূল দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন্ পথে যাইলে সে সমুদ্র পার হইতে পারিব তাহা নির্ণয় করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। একটা দিঙ্নির্ণয় যন্ত্র অর্থাৎ Compass সঙ্গে না থাকিলে, কার্ সাধ্য সে শাস্ত্র-সাগরের কূলে উত্তীর্ণ হয়! অতএব এই দায়িত্বরূপ Compass লইয়া নাহয় দেখা যাক্—একটা কূল মেলে কি না।

জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কিনা, মিমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে এই কয়টি কথার বিচার করিতে হইবে।

১ম। আমাদের একটা "আমিত্ব" আছে। অর্থাৎ আমি কেবল জড়-পদার্থের সমষ্টি নহে, "আমি" বলিয়া জড় হইতে কোন একটা পৃথক সত্তা আছে। ২য়। আমার একটা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা আছে, যদ্বারা আমি ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম। কারণ, কার্য্যটি আমার নিজ শক্তির দ্বারা কৃত না হইলে, তাহার ফলাফলের জন্য আমি দায়ী হইব কেন? ৩য়। আমার একটা বিবেক-শক্তি আছে, যদ্বারা আমি ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সক্ষম। ৪র্থ। যখন কোন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তখনকার আমি, এবং তাহার পরবর্ত্তী সময়ের আমি, একই ব্যক্তি। ৫ম। অন্যের, আমার কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিবার অধিকার আছে।

৬ষ্ঠ। আমার দণ্ড দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ৭ম। মানবের কার্য্যাকার্য্যের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ Standard আছে কিনা। ৮ম। আমাদের কার্য্যাকার্য্যের জন্য আমরা কাহার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য।

এই কয়টি কথা বিচার করিলে, দায়িত্ববাদের মর্ম্ম অনেকটা বোঝা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাক্, আমার "আমিত্ব" আছে কিনা।

"আমি কে ?" এই প্রশ্ন মনে উদয় হইলেই, এই প্রত্যক্ষমান জগৎ যেন দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরিত হইয়া যায়। মানব-ঐশ্বর্য্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ, অসীম সুখস্বচ্ছন্দতার ভাণ্ডার, ওই গগনস্পর্শী প্রাসাদমালা, মানব-প্রাণের নিরাপদ আশ্রম—ওই দেবমন্দির, মানব-বুদ্ধির আশ্চর্য্য বিকাশ ওই সেতুবন্ধন, ওই বাণিজ্য-পোত, মানব-বিলাসের অপরিমেয় প্রবাহ, ওই শত শত ঘোটক বাহিত-শকট-শ্রেণী, তদুপরি নানা বসনে ভূষিত, ওই মানবাকৃতি, মানব-জ্ঞানের অপরিসীম উচ্ছ্বাস, ওই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান,—মানবের এই কর্ম্মক্ষেত্র—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নি, আত্ম, বন্ধু পরিবেষ্ঠিত সংসার, এ সকলি যেন দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া বহুদূরে অবস্থিতি করে, সম্মুখে যেন এক অসীম অন্তঃশূন্য অতল গহ্বর বিরাজ করে, তাহারি গর্ভে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া মনে হয়—"আমি কি সত্য সত্যই আছি ?" কিন্তু কৈ, আর তো কিছুই নাই !—তবে কি আমি একা আছি ? আছি যদি, তো কোথায় আছি, কিসে আছি ? আমি হইলাম কি করিয়া—কোথা হইতে আসিলাম—যাইব কোথায় ? আমি আছি বৈকি,—নহিলে এ সকল প্রশ্ন করে কে ? তবে আমি কে ? আমি কি একখণ্ড মৃত্তিকা—না, কতকটা সলিল ? না একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ? না, একটা বাষ্পযন্ত্র ? না শূন্যময় চর্ম্মাকৃতি—কেবলি অস্থি মেদ মাংসের একটা পিণ্ড ? না, আমি একটা শব্দ, একটা গতি—না একটা মূর্ত্তি ? আমার এই দেহটা কি "আমি" ? না আমার মনটা "আমি" ?

এই সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলেও মনে হয়—এই কর্ম্মময় জীবন ধারণ করিয়া—এই কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া—কেমন করিয়া ভাবিব যে আমি নাই ! আমার একটা নিজত্ব (Individuality) বা আমিত্ব (Ego) নাই !—আমি কিছুই নহে—কেহই নহে !

বস্তুত, "আমি আছি"—"আমি একজন"—এ জ্ঞান এক প্রকার

স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু, "আমি"—জ্ঞান এত সহজ হইলেও, ইহার মীমাংসা নিতান্ত দুরূহ।

Plato বলিয়াছেন—The best way of arriving at truth is not very difficult to point it, but most hard to pursue. সে কথা সত্য। ভারতবর্ষ এখন অন্ধকারে,—ইউরোপ আলোকে। সেই আলোকপূর্ণ ইউরোপের কথাই আগে বিচার করা যাক্। আমরা এখন ইউরোপের শিষ্য। আমাদের গুরুভক্তিও বড বেগবতী। ইউরোপ যদি বলে "আমি নাই," আর স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া যদি বলেন—"আমি তোমায় সৃষ্টি করিয়াছি, তুমি আছ বৈ কি"; তথাপি আমরা "আমি নাই" বলিতেই অগ্রসর হইব। এখন দেখা যাক্ ইউরোপ কি বলেন।

ছয় সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ইউরোপে বিজ্ঞানের বিচার হইতেছে। জড় বিজ্ঞান লইয়া ইউরোপ যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষ বোধ হয় সেরূপ কখনো হয় নাই। ইউরোপের দেহতত্ত্ব (Anatomy) বিদ্ পণ্ডিতেরা মানবদেহ, মানবের হৃদয়, মস্তিষ্ক ক্ষত বিক্ষত করিয়া, অস্থি, মেদ, মাংস, শিরা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া "আমিত্বের" অনুসন্ধান করিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) বিদ্ পণ্ডিতেরা অনু পরমানুকে তন্ন তন্ন বিশ্লিষ্ট করিয়া "আমিত্বের" অনুসন্ধান করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান (Psycology) বিদ্ পণ্ডিতেরা, মন এবং তাহার উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া আমিত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার পর, ইউরোপের দার্শনিকেরাও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এক্‌হাতে "কার্য্য"—এক্‌হাতে "কারণ" লইয়া জ্ঞানমার্গের জটিল কুটিল নানাবিধ পথ আবিষ্কার করিয়া "আমিত্বের" অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানের বাতি নিবিয়া গেল—কিন্তু ইউরোপে, "আমি"—যে তিমিরে, "আমি" সে তিমিরে। যে সকল পণ্ডিতেরা সেরূপ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন, এক এক সময়ে তাঁহারা ইউরোপের মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছেন। এখনো কেহ কেহ করিতেছেন। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে, বিচার করিয়া দেখিবার উপযুক্ত। সকলের মতামত বিচার করিবার সাধ্য আমার নাই, তদ্রূপ কার্য্যের উপযুক্ত সময় এবং স্থানও, ইহা নহে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহারি

আলোচনা করিব। Stahl সাহেব একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জড়বিদ্ পণ্ডিতদিগের বিচারে পরিতুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন— The body has, as body, no power to move itself and must always be put in motion by immaterial substances. All motion is a spiritual act. যে মূল হইতে জীবনী-শক্তির উৎপত্তি, Stahl সাহেব তাহাকে "Soul" বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই "Soul" বা "আত্মা" সম্বন্ধে বলিয়াছেন—It does without teaching what it ought to do, and does it without consideration.

Schimid সাহেবও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বলিয়াছেন— Life is the activity of matter according to laws of organisation.

Muller সাহেব একজন প্রধান জড় শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। তিনি বলিয়াছেন—Organised beings are composed of a number of essential and mutually dependent parts.

Cuvier সাহেবও এ বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি বলিয়াছেন—Cause of life consists in the faculty which belongs to certain bodily combinations to continue during a determinate time under a determinate form constantly attracting into composition a part of the surrounding substances and giving up in return some part of their own substance.

Rev. Whewell সাহেব জড়বিজ্ঞানের আদ্যন্ত বিচার করিয়া বলিয়াছেন—All attempts to obtain a distinct conception of the nature of life in general, have ended in failure and produced nothing beyond a negative result.

তাহার পর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Huxley সাহেব বলেন—The properties of living matter distinguish it absolutely from all other kinds of things, and the present state of science furnishes us with no link between

the living and the unliving. * * of the causes which have led to the origination of living matter, it may be said that we know absolutly nothing.

ফলতঃ ইউরোপের জড়শাস্ত্রবিদ্ অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মত যে জড়েই জীবের উৎপত্তি, জড়েই স্থিতি, জড়েই লয়। জড়শক্তিই জীবের মূলে, মধ্যে ও অন্তে। জড় ব্যতীত জীবের পৃথক অস্তিত্ব নাই। মানবের দেহ, মন, প্রাণ, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধ্যান, জ্ঞান, তাহার অনুভূতি, আশক্তি, তাহার অনুমান, উপমান, তাহার মায়া, দয়া, স্নেহ, প্রেম, তাহার যপ্, তপ্, পূজা, অর্চ্চনা, তাহার ভাব-ভক্তি, সকলি জড়গত। জড়ই তাহার কর্ম্ম, জড়ই সে কর্ম্মের কারণ। জড়ই তাহার নিয়ম, জড়ই নিয়ন্তা।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ জীবনটা কি? এত আশা অভিলাষ, এত সুখ দুঃখ, কল্পনা, তাহার সকলি কি বৃথা! কত কার্য্য করিলাম, ভালমন্দ কত কার্য্যই করিলাম! তাহার কি আমি কেহই নহি? এত হাসিলাম, এত কাঁদিলাম! এত আপনার করিলাম, এত ভালবাসিলাম, সে সকলের কি আমি কিছুই নহি, কেহই নহি? আমি কি তবে ভূতের বোঝা বহিতেছি, আমি কি তবে চিনির বলদ! আমি যাহা কিছু করিতেছি, সে সকলি যদি জড়শক্তি দ্বারাই কৃত হইতেছে, তাহা হইলে আমার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? তবে আবার "আমি" "আমি" করি কেন? তাহা হইলে আমার "আমিত্ব" নাই—"আমি" নাই। আমার ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই, পাপও নাই, পুণ্যও নাই। তবে এপিকিউরস বা চার্ব্বাকের শিষ্যকে উপহাস করি কেন?

জড়বাদি হয়তো বলিবেন—ধর্ম্ম থাকিবে না কেন? জড় প্রকৃতির তো একটা বিধি রহিয়াছে, সামাজিক একটা বিধি রহিয়াছে, এই দুই বিধিই তোমার ধর্ম্ম। এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া জড়বাদি ও কারণবাদি উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই একটা বিচিত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহারা মানবকে হয় জড় বিধির, নয়, কার্য্যকারণ-বিধির একান্ত অধীন করিয়াও, তাহার একটা ঋণ খাড়া করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানব যখন জন্মাবধি জড়ের ও নরের নিকট ঋণি, সে ঋণ তাহাকে পরিশোধ করিতেই হইবে। তুমি যে দেশে, যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে দেশ, সে স্থান এবং সে সকল লোকের নিকট, তোমার অস্থি মজ্জা মেদ, এমন কি, তোমার

জীবন পর্য্যন্ত ঋণী। তদ্দেশের তৎস্থানের এবং সেই সকল লোকের উন্নতি-কল্পে তোমার জীবন উৎসর্গ করা উচিত। জড়-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গেও, তোমার চক্ষের উপর এই শিক্ষাই বিরাজ করিতেছে। অন্য কোন ধর্ম্ম নাই বা থাকিল। কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা স্বাভাবিক "ভাব" তো মানব মাত্রেরই রহিয়াছে, সে ভাব জড়শক্তি হইতে উদ্ভূত হইলেও—তাহাই মানবের একমাত্র পালনীয় ধর্ম্ম। নতুবা তুমি মনুষ্য-সমাজের সুখ-সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে অধিকারী নহ। তুমি সমাজ-বিধি পালন না কর, তুমি সমাজের চক্ষে ঘৃণিত হইবে। সমাজ-বিধির বিপরীত কার্য্য কর, তুমি সমাজের নিকট অপরাধী হইবে, দণ্ডনীয় হইবে। কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। কিন্তু বুঝিতে পারি না, যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, যাহার চিন্তার বা ভাবের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, যাহার কার্য্যাকার্য্য সকলি প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ পরম্পরায় ঘটিতেছে, তাহার আবার ঋণ কোথা হইতে আসিল ? ঋণ থাকিলেই বা কি ? সে ঋণ শোধ করিবার স্বাধীনতা কৈ ? কৃতজ্ঞতা বলিয়া যে একটা ভাব আছে বলা হইল, তাহারই বা মূল কোথায় ? তাহাও কি সমাজের রচনা নহে ? আর সমাজ ? তাহার সঙ্গে তো আমার ব্যবসাদারের সম্পর্ক, কেবল লাভ-লোক্সানের বাধ্যবাধকতা, Contractor এর ব্যবসা মাত্র। অধিক পরিমাণে Tender বা দাদন দিলেই সমাজের বড় বড় মানসম্ভ্রম, বৃহৎ বৃহৎ স্বাধীনতা ও সুখ-সম্ভোগ আমার আয়ত্বাধীন হইবে। যদি তাহাও না পারি তাহা হইলে, কৌশল বা চাতুরী বা তোষা-মোদ আছে, সমাজের চক্ষে ধূলা দিতে পারিলে বা তাহার কর্ত্তৃপক্ষকে অধিক পরিমাণে তৈলসেক করিলে, সকল অপরাধ হইতে নিস্কৃতি পাইব। কিন্তু ইহাই কি ধর্ম্ম ?

Bentham সাহেব Utility অর্থাৎ ক্ষতিলাভ গণনার উপর মানব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, জগদীশ্বরের সৃষ্টিকে একটি ইন্‌জিন বা বাস্পযন্ত্রে পরিণত করিতে চাহেন। মানব-হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে ব্যবসাদারের একটা নিক্তি, বা তৌলদাড়ি করিতে চাহেন, তাহার ওজন হইবে কি ? না, কতক-গুলো ছাই ভস্ম, কতকগুলো লাভ, আর লোক্সান্! লাভ লোকসানের কোন একটা পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে কি ? কি সম্বন্ধে লাভ ? জীব-নের উদ্দেশ্য কি ? সুখ্ তো ? একজনের যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে সুখ

হইতেও না পারে। যদি বল দশজনের যাহাতে সুখ, তাহাতেই আমার সুখ জ্ঞান করিব। তাহা করিলেও সুখের সীমা কোথায়? যখন বুঝিতেছ, সুখের একটা সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, তখন অনির্দ্দিষ্ট জিনিষের উপর কি বলিয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে চাও। ক্ষতিলাভ গণনার উপর মানব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, মানব ঘোরতর ব্যবসাদার হইয়া উঠিবে, দিন দিন তাহার লাভের কামনাই বৃদ্ধি হইবে, জীবনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, অশান্তিতে মানব অস্থির হইয়া উঠিবে। সেই অশান্তির জন্যই কি ধর্ম্ম? অন্তরের অন্তর খুঁজিয়া দেখ দেখি, ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝি? ধর্ম্ম বলিলেই মনে হয়, যে তাহা ইহ জীবনের একটি নিরাপদ আশ্রয়-স্থান। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা জীবনের শোক-তাপ, জুড়াইবার এক শান্তি-প্রস্রবণ। তাহাই যদি ধর্ম্মের অর্থ হয়, তাহা হইলে ওই কামনাপূর্ণ ক্ষতিলাভ গণনায় কি সে আশ্রয় লাভ হইতে পারে! পার্থিব বস্তুর আদি—মধ্য—অন্তঃ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, কিছুতেই সে শান্তি-নিকেতন নাই। অগত্যা মানবকে ভাবিতে হইবে কোথায় সে শান্তি-কুঞ্জ, কে সে শান্তি দাতা। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিলেন—সেরূপ শান্তিদাতা কেহ আছে কি না, তাহা কেহ জানে না, জানিতে পারে না। তিনি অনিশ্চিত, বা তিনি থাকেন থাকুন, আমাদের তাঁহাকে জানিবারও প্রয়োজন নাই। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে মনে হয়, যে তিনি থাকিলেও জীবের মঙ্গল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় হইতে পারে না। আমরাও যে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহারও উদ্দেশ্য জীবের মঙ্গল। জগদীশ্বর যদি থাকেন এবং এই বাহ্য-প্রকৃতি যদি তাঁহারি স্থষ্টি হয়, তবে আমরা তাঁহারি অভিপ্রেত কার্য্য করিতেছি। কারণ, এই শিক্ষাই প্রকৃতির পত্রে পত্রে লিখিত রহিয়াছে। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না, ধর্ম্মরাজ্যের কার্য্য ব্রিটীশ-রাজ্যের কার্য্যের ন্যায়, ছাপার ফরম পূরণ করিয়া চলে না। সম্রাজ্ঞী-ভিক্টোরীয়া কোথায় সাত সমুদ্র পারে বসিয়া আছেন, ভারতবর্ষে তাঁহার সকল কার্য্যই ছাপার ফরম পূরণ করিয়া চলিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের সম্রাটকে অতদূরে রাখিয়া, ছাপার ফরম পূরণ করিয়া সমাজ-রূপ কলেক্টরীতে মালগুজারি জমা দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, সে মালগুজারী সম্রাটের কাছেও পৌছায় না, প্রজাও নিরাপদে

থাকে না। প্রজার জমী-জমা শুকাইয়া যায়, ফশল জন্মায় না, সঞ্চিত ফশল লুটপাট হয়, প্রজার ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়। ধর্ম্মের রাজ্য বাহিরে নহে, সে রাজ্য মানবের হৃদয়ে। সে রাজ্যের রাজা নিজে উপস্থিত না থাকিলে, সে রাজ্য কিছুতেই রক্ষা হয় না। মুখে বলি, না বলি, অন্তরের অন্তরে বুঝিব যে আমার হৃদয়-রাজ্যের সম্রাট, আমার চোকের উপর, আমার বুকের ভিতর, আমার প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। আমি যাহা কিছু দেখিতেছি, সে তাঁহারি রূপ, যাহা কিছু পাইতেছি সে তাঁহারি কৃপা, যাহা কিছু করিতেছি, সে তাঁহারি কার্য্য, যাহা কিছু বলিতেছি, সে তাঁহারি গুণ, যাহা কিছু শুনিতেছি, সে তাঁহারি আজ্ঞা, যাহা কিছু ভাবিতেছি, সে তাঁহারি মহিমা। তিনিই আমার সম্রাট, তিনিই আমার পিতা, তিনিই আমার মাতা। আমার স্ত্রী, বা স্বামী, আমার পুত্র, বা কন্যা; আমার ভাই ভগ্নী বা বন্ধু, আমার আত্ম-পরিজন, সকলি তিনি, আমার সুখও তিনি, আমার দুঃখও তিনি, আমার ঐশ্বর্য্যও তিনি, আমার অভাবও তিনি। জগতে, তিনি আর আমি, এই দুই ছাড়া আর কেহই নাই, আর কিছুই নাই। ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানি;—ইহা ছাড়া যদি আর কোন ধর্ম্ম সম্ভব হয়, তবে সে মানবের বুদ্ধি বা ভ্রান্তির বিকাশ মাত্র। এ সকল কথা, এখন থাক্।

ক্রমশঃ

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্যমুখী।

কহ দেখি, সূর্য্যমুখি, সুবর্ণ বরণি,
কোথায় শিখিলে হেন অবিদিত নরে
প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা, দৃষ্টান্ত চরম?

আছে কি, লো চারুশীলে, সুদুর্জ্ঞেয় কোন
প্রেমতন্ত্রে লেখা তব প্রণয় পদ্ধতি?

সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করি, শুভাননে,
তব গাঢ় প্রেমযোগ—পূর্ণ একাগ্রতা।
প্রত্যূষে শিশির-জলে করি স্নান দান
আধ বিকসিত ভাবে চাহি পূর্ব্বপানে

ভাস্করের প্রতীক্ষায়, মরি, কি কঠোর
একাগ্রতা যোগে মগ্না হও লো সুন্দরি!
ঐকান্তিক ভাবে তুমি চাহি থাক বলি
স্নেহবিগলিত ভানু দেন দরশন
প্রতিদিন যথাকালে পূরব গগনে
পুরা'তে তোমার, সতি, একাগ্র বাসনা।
সমুদিলে প্রভাকর চাহি তাঁরপানে
স্থিরদৃষ্টে নিরন্তর নেত্রে নির্নিমেষ
কি সুন্দর যোগ, সতি, করলো সাধন?
উঠিলে মস্তকোপরি প্রখর তপন
উন্নমিয়া আপনার গ্রীবা সুকোমল
চাহি থাক দুর্নিরীক্ষ্য মার্ত্তণ্ডের প্রতি
(প্রেম-চক্ষে রবিকর তাও কি শীতল?)
আবার পশ্চিম প্রান্তে অস্তাচলশায়ী
হন যবে বিভাবসু তুমিও অমনি
হইয়া পশ্চিম মুখ হের তাঁর রূপ।
নাচে পাখী, গায় গান, কুহরে কোকিল,
গুঞ্জে অলি, করে ক্রীড়া পবন চতুর,
কতদিকে উঠে কত কৌতুক তরঙ্গ;
কিন্তু তব একাগ্রতা নহে বিচলিত
কোন মতে; কায়মনে কর উদ্‌যাপন
দুঃসাধ্য সে প্রেমযোগ বিস্ময়-জনক।
এইরূপে চখে চখে রাখি প্রাণনাথে
হারাও যখন তাঁরে সন্ধ্যার তিমিরে
সম্বরিয়া স্বর্ণকান্তি, অতুল সুষমা,
ক্ষণিক সংসার লীলা, না জানি সুভগে
চলি'যাও কুতূহলে কোন্ পুণ্য লোকে।
ক্ষুদ্র তুমি, কিন্তু এক আদর্শ মহৎ
ধরাতলে নারে নর চিনিতে তোমায়।

নহে বৃথা, সূর্য্যমুখি, তব প্রেম-যোগ,
অসামান্য একাগ্রতা, প্রভাবে যাহার
ভাস্কর শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রেম পরাধীন
বিনা সেই প্রেম যোগবল আসিত কি
দুর্জ্জয় তপন ঘুরে ঘুরে একই স্থানে
দেখা দিতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ?
যে'ত চলি এতদিন প্রচণ্ড বেগেতে
কোন্ দেশে, কেবা তার পাইত সন্ধান।
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছ তুমি তাঁর গতি।
বড় সাধ, সূর্য্যমুখি, লভিতে জনেক
তব সম যোগবতী প্রণয়িনী, শুভে,
পারে যে সুশীলা বিনা কর্কশ বচন,
কদাচার, কপটতা, তাড়ন, শাসন,
শুদ্ধ তব প্রদর্শিত প্রণালী ধরিয়া,
করিয়া বশতাপন্ন একাগ্রতা যোগে,
উচ্ছৃঙ্খল জীবনের নাশিয়া যাতনা,
নিয়ন্ত্রিত করিবারে জীবন আমার।
শিখাও, লো সূর্য্যমুখি, তোমার ও যোগ
দয়া করি, অপাংগুলে, শিখাও লো তারে
জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া যাহায়
স্থাপিয়াছি সযতনে হৃদয়-আকাশে।

কি লিখি?

সাময়িক পত্র সমূহে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য আমি প্রায়ই অনুরুদ্ধ হইয়া থাকি। এই পূর্ণিমার পক্ষ হইতেও কতবার অনুরোধ আসিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয়ের নামোল্লেখ থাকে না। যাঁহারা অনুরোধ করেন, তাঁহারা ভাবেন মহামহিমান্বিত লেখক মহাশয় দিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। সাধুসংকল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শিষ্টাচারনিবন্ধন আমার একটু অসুবিধা বোধ হইতেছে, কারণ 'কি লিখি?' সর্ব্বাগ্রে এই মহা সমস্যার পূরণ করিতে হইবে। এটি নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যের বাজার কিরূপ, আজকাল সাময়িক-সাহিত্যে কিরূপ প্রবন্ধ সময়োচিত ও সমধিক আদৃত, এক কথায় সুচতুর বৈদ্যের ন্যায় সাহিত্যিক নাড়ীটি ভাল করিয়া টিপিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে আমার প্রতিভা সাহিত্য-তরুর কোন্ শাখায় ছুটিবে ভাল। প্রথম তত্ত্বটি বহির্মুখ, দ্বিতীয়টি অন্তর্মুখ। শেষোক্তটিই বড় শক্ত কথা,—কারণ আত্ম-পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা আর নাই, প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। দার্শনিকেরা বলেন, যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, যে আপনাকে চিনিয়াছে,—তাহার সর্ব্ববিধ-জ্ঞানের অভাবই পূর্ণ হইয়াছে। এই জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধপুরুষেরাই অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন। তবেই দেখুন, প্রবন্ধের বিষয়োল্লেখ না করায় লেখককে কতটা বেগ পাইতে হয়।

এক্ষণে 'কি লিখি?' এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সাহিত্যের বিজ্ঞান শাখাটি বিলক্ষণ উচ্চ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটা ভারতের দারিদ্র্য-রোগের অব্যর্থ মহৌষধি বলিয়া অনেকের ধারণা, সুতরাং ইহার খুবই গৌরব। আমি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে কতকটা ভালবাসি, কেন না এ পথে উৎপাত কম। এই জাতীয় প্রবন্ধের দুই শ্রেণীর পাঠক থাকেন, এক যাঁহারা প্রবন্ধের মর্ম্ম বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; অপর যাঁহারা খাঁটি বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন, ইঁহারা বড়ই উদার প্রকৃতির লোক, অকাতরে ও মুক্তকণ্ঠে লেখকের

সুখ্যাতি করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নজরে প্রবন্ধ প্রায়ই পড়ে না, এ হিসাবে ইহাদিগকে বাদ দিলেও চলিত,—যদিই দৈবাৎ পড়ে, নবীন-বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের নূতন আমদানী বোধে 'অমৃতং বালভাষিতম্' স্মরণ করিয়া কৃপা-পরবশ হইয়া সমস্ত ত্রুটিই উপেক্ষা করেন। কেবল একটিমাত্র আপত্তি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে হইলে নামোল্লেখ না করিয়া কোনও ইংরাজী প্রবন্ধের বা গ্রন্থের অনুবাদ বা সারাংশ লেখাই আজকালকার রীতি দাঁড়াইয়াছে। এই উঞ্ছবৃত্তি সন্নীতির অনুমোদিত কি না সন্দেহ হয়। সে দিকে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেও—দুই তিন মাস পর্য্যন্ত মনোমধ্যে একটা উদ্বেগ থাকিয়া যায়, কেহ ধরিয়া ফেলিলেই পশার মাটী। অতএব বিজ্ঞানশাখা আপাততঃ বাদ দিলাম।

ইতিহাস লেখা একরকম মন্দ নয়। তবে সমালোচকের লোষ্ট্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে একেবারে অজ্ আগ্‌ডালে গিয়া বসিতে হয়—অর্থাৎ রাজা মান্ধাতার আমলের বা তৎপূর্ব্বের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়। ঋক্‌বেদের সময়ের ইতিহাসও সবিশেষ নিরাপদ। শেষোক্ত প্রকারের ইতিহাস বড় একটা কেহ পড়ে না সত্য; কিন্তু নাই বা পড়িল? দুই একটা ঋকের বিকটমূর্ত্তি দেখিয়াই—বিশেষতঃ "মাত্রা" চড়ান থাকিলে—সাময়িক পত্রের বেশ পশার বাড়ে, লেখকও বেশ বিদ্যাদিগ্‌গজ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তথাপি ইহাতে আমার তেমন মন সরে না, কারণ এরূপ ইতিহাস ও উপন্যাস প্রায় তুল্যমূল্য, আর উপন্যাসে আমার ঘোর আপত্তি; বিশেষতঃ আমি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, উপন্যাসকে প্রবন্ধ বলা চলে কি?

সম্প্রতি ঐতিহাসিক-প্রবন্ধ লেখার একটা অভিনব প্রণালী বাহির হইয়াছে, সেটায় উপন্যাসের চারাপাতের আশঙ্কা অল্প বটে, কিন্তু তাও আমার মনঃপূত হয় না, কারণ সেটা হইতেছে লেখার 'ঈষৎ আভাযুক্ত গাঢ়' টীকাসংগ্রহ মাত্র। প্রবন্ধত নয় ঠিক্ যেন সটীক শ্রীমদ্ভাগবত, মূলের শ্লোকটি কোথায় পড়িয়া আছে খবর নাই, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাখ্যাই চলিতেছে, আমি চাই কলম চালাইয়া দু কথা লিখিতে, অত রাশি রাশি বই নকল করা আমার কাজ নয়।

জীবন-চরিত ঘটিত প্রবন্ধও বাজারে কাটে মন্দ নয়। কিন্তু এও ইতিহাসের রূপান্তর বৈ ত নয়, সুতরাং ইতিহাস বিষয়ক আপত্তি ইহাতেও বর্ত্তিতে

পারে, অর্থাৎ উপন্যাসের ছায়া ও টীকার ঘণ্টের বিভীষিকা ইহাতেও প্রায় তুল্যমাত্রায়। এ গেল পুরাতন জীবন-চরিত—অর্থাৎ বৈদিক ঋষি বিশেষের বা তৎসাময়িক অন্য কোনও ব্যক্তির জীবন-চরিতের কথা। তবু যদি জীবন-চরিতই লিখিতে হয় তবে ঐ রকমের একটা লেখা বরং ভাল, আধুনিকের নামও করিতে নাই। কারণ আধুনিক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে নির্ব্বংশ অতি অল্প, নির্ব্বান্ধব অল্পতর, নিঃশত্রু একজনও নন। এমতস্থলে যাহাই লিখি না কেন, প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী, দোষোল্লেখ করিলে এক পক্ষ হইতে, গুণ গাহিলে অপর পক্ষ হইতে; অথচ, সকলেই জানেন দোষগুণ ছাড়া জীবন নাই, জীবন-চরিতও অসম্ভব। অতএব জীবন-চরিতেও সুবিধা নাই।

তবে কি কবিতা লিখিব? বিশেষ আপত্তি দেখি না, কারণ এ কাজটা ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে অক্ষরগণা ও মিল খোঁজা দুই রকম মেহনৎ ছিল, আট দশ লাইন্ কবিতা লিখিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। ক্রমে মিল খোঁজার দায় হইতে রেহাই পাওয়া গেল, দিন কতক খুব সতেজে অমিত্রাক্ষর লিখিয়াছিলাম, আঙ্গুলে কড়া পড়িত মাত্র, অভিধান ঘাটিতে হইত না। এখন আরও সহজ। যাকিছু লিখিতে হইবে গদ্যে লিখিয়া লইয়া, পরে শব্দ গুলিকে উল্টা পাল্টা করিয়া বসাইয়া খাম্‌-খেয়ালি রকমে লাইন্ বাঁধিয়া দিতে হয়, আর কতকগুলা 'ছিনু' 'গেনু', 'মরি', 'হায়' 'তুইরে' প্রভৃতির তথা মাইকেলী আর্ষ-প্রয়োগের ছড়াছড়ি করিতে হয়, বস্ নব্যতন্ত্রের কবিতা হইয়া গেল। ভাবের খরস্রোতে কবিতামালার ক্ষীণ সূত্রগাছটি স্বভাবতঃই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, এ কথা কে না জানে? সুতরাং যেখানে কবিতা যত ভাঙ্গা সেইখানেই জানিবে ততই ভাবের তোড়। তোড়ে পড়িয়া ব্যাকরণ অলঙ্কার অভিধান দূরে ভাসিয়া যায়, ভাবের গভীরতায় পাঠকের বুদ্ধির লগি ঠাঁই পায় না, কাজেই অর্থবোধের সম্ভাবনা থাকে না। প্রলাপের উক্তির সদর্থ প্রকাশের নিমিত্ত দুই একটি মল্লীনাথের আবির্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পুঞ্জীকৃত অমূল্য রত্ন 'খনির তিমির গর্ভে' পড়িয়া থাকে, কাহার প্রাণে সহ্য হয়? বাস্তবিক যে তাহাই হইতেছে, যাঁহারা পাতা না কাটিয়া বই পাঠান, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। কদাচিৎ অর্থবোধ সম্ভাবনা থাকিলেও, আধুনিক কবিতা পড়িতে শক্ত দাঁতের আবশ্যক, ম্যালেরিয়া বিমর্দ্দিত নিত্য কুইনীন্-

সেবী নির্জ্জীব বাঙ্গালীর সেরূপ দাঁত আছে কি? আর একটা কথা,—লোকের জীবন ক্রমশঃই গদ্যময় হইয়া উঠিতেছে, উদারান্নের নিমিত্ত প্রায় সকলকেই কঠোর হইতে কঠোরতর জীবন-সংগ্রামে অবিরত যুঝিতে হইতেছে সুতরাং কবিতাকুঞ্জের স্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিবার অবসর ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া বিজ্ঞমাত্রেরই ধারণা হইয়াছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবিতাদেবীর স্বর্গলাভ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কবিদেরও নাম ডুবিবে। এই সকল নানা কারণে, কাজ সহজ হইলেও, কবিতা লেখায় বিরত থাকিতে হইতেছে;

তাই ত! তবে লিখি কি?

ওহো! ভাল কথা মনে পড়িয়াছে, আর ভাবিতে হইবে না, আমি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিব। সাময়িক-পত্রের উপযোগী এমন আর কিছুই নয়; অথচ কাজ অতি সহজ, লেখকের ভারি আরাম। অবস্থানভিজ্ঞ বলিবেন—'সহজ কেমন করিয়া, আরামই বা কিসে? মাথার ঘাম পায়ে করিয়া দেশে বিদেশে ঘুরিতে হইবে, তবে ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত?' অবস্থানভিজ্ঞেরই কথা। ও সব হাঙ্গাম কিছুই করিতে হয় না। গোটা পৃথিবীখানিতে এমন লক্ষ লক্ষ স্থান আছে যেখানে কোনও বাঙ্গালী কখনও যায় নাই,—আর প্রতিভা-শালী লেখকের উর্ব্বরা মস্তিষ্কে এমন কোটি কোটি স্থান থাকিতে পারে যেখানে বাঙ্গালী কেন দেব, নর, যক্ষ, রক্ষঃ কাহারও যাইবার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ একটা স্থানে গিয়াছি বলিলেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা হয়, সহজেই সকলের তাক্ লাগিয়া যায়।

ভ্রমণ বৃত্তান্তে না লেখা চলে এমন কথাই নাই। মনে কর আমি নৌকায় যাইতেছি, এ স্থলে নাবিকদিগের মধ্যে কজনের দাড়ি আছে কজনের নাই, কাহার মুখমণ্ডলে কতগুলি তিল আছে, ইত্যাদি সকল কথা প্রাসঙ্গিক বলিয়া গণ্য হইবেক। অথবা মনে কর আমি গজারোহণে ভ্রমণে বহির্গত। শুধু এই টুকু বলিলেই পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ পাঠকের মনে একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইবে, কারণ হাতী চড়াটা অনেকের পক্ষে দিল্লীর লাড্ডু বিশেষ। তার পর হাতীর বয়স কত, চাদর কাঁধে লইলে ভার সহ্য করিতে পারিবে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে পাঠকমহলে অমনই বাহবা পড়িয়া যাইবে। আবকারী

বিভাগের সহিত আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাহার কিরূপ সম্পর্ক তাহা জানিবার জন্য অবশ্যই তোমরা সমুৎসুক থাক, সুতরাং মাত্রাদির উল্লেখ করিয়া সুরুচির পরিচয় দিতে হয়। সব চেয়ে সোজা কিন্তু হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র পল্লীসমূহে যোগী সাজিয়া ভ্রমণ করা। এ অবস্থায় নিজের জ্ঞানের ও সাধুতার অনেক জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ তোমাদিগকে দেওয়া চলে, আর স্বভাবোক্তিতে গা ঢালিয়া দিয়া যা ইচ্ছা বলা চলে, যথা কোন্ মুখে বসিয়া, কেমন করিয়া, কাহার প্রদত্ত, কিসের তৈয়ারী, কয়খানি রুটি, কি দিয়া, কতবার চর্ব্বণ করিয়া, কি পরিমাণ সলিল-সাহায্যে, কত ঘণ্টা মিনিট ও সেকণ্ডে গলাধঃকরণ করিলাম, এবং কম্বল মুড়িদিয়া কোন্ শিয়োরী হইয়া কতক্ষণ কি ভাবিতে ভাবিতে কিসের উপরে শুইলাম, ইত্যাদি। এও আসলে এক রকম উপন্যাস, স্বয়ং লেখক নায়করূপে পাঠকসমক্ষে উপস্থিত। তাহাতে প্রচুর সুবিধা। প্রভেদ এই যে উপন্যাস নাম দিলে ঘটনা সত্য হইলেও লোকে মিথ্যা জানিবে, আর ভ্রমণ বৃত্তান্তের ঘটনা মিথ্যা হইলেও লোকে সত্য মনে করিবে।

ইহাতে একটা বিশেষ সুবিধা আছে, সেটা সাহিত্যিক জীবনে নিতান্তই দুর্ল্লভ। মনে কর আমি অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেব-দর্শন মানসে কোনও দেব-মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছি, পথিমধ্যে একটি অতি কদাকার কর্ত্তিতপুচ্ছকর্ণ কুক্কুর দেখিয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিয়া অনুগৃহীত সাময়িক পত্রের দুই তিন পৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ করিলাম। যদি উপন্যাস লিখিতে বসিয়া এরূপ বেল্‌কমি করি, সমালোচক-মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে, অনেকেই বলিবেন সারমেয়-প্রসঙ্গ অতি অসাময়িক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে;—কেহ হয়ত বলিবেন লেজটি না কাটিয়া রাখিয়া দিলে, তবু কতকটা মানানসই হইত;—কোনও সুধীর সমালোচক ধীর গম্ভীরে বলিবেন—যাই বল তাই বল, কুক্কুর চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু যদি বলি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতেছি—অমনই চুপ, আর কাহার কথাটি বলিবার যো নাই,—কারণ এ যে সত্য ঘটনা। লেখককে সত্যের আলাপ করিতে কোন্ সাহসে বলিবে? এটা ত আর কাল্পনিকচিত্র নয়, এ যে ভগবান্-ভাস্করাঙ্কিত ফটোগ্রাফের ছবি। এ ক্ষেত্রে যদি কাহারও দোষ হইয়া থাকে, তবে তা ঐ অর্ব্বাচীন সরমানন্দনের, কারণ সে সম্মুখীন না হইলে ত আমি

রূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। এ সকল গুহ্য কথা প্রকাশ করায়, দলের ভেদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, স্ব শ্রেণীস্থ লেখকভায়ারা বিলক্ষণ রুষ্ট হইবেন ইহা জানিয়াও,—কঠোর সমালোচকের নাসিকাগ্রসমীপে অন্ততঃ একবারও যে দৃপ্তাঙ্গুষ্ঠ ধরিতে পারা যায়, একথা মনে হওয়ায় হৃদয়াভ্যন্তরে এক প্রকার তীব্র আনন্দের উন্মাদক ফোয়ারা এতই সজোরে ছুটিতেছে যে, কিছুতেই তাহাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিলাম না। যখন এতই সুবিধা, তখন চতুর লোকে ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিবে কেন ?

কদাচিৎ কোনও কোনও লেখক আত্ম-কথার সঙ্গে সঙ্গে পথঘাট ও স্থানাদিরও বর্ণনা করেন, কিন্তু বর্ণনা অসত্য হইলেও বড় একটা এসে যায় না, বরং তাহাতেই সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ। মনে কর কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান যাইতেছি, পথের বর্ণনা করিতে হইবে। এ স্থলে অনায়াসেই বলা চলে যে প্রথমে ডায়মণ্ডহারবরে গমন করিয়া গঙ্গাসাগরের স্বাদুসলিলের ললিতলহরী-লীলা অবলোকন করিলাম। ক্রমে রেলেরগাড়ী মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে মহাভারত-প্রসিদ্ধ বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল,—তথা হইতে পেঁড়োর পুরাতন মন্দির নয়নপথে পতিত হইল। অতঃপর রাণীগঞ্জের কয়লার খনি সমূহে সমাগত হইলাম, এবং সূচিভেদ্য অন্ধকারময় খনিমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথাকার কারুকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অকস্মাৎ অবনীপৃষ্ঠে এক অতি মনোহর কুসুমোদ্যানে আসিয়া উপনীত হইলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম উহাই বর্দ্ধমানের হীরামালি-নীর মোহনমালঞ্চ, আর যাহাকে লোকে এক্ষণে মৃদঙ্গারখনি মনে করিতেছে, উহা প্রকৃতপক্ষে কাঞ্চীপতিসুত সুন্দরের সুরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়। দেখিলে ?—সোজা, নিরেট, নীরস, রেলের রাস্তায় কতখানি কবিত্ব, ভাবু-কত্ব, প্রত্নতত্ত্বজ্ঞত্ব, কত-কি-ত্ব আর আরব্যোপন্যাসের আভা ঢালিয়া দিলাম। তবে সত্যের অনুরোধে তাও বলি এতটা যার-তার সাহসে কুলায় না, বিশেষত কলিকাতা বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় সদরজায়গা হইলে। একটিবার লেখকের নাম পড়িয়া যাওয়া চাই; তারপর থেকে লোকে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া বাহবা দিতে দিতে ঐরূপ বর্ণনা পড়িবে। এ প্রকার বাহাদুরীর ভূরি ভূরি নজির আছে, সুতরাং আমি পিছপাও হইবার নই, মণৌ বজ্রসমুৎ-কীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।

ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি চমৎকার অধিকার জন্মিয়া থাকে,—সেটা, যে দেশে পদার্পণ করা হয়, (অথবা পদার্পণ করা হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হয়) প্রবন্ধ মধ্যে সেই দেশের ভাষার বুকনী সমাবেশের ন্যায্য অধিকার। বিশেষ হিন্দী ভাষার বুকনী, কারণ আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে ঐ ভাষাটি নিতান্ত বে-ওয়ারিশ মাল। ফলতঃ যিনি কলিকাতা হইতে অন্ততঃ মানকর পর্য্যন্ত 'ভ্রমণ' করিয়াছেন, এবং তথা হইতে অসমসাহসিকতার নিদর্শন স্বরূপ অমলধবল কদমা কিনিয়া ফেরৎ গাড়ীতে ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছেন,—তোমার হিন্দীই বল আর উর্দ্দুই বল, (বোধ করি কদমার সঙ্গে ব্যাক্‌টীরিওলজির সূক্ষ্ম সূত্রাবলম্বনে) সমস্তই যে তাঁহার কুক্ষিগত হইয়াছে, কণ্ঠগত কা কথা,—ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য-প্রত্যক্ষ। 'বিবাহ-বিভ্রাটের' ঝী নিজ্ মানকরের না হউক বর্দ্ধমান জেলা সম্ভূতা, ইহা বিগত ১৮৯১ সালের সেন্‌সস্‌বিবরণী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, তাই ত সে অতক্ষণ ধরিয়া কনষ্টেবলের সহিত হিন্দীভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিয়াছিল। শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি অন্ততঃ সাত বৎসর যাবৎ বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রবাসী ছিলাম, সুতরাং বুকনীবিন্যাসে যে সিদ্ধহস্ত হইয়াছি এ কথা বড় গলা করিয়া বলা চলে। ঝী হিন্দীবক্তৃতা গুণে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, আমিও দেখিবেন বুকনীর বাহারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিব। অতএব এখন হইতে ভ্রমণ বৃত্তান্তই লিখিব স্থির করিলাম, সম্পাদক মহাশয়ের তথা প্রিয় পাঠকগণের অনুমতি ও অনুমোদনের অপেক্ষা মাত্র।

শ্রীখেয়ালচাঁদ।

গেরুয়া।

গিরি কোথা তার নাই উদ্দেশ,
গিরিমাটি আসি ছাইল দেশ!
গেরুয়াবসন সবাই পরে,—
সাধুজনগণ মরিছে ডরে!
সে দিন দেখি যে মজুর মুটে,
গেরুয়া পরেছে ক'জন জুটে!
নেড়ানেড়ী হল গেরুয়াধারী!
গেরুয়া পরিয়া গাইছে "জারী"!
আহা কি সুন্দর দেখিল নয়ন,—
মৌলবী সাহেবের গেরুয়া বসন!
"বাতরসা ভাল" করিছে বৈদ্যে,—
গেরুয়া বসন পরেছে ফেঁদে!
বাজার মাঝারে বারাঙ্গনা
গেরুয়া পরিয়া বীরাঙ্গনা!
সে দিন দেখিয়া কাঁপিল মন
"মুক্তিফৌজে"র গেরুয়া বসন!
কোট্ পেণ্টেলুন গেরুয়া তার,
গেরুয়া গাউনে বিবির বাহার!
বাকি ছিল এক ব্রাহ্ম-সমাজ,
তাদেরো মাঝে যে গেরুয়া সাজ!
কারো কারো আরো নূতন বাহার,—
গেরুয়া বসনে "অরেঞ্জ-কলার"!!
বারবিলাসিনী পরিত সুধু,
"অরেঞ্জ-কলারে" এতই মধু?—
"স্বামিজীর" শীরে পাইল মান,
ব্রাহ্ম-সমাজে পাইল স্থান!
কাশিতে গেরুয়া-কৌপিন আঁটি,
"কুমার" বাহাদুর কল্লেন মাটি!

"গেরুয়াবসন" কহিছে ডরে,
ঋষিরা ভারতে সৃজিল মোরে!
এখন তাঁহারা গেলেন কোথা?—
চারিদিকে খায় আমার মাথা!
ঋষিরা পালা'ল তড়িৎ-বৎ,
আমি যে পালাতে পাই না পথ!
আর, ও গেরুয়া পো'রো না ভাই,
এদেশে আর কি কাপড় নাই?
সাধুর বসন দেখিতে চাও,
ভাস্করানন্দের নিকট যাও!
নইলে আমার মাথাটি খাও,
গেরুয়া বসনে বিদায় দাও!

অথবা,

গিরিশৃঙ্গে গিয়া ঘসিবে পাছা,
ঘসিতে ঘসিতে খসিবে কাছা,
গিরিমাটি ক্রমে জড়াবে গায়
গেরুয়াবসন সাজিবে তায়!—
হইবে কুমার ব্রহ্মচারী,
গিরিগুহাবাসী গেরুয়া ধারী!
সহরে বসিয়া তেতালা-ঘরে,
গেরুয়াবসন যেজন পরে,
বারবিলাসিনী তাহার নাম!
রাজত্ব তথায় করেন "কাম"!
ছিছি, ছিছি, ছিছি, গেরুয়া ছাড়,
আপন অঙ্গের ময়লা ঝাড়!
পর সাদাধুতি চাদর ভাই,—
সাদার সঙ্গে যে তুলনা নাই!
হাতে ধরি বলে আর্য্যমিশন্,
ছাড় ছাড় ছাড় গেরুয়াবসন!!

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।

সুধাময়ী।

উপন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ললিতকুমার চৈতন্য লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলেন, পার্শ্বে খোজা উপবিষ্ট—দ্বারদেশের অন্তরালে সহচরী পরিবৃতা নবাবপুত্রী দণ্ডায়মানা, শ্বেতমর্ম্মর বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল, সম্মুখে ক্ষুদ্র জলাশয়, সকলি ললিতের দৃষ্টি-গোচর হইল। খোজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিবরণ অবগত হইলেন। তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—

"নবাবপুত্রী, আমি আপনার দরিদ্র প্রজা, আমার প্রতি আপনার অপরিসীম দয়ার প্রতিদান দিই, এমন সাধ্য আমার নাই। জীবনে কখনো সেরূপ সাধ্য আমার হইবেও না। অগত্যা চিরজীবন আপনার কাছে ঋণী রহিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি চিরসুখে সুখী হউন। এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি, আমার অবস্থা বড় শোচনীয়, কর্ত্তব্য অতিশয় গুরু, উদ্দেশ্য নিতান্ত দুষ্কর। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে ?" বলিতে বলিতে ললিতের চক্ষুর্দ্বয় ছলছল হইয়া আসিল।

ললিতকে কাতর দেখিয়া, নবাবপুত্রী পরিচারিকা দ্বারা ললিতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ললিত কহিলেন—রাজা মনিমোহনের কন্যার গৃহদাহে হত্যা অপরাধে পিতা নবাব-দরবারে বিচারাধীন, আমি সে হতভাগ্য পিতার নিতান্ত অভাগা জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতাকে রক্ষা করিবার মানসে আসিয়াছি, কিন্তু নিঃসহায়, উপায়হীন, অক্ষম, বুঝি আমার দ্বারা পিতার উদ্ধার সাধন হইল না। এই বলিয়া ললিতকুমার নিতান্ত অবসন্ন ব্যক্তির ন্যায় হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলেন।

নবাবপুত্রী পরিচারিকা দ্বারা ললিতকুমারকে কাতর হইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তাঁহার পিতার উদ্ধার চেষ্টায় তিনি নিজে ব্রতী হইলেন, নবাবের নিকট তিনি অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া ললিতের পিতার জীবন ভিক্ষা করিবেন। কিন্তু বিচার-কার্য্য এ পর্য্যন্ত যতদূর নবাবপুত্রী নিজে দেখিয়াছেন, তাহাতে রত্নেশ্বরের সকল দোষ ক্ষালন হইবার নহে। নবাব সুজাউদ্দৌলা,

বড় দয়ার্দ্রচিত্ত বটেন, অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, সত্য, কিন্তু অত্যাচারীর অপরাধের মার্জ্জনা তাঁহার কাছে নাই, বিশেষত, রাজা মনিমোহন তাঁর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। যাহাহোক্ নবাবপুত্রীর চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, তাহা করিতে তিনি ক্রটী করিবেন না। এই বলিয়া খোজাকে ললিতকুমারের জন্য, বহির্দ্দেশে উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া, নবাবপুত্রী কক্ষান্তরে গমন করিলেন। খোজা ললিতকুমারকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নবাবপুত্রী, কক্ষান্তরে পরিচারিকা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি অন্যমনস্কা, সখীদিগের কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না, তাঁর দৃষ্টি হর্ম্ম্যতলে, কিন্তু মন কোথায়! তাঁহার হৃদয়কক্ষের অবরুদ্ধ গবাক্ষ একটি সহসা খুলিয়া গিয়াছে। সেই মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর ঝুরু ঝুরু করিয়া, নব-বসন্তের, নবীন দুর্ব্বাদল পরিবেষ্টিত নীলাভ-জলরাশির-হিল্লোল-বিক্ষোভিত সদ্যপ্রস্ফুটিত নীলাব্জের কেশর প্রবাহিত সায়াহ্ণসমীর প্রবাহিত হইতেছে। তাহার মধুর স্পর্শে তাঁহার প্রাণের কোমলাঙ্গ শিহরিত, রোমাঞ্চিত হইতেছে, বুকের ভিতর ঘুমন্ত লজ্জা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, সেই সময়ে আবার সন্ধ্যালোকে স্ফুটোন্মুখ মল্লিকা-কোরকের অস্ফুটভাষার ন্যায় এক অতি মধুর সঙ্গীত তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

কি জানি কি আছে নয়নে তাহার!
আঁখিতে মিলিলে আঁখি আমি নই আমার!
অতুলন তার মুখ
হেরিলে উথলে সুখ
ফিরাইতে আঁখি আমি নাহি পারি আর।
সাধ যায় দিবানিশি
নিরখি সে মুখশশী
দাসী হয়ে পদতলে পড়ে থাকি তার।
জানি সে দুর্লভ ধন
তবু যে বোঝে না মন,
ভেসে যায় কুলশীল লাজ ভয় ছার!

সঙ্গীত গাহিতেছিল নবাবপুত্রীর পরিচারিকা। নবাবপুত্রীর কর্ণে সঙ্গীত প্রবেশ করিবামাত্র তিনি ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—

লছমন্ এ গান্ কোথায় পেলি?

লছমন্। আজ এইখানেই পেয়েচি।

ন-পু। এখানে আবার এ গান কোথায় পেলি?

ল। গান্ না পাই, ভাব্ও কি পেতে নেই?

ন-পু। সহসা এ ভাব্টা হোল কিসে থেকে?

ল। এ আপনার অন্যায় কথা।

এই বলিয়া লছমন্ অপর একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা চামেলি, বল দেখি পুরুষের শোভা কিসে?

চা। পুরুষের বুঝি আবার শোভা আছে? শোভা তো স্ত্রীলোকের। এক্‌মুখ গোঁপ, এক্‌মুখ দাড়ী, লম্বা লম্বা হাত, লম্বা লম্বা পা। কথা কন্, যেন ঢাক্ বাজে—চলেন, যেন রণজয় কত্তে যান্; পুরুষ গুলোর আবার শোভা কি? আমি তো বে কোরবোই না, যদি করি, তো মেয়ে মানুষকে।

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। নবাবপুত্রী বলিলেন, লছমন্ বেশ লোক্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিস্।

লছমন্ দিল্‌নাম্নী অপর একজন সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল— দিল্ তুমি বলতো ভাই। দিল্ একটু গম্ভীরস্বরে বলিল—পুরুষের বিদ্যাই শোভা। লছমন্ ঠাস্ করিয়া দিলের গালে এক্‌টি মৃদুল চপটাঘাত করিয়া বলিল, "ফের ওই কথা। ছেলেবেলা থেকে ওই কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা। বাবা বল্‌তেন, এলেম্ই পুরুষের সকল শোভা, কাজী সাহেব আবার বাবার বাবা। তিনি বল্‌তেন, এলেম্ না হলে, পুরুষের জন্মই বৃথা, এলেম্ না থাক্‌লে অতি সুপুরুষকেও নিতান্ত কুৎসিৎ জ্ঞান্ হয়। আমি একদিন কাজি সাহেবকে বলেছিলাম, "সাহাব, শুনেছি হিঁদুদের নবদ্বীপের পণ্ডিত গুলোর খুব এলেম্। তাদের একটার সঙ্গে আপনার মেয়ের বে দেবেন। শুনেছি তাদের ন্যাড়া মাথা, গোঁপ দাড়ী কামান, গা খোল্‌া, দেখ্‌তে যেন বিলিতি কুম্‌ড়োটি। সে কথা শুনে কাজি সাহেব হেসে বলে-ছিলেন, হিঁদুদের বিদ্যাগুলো ভাল নয়, সে গুলো অসভ্য বিদ্যা। বিদ্যার আবার সভ্য অসভ্য আছে, শুনে আমি কাজি সাহেবকে ছেলাম করে চম্পট্

দিলুম। সত্যি ভাই, বিদ্যার কথা গুলো আমার দুচক্ষের বিষ্। পুরুষের চোক্ গেল, মুখ গেল, ভ্রূ গেল, ঠোঁট্ গেল, চলন্ গেল, বলন গেল, ধরন গেল, বলে কিনা বিদ্যাই পুরুষের সকল শোভা। আমাদের মোল্লাজীর তো এলেম্ খুব্। কিন্তু মুখখানি যেন হিঁদুদের জগন্নাথঠাকুর। দিল্, মোল্লাজির মত বর্ হলে, তুই রাজী আছিস্?

দিল্। দূর, তা কেন। সবাই বলে, তাই বল্লুম।

ল। সবাই বলে! তুই কি চোকের মাথা খেয়েচিস্!

ন-পু। আচ্ছা লছমন্, তুমিই বল, পুরুষের শোভা কিসে।

লছমন্ বদ্ধাঞ্জলি করিয়া কহিল—"বন্দা অপারগ, চোদ্দ বছর বয়স থেকে পুরুষের রূপ্ দেখে আস্‌চে, কিন্তু মনের মত তো এক্‌টাও দেখ্‌তে পাইনি।

কোনদিন কারো চোক্ দুটো, কারো ভ্রূ দুটো, কারো চুলগুলো, কারো মুখের নীচের দিক্‌টে, কারো কপালখানা, কারো গড়নটা, কারো কথাগুলো কারো গান্‌টা, কারো চলনটা, কারো ধরণটা মিষ্টি লেগেছিল বটে, কিন্তু একাধারে সকল শোভা দেখা আমার ভাগ্যে এতদিন ঘটে নাই। এক একবার মনে হোতো বিধাতার হাত থেকে পুরুষ মানুষ গড়ার ভার্‌টা কেড়ে নেবো, আমি নিজে মনের সাধে পুরুষমানুষ গড়্‌বো। আবার মনে হোতো এত সাধ করে গড়্‌বো, আর দশজনে কেড়ে নেবে, আমি পাব না, তবে ছাই গড়ে কি হবে! আমি যাকে মনঃপ্রাণ ঢেলে গড়্‌বো তারতো আমায় পছন্দ হবে না, আমার চেয়ে তো সবাই সুন্দরী, তবে কেন আমি চিনির বলদ হতে যাবো!—সে যাক্ আজ কিন্তু আমার মনের আক্ষেপ মিটেচে, আজ এক্‌টা পুরুষের মত পুরুষ দেখেছি। তা দেখ্‌লে কি হবে, চারদিকে ডাইন, যে হাঁ কোরে চেয়েছিল, মানুষটাকে যেন গিল্‌ছিল, আমার ইচ্ছা কচ্ছিল ছুঁড়ী গুলোর চোকে ছোরা বসিয়ে দিই!

নবাবপুত্রী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে সে মানুষ লছমন্?

ক্রমশঃ

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(৮)

দেখা যাইতেছে মানুষ পাপ করিলে প্রথমত কতক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে। পরে যমালয়ে তাহার সেই পাপের জন্য নরকভোগ হয়, পরে একটু ভোগ অবশিষ্ট থাকিতে আবার তাহাকে অবশিষ্ট পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য মর্ত্ত্যভূমে আসিতে হয়। ভোগ কারণ পাপক্ষয় উপলক্ষে রাজ-দণ্ড ভাল—কেননা সেই পরিমাণে যমালয়ে ভোগ কমিয়া যায়। যাহারা পৃথিবীতে রাজাকে ফাঁকি দেয় তাহাদের যমালয়ে দণ্ড বেশী। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "নরাণাঞ্চ নরাধিপম্" অর্থাৎ নরগণের মধ্যে আমি নরা-ধিপ। একবার পাপ করিলে তাহার জন্য সুতরাং তিন দফা ভুগিতে হয়। এই তিন দফা ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে রাজদণ্ডের বিবরণ আছে, একাদশ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয় সবিস্তারে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া মনুসংহিতা পাঠ করেন। মনু একাদশ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—

চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিষ্কৃতৈনসঃ॥

যখন এই সকল কুকর্ম্ম (সুবর্ণ চুরি, সুরাপান, গুরুভার্য্যা গমন, প্রাণী-হিংসা ইত্যাদি) করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরজন্মে নিন্দনীয় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তখন কুকর্ম্ম করিয়াই যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কিরূপ কার্য্যের ফলে কিরূপ জন্ম হয় এ সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫ গীতা ১৪ অঃ

সত্ত্বগুণ বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইলে যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তখন সে জ্ঞানি-গণ্য নির্ম্মল-লোক প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ বৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু হইলে সে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-লোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মে।

গীতায় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সম্বন্ধে ভগবান বিশেষ করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। মনুসংহিতার ১২ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে অনেক কথা বলার পর সংক্ষেপে

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥

এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ তমোগুণের লক্ষণ কাম প্রধানতা, রজো-গুণের অর্থ নিষ্ঠতা, সত্ত্বের ধর্ম্মপ্রাধান্য ইহার মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। তারপর ৪০ শ্লোকে মনু বলিতেছেন,

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণে অবস্থিত সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, যে রজোগুণে সে মনুষ্যত্ব ও যে তমোগুণ বৃদ্ধিতে অবস্থিত সে পশু পক্ষী যোনিত্ব লাভ করে।

এই যে গুণাশ্রিত ব্যক্তিগণের ত্রিবিধ স্থূল গতির উল্লেখ হইল, ইহার আবার দেশ কাল পাত্র ভেদে ও সংসার হেতু কর্ম্ম ভেদে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গতি আছে, তাহাও প্রধানত উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। এই সমস্ত বিষয় পূর্ণরূপে বা সংক্ষেপেও লিখিবার আমার অবকাশ ও স্থান নাই। পাঠক মহাশয়কে সঙ্কেত করিতেছি তিনি মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। তবে যাঁহাদের আবার অবকাশ ও সুযোগ নাই, তাঁহাদের জন্য একটু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে।

মনু তমোগুণের জঘন্য গতির মধ্যে বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি এবং কীট, মৎস্য, সর্প, কূর্ম্ম, পশু, মৃগ ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তমোগুণের মধ্যম-গতিতে হস্তী, ঘোটক, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর ইহাদের উল্লেখ করেন। তমোগুণের উত্তম গতির উদাহরণ নটাদি, পক্ষী ছল করিয়া ধর্ম্ম-কারী পুরুষ, রাক্ষস এবং পিশাচ। রজোগুণের অধমগতির উদাহরণ—ঝল্ল নামক জাতি যাহারা লগুড় দিয়া যুদ্ধ করে, মল্লযুদ্ধকারী, নট শস্ত্রজীবী,

দ্যুতক্রীড়া ও মদ্যাদিপানে আসক্ত ব্যক্তি। রজোগুণের মধ্যম গতির উদাহরণ—অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্ত্তা, ক্ষত্রিয় জাতি, রাজ-পুরোহিত, শাস্ত্রার্থে কলহপ্রিয় ব্যক্তি। রজোগুণের উত্তম গতির উদাহরণ—গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যক অর্থাৎ যক্ষগণ, পুরাণ-প্রসিদ্ধ বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ। সত্ত্বগুণের অধম গতির উদাহরণে মনু উল্লেখ করিয়াছেন—বানপ্রস্থ এবং যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র সকল ও দৈত্যজন্ম। সত্ত্ব গুণের মধ্যমগতি যাগশীল, ঋষি, বেদাদি বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা, ধ্রুব প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, বৎসর এবং সোপম প্রভৃতি পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ। সত্ত্বগুণের উত্তম গতির ফল—ব্রহ্মা ও মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এবং সাংখ্যমত প্রসিদ্ধ তথা দুয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। অতএব ভগবান্ ব্যতীত সকলই গুণের অধীন, তিনিই গুণাতীত। তারপর বলিয়াছেন—

এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ।
ত্রিবিধ স্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসার সার্ব্বভৌতিকঃ॥ ১২, ৫১
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্ সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ॥ ৫২
যাং যাং যোনিন্তু জীবোঽয়ং যেন যেনেহ কর্ম্মণা।
ক্রমশো যাতি লোকেঽস্মিংস্তত্তৎ সর্ব্বং নিবোধত॥ ৫৩

মানসিক, বাচিক, দৈহিক সাধনভেদে তিন প্রকার কর্ম্ম, উহার সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণভেদে তিন প্রকার গতি, উহার আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকার আছে, এই সকল প্রাণিদিগের গতি বিশেষ তোমাকে কহিলাম।

সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়াসক্তির জন্য এবং প্রায়শ্চিত্ত আদি ধর্ম্মানুষ্ঠান না করার জন্য মূঢ় অধম লোক কুৎসিতা গতি পায়।

যে যে পাপ কর্ম্ম দ্বারা (জীব) ইহলোকে যে যে যোনি প্রাপ্ত হয় সে সকল তোমাদিগকে ক্রমে বলিতেছি শ্রবন কর। ব্রহ্মহত্যাকারী নরক-ভোগাবসানে কুকুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, অজ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল এবং নিষাদ হইতে শূদ্রাজাত পুক্কশ হয়, দুষ্কৃতের গৌরব বা লাঘব বুঝিয়া ক্রমশ ঐ ঐ যোনি প্রাপ্ত হয়।

সুরাপানকারী—কৃমি, কীট, শলভ, বিষ্ঠাভক্ষক, পক্ষী, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক প্রাণী। সুবর্ণহারী ব্রাহ্মণ—উর্ণনাভ, সর্প, কৃকলাস, জলচর পক্ষী, কুম্ভির

আদি, পিশাচাদি। গুরুদারগামী—দূর্ব্বা প্রভৃতি তৃণ, গুড়ুচ্যাদি গুল্ম, আমমাংসভক্ষক পক্ষী গৃধ্রাদি। প্রাণী-হিংসাকারী—বিড়ালাদি যোনী, কৃমি, প্রেত। রত্ন-চোর—স্বুবর্ণকার বা হেমকার পক্ষীযোনি। ধান্যচোর—হংস, জলচর প্লব, মধুহর্ত্তা দংশ, দুগ্ধ হর্ত্তা কাক, ঘৃতচোর নকুল, মাংস চোর গৃধ্র, বপা চোর পানকৌড়ী, তেল চোর তেলাপোকা, লবণ চোর চীরীবাক কীট, দধি চোর ক্ষুদ্র বকপক্ষী (বলাকা) হয়, তষর কাপড় চুরিতে তিত্তির পক্ষী, ক্ষৌমবস্ত্রে মণ্ডুক, কার্পাসবস্ত্রে ক্রৌঞ্চ বা কোঁচবক, গো চুরিতে গোধা, গুড় হরণে বাদুড় হয়। কর্পূর আদি সুগন্ধ দ্রব্য চুরিতে ছুঁচা, বাস্তুকাদিপত্র শাক হরণে ময়ূর, সিদ্ধান্ন শক্তু হরণে সজারু, ব্রীহিযব হরণে শল্যক হয়। অগ্নি চুরিতে বক, সূর্প আদি হরণে গৃহ নির্ম্মানকারী পক্ষী, রক্তবর্ণ বস্ত্র চুরিতে চকোর হয়। মৃগ হরণে নেকড়ে, ঘোটক চুরিতে ব্যাঘ্র, ফল চুরিতে মর্কট, স্ত্রী চুরিতে ভল্লুক, জল চুরিতে চাতক, শকট চুরিতে উষ্ট্র, ইতর পশু হরণে ছাগ হয়। যে বস্তুর চরিতে পুরুষের যে যে যোনিতে জন্ম হয়, স্ত্রীলোক যদি এই সকল দ্রব্য চুরি করে তবে ঐ ঐ জন্তুর স্ত্রী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। স্বকর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ আলেয়া হয়, ঐরূপ ক্ষত্রিয় শব বিষ্ঠা ভক্ষক কটপূতন নামক প্রেতবিশেষ হয়। বৈশ্য দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ভ্রষ্ট হইলে মৈত্রাক্ষ-জ্যোতিক নামক পূয় ভক্ষক প্রেত হয় (ইহাদের গুহ্যদেশে চক্ষু আছে) এবং ধর্ম্মচ্যুত শূদ্র চৈলাশক বস্ত্রাস্থিত কীটভক্ষণকারী প্রেত হয়। আর কাজ নাই।

তেঽভ্যাসাৎ কর্ম্মণাং তেষাং পাপনামল্পবুদ্ধয়ঃ
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু॥
তামিস্রাদিষু চোগ্রেষু নরকেষু বিবর্ত্তনং
অসিপত্রবনাদীনি বন্ধনচ্ছেদনানি চ॥
বিবিধাশ্চৈব সম্পীড়াঃ কাকোলূকৈশ্চ ভক্ষণং
করম্ভ বালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্॥ ৭৬

ঐ অল্পবুদ্ধি মানবগণ বিষয়ভোগের অভ্যাসের ন্যূনাধিক্যে গর্হিত ও গর্হিততর ও গর্হিততম তির্য্যগ্ আদি যোনিতে জন্মগ্রহণরূপ দুঃখ অনুভব করে। এবং তামিস্রাদি নরকে, অসিপত্রবনাদি ও বন্ধনচ্ছেদনাদি নরকে দুঃখ অনুভব করে। আর নানাবিধ পীড়ন, কাকাদি কর্ত্তৃক ভক্ষণ, তপ্ত বালুকাদি এবং কুম্ভীপাকাদি অতি ভয়ানক প্রাপ্ত হয়।

"বিবর্ত্তন" কথাটা হইতে বিবর্ত্তনবাদ ও তথা ডারউইন সাহেবকে মনে পড়িয়া গেল। সে কেবল গুরুর কৃপা। এখন পাঠক মহাশয়, বলি ডারউইনের মত "থিওরী" মাত্র ত বটে, আবার তাতেও পক্ষী লাল হয় কেন, নীল হয় কেন, ময়ূরের বর্ণ হয় কেন, তাহা ত নাই। আবার তাহার উপর মিসিংলিঙ্ক আছে ত। ভাল আমাদের ওটা ও না হয় "থিওরী" হল। ডারউইনের দোক্কা কম হইতে পারিলে, আমাদেরও হইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

মধুময়ী গীতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তম যোগ।

সংসার বৃক্ষ—ঐ বৃক্ষমূলে মহাবস্তু লাভ—পরম ধাম—জীবাত্মার দেহান্তর—কেবল শাস্ত্রাভ্যাসে আত্মদর্শন হয় না—ক্ষরাক্ষর পুরুষদ্বয় ও পুরুষোত্তম—তত্ত্বজ্ঞানে সকলেরই অধিকার।

শ্রীভগবান কহিলেন—

ঊর্দ্ধমূল অধোশাখা অশ্বত্থ অব্যয়
এ শরীর,—বেদ যার পত্র সমুদয়;
এ হেন শরীর-বৃক্ষ জানেন যে জন,
তিনিই যথার্থ জ্ঞানী বেদবিৎ হন। ১
সত্ত্বাদি সলিলে যার শাখা বৃদ্ধি হয়,
বিষয়-পল্লবে যাহা অতি শোভাময়,
অধউর্দ্ধব্যাপী; যার কর্ম্ম অনুগত
অধোদিকে মূল সব রয়েছে বিস্তৃত। ২
শরীর বৃক্ষের রূপ জানা নাহি যায়,
আদি অন্ত স্থিতি তার কে জানে কোথায়?
শরীর-অশ্বত্থ হেন, বদ্ধমূল যার;
ছেদিয়া নির্ম্মম-অস্ত্রে মূলেতে তাহার, ৩
মহাবস্তু অন্বেষণ করিবে যতনে
হবে না জনম আর লভিলে যে ধনে!

যে আদি পুরুষ হ'তে নিঃসৃত সংসার,
তাঁহার উপর করি একান্ত নির্ভর,
ভক্তিযোগে অন্বেষণ করিবে সে ধন,—
দেবতা-বাঞ্ছিত মোক্ষ অমূল্য রতন! ৪
আত্মনিষ্ঠ যাঁরা, মান-মোহ বিরহিত,
সন্তানে আসক্তিশূন্য, নিষ্কাম নিয়ত,
সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাতীত যাঁদের হৃদয়,
তাঁহারা অব্যয়পদ পান ধনঞ্জয়। ৫
যে পদ লভিয়া পার্থ মহাযোগিগণ
না করেন এ সংসারে পুনঃ আবর্ত্তন,
পাবক শশাঙ্ক-সূর্য্য প্রকাশিতে নারে,
সে মোর পরমধাম প্রকৃতির পারে। ৬
সতত সংসারীরূপে বিদিত ভুবন,
জীবরূপী আমার এ অংশ সনাতন
সুষুপ্তি-প্রলয়-লীন; করে আকর্ষণ
সংসার ভুঞ্জিতে পুনঃ পঞ্চেন্দ্রিয় মন। ৭
দেহস্বামী জীবরূপী ঈশ্বর যখন
কর্ম্মবশে দেহান্তরে করেন গমন,
পূর্ব্বের ইন্দ্রিয় যান করিয়া হরণ,
হরে যথা ফুলগন্ধ মন্দ সমীরণ। ৮
চক্ষু কর্ণ নাসা ত্বক—অন্ত রাধিকার
করিয়া বিষয় ভুঞ্জে জীবাংশ আমার। ৯
দেহান্তর কালে কিম্বা দেহে অবস্থিত,
বিষয় সম্ভোগে কিম্বা ইন্দ্রিয় সংযুত,
আমার জীবাংশ মূঢ়ে দেখিতে না পায়,
জ্ঞানচক্ষু পারে মাত্র দেখিতে তাহায়। ১০
ধ্যানেতে সংযতচিত্ত যোগিগণ যত
দেখেন এ আত্মা দেহে আছে অবস্থিত!
শাস্ত্রাভ্যাসী অসংযমী মন্দমতিগণ,
বহুযত্নে নাহি পায় আত্ম-দরশন। ১১

সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি-তেজে বিশ্বের প্রকাশ,
সে তেজ আমার, যাতে সূর্য্যাদি বিকাশ। ১২
আত্মবলে করি আমি ভূতের ধারণ,
রসচন্দ্ররূপে করি ওষধি বর্দ্ধন। ১৩
প্রাণাপান—যোগে জঠরাগ্নিরূপ ধরি,
চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় অন্নপাক করি। ১৪
অন্তর্যামীরূপে দেহে আছি দেহময়,
স্মৃতি জ্ঞানোদয় করি, করি তার লয়,
বেদের জ্ঞাতব্য আমি, বেদগুরু হই,
আমিই বেদার্থবেত্তা,—গূঢ় তত্ত্ব এই। ১৫
ক্ষরাক্ষর নামে দুই পুরুষ সুন্দর;—
সর্ব্বভূত ক্ষর, আর কূটস্থ অক্ষর। ১৬
ক্ষরাক্ষর ভিন্ন আছে পুরুষ প্রবর,
পরমাত্মা যিনি, বিশ্বপালক ঈশ্বর। ১৭
ক্ষরাক্ষর হতে পার্থ আমি সর্ব্বোত্তম,
তাই পাইয়াছি নাম "পুরুষ উত্তম"। ১৮
ভারত "পুরুষোত্তম" বলিয়া আমায়
যে জন জানেন, মোরে পান নিঃসংশয়;
তিনিই সর্ব্বজ্ঞ হন।—কহিনু কেবল, ১৯
অনঘ, পরম গুহ্য শাস্ত্র সুনির্ম্মল!
যে সে হোক, এ তত্ত্বের মর্ম্ম যদি পায়,
জ্ঞানেতে কৃতার্থ হয়, পায় সে আমায়! ২০

ইতি পুরুষোত্তম যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।

ধর্ম্মসাধন।

শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, নীতিবৃত্তি বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, মানব-প্রকৃতির যে কোন অংশের উন্নতি লাভ করিতে হইলে কেবল উপদেশ শ্রবণে সফল-কাম হওয়া যায় না। উপদেষ্টা তোমাকে পদ্ধতি মাত্র বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তুমি নিজে সাধন না করিলে তোমার শিক্ষা সাঙ্গ ও ফলোপধায়ক হইবে না। যে শিশু চলিতে পারে না, তাহাকে চলিবার প্রণালী বলিয়া দিলে, চলিয়া দেখাইলে অথবা তাহাকে স্কন্ধে করিয়া শত ক্রোশ ভ্রমণ করিলে সে চলিতে শিখিবে না। শিশু নিজে পুনঃ পুনঃ তোমার অঙ্গুলি ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে, অনেকবার পড়িয়া ব্যথা পাইবে, আবার উঠিয়া যত্ন করিবে তবে সে হাঁটিবে ক্রমে দৌড়িবে ও শেষে লাফাইবে।

শিক্ষক অঙ্ক কষিবার প্রণালী বলিয়া দিলেন, কিংবা নিজে কষিয়া দেখাইলেন তাহাতে ছাত্র তদ্বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবে না। যখন সে স্বয়ং বার বার যত্ন করিবে, অনেকবার ভুলিয়া আবার অধিকতর উৎসাহ ও দৃঢ়তা সহকারে প্রয়াস করিবে তখন সিদ্ধকাম হইবে।

পিতামাতা বা শিক্ষক "সত্য বলিবে মিথ্যা বলিবে না" এই উপদেশ যদি বালককে শতবার শুনান; "মাতৃবৎ পরদারেষু পর দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" এই সারাৎসার অতুলনীয় নীতিসূত্র সুন্দররূপে বুঝাইয়া সহস্রবার আবৃত্তি করান, তথাপি বালক নীতি-পরায়ণ হইতে পারিবে না। হয়ত অতিপরিচয় জন্য ঐ মহামূল্য বাক্যে অনাদর জন্মিবে। নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে মনুষ্যকে আগ্রহ ও যত্নের সহিত উপদেশানুরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সে অনেকবার নীতি-মার্গে স্খলিতপদ হইবে, আবারও স্থির-প্রতিজ্ঞার সহিত চেষ্টা করিবে, তবে সে নীতিমান্, হৃদয়বান্ ও উদারস্বভাব হইতে পারিবে। কঠোর সাধন না করিলে কখন সিদ্ধিলাভ হয় না।

ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে শতগুণ অধিক কষ্টস্বীকার ও তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন। তুমি গুরুমুখে শুনিলে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে পড়িলে যে

আত্মা অবিনশ্বর, দেহ অনিত্য, সংসারে প্রকৃত সুখ নাই, *পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু জন্য দুঃখ অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় পরমেশ্বরের আরাধনা। এই প্রকার পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণে কোন ফল হইবে না। নিয়ত প্রবর্ত্তমান দৃঢ়তর সাধন দ্বারা ঐ সকল সত্য হৃদয় গোচর এবং মানসে প্রত্যক্ষীভূত করা আবশ্যক। ধর্ম্মসাধন বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমরণ যত্নাতিশয়ে অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে বহুজন্মের পর "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিবে।

প্রাচীন ভারতে, পিতামাতা সন্তানদিগকে জ্ঞানোন্মেষ হইলেই অন্যান্য বিষয়ের সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে শিখাইতেন। উপনীত হইলেই বালকগণ পবিত্র শরীরে ও পবিত্র মনে প্রতিদিবস কালত্রয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিত। পিতামাতা ও গুরুজনকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিত। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষার দোষে ও কালধর্ম্মে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ উপদেশ দ্বারা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান শিখাইতেছেন ও যত্ন পূর্ব্বক আচরণ করাইতেছেন, তথাপি প্রবল কাল-ধর্ম্ম প্রভাবে বালক ও যুবকগণ তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছে। কোন ইষ্টনিষ্ঠ ধার্ম্মিক অধ্যাপক স্বীয় পুত্রদিগকে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ সম্মুখে বসাইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করাইতেন কিন্তু পুত্রগণ তাঁহার চক্ষুর বাহির হইলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিতেন। তাহারা যে ভাবিয়া চিন্তিয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট আচরণে অনাস্থা করিতেন তাহা নহে। সম্ভবতঃ সমবয়স্ক সুহৃদ্দিগের ও সমাবস্থজনগণের দৃষ্টান্তই তাঁহাদিগকে পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবর্ত্তিত করিত। এ স্থলে বিদ্যাবুদ্ধি ও মর্য্যাদাসম্পন্ন জনসাধারণের মত ও আচার ব্যবহারই কালধর্ম্মপদে অভিহিত হইয়াছে। উল্লিখিত অধ্যাপকের ন্যায় অবিভাবক আর অধিক দেখা যায় না। তথাপি কালধর্ম্মবশে তিনি সফলকাম হন নাই। এক্ষণে অবিভাবকেরা কেবল ব্যায়াম শিক্ষা দ্বারা বালকদিগের শরীর বলিষ্ঠ করিতে ইচ্ছা করেন, অধ্যয়নাদি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত করিতে অভিলাষ করেন, কথঞ্চিৎ নীতির

*হিন্দু ও বৌদ্ধেরাই কেবল পুনর্জন্মের বিষয় স্বীকার করেন, অন্যধর্ম্মাবলম্বীরা উহা মানেন না। উভয় পক্ষের যুক্তির বলাবল বিচার করিয়া সময়ান্তরে একটী প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

উপদেশ দান করিতেও বাসনা করেন, কিন্তু বালকগণকে ধর্ম্মাচরণে অভ্যস্ত করা যে আবশ্যক ইহা প্রায় কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। বালকের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে, ধর্ম্মাচরণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া যথাযোগ্য কার্য্য করিবে, এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহাদিগের ঐ প্রকার আশা সাঁতার শিখিয়া জলে নামার আশার ন্যায় কিয়দংশে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কৃতবিদ্য যুবক উপদেশ শুনিয়া বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্বের অনেক গূঢ় কথা শিখিতে পারেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের ও সাধনের অভাবে সে শিক্ষা বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে বালক শুকপক্ষীর ন্যায় মন্ত্রাদি পাঠ করিলেই ধর্ম্মশিক্ষা সাঙ্গ হইল। ধর্ম্মাচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য যে আত্ম-সংযম, ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়, তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া কেবল বাহ্য আচারে কি ফল?

ফলকথা এক প্রকার বৃত্তির পরিচালনা শেষ করিয়া অন্যবিধ বৃত্তির চালনা করিবে এ জ্ঞান একান্ত ভ্রমপূর্ণ। বালকের মনে যখন যে বৃত্তি বা প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখন হইতেই আবশ্যকমত কাহারও সংবর্দ্ধন কাহারও বা সংযম না করিলে, অনেক শুভকর বৃত্তি নিস্তেজঃ এবং অশুভকর প্রবৃত্তি অনুচিতরূপে বর্দ্ধিত হইবে। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মাচরণের অভ্যাস না হওয়ায় অনেক বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মহীন, সদাচার-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে।

মনুষ্যগণের মানসিক শক্তি, প্রকৃতি ও রুচি নানা প্রকার, সুতরাং একই ধর্ম্মসাধন-প্রণালী সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না, এই বিষয় বিবেচনা করিয়া আর্য্যঋষিগণ ধর্ম্মসাধনের বিবিধ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্থূলদর্শী লোকে ভিন্ন ভিন্ন সাধনরীতির আপাততঃ বিরুদ্ধ, মতবাদ শুনিয়া অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিলে প্রতীয়মান হইবে যে উহা মানব-প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জস ও নৈসর্গিক।

বর্ণপরিচয় ও শব্দজ্ঞান না হইলে কেহ কালিদাসের কবিতারসের মাধুর্য্য সুন্দররূপে ধারণা করিতে পারে না; শতিকা না শিখিয়া কেহ দুর্ব্বোধ বীজ-গণিতের প্রশ্ন সকলের সমাধান করিতে পারে না। আবার দেখা যায় কেহ কেহ অল্পায়াসে সাহিত্যে প্রবীণতা লাভ করে কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও

গণিতাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। কেহ বা গণিতাদিতে বিশেষ অনুরক্ত কিন্তু কাব্যরসের জন্য তাদৃশ লালায়িত নহে। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যেমন শক্তি, রুচি ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধেও সেইরূপ করা আবশ্যক।

অজ্ঞ, বিজ্ঞ, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নানা অবস্থাপন্ন ও নানা প্রকৃতিক লোকদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট না হইলে সাধনে কখন সিদ্ধি হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আর্য্য-শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তি-যোগ, রাজ-যোগ, হঠ-যোগ প্রভৃতি বিবিধ পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাগ, যজ্ঞ, জপ, হোম প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। কিন্তু "ঋজু কুটিল নানা পথ জুষাংনৃণামেকোগমাস্ত্বমসি পযসামর্ণব ইব।" সকল নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয় সেইরূপ হে ভগবন্! সরল ও বক্র নানা মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলেও সাধকগণের তুমিই গম্য স্থান।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীবাস অঙ্গনে আজু গোরাচাঁদ খেলিছে।
চৌদিকে ভকতগণ,
করে কিবা সংকীর্ত্তন,
গোলক সৌভাগ্য আজি নদীয়ায় ভাতিছে।
বাজে করতাল খোল,
কি মধুর 'হরিবোল',
উচ্ছ্বাসে মরম মাতে প্রাণ ঢ'লে পড়িছে।
এই নামসুধা ছিল গোলকেতে গুপতে।
জীবতরাবার হেতু
(এ নাম অমূলসেতু)
দয়াময় গোরাচাঁদ আনিলেন জগতে।
নিত্যানন্দ হরিদাস,
পুরাল জীবের আশ,
সবে দিল নামসুধা যত সাধ মনেতে।

গোলকের নাম এযে মরতেতে এসেছে।
'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'
উঠিল সকল ঘরে,
আচণ্ডাল আদি ওই নাম শুনে মেতেছে।
তার্কিকের তর্কদূর,
প্রেমপূর্ণ হৃদিপুর,
প্রেমের দেবতা হেন কে কোথায় দেখেছে!
নাচত অঙ্গনে গোরা প্রেমানন্দে মাতিয়া,
কভু ভাবে পড়ে ঢ'লে,
নিতাই লইছে কোলে,
রাধাভাবে কভু বোয় কাহা নাথ বলিয়া।
কভু 'ওই নাথ আসে',
বলি ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
জীবের শিখায় নিতি পন্থ নিজে সাধিয়া।
প্রেমকল্পতরু গোরা সমাদরে রোপিয়া,
আপনি হইয়া মালী,
জীবেরে দিছেন ডালী—
সুমধুর প্রেমফল নিজ কর ভরিয়া।
ভখি সে মধুর ফল,
প্রেমপূর্ণ ধরাতল,
আমি শুধু প'ড়ে আছি মরমেতে মরিয়া।

মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

বিদেশে ও স্বদেশে।

আমরা পরাধীন 'অসভ্য' জাতি, স্বাধীন 'সভ্য' জাতিদিগের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির কথা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি না, তাঁহাদের কার্য্য-কাণ্ড দেখিয়া, এমনও অনেক সময় মনে হয়, যে ঐ সকল বুঝিযাও কাজ নাই। মূর্খের দশাই এই, মূর্খ প্রায় পণ্ডিত হইতে চায় না। সভ্য দেশের অতি প্রধান একখানি সংবাদ পত্রের একটি কথা শুনিলেই আপনারা আমার কথা বুঝিতে পারিবেন। As attempts at assassination are for monarchs very much like what colds in the heads are for their subjects,—one of the liabilities of their position—they only deserve attention, when they have any practical result.*

অর্থাৎ যেমন শরীর থাকিলেই ব্যারাম হয়, তেমনই রাজা হইলেই লোকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে। 'সভ্য' দেশের রাজা হওয়া কিরূপ দায়, এবং ঐ সকল দেশের প্রজারা কিরূপ প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির লোক দেখুন। রাজা দূরে থাকুন, সামান্য একজন বুনিয়াদী বংশের লোককে আমরা কতই না আদর অপেক্ষা করি। আর সভ্যদেশে যিনিই রাজা হউন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কেহ না কেহ, খুন করিতে উদ্যত হইবেই হইবে !!! তাহার পর এই ক্রীট্‌দ্বীপের কথাটাই ভাবুন্। একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে কিয়দংশের সুখ দুঃখের অথবা আচার বিচারের কথা লইয়া—গ্রীস্, তুরস্ক, —ইংলণ্ড, ইটালী—ফ্রান্স, জর্ম্মানি—অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া—য়ুরোপের অষ্টবজ্র একত্র হইয়াছেন। বৈশাখে গ্রীস্ তুরস্ক মহা আহবে উন্মত্ত হইল, ষট্‌শক্তি সচ্ছন্দে রক্তপাত পরিদর্শন করিলেন। ভাল, একিই কি বলে সালিসি? আসল কথা, এসকল দেবতার লীলা খেলা, আমরা পড়িশুনি এইমাত্র, কিছুই বুঝি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক সময় মনে হয়, দূর হোক ও সকল বুঝিয়াই কাজ নাই। আমরা মূর্খ আছি, মূর্খই থাকি, আর পণ্ডিতিতে কাজ নাই। কিন্তু ভগবানের লীলাখেলায়, আমাদের সহজ মূর্খতার উপর বিদেশের দারুণ পাণ্ডিত্য, অসভ্যতার উপর সভ্যতা—দারুণ বল করিতেছে। যিনি কুব্জাকে সুন্দরী করিতেছেন, সৌন্দর্য্যময়ী আহ্লাদিনীকে, পথে পথে কান্দাইতেছেন,

---

*The Review of Reviews. *May* 15, 1897.

তিনিই আমাদের এই বিড়ম্বনায় অবশ্য তাঁহারই লীলা-রহস্য প্রকট করিতেছেন।

বিদেশের দারুণ সভ্যতার সহিত আমাদের দুর্ব্বল অসভ্যতার সংঘর্ষণ যেমন একদিকে মহা কষ্টকর, তেমনই এই সংঘর্ষণে বৈচিত্রময়ের লীলাভঙ্গি বুঝিলে, উহা তেমনই রহস্যময় ও কৌতুকপূর্ণ। আমাদের দুর্ব্বল অসভ্যতার উপর বিদেশের দারুণ সভ্যতার উপদ্রব দেখুন—কিরূপ ভয়ঙ্কর ও কেমন বিড়ম্বনা পূর্ণ।

এই দুর্ব্বৎসরের দারুণ কষ্ট, কে না জানে? কে না বুঝে? কে না ভুগিতেছে? এমন অন্নকষ্ট শত বৎসর মধ্যে হয় নাই, এমন দেশব্যাপী জলকষ্ট,—পূর্ব্বে কথন শুনাও যায় নাই। বোম্বাই প্রভৃতি স্থলে যেরূপ মহামারী হইল, ইতিহাসে অতি অল্পই একপ দেখা যায়; এরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প পাহাড় অঞ্চলেই হইত, এখন ত দেখা যাইতেছে, পাহাড়-প্রান্তর পাপের ভরে সমান কাঁপিতেছে। গৃহবাসী কত লোকের যে কত ক্ষতি হইল, তাহা গণনা করাই অসাধ্য। তাহার পর কোথাও অতি বৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও ঝড়-বাদল, কোথাও বিষম বন্যা—এ সকল ত আছেই। চারিদিকেই ভগ্ন মন, রুগ্ন দেহ, জীর্ণ গৃহ, শীর্ণ কলেবর, প্রজাবৃন্দের হাহাকার ও ত্রাহি ত্রাহি রব,—কিন্তু বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে আমাদের করিতে হইবে কি? না, জুবিলি! মুকুট-ধারিণী বিক্টোরিয়ার দীর্ঘ রাজত্বের জন্য আনন্দের মহোৎসব!!

যাঁহার আনন্দে এই আনন্দ, সেই শান্তিময়ী বর্ষীয়সী বিধবা, আনন্দের নামে এই যে সং সাজান ব্যাপার—ইহার কিছুই নাকি চান না। The Queen, it is an open secret, regards the whole Commemoraton with keen personal dislike.*

তিনি যে এই বাহ্যাড়ম্বর, কেবল চান না, এমন নহে, তিনি ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত। মন্ত্রীরা অবশ্য এই উৎসবের ঘটা ছটার অভিলাষী। কাবুলের সীমান্ত প্রদেশে ইতি মধ্যে ঘোর বিপৎপাত হইয়াছে। বহুতর ইংরাজ সেনানী হঠাৎ সীমান্তবাসী মুসলমান কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। দুই তিন শত রক্ষী-সৈন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই মহা বিপৎ-

*The Review of Reviews, *May* 15, 1897.

পাতের পর বিলাতী মন্ত্রীগণ এখনও জুবিলীর অভিলাষী কি না জানি না। কিন্তু বিদেশে যাহাইহোক ভারতবাসীর আজিকাব দিনে এ উৎসব-রোগ কেন? পাঞ্জাবীর নিকট সকল ভারতবাসীব এই বিষয়ে প্রকবণ পদ্ধতি শিক্ষা করা, তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করা, উচিত ছিল। তাঁহারা এই জুবিলি উপলক্ষে রাজরাজেশ্বরীব প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য দানোৎসব করিবেন, কিন্তু কেবল দেশের দারুণ দারিদ্র-ভার লাঘব করিবার জন্য। সুন্দর পন্থা! সুন্দর প্রকরণ! আইস ভাই বঙ্গবাসী, আমরা সকলে স্বীয় স্বীয় সাধ্যমত প্রতিবেশীর অন্নকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করি, এবং রাজরাজেশ্বরীর এই ষষ্টি-বৎসর রাজত্বের বর্ষে যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্ব্বজাতীয় প্রজাবৃন্দের দারুণ কষ্টের উপশান্তি হয়, তজ্জন্য সকলেই ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি, এবং শাস্ত্রানুসারে শান্তি স্বস্ত্যয়নের প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করি। আড়ম্বরের দিন আর নাই; এখন অনুষ্ঠান একান্ত অবলম্বনীয়।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

গ্রন্থ সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন স্মৃতিরত্ন বিরচিত টীকা সমেত দত্তক চন্দ্রিকা, ৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

দত্তক-পুত্র গ্রহণ বিষয়ে দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা এই দুই খানি গ্রন্থ এতদ্দেশে প্রচলিত, তন্মধ্যে শেষোক্ত খানি অতি সংক্ষিপ্ত, অথচ ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই উল্লিখিত আছে। পূর্ব্ব প্রচারিত দুই খানি টীকা সত্ত্বে যখন স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই নূতন ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন তখন সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহাতে অনেক দুর্ব্বোধস্থল বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। অনেক অংশ পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হইল যে টীকা খানি দ্বারা পাঠার্থীদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

টীকাকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "দত্তক-চন্দ্রিকা অতি প্রাচীন গ্রন্থ" আবার নিজেই শেষ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে এই শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদ্যাক্ষরদ্বয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্ত্যাক্ষর দ্বয় গ্রহণ করিলে গ্রন্থকারের নাম "রঘুমণি" এইরূপ বোধ হয়। জনশ্রুতির বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন যে কৃষ্ণনগর রাজগুরু রঘুমণি ভট্টাচার্য্য ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রন্থের অপ্রামাণ্য ভয়ে আপন নাম গোপন করিয়া কুবের রচিত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিয়াছি যে কোন মোকদ্দামায় প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য দত্তক-

চন্দ্রিকা রচিত হইয়াছিল। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু গ্রন্থকার স্মৃতিবাক্যস্থ ঐ অনুমতিশব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে স্পষ্টবাক্যে অনুমতি না থাকিলেও, নিষেধ না করিলেই, অনুমতি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। "অনুমতিশ্চ অপ্রতিষেধেঽপি ভবতি"। এইটী কেবল দত্তক-চন্দ্রিকাকারের নিজের মত, অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থকার এ প্রকার বলেন নাই।

এই পুস্তকের অনেকস্থলে মুদ্রাকর প্রমাদ দৃষ্ট হইল, ভরসা করি স্মৃতিরত্ন মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণে সে গুলির সংশোধন করিবেন এবং মূল গ্রন্থের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থখানি প্রাচীন কি আধুনিক, তাহার সিদ্ধান্ত ভূমিকায় প্রকাশ করিবেন।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য।

(সমালোচনা।)

নদিয়াবাসী। ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩০৩। সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা যে, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি উহার সেবা করে। যে দেশে, যে সময়ে এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়, সে দেশে, সেই সময়ে, সাহিত্য রাজরাজেশ্বররূপে বিরাজিত হন। আবার শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতিও আকাঙ্ক্ষা করে, সাহিত্য উহাদের সেবা করে; এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইলে, সাহিত্য অপদস্থ হইতে থাকেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের আজিও এ গৌরব হয় নাই, যে ব্যবসাদারের সেবা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য আপনার স্থিতি বা উন্নতি করিতে পারে। নদিয়াবাসী প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞাপন পত্র। এই বিজ্ঞাপন প্রচারের সুবিধার জন্য সাহিত্যকে সেবকরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে সাহিত্যের কেবল অগৌরব করা হইতেছে মাত্র।

চিকিৎসক ও সমালোচক মাসিক পত্র। তৃতীয় খণ্ড, ১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৩ সাল। এই পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় 'বর্ষারম্ভে প্রাপ্তি স্বীকার'। তাহাতে বিনিময়ে যে সকল পত্র সম্পাদক পাইয়াছেন, সেই সকলের নাম আছে। দ্বিতীয় হইতে ১১শ পৃষ্ঠা, 'চিকিৎসকের বিপদ' বলিয়া গুটি কয়েক গল্প। ১২শ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে, সম্পাদক মহাশয়, তাহার সকল গুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই।

১৩ পৃষ্ঠা হইতে শেষ ৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোন ভাবি পুস্তকের অংশ মাত্র। এরূপ 'গ্রন্থ'কে কি মাসিক পত্র বলা চলে ?

সখা ও সাথী। ১৩শ বর্ষ, ১১ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৩ সাল, এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০৪ সাল। এই পত্র যে কেবল বালক বালিকার উপযোগী এমন নহে, সকলেই সখা ও সাথী লইয়া দুই দণ্ড বেশ কাটাইতে পারেন। বীরবল প্রবন্ধে আইন আকবরী হইতে এবং দিল্লী প্রবন্ধে কনিংহামের বিবরণী হইতে, একটু আধটু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত দিলে আরও ভাল হইত।

সাহিত্যসেবক। ২য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০৪। এই সংখ্যায় সাতটি প্রবন্ধ আছে। তাহার, প্রথম, মধ্যম ও শেষ প্রবন্ধটি বাদ দিলে, সাহিত্য-সেবক সুপাঠ্য। প্রথম প্রবন্ধ প্রায় বার পৃষ্ঠা 'আধ্যাত্মিক বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ', কে পড়িবে বল? মধ্য প্রবন্ধ প্রায় আট পৃষ্ঠায় খণ্ড উপন্যাস—"অপূর্ব্ব বাসর" এ একটা দায়—পূর্ণিমার গ্রাহককেও যাহাতে এই দায় হইতে নিস্কৃতি দেওয়া হয়, তাহার জোগাড়যন্ত্র হইতেছে। শেষ প্রবন্ধ "রুষাবিষ্কৃত বৌদ্ধ যিশু"। লেখা ভালই হয় নাই। আগে রুষ গ্রন্থকারের মতটা কি বলিয়া দিতে হইবে, তারপর তাহার খণ্ডন? তা কৈ?—আর ত ভাষাটা যেন জ্ঞানবানের প্রলাপ—"বজ্র ঘোষণে আকাশ বিদীর্ণ করিতে চাহি না, কিন্তু অন্যায় বাক্য মর্ম্মে শূল সমান বিদ্ধ হয়। সে অসহ্য বেদনা, যাঁহার মর্ম্ম আছে, তিনিই বুঝিতে পারেন।" এ সকল কি? সাহিত্য-সেবকের কি সম্পাদক নাই ?

দারোগার দপ্তর। ৬১ সংখ্যা, কাজেই ষষ্ঠ বর্ষে, পদার্পণ করিয়াছে। ৬২ সংখ্যায় একটি গল্পের প্রথমাংশ মাত্র। এই দপ্তর সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আছে। অনেক কাল্পনিক কথা দারোগার দপ্তরে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রকাশিত হয়; সাধারণত তাহাতে কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে গল্প লেখে, সেই ত বলে প্রকৃত কথা; তাহাতে কিছু এসে-যায় না। কিন্তু উপস্থিত সংখ্যার লিখিত বিবরণ যদি বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা না হয়, তাহা হইলেও বিষম কথা !!! ৬১ সংখ্যার মূল কথা—একজন কুলনারী সপত্নী-সুলভ বিদ্বেষবশে, নিজ সপত্নীকে হত্যা করিয়া তাহার

মাংস স্বীয় স্বামীকে খাওয়াইয়াছিল, আর পরে সেই কথা স্বামীকে এবং সকলকে বলিল। যদি ইহা কাল্পনিক কথা হয়, তবে প্রকাশক বাণীনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি অনর্থক অমূলক বঙ্গ কুলনারীকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে পৈশাচিক পাপে কলঙ্কিত করেন কেন? এই রূপ কলঙ্ক আরোপে তিনি সমাজদ্রোহী। আর যদি এই গল্প প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে বিনয়ে বলি, তিনি যেন নায়ক নায়িকাদের প্রকৃত নাম, ধাম, ঠাঁই, ঠিকানা, আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিব না, কেবল গোপনে অনুসন্ধান করিয়া, গল্প ঘটনামূলক বুঝিলে, বাণীনাথ বাবুর উপর আমরা যে সমাজ-দ্রোহিতার গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি, তাহার প্রত্যাহার করিব, এবং তিনি প্রকৃত পাপেরই পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিব।

বামাবোধিনী। ৩৪ বর্ষ, ৩৮৮ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০৪। চৌত্রিশ বা বামাবোধিনী—আমাদের আহ্লাদের সামগ্রী, আদরের সামগ্রী, গৌরবের সামগ্রী, পুরুষ-পাঠ্য পত্র স্থায়ী হয় না, প্রধানত স্ত্রীপাঠ্য বামাবোধিনী প্রৌঢ়ার বয়সে পৌঁছিয়াছে, একি কম গৌরবের কথা! সাধু সমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, কেবল এই জন্যই আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

নব্যভারত। ১৫শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০৪। আর ধন্যবাদের পাত্র এই নব্যভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। অন্য গুণপনার কথা ধরি না, অন্য কৃতিত্বের কথা আজি বলিতেছি না, নব্যভারত যে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল ইহাই দেবীপ্রসন্নের প্রধান কৃতিত্ব। এই চিরস্থায়ী দারুণ দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে, সাহিত্য-সেবকগণের অবসাদ-ক্ষেত্রে*

*এই অবসাদের বর্ণনা, নব্যভারতের এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "বিয়োগ ও যোগ" হইতে উদ্ধৃত হইল। ভাষার জন্য সত্যসত্যই দেবীপ্রসন্নের হৃদয় কাঁদে, সেই দেবীপ্রসন্নের ভাষা এই স্থানে জলন্ত হইয়াছে।

"বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এবং প্রচার, অক্ষয়-চন্দ্রের নবজীবন, যোগেন্দ্র নাথের আর্য্যদর্শন, কালীপ্রসন্নের বান্ধব, রবীন্দ্রনাথের "সাধনা",—এ সকল প্রধান পত্রের তিরোধানের কারণ, গ্রাহকগণের অসীম দয়া! চন্দ্রনাথ আজ *স্কুলপাঠ্য লেখেন পাঠকগণের অসীম দয়ায়;* কেন না শুনিয়াছি, যে শকুন্তলা-তত্ত্বের জন্য তিনি দেশ-বিখ্যাত, সেই শকুন্তলা-তত্ত্বের প্রথম সংস্করণের শত খণ্ড পুস্তকও বিক্রীত হয় নাই। অক্ষয়চন্দ্র ও হেমচন্দ্র আজ সাহিত্য-ক্ষেত্র

সাহিত্য-প্রিয়গণের বিষাদ-ধ্বনি মধ্যে—একা দেবীপ্রসন্নই মুখরক্ষা করিতেছেন, আবার বলি, উমেশ বাবুর সহিত তিনিও আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

বিদ্যোদয়ঃ সংস্কৃত মাসিক পত্রং। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪। এই বিদ্যোদয়ে, যে সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচয় আছে তেমনই আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীর বা সংস্কৃতজ্ঞ অসাধারণ বাঙ্গা[illegible] অসারতার ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় আছে। কেন না ভাটপাড়ার বিদ্যোদয় হইতেছেন, The Sanscrit Critical Journal o' Oriental Nobility Institute, Woking, England. ইংলণ্ডের ওয়াকিং নগরে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় জনগণের (উপব সভা আছে, বিদ্যোদয়, হইতেছেন, সেই সভার সংস্কৃত সমা[illegible] [illegible]রও খোলা কথায় বলি, সেই ওয়াকিং নগর হইতে কলিকাতা[illegible] [illegible]এই টাকায় বিদ্যোদয় ছাপা হয়। একখানি ষোলপাতার [illegible] [illegible]র, বাঙ্গালি বিদেশ হইতে ভিক্ষা না করিয়া চালাইতে অ[illegible] [illegible] হাদুর বটি!

সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী। ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০[illegible] প্রধানত বৈষ্ণবী পত্রিকা। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবি[illegible] সম্পাদক। এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে কেবল কার্য্য বিবরণ। ৩[illegible] প্রভুর উপদেশ। ৪র্থ জৈব ধর্ম্ম (জীবধর্ম্ম বলিলে কুলাইত না কি?) সংহিতা, ভাষা ও তাৎপর্য্য সহিত খণ্ডশ প্রকাশ। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ম[illegible] 'বিদায়' শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসীর লেখা। এই প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত [illegible]

বিদায়।

প্রভুর সন্ন্যাস কথা, শুনিয়া ভকতগণ মরমে পাইল ব্যথা॥
দূরে গেল যত সুখ, আঁধার হইল ধরা বিষাদে ফাটিল বুক॥
নাহি বাঁধে কেশপাশ পড়িয়া চরণতলে কহে গদগদ ভাষ॥
দাসে হ'য়ে নিরদয়, পালিতে সন্ন্যাসধর্ম্ম কোথারে যাবে রসময়॥

পরিতাপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোগেন্দ্রনাথ ডেপুটীগিরি করিতেছেন রজনীকান্ত, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ স্কুলপাঠ্য লিখিতেছেন, কালীপ্রসন্ন, ত্রৈলোক নাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং নবীনচন্দ্রের সাহস এবং বুকের বল অধিক, তাই তাঁহারা সহ্য করিয়াও, রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়াও মাতৃভাষার সেবা করি তেছেন! ঠাকুরদাস অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া চাকরীর উমেদারি করি তেছেন, জ্ঞানেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র চাকরীতেই সুখী হইতেছেন!"

তোমাবিনা মোরা সব, না বাঁচিব তিলআধ জীবনে হইব শব॥
তুমি নাথ দয়াময়, অনুগতজনে ত্যাগ এই কি উচিত হয়?॥
পূরবে বাড়ায়ে প্রীতি, দেখাইলে কত প্রেম এবে বধ একি রীতি॥
ধর্ম্মসংরক্ষক তুমি, মানবে শিখাতে নীতি এসেছ মরতভূমি॥
তবে নাথ বল হেন, তেয়াগি বান্ধবদলে সন্ন্যাস করিবে কেন?
কাঁদিবে মা তোমার, কাঁদিবে যে বিষ্ণুপ্রিয়া করি কত হাহাকার॥
তুমি যদি কর অনাচার, তবেহে তোমার নীতি বল কে পালিবে আর?
গণে ধরিয়া বলি, করিও না নিঠুরতা দূরে রাখ ঠাকুরালী॥
নমুরতি মাঝে এত নিঠুরতা নাথ! জানি না কেমন রাজে!
া বসি বিরলে তোমারে পড়িল বুঝি আমরা মরিব ব'লে!
উচ্ছাস রাশি, হেরি, কন গোরাচাঁদ প্রেম অশ্রুনীরে ভাসি।
তামা সবাকায়, সাধেকি পরাণ মোর সন্ন্যাস করিতে চায়!
দ্ধারের তরে, ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠভূমি আসিয়াছি ধরাপরে॥
নীরবে রহি বসি, জীবের বাঁধন তবে কেমনে যাইবে খসি।
র দুর্গতি ভার, পারে না সহিতে মোর অবশ হৃদয় আর।
তে বলিতে হায়! অসীম করুণারাশি, আঁখি দিয়া উথলায়।
রিতা ভকতদলে, বিদায় সম্মতি দিয়া মুরছি পরে ভূতলে॥
এমন দয়াল প্রভু, একায়া জগতে আর খুঁজিয়া মিলে না কভু।
জীবের মঙ্গল তরে, আত্মসুখ পরিহরি চলিলেন দেশান্তরে॥
এমন দয়াল জনে, ডাক মন প্রাণ ভরে লুটাইয়া সে চরণে॥
তিনি বিনা কেবা আর, এই ভব সিন্ধু হতে লইবেন পরপার॥
নাহি চাই মোক্ষ ছাই, শুধু সাধ সে চরণে লুটাইব সর্ব্বদাই॥
বালার পরাণ কাঁদে, হৃদি মাঝে পাছে নারে বাঁধিবারে গোরাচাঁদে।

সনাতন ধর্ম্মকণা। প্রথম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪। প্রতি সংখ্যায় ১৬ খানি করিয়া পৃষ্ঠা, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অবয়বে, অতি সার কথা সকল, উপদেশরূপে দেওয়া হইয়াছে। এই বৈষ্ণবী-পত্রিকার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

৺ ঈশান চন্দ্র ... ায়।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩০৪ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

মানব-জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জড়বাদিদিগের মীমাংসা অসম্পূর্ণ। জড়বিজ্ঞান দ্বারা এপর্য্যন্ত যত সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই জানা যায় যে জড়পদার্থকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় বিশ্লিষ্ট করিলে যে অণু বা পরমাণু থাকে, তাহাও এক জড় পদার্থ। তাহার একটা আকর্ষিণী বা সংঘর্ষিণী শক্তি আছে। তাহাই বিশ্বের মূলীভূত কারণ। কিন্তু, অণু বা পরমাণুকে সেই শক্তি হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া, শক্তি হইতে পরমাণুর উৎপত্তি, না পরমাণু হইতে শক্তির উৎপত্তি, এ মীমাংসা করিবার ক্ষমতা জড় বিজ্ঞানের এপর্য্যন্ত হয় নাই। তাহার পর, মানবের যে চিত্তবৃত্তি বলিয়া একটি জিনিষ রহিয়াছে, যাহা হইতে মানবের সকল ভাবই উদ্ভূত হইতেছে, তাহার মীমাংসা জড় বিজ্ঞান "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" করিয়া সারিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মানবের মন, এবং তাহার ভাবসমষ্টিও জড়ের বিকাশ। যখন দেহ নহিলে মনও থাকে না, ভাবও থাকে না, তখন মন, বা ভাবের, জড় হইতে পৃথক অস্তিত্ব কি করিয়া স্বীকার করিব? যখন দেখিতেছি যে জড়ে বুদ্ধিবৃত্তি রহিয়াছে, তখন জড়েও যে চিত্তবৃত্তি নাই, তাহা সহসা বলিতে পারি না। একটি গোলাপ ফুল চক্ষের সম্মুখে ধর, উহার গঠন প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখ, যেখানে যেটি হইলে উহার সৌন্দর্য্য রক্ষা হয় তাহাই করা হইয়াছে। যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত

ওই গোলাপ ফুলটি রচিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া কে বলিবে যে জড়ে বুদ্ধি-বৃত্তি নাই? জড়, ও চিত্তবৃত্তির, সন্ধিসূত্র এখনো বিজ্ঞান-খুঁজিয়া পায় নাই বটে, কিন্তু সে সন্ধিসূত্র যে জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা কখনো আবিষ্কৃত হইবে না, তাহা কিরূপে জানিলে? আমেরিকা বলিয়া যে পৃথিবীর আর একটা খণ্ড ছিল, তাহা আগে কে জানিত? বানরের উৎপত্তি বৃক্ষ হইতে, এবং বৃক্ষের উৎপত্তি মৃত্তিকা হইতে; অথবা মনের উৎপত্তি কেবল মস্তিষ্ক হইতে, এবং জ্ঞানের উৎপত্তি সেই জড়গত মন হইতে, এরূপ প্রমাণ যে জড় বিজ্ঞান কখনই করিতে পারিবেনা, তাহা বলাও সঙ্গত নহে। আমরা বলি, যে যত-দিন না জড়বিজ্ঞান সেরূপ প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারিবে, ততদিন আমরা তাহার কথা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবান চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, তোমরা যদি ভগবানকে উড়াইয়া দিতে পার, তোমাদের কথার একটা অকাট্য প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে, আমরাই বা তোমাদের মত গ্রহণ করি কিরূপে।

উপরে যে মতামত উদ্ধৃত করা গেল, তাহাই প্রধানত জীবনী-শক্তির উৎপত্তির মূল সম্বন্ধে। "আমিত্ব" সম্বন্ধে ও অনেকানেক পণ্ডিত, মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা কি বলিয়াছেন, শুনুন।

Malebranche, Condillac, Spinoza প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরাও দেহের উপর মনের প্রভুত্বের নিশ্চিত কারণ খুঁজিয়া পান্ নাই। Germanyর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Kant সাহেব তাঁহার Critique of True Reason নামক প্রস্তাবে, কতকটা বিশ্বাসবাদি হিন্দুর ন্যায় কথার বিচার করিয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে Pure অর্থাৎ transcendental Ego অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এরূপ কোন আমিত্বের ধারণা, আমাদের একেবারেই নাই। Kant সাহেবের এই আংশিক তথ্য অবলম্বন করিয়া Hegel প্রভৃতি পর-বর্ত্তী দার্শনিকেরাও কতকটা হিন্দুদার্শনিকদিগের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া-ছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ঈশ্বরই প্রকৃত বস্তু, আর সকলি তাঁর বিকাশ মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের সে কথা জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত ইউরোপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। Comte সাহেব নিরীশ্বরবাদি হইলেও হিন্দুর মত

অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন যে দৃশ্যমান জগতের অতীত কিছু আছে কি, না, তাহা আমাদের জ্ঞাত হইবার উপায় নাই, এবং তাহার আবশ্যকতাও নাই। আমরা বলি, সে কথা না জানিলে অন্য সকল কথাই ফাঁকা কথা। আমি কি উপাদানে গঠিত—সে উপাদানের মূল কোথা—তাহা না জানিলে, আমার কর্ত্তব্য ও পরিণাম, কিছুই স্থির হইতে পারে না। তোমরা যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলিয়া তাহারি উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতেছ, ভারতের সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা সেই জগৎকেই মিথ্যা বলিয়া, তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছেন না হয় প্রমাণ কর, ভারতের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, নয়, তোমাদের মত ও ভারতের মতের একটা সামঞ্জস্য করিয়া দেও, তবে তোমাদের অনুসরণ করিব।

Hume সাহেব "আমিত্বের" অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, Mind is an aggregate of impressions. আর এক স্থানে বলিয়াছেন, I can never catch myself without a perception অর্থাৎ কোন একটা বিষয়ের ধারণা ব্যতীত আমি আমার পৃথক অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। তৎসম্প্রদায়ের লোকেরা এ কথার আরো সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন আমি কেবল কতকগুলি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র, যথা, দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শ, ইচ্ছা, ঘৃণা প্রভৃতি একত্রিত হইয়া আমার আমিত্বের উদ্ভব হইয়াছে; নতুবা, আমার পৃথক অস্তিত্ব নাই।

John Stuart Mill সাহেব বলিয়াছেন—The notion of a self is, I apprehend, a consequence of memory. There is no meaning in the word Ego or I, unless the I of to-day, is also the I of yesterday. অর্থাৎ মানবের স্মৃতি হইতেই তাহার "আমিত্ব" জ্ঞানের উৎপত্তি। আজকের আমি, কাল্‌ও ঠিক্ সেই আমিই ছিলাম; ইহার স্থির সিদ্ধান্ত না হইলে "আমি" কথার কোনই অর্থ নাই।

Mill সম্প্রদায়ের একজন নেতা Bain সাহেব কিন্তু বলিয়াছেন Sensations have the power of continuing as ideas after the actual object of sensation is withdrawn. অর্থাৎ, যে

ভাব দৃশ্য বস্তু হইতে উৎপন্ন হইলেও, ভাবের এরূপ ক্ষমতা আছে, যে সেই দৃশ্য বস্তুর অবর্ত্তমানেও অবস্থিতি করিতে পারে। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে—It is thus correct to draw a line between feeling and knowing that we feel, although there is a great delicacy in the operation. It may be said in one sense that we cannot feel without knowing that we feel, but the assertion is verging on error, for feeling may be accompanied with a minimum of cognitive energy or as good as none at all. এস্থলে Bain সাহেব বলিতেছেন অনুভূতি হইতে অনুভবকারীকে স্বতন্ত্র করা যুক্তিসিদ্ধ।

ইঁহাদের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, যে জড়ের উৎপত্তি জড়ে, এবং মনের উৎপত্তি মনে। ইহার অধিক কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই।
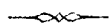
ভজন।

ভঁয়রো।

নারায়ণ হৃষীকেশ কেশব অচ্যুত হরি।
জনার্দ্দন পদ্মনাভ মাধব মুরারি।
নবীন নীরদ শ্যাম, নীলতনু অভিরাম,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, বনমালা ধারী।
সূরজ মণ্ডল বাসী, সরোজ আসনে বসি,
উজারি দশ দিশি, অচিন্ত্য বিহারী।
কনক কেয়ূর করে, কুণ্ডল কর্ণপুরে,
পুরট কিরীট শিরে, কিরণ বিথারী।
গায়ত্রীর উপলক্ষ, ভক্তের ভজন লক্ষ্য
বিশ্ববীজ বিশ্বপ্রাণ, বিপদ কাণ্ডারী।
রাস রসিক বর, নটবর রসেশ্বর,
আনন্দ-কন্দর তুঁহি সুন্দর শৌরি॥

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

প্রাণের দেবতা।

ব্যাধির উপশম সহজেই হইতে পারে। কিন্তু আধির উপশম বড় একটা হয় না। মনের ব্যথা প্রকৃত হইলে কার সাধ্য তাহা নিবারণ করে। কিন্তু তথাপি প্রত্যেক মানুষই শোকাবেগ দমন ও মনোদুঃখ দূর করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পায়। সাহায্য প্রায়ই বাহ্যজগৎ হইতে আইসে কিন্তু অন্তর্জগতের সাহায্য অতুলনীয়। যাঁহারা বাহ্যজগতের সাহায্যে শোকদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারাও অলক্ষিতভাবে মনোবৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানারূপ চিত্তাকর্ষক নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে রত হয়েন, কেহ বা প্রতিভাশালী চিত্রকরদিগের অতুলনীয় চিত্রসমূহে মনো-নিবেশ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং কেহ বা Shakespeare, Tennyson, Scott অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এইরূপ বাহ্যজগতের সাহায্য গ্রহণে বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভববৃত্তি এবং কর্ম্মকারিণীবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হয়। কিন্তু কুসুমেও কীট আছে; অনেক সময় মানুষ বাহ্যজগতের সাহায্য লইতে গিয়া কেবল বহিরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতেই উন্মত্ত থাকে এবং ক্রমে মহা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্য নামের কলঙ্কে পরিণত হয়। কিন্তু যাঁহারা অন্তর্জগতের সাহায্যে শোকদুঃখ জয় করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের উপরিলিখিত কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকে না। শোক আসিতেছে, দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু কদাপি উহাদের দ্বারা অভিভূত হইব না, এইরূপ চিন্তা করিতে শিখিতে হইলে যথেষ্ট মানসিক-শক্তির প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই শক্তি একবার অর্জ্জিত হইলে আর বাহ্যজগতের সাহায্য আবশ্যক হয় না। এই মানসিক-শক্তির মূল—পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা। যখন সকল সাহায্য ক্রমে ক্রমে একে একে নিষ্ফল হয়, তখন থাকে কেবল এক মহান্ বিশাল আশ্রয় বৃক্ষ পরমেশ্বর। সুখদুঃখ হর্ষবিষাদ—এসব কিছুই নয়, পরমেশ্বরই সব, এই ভাবিয়া যিনি পরমেশ্বরের আত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংমিলনে যত্নবান হয়েন, শোক অথবা দুঃখ তাঁহার কেশ মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। চিত্তপ্রসাদ এবং আনন্দ অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বদা Communion with God অথবা

যোগের প্রয়োজন। আন্তর্জাগতিক সাহায্যের ইহাই চূড়ান্ত। এই শোক-দুঃখময় সংসারের একটি পরমাণু বলিয়া আমাকেও সময়ে সময়ে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ উভয়েরই সাহায্য লইতে হয়। বাহ্যজগতের সাহায্য অনায়াসসাধ্য বলিয়া আমি তাহাতেই বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু অন্তর্জগৎ হইতে সাহায্য পাইবার জন্যও আমি যথাশক্তি চেষ্টা করি। সকল সময়ে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পৌছান যায় না; মনোভাব সকল সময়ে ঈশ্বরমুখী হয় না; এই জন্য আমাকে অধিক সময় একটি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে পঁহুছিয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়; অথবা এই নিম্নস্তরের সাহায্য লইয়া ঈশ্বরের সাহায্য লইতে হয়। এই নিম্নস্তর আমার ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার সোপান। এই নিম্নস্তর আর কিছুই নয়, আমার সেই কৈশোর সখী প্রাণের-দেবতার প্রতি ভালবাসা। লোকে যেমন পরমেশ্বর সহায় আছেন, মনে করিয়া পৃথিবীর কোন কষ্টকেই গ্রাহ্য করে না, আমিও সেইরূপ আমার ভালবাসার সহায়ে অসহনীয় শোক-তাপকে তৃণগুচ্ছের ন্যায় হেয় জ্ঞান করি। যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তাহার গুণের স্মরণ করিলে চিত্ত পবিত্র হয়। চিত্ত পবিত্র হইলে পার্থিব সুখদুঃখের জ্ঞান থাকে না। একটি আত্মা আমার আত্মাকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং আমার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী এবং আমারও তাহার প্রতি সেইরূপ ভাব, এই চিন্তা করিয়া আমি এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। আমাদের এই পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত পুলকিত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মনে হয় এত সুখ যার তাহার আবার দুঃখ কিসের? পৃথিবীর যাবতীয় শোক-তাপ-যন্ত্রণা আমার ভালবাসার সহিত তুলীকৃত করিলে আমার বোধ হয় দুঃখভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে। কিন্তু কেবল দুঃখের সময়েই তাহার কথা স্মরণ করি এমন নহে। লোকে কি কেবল বিপদে পড়িলেই পরমেশ্বরকে ডাকে। সকল অবস্থাতেই তাহার কথা মনে হয়। কখন কখন বাস্তবিকই তাহাকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ধ্যান করি। তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে সুখদুঃখ ভুলিয়া যাই; বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই; নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই। মনে থাকে কেবল একটি জীবন্ত আত্মার সহিত আত্মার অদ্ভুত সম্বন্ধ; মনে থাকে কেবল এক অননুভূত অপূর্ব্ব আনন্দ। আমার এইরূপ ভালবাসার অবস্থা কতকটা কবি Wordsworthএর প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার ন্যায়। তিনি বাহ্যপ্রকৃতিতে এক

অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী শক্তি দেখিতে পাইতেন এবং তাহার ধ্যান করিতে করিতে আত্মহারা হইতেন।

সহজ কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় আমি সেই দেবতার উপাসনা করি। লোকে যেমন পরমেশ্বরের উপাসনা করে, আমিও যেন তদ্রূপ করি। আমার বিশ্বাস এইরূপ ভালবাসা ঈশ্বরোপাসনার সোপান স্বরূপ। এইরূপ ভালবাসার ভাব পূর্ণ হইলে ঈশ্বরোপাসনার ফল হয়; মানুষ দেবতা হয়। আমার ভালবাসার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার তাহা বলিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে আমি লোকতঃ ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ এরূপ ভালবাসায় অধিকারী কিনা? আমি বিবাহিত পুরুষ, যাহাকে এত ভাল-বাসি সেও অপরের বিবাহিতা স্ত্রী; অথচ আমাদেব এরূপ ভালবাসায় অধি-কার আছে কি না এবং ইহাতে কোনরূপ গুরুতর দোষ স্পর্শে কি না আমাকে সে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা কবিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার "স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা" এবং এই দেবতার প্রতি ভালবাসা উভয় স্বতন্ত্র। বিভিন্নতা একটি গুরুতর বিষয় লইয়া। আমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা সকাম আর এই ভালবাসা নিষ্কাম। অর্থাৎ প্রথমোক্ত ভালবাসা কতকপরিমাণে কামভাবমিশ্রিত, দ্বিতীয় কামগন্ধ-বিবর্জ্জিত। হিন্দুর বিবাহ অবশ্য আত্মায় আত্মায়। কিন্তু সে আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ স্থাপন বহু সময় সাপেক্ষ এবং বহু যত্ন সাপেক্ষ। এমন দিন হয়ত আসিবে যে সময়ে আমার স্ত্রীর সহিতও সেইরূপ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তুমি অপর বালিকার সহিত এত সহজে কিরূপে এইরূপ নিষ্কাম সম্বন্ধ স্থাপন করিলে? ইহার উত্তর ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু এক্ষণে বলিতে পারি শুভমুহূর্ত্তে পরস্পরের প্রথম সাক্ষাৎ হইলে এবং ইচ্ছাশক্তির (Will force) বল থাকিলে, এরূপ ভাল-বাসা অসম্ভব হইতে পারে না। যেরূপ ঘটনায় পড়িয়া আমি ভালবাসিয়াছি এবং যেরূপ অবস্থায় আমার ভালবাসার রূপান্তর ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে হৃদয়ের ভাবগুলিকে সম্পূর্ণ-সুন্দর করিতে পারা যায়।

এক্ষণে কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তোমার এই ভালবাসার ভিতরে অলক্ষিতভাবে একটু রাজসিকভাব থাকিতে পারে। তুমি সত্ত্ব

সেই প্রিয়জনের চিন্তা কর। সে তোমার নিকট থাকিলে হয়ত তুমি অত্যন্ত আনন্দিত হও। তোমার এই মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে হয়ত অন্তর্লীন-বিষয়-সুখেচ্ছার একটু গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। কোন বহুদর্শী রসিক পুরুষ হয়ত একটু মুচকী হাসিয়া বলিতে পারেন "Frailty thy name is woman," or "Frailty thy name is human." এই সকল কথার উত্তর দিতে হইলে, আমাকে কতকগুলি সহজ কথার আলোচনা করিতে হইবে। আমি মনে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

প্রকৃত ভালবাসার সহিত কাম অথবা রাজসিক ভাবের কোন সংস্রব থাকিতে পারে না। রজোগুণ সমুদ্ভব ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নহে। যে ভালবাসা চিত্তের অতি নির্ম্মল অবস্থায় সংঘটিত হয় এবং যে ভালবাসায় চিত্তশুদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় সেই ভালবাসাই প্রকৃত এবং স্থায়ী। দাম্পত্য ভালবাসা কখন কখন রজোগুণ সমুদ্ভূত হইতে পারে; কিন্তু তাহার পরিণতি সাত্ত্বিকভাবে, আধ্যাত্মিকতায়। Shakespeareএর Brutus এবং Portia-র ভালবাসার এক কথায় বর্ণনা "Their souls have met." কিন্তু যেখানে বিবাহের বন্ধন নাই, সেখানে ভালবাসা সত্ত্বগুণ-সমুদ্ভূত হইলেই ভালবাসা নামের যোগ্য এবং চিরস্থায়ী হয়। এইরূপ ভাল-বাসাতে ইন্দ্রিয়লালসা থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাতে ইন্দ্রিয় জয় হয়; ভালবাসার পাত্রকে দেবতা বলিয়া মনে হয় এবং তাহার সুখে দুঃখে আপনা-কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়; মন সমস্ত জগৎ ছাড়িয়া কেবল তাহারই প্রতি ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়। এরূপ ভালবাসার ভাব মনে হইলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দধারা অনুভূত হয়। হৃদয়ে মাত্র কামভাব থাকে না। কেন এত ভালবাসি ইহার শেষ উদ্দেশ্য কি প্রভৃতি কিছুই মনে থাকে না। মনে হয় কেবল প্রাণের এক অপূর্ব্ব অবস্থা; মনে হয় কেবল একই কথা, "আমি ভালবাসি"। হৃদয় তখন ভাবের আবেশে পরিপূর্ণ হইয়া সুখানুভূতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়। এরূপ ভালবাসা কেবল ভালবাসার জন্য। "Love for the sake of Love" ইহার motto. ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য; ইহাই পরমেশ্বরের প্রতি ভালবাসা।

আমি তাহাকে নিকটে দেখিলে অবশ্য অত্যন্ত সুখী হই। আমি যাহাকে দেবতার মত ভালবাসি তাহাকে সশরীরে দেখিলে সুখী হইব না, ত কাহাকে

দেখিলে হইব ? শরীরী ভগবানকে দেখিলে কে না আনন্দিত হইবে ? যদি কোন ভাগ্যবান্ ভক্তকে ভগবান শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ভূষিত মোহনবেশে দেখা দেন ভক্তের হৃদয় তাহাতে কত অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে নিমগ্ন হয়। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তিপ্রদায়িনী সেই মূর্ত্তি না দেখিলে অদর্শন জনিত কষ্টও অনুভব করি। কিন্তু মনশ্চক্ষে যাহাকে দেখিতে পাই, যাহাকে ধ্যান করিতে পারি, তাহার অদর্শনে বিরহজনিত দুঃখ ততঃ ক্লেশদায়ক হয় না। দুঃখের বিষয় বুঝিতে পারিলে এবং ভাবিতে পারিলে দুঃখ মধুর ও কবিত্বময় বলিয়া বোধ হয়। এ জগতে দুঃখ না থাকিলে বোধ হয় কবিত্ব থাকিত না। দুঃখ আছে বলিয়াই কবিত্ব আছে। দুঃখের গীতি বড়ই সুন্দর ও মধুর। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts." এই বিরহজনিত দুঃখ আছে বলিয়া আমার অন্য দুঃখের লাঘব হয়। তাহার কথা ভাবিলে আমায় অন্য দুঃখ আক্রমণ করিতে পারে না। তন্ময় হইয়া তাহার কথা ভাবিলে মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়। যাহার প্রতি মনের ভাব এইরূপ তাহার দর্শনে দোষ স্পর্শের কোন শঙ্কা নাই। পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিলে মনের ভাব পবিত্র হয়। "To look on noble forms makes the mind nobler."

আর একটা সোজা কথা বলিয়া এই ভালবাসার ভাবটি পরিস্ফুট করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃত ভালবাসা কামগন্ধ বর্জ্জিত। যাহাকে প্রকৃত ভালবাসি তাহার সহিত কোনরূপ কামসম্বন্ধ হইলেই তাহার প্রতি ভয়ানক শত্রুতার কাজ করা হইল। যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, যদি তাহারই অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম, তবে আর ভালবাসার ভাব রহিল কই ? এরূপ পাপ কথা মনেতে স্থান দেওয়াও মহাপাপ। যখন শত্রুরও অনিষ্ট করা অন্যায়, তখন এই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধুর অনিষ্ট করিতে কিরূপে প্রবৃত্ত হইব ? আর আমরা সংসারে সচরাচর কি দেখিতে পাই। অনেকেই শৈশবের সঙ্গিনীদিগকে শৈশববেলার সময় ভালবাসেন। পরে তাহারা বড় হয়, বিবাহিত হয়, সংসার-ধর্ম্ম করে। বালক যুবক হইয়াও আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। একত্র বাস হইলে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎও হয়। কিন্তু নিতান্ত পাপিষ্ঠ ব্যতীত কেহ ভুলিয়াও ত কুভাব মনে স্থান দেন না। যদি কোন ব্যক্তি মনে মনেও পাপ সংকল্প করে অভ্যাস দ্বারা সহজেই তাহার এই দুষ্ট সংকল্প দূরীভূত হইতে পারে। এই পবিত্র

বাল্য প্রণয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অপবিত্রভাব আনয়ন করিতে প্রয়াস পায়, তাহার তুল্য মহাপাপ এ জগতে আর নাই। এই প্রণয়ের মধ্যে একটি কবিতাময় ভাব আছে; ইহার মধ্যে কামগন্ধ থাকিতে পারে না। নূতন কোন অলৌকিক সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলেও এরূপ মধুর মনোভাব হয় না। কত সময়ে আমরা কত অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি। কিন্তু তাহারা হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট অদ্ভুত মনোহারিণী মূর্ত্তির ন্যায় অচিরেই বিস্মৃতি সাগরে বিলীন হয়।

যে যে কারণে এই "প্রাণের দেবতা"র প্রতি ভালবাসা চিরস্থায়ী হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই—(১) প্রথমতঃ শুভমুহূর্ত্তে দর্শন। এমন কতকগুলি শুভমুহূর্ত্ত সময়ে সময়ে পৃথিবীতে দেখা যায়, যে সেই সময়ে যে কোন কর্ম্ম করা যায় তাহাই শুভ হয়। কেহ চেষ্টা করিয়া সেই শুভ-মুহূর্ত্তের সাহায্য পান না, কেহ বা বিনা চেষ্টায় সেই শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের দর্শন পান। শুভ মুহূর্ত্তে দর্শন হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়; যে ভালবাসার পাত্র নয় সে পর্য্যন্ত ভালবাসার পাত্র হয়। পৃথিবীতে ইহার শত শত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রকৃত ভালবাসার পাত্র তাহার সহিত শুভমুহূর্ত্তে দেখা হইলে ত কথাই নাই। অপূর্ব্ব মনিকাঞ্চন সংযোগ হয়। (২) কি পুরুষ কি স্ত্রী কতকগুলি লোকের বাহ্য আকৃতিতে এমন কিছু আছে যাহা দেখিলেই তাহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। কেন এরূপ ইচ্ছা হয় কেহ বলিতে পারে না। গুণ আকৃতিতে। তপস্বিনী গৌরী অজিনাষাঢ়ধারী ব্রহ্ম-চারীবেশী মহাদেবকে বহুমানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ কালিদাস বলিয়াছেন, "ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্ট চেতসাং, বপুর্বিশেষেষ্বতি গৌরবাঃ ক্রিয়াঃ"। সাম্যভাব পৃথিবীর নিয়ম হইলেও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সাধুজনদিগের অত্যাদর হইয়া থাকে। আমার "প্রাণের দেবতার" মূর্ত্তিতেও অতি গৌরবাকর্ষক একটা কিছু আছে। আমাতেও যৎকিঞ্চিৎ এই রকম একটা কিছু সামান্য পরিমাণে থাকিতে পারে। (৩) সময়ের গতির সহিত স্ব স্ব চেষ্টায় এই মনোভাবের ক্রমোৎকর্ষ হইতেছে। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ এই ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। সময়ে পরিপক্ক হইয়া এই অপূর্ব্ব ভাব ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইতেছে। এই ভালবাসার মধ্যে যেটুকু অভাব ও অপূর্ণতা আছে, উভয় পক্ষের সমবেত চেষ্টায় সেটুকু ক্রমশঃ দূরীকৃত হইতেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবের শিক্ষা।

ভগবচ্চরণই একমাত্র সুখ শান্তির স্থল। বাল্যকাল হইতে পিতামাতা যদি বালক বালিকাদিগের কোমল চিত্ত কেবল পুতিগন্ধময় বিষয়-বিষে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চরণের শীতল ছায়াতলের দিকে আকর্ষিত করেন, তবে সংসার বড়ই সুখের হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দিকে পিতামাতার লক্ষ্য নাই, কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস সন্তান ভগবচ্চরনের দিকে অগ্রসর হইলেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, যিনি প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবানের নিকট অগ্রসর হইবেন, তিনি কেন অন্যায়াচরণ করিয়া পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদিগের মনে ক্লেশ উৎপাদন করিবেন? বিশেষতঃ পর্ব্বত গুহায় বা বনে গেলেই সংসার ত্যাগ হয় না, বাসনা সংযত হইলেই সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত সংসার ত্যাগ হয়। মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিয়া যখন কুর্ম্মভবনে উপস্থিত হইয়া কুর্ম্মকে কৃপা করিয়া বিদায় হইতেছেন তখন প্রভুর বিরহে কুর্ম্ম অত্যন্ত কাতর হইয়া তৎসহ গমনের প্রার্থনা করিলে—

"প্রভু কহে ঐছেবাত কভু না কহিবা,
গৃহে বসি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম লৈবা।" চৈঃ চঃ

শ্রীমহাপ্রভু যে সংসারী-জীবকে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন তাহা ঐ দুই চরণেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। অতএব যাঁহারা প্রকৃত ভগবৎপথে অগ্রসর হইবেন তাঁহারা কখনই শ্রীপ্রভুর বাক্য লঙ্ঘন পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলতার পথে প্রবিষ্ট হইবেন না, সুতরাং সন্তানদিগকে ভগবৎপথে আকর্ষিত করিতে কোনই আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা দূরে থাক, সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন বালকবালিকা ভগবচ্চরণের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন, তবে তাঁহাদিগের পিতামাতা প্রভৃতি অবিভাবকগন তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য হিরণ্যকশিপুর ন্যায় নানারূপ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না।

জীবের জন্য শ্রেয় এবং প্রেয় দুইটি আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, শ্রেয় জীবকে আধ্যাত্মিক পথে প্রবিষ্ট করায়, প্রেয় জীবের আধ্যাত্ম চিন্তা নষ্ট করিয়া

সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে ও তাহা হইতেই জীব পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপানলে জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

"অন্য চ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়,
স্তেউভে নানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃনীতে।" কঠোপনীষৎ ২।১

অতএব প্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়াবলম্বন করাই জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

জীব স্বতঃই দুর্ব্বল তাহারা যখন সংসারের কোনরূপ কঠোরাঘাতে পেষিত হইয়া থাকে, তখন তাহারা একজন মনের মত সঙ্গীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেই জন্যই একজন প্রাণের সঙ্গী ব্যতীত মানব-জীবন বড়ই ভার বোধ হয়। কিন্তু সেই সঙ্গীর স্থলে যদি মানুষের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তবে জীবন বড়ই সুখের হয়, তাহা হইলে আর কোন তাপই মানবকে পীড়ন করিতে পারে না। এখন কথা হইতেছে তাঁহাকে কিরূপে সঙ্গীরূপে লাভ করিতে পারা যায়? তিনি প্রেমময়, বিশুদ্ধ প্রেমেই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন, অতএব প্রেম সাধন দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে। যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার সহিত কখনও পরিচয় নাই, তাঁহার সহিত প্রেম, কথাটী জড়জগতে হাস্যজনক বটে, কিন্তু আধ্যাত্ম জগতে হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয় না,—যিনি শ্রীভগবান তিনি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন এবং তিনি অসীম কৃপাময়, তোমার চিত্ত যখন তৎ সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তচ্চরণে আত্ম নিবেদন করিতে সমর্থ হইবে তখনই তিনি সহায় হইয়া তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।

"পীরিতি করিব কেমনে তোমায়?
তুমি যদি তার না কর সহায়।
মানুষের সঙ্গে পীরিতি করিতে।
মানুষ তোমারে হইবে হইতে।" শ্রীকালাচাঁদ গীতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন সুতরাং মানুষ হইয়া মানুষের নিকট আসাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে মৌখিক চেষ্টায় ভগবত প্রেম লাভ করিতে পারা যায় না, যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্ম নির্ভর করিতে পারা যায় তখনই তৎ প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

তৎসেবা, তৎকীর্ত্তি শ্রবন, তৎপ্রতিকৃতি দর্শন, তৎভক্ত সহবাস প্রভৃতি কার্য্যগুলি তৎপ্রেমের সহায়তা করে। ভগবৎ সাধন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাতে ঐকান্তিক রুচি হইয়া থাকে এবং সেই রুচি যখন গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় তখনই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা,—

সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তার প্রেমনাম কয়। চৈঃ চঃ।

প্রেম একবার উৎপন্ন হইলে আর তাহা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

"টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত,
যৈছন বাড়ত মৃণালক সুত।" বিদ্যাপতি।

প্রেমের জন্য দৃঢ় তন্ময়ত্ব, দৃঢ় আত্মত্যাগ, অসীম একাগ্রতা, প্রেমময়ী শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই, সেই জন্যই বৈষ্ণব-জগতে রাধার প্রেমই আদর্শ প্রেমরূপে পরিগণিত। জীব যদি শ্রীমতীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধনা করে তবে তাহারাও ব্রজের মধুর রস উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। অনেকে ব্রজলীলাকে অশ্লীলাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রজলীলায় মধুরতার পরিবর্ত্তে অশ্লীলতার পরিচয় পাইয়া থাকেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ভগবত্তত্ত্বে তাঁহাদিগের আদৌ প্রবেশ নাই। ব্রজলীলায় পবিত্র প্রেমের পরিবর্ত্তে যদি কামের ছায়া মাত্র লক্ষিত হইত তবে উহা উপাদেয় না হইয়া ঘৃণার্হ হইতে পারিত। কিন্তু ব্রজলীলায় কেবল প্রেম, কেবল আত্মত্যাগ, সেইজন্যই উহা এত মধুর।

তিনিই প্রেমিক যিনি,—

"আপনা ভুলিয়া পরেতে মিশাতে পারে।"

প্রেমিক আপনাদ্বারা অন্যকে সুখী করিতে চাহেন, কামুক অন্যের দ্বারা নিজে সুখী হইতে চাহেন। প্রেমিক ও কামুকে ইহাই বিশেষ পার্থক্য। প্রেম স্বর্গের বস্তু, কাম নরকের নক্কারজনক ঘৃণার্হ পদার্থ। ব্রজাঙ্গনার প্রেমে কামের লেশমাত্রও ছিল না, তাঁহারা কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে কুলশীল জীবন যৌবন সমস্তই তৎপদে অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"তে মন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ।
যে ত্যক্ত লোক ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্বিভর্ম্ম্যহং।

ময়িতাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুল স্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎ কণ্ঠ বিহ্বলাঃ।
প্রধারয়ন্তি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্বল্লভ্যো মে মদাত্মিকাঃ।"

কি মহান্ প্রেম! পরমারাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবও ব্রজগোপীদিগের প্রেম-সাধন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। জীবের চরম প্রয়োজনকে সাধ্য এবং সেই প্রয়োজনীয় বস্তু যদ্দ্বারা লাভ হইয়া থাকে তাহাকে সাধন বলা যায়। শ্রীমন্মহা প্রভু জীব শিক্ষার্থেই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি জীবকে যে শিক্ষা সকল প্রদান করিয়াছেন তাহাই জীবের পালনীয়। তিনি ব্রজাঙ্গনার প্রেমকেই সাধনীয় বলিয়াছেন, অতএব তৎশিক্ষা হইতেই জীবের সাধনতত্ত্ব বিচার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই জীবের প্রকৃত সাধন তত্ত্ব। তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমতে জীবকে তিনি কখনই ভ্রমাত্মক শিক্ষা প্রদান করেন নাই, অতএব তৎশিক্ষানুসারেই পরিচালিত হওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি জীবকে বলিতেছেন

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মান দেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

কিন্তু হায় এখন কয়জন সে শিক্ষা পালন করিয়া থাকেন! দীনতা মানব হৃদয়ের একটী ভূষণ স্বরূপ, যে জীবন দীনতা শূন্য সে জীবন মনুষ্যত্বহীন। মুখে দীনতার ভান করিয়া অনেকে জনসমাজের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিয়া থাকেন, যিনি এরূপ করিয়া থাকেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি সে হৃদয় প্রকৃত দীনতা শূন্য ও ঘোর শঠতায় পূর্ণিত তিনি জগতের ঘৃণার্হ হইবার উপযুক্ত। দীনতা গভীর অন্তঃস্তলের মহান্ রত্ন, উহা মুখের চাটুকারিতায় লভ্য নহে। দীনতা হইতে ক্ষমা ও দয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। দীনতাই ভগদ্ভক্তির একটী প্রধান সোপান, অতএব হৃদয়কে দীনতা রত্ন দ্বারা ভূষিত করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অতিথি সৎকার গৃহস্থের একটী ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন। যথা,—

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে।

কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ।
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনি বসিয়া।
তুষ্টি করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥ চৈঃ ভাঃ

যাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিয়া ভগবৎ প্রাপ্তি বাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা যেন মহাপ্রভুর শিক্ষা গুলি বিশেষরূপে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। শ্রীভগবান গৌরাবতারে জীবকে কেবল হরিনাম উপদেশ করিয়াছিলেন এবং কলিযুগে যে কেবলমাত্র নাম সংকীর্ত্তনই জীবের ভব-বন্ধন খণ্ডনের একমাত্র উপায় তাহা তাঁহার শ্রীমুখোক্ত বাক্যেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। যথা—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিক্ষা অবশ্য পালনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসারী জীবদিগকে যেমন সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন, সংসারত্যাগী বৈরাগীদিগকেও সেইরূপ প্রকৃতি সম্ভাষণে নিষেধ করিয়াছেন। প্রভু তৎভক্ত ছোটহরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র বৈরাগীদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, যথা—

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥ চৈঃ চঃ

অসীম দয়াল গৌরাঙ্গদেবও যাহার বদন দেখিতে অনিচ্ছুক পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন তাহার পাতকরাশি কিরূপ ভয়ানক। কিন্তু হায় দয়াল প্রভুর পবিত্র শিক্ষাও এখন কলির প্রতাপে কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত প্রায়। অধুনা সংসার বিযুক্ত অনেক বৈরাগীকে এক একটি প্রকৃতি সহ অনেক মঠে দেখা গিয়া থাকে, ইহাঁরা বৈষ্ণব নহেন, প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণবকুলের কলঙ্ক। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের জন্যই আজ মহাপ্রভুর পবিত্র সমাজও কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছে। প্রভু করুণা করিয়া এই অত্যাচার নিবারণ কর তোমার করুণা ব্যতীত দীনহীন বৈষ্ণবদিগের অন্য উপায় নাই।

মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

পৃথিবীতে যাহা কিছু অবলম্বন করিয়াছিলাম, একে একে সবইত দেখি ধ্বংস হইতে চলিল। মরিবার এবং মারিবার জন্যই কি সমস্ত আয়োজন ? দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে লক্ষ লক্ষ কাঙ্গাল-গরিব মরিল, বাকি ছিল রাজা, জমিদার, বড়মানুষেরা, ভূমিকম্পের দুর্জ্জয় আঘাতে তাহারাও কেহ মৃত, কেহ পঙ্গু, কেহ বা হৃতসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় হইয়া পর্ণকুটীরে তপস্বীর বেশে এখন অবস্থান করিতেছে। সমস্ত আয়োজন তবে কি শেষ মরিবারই জন্য ? মরিলেই দেখিতেছি সকল উৎপাত চুকিয়া যায়, এ সকল আর কিছুই ভাবিতে হয় না; তবে মরাই ভাল। কোন সুরাপায়ী সৈনিক-পুরুষ দ্বিপ্রহর বেলার সময় গির্জ্জার নিকট দাঁড়াইয়া এক দুই করিয়া ঘড়ির শব্দ শুনিয়া শেষ যেমন বলিয়াছিল, "এত বিলম্ব কেন বাবা! একেবারে বারটা হইয়াছে বলিলেইত হইত।" আজ কালকার দৈব দুর্ঘটনাগুলি একে একে গণিয়া তেমনি সেই কথা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। মরিলেই যদি সব গোলযোগ মিটিয়া যায় তবে একবারেই তাহা শেষ হইয়া যাউক! পুনরায় নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হউক! অথবা তাহাই বা কেন বলি ? ইহাও ঠাকুরের এক লীলা। কত প্রকারের বিকট ভীষণ বিপদ মৃত্যু আছে, একে একে সেগুলি বুঝি তিনি দেখাইয়া জীবকে শিখাইতে চান। তবে তাই, তাই হউক! আমরা যদি এত দুর্ঘটনাতেও মরিলাম না, যমের অরুচি হইয়া এখনও বাঁচিয়া রহিলাম, তবে শেষদিন পর্য্যন্ত, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা করা যাউক! লীলাময়ের অনন্ত লীলা দেখা যাউক।

কিন্তু এ বড় বিষম বিপদ। কোন দিকে আর কূল কিনারা দেখা যায় না। ধনীসন্তান, রাজপুত্র বহুদিনের সঞ্চিত সম্বল ব্যয় করিয়া, পাকা বুনিয়াদ গাঁথিয়া সুদৃঢ় সৌধমালা নির্ম্মাণ করিলেন, বহুমূল্য সামগ্রীতে তাহা সাজাইলেন, শেষ কিনা সেই অকৃতজ্ঞ গৃহভিত্তি, ক্রীত বিলাস সামগ্রী তাঁহাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়া প্রাণ নাশ করিল ? ভৌতিক জগতে কি কোন বিচার নাই, বিধিব্যবস্থা নাই ? ঈদৃশ দুর্গ সমান নিরাপদ গৃহে থাকিয়াও যদি হাত পা ভাঙ্গে, তবে আর নিস্তার কোথা ? মানুষ দাঁড়ায় কোথা ? ঘরের গোড়াতেই ভূমিকম্পের বাসা। আবার মেরামত করিব আবার ভাঙ্গিবে। কতকাল আর ধৈর্য্য থাকে! কাঠপ্রাণী পাষাণ মন তবু বৈরাগী হইতে চায় না।

ঘরবাড়ী না হয় কোনরূপে আবার মেরামত করিয়া লওয়া গেল, তার পর এই দেহের উপরই বা বিশ্বাস কি ? তাহাকে কত ক্ষীর, সর, নবনী, ভূচর, খেচর, ঘৃতপক্ক খাওয়াইলাম, কত সুবাসিত তৈল, সাবান মাখাইলাম, কত মূল্যবান বসনভূষণে সাজাইলাম, তথাপি সে কি আমার বশে রহিল ? জ্বর, প্লীহা, অম্ল, শূল ও উদরাময় রোগে সে সর্ব্বদা কাতর। এখন আছেত তখন নাই। দিন যায়ত রাত্রি যায় না। ইহাকে কোথাও রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। স্বাস্থ্য যৌবনে যখন সে তেজস্কর বলিষ্ঠ, তখন ক্ষুধা ইন্দ্রিয়-লালসায় সর্ব্বদা বিকারী রোগীর ন্যায় উন্মত্ত, পীড়ার সময় কেবল, ক্যান ক্যান ঘ্যান ঘ্যান।

ভাইবন্ধু আত্মীয়-প্রিয়জনের উপর নির্ভর করিয়া অধিক দিন যে নির্ব্বিঘ্নে থাকিব তাহারই বা স্থিরতা কি ? আজ যে ভাই কাল সে ঘোর বিদ্বেষী পর, আজ যে বন্ধু কাল সে চির অপরিচিত শত্রুর ন্যায়, যিনি ছিলেন কুটুম্ব নারায়ণ, তিনি এখন পরোক্ষে নিন্দাকারী। তবে বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ? কোন রকমে মান বাঁচাইয়া হাড় কয়খানা গঙ্গায় ফেলিব তাহার ভিতর কতই বিঘ্নবাধা। কয়দিনের জন্যই বা এখানে থাকা ? তাহার মধ্যে এই এত বিপদ ! যদি ভাবি যে দূর হউক ! আর এসব ভাবিব না, এখন তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিয়া অসার ভবের ভাবনা সকল ভুলিয়া যাই। তাই কি বড় সোজা কথা না কি ? বিজ্ঞানতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া হাক্সলি, টিণ্ডেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগুল শেষ ঘুরুণিরোগে চক্ষে আঁধার দেখিয়া শূন্য প্রাণে দেহ-লীলা শেষ করিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে বলিয়া গেল, "জড়ের ভিতর হইতে জীব কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাও বুঝিতে পারিলাম না, এবং জীব জগতে মনোবুদ্ধি আত্মজ্ঞান কিরূপে জন্মিবে, তাহারও কোন অন্ধিসন্ধি পাইলাম না" এত বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগের যখন এই কথা, তখন তুমি আমি কোথায় লাগি ? যাই হউক, অনেক পরিশ্রম খরচপত্র করিয়া সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহারা যাহা কিছু মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিল তাহার সাহায্যে, আমরা মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত তাহা বুঝিয়া লইলাম। এবং কিছুই যে বুঝি না, এটাও বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু জ্ঞান-রাজ্যও অকূলপাথার। এখানেও দাঁড়াইবার জায়গা, বিশ্রামের স্থান দেখি না।

ভজন, সাধন, যোগ, তপস্যা, তাই বা কিরূপে করিব? কত যোগীঋষি উইনন্দনের ঢিবি হইয়া গিয়াছে তথাপি ভগবত্তত্বের অন্ত পায় নাই। আমরা কলির জীব, দীন দরিদ্র দুর্ব্বল বাঙ্গালী, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারি? হায় তবে সব দিকেই যে অকূল পাথার দেখিতেছি! হাত পা যে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল! নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অভিমান আর এখানে তিষ্ঠিতে পারিল না। ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু এতদিন মোহাশক্তি আত্মাভিমানে খুব বড় মনে হইত, এখন তাহা অকূল সাগরে কোথায় ডুবিয়া গেল। আপনাকে কৈ আরত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হায় একি হইল। ধূলিকণা হইয়া আমি অনন্তে মিশিয়া গেলাম। যাউক, সব ডুবিয়া যাউক! ঠাকুর তুমি আমাকে তোমার অনন্ত গভীর গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়াছিলে সেইখানে পুনরায় আবার স্থান দাও। তুমি যে হও সে হও, তোমার সৃষ্টি-লীলার কুটিল রহস্যও বুঝিতে চাহি না, তোমাকেও বুঝিতে চাহি না। কিন্তু আমি যখন স্বতন্ত্র উপাধি বিশিষ্ট জীব তখন আমার পিতামাতা গুরু সখার দরকার। তুমি মা হইয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লও, আমি সেখানে বিশ্রাম সম্ভোগ করি, পথে বড় কষ্ট পাইয়াছি। তোমার অভয় চরণে একটু স্থান দান কর।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

জন্মান্তর।

জীবগণের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ সুস্থ, সবল ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; কেহ অন্ধ, খঞ্জ, ও বিকলাঙ্গ; কোন ব্যক্তি সাধুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা সদুপদেশ লাভ করিতেছে; কেহ দস্যুর সন্তান হইয়া পরস্বাপ-হরণ ও নরহত্যাদি গুরুতর পাপ কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতেছে। উৎপত্তিকালেই জীবের অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ পার্থক্য হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা অতি কঠিন। কিন্তু যাঁহারা দেহের অধিষ্ঠাতা অজড়-দেহী অর্থাৎ আত্মার সত্তায় বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা মনে করেন জীবদিগের চেতনা দেহের উপাদানভূত জড় পরমাণু সকলের বিশেষ বিশেষ সংযোগের ফল মাত্র, যাঁহারা বিশ্বের আদিকারণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহার মীমাংসা সহজ। ঘটনাক্রমে যে দেহটা যেরূপ জনকজননী হইতে

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ।

বাঁশবেড়িয়া,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দে দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৪।

সূচীপত্র।

পঞ্চম বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
" আনন্দগোপাল ঘোষ।
৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।
" কালীপদ সরকার।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
" কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
" চন্দ্রশেখর কর।
" চিরঞ্জীব শর্ম্মা।
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।
শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।
" বীরেন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" সুরেশচন্দ্র সেন।
" ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

উৎপন্ন হইয়াছে বা যে প্রকার অবস্থায় পড়িয়াছে তাহার তাদৃশ দশা ঘটিয়াছে, এই কথা বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যাঁহারা আত্মা, ঈশ্বর, ও পাপপুণ্যের ফলাফল ইত্যাদি বিষয় স্বীকার করেন তাঁহাদিগের পক্ষে সেরূপ সহজ নহে। প্রচলিত ধর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে সকলেই এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে জন্মকাল হইতে জীবের উক্তবিধ অবস্থাভেদের কারণ ঈশ্বরেচ্ছা। উহাকেই তাঁহারা অদৃষ্ট বা ভাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বর আত্মা সকলের সৃষ্টি করিয়া আপন ইচ্ছামত নানা অবস্থায় স্থাপিত করেন, তৎপরে তাহারা জীবনকালে যে সকল কার্য্য করে, তাহার ফল স্বরূপ অনন্তকাল স্বর্গে বা নরকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। কয়েকটী কারণে এই মত সদোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথমতঃ বিনা কারণে কাহাকে সুখী কাহাকে বা দুঃখী করায়, "নিত্য বুদ্ধশুদ্ধস্বরূপ" পরমেশ্বরের বৈষম্য ও পক্ষপাত প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি দশ, বিশ, পঞ্চাশ বা শত বৎসরে যে কার্য্য করিল, তাহার ফল অনন্তকাল ভোগ করিতে হইবে; তাহাকে আপন দোষ সংশোধনের জন্য আর সুযোগ দেওয়া হইবে না, ঈশ্বরের পক্ষে ইহা যেন অবিচার ও নির্দ্দয়তার কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন অজ্ঞ নরপতি কাহাকে পাপানুষ্ঠানের সুযোগ দিয়া, অসাধু হইবার অনুকূল অবস্থায় স্থাপিত করিয়া, পরে অসৎকার্য্য করিয়াছ বলিয়া তাহাকে চিরদুঃখ ভোগ করায়; অথবা কোন ব্যক্তিকে সৎ ও পুণ্যবান হইবার জন্য স্বয়ং বিবিধ সুযোগ বিধান করিয়া পরে সৎকর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া তাহার চির সুখভোগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে তাহাকে যথেচ্ছাচার ও অন্যায়কারী বলিতে কেহই কুণ্ঠিত হয় না। সর্ব্বগুণাকর বিশ্বপতির পক্ষে তাদৃশ কর্ম্ম কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এই মতবাদের আরও দুই বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে। প্রথমতঃ আত্মার সৃষ্টি বা উৎপত্তি আছে, অথচ ইহা অনন্তকাল-স্থায়ী একথা সহজে বোধগম্য হইতে পারে না। যাহারই উৎপত্তি বা আদি আছে তাহারই নাশ বা অন্ত আছে। কোন বস্তুর আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই ইহা অনুভববিরুদ্ধ। জগতে তাদৃশ দৃষ্টান্তও দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন কেবল

মনুষ্যেরই অবিনশ্বর আত্মা আছে, অন্য প্রাণীর তাদৃশ আত্মা নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সকল শেষ হইয়া যায়। এ বিষয়ের যুক্তি আমাদিগের বোধাতীত। মনুষ্যদিগের ন্যায় পশু পক্ষীদিগেরও স্নেহ, মমতা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৃত্তির কার্য্য দেখা যাইতেছে। বিদেশ হইতে সমাগত প্রভুকে দেখিয়া তাহার পালিত কুক্কুর কত আনন্দ প্রকাশ করে, তাহা দেখিলে হৃদয় আর্দ্র হয়। প্রভুর বিত্ত বা পুত্রের রক্ষার্থ যত্ন করিতে গিয়া প্রভুভক্ত কুক্কুর প্রভুরই হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, অথচ তাঁহার বস্তু রক্ষা করিবার জন্য যত্ন পরিত্যাগ করে নাই। বিশ্বস্ত অশ্ব বন্দীকৃত, নিগড়বদ্ধ প্রভুকে বহুযোজন বহনানন্তর গৃহে আসিয়া উৎকট শ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভীষণ সিংহ আপন শৈল্যোদ্ধারক ও ক্ষতচিকিৎসক দাসকে বহুকালের পর সম্মুখে দেখিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রকার বৃত্তান্ত বালক পাঠ্য ইংরাজী পুস্তকে অনেকেই পড়িয়াছেন। এতাদৃশ পশু সকলের আত্মা নাই, অথচ মানব কুলকলঙ্ক নিষ্ঠুর, পাষণ্ড ও কৃতঘ্নদিগের আত্মা আছে এ কিরূপ সংস্কার বুঝিতে পারি না। ভারতের বহির্ভাগে যে সকল ধর্ম্মবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জীবাত্মা সম্বন্ধে যে প্রকার মত সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করিলাম। এক্ষণে ঐ বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যদিগের মত বিবৃত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে আত্মা সৃষ্টবস্তু নহে, উহা অনাদি ও অনন্ত। দেবতা হইতে উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সকলেই জীব এবং সকলেরই অবিনশ্বর আত্মা আছে। কেবল স্ব-স্বরূপের বিকাশ, কোন স্থলে অল্প বা কোন স্থলে অধিক, এইমাত্র প্রভেদ। যতকাল জীবগণ মুক্ত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা অজ্ঞানাদি বর্জ্জিত হইয়া স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত না হয়, ততকাল পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে যে প্রকার সুকৃত বা দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করে ইহ বা পরজন্মে সে তদনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে সুকৃত দুষ্কৃতই অদৃষ্ট পদবাচ্য। অদৃষ্টের বা পাপপুণ্যের ফলভোগ বিষয়ে পরমেশ্বরের একেবারে কিছুমাত্র সংস্রব নাই এরূপ নহে, তিনি কর্ম্মফলদাতা। যেমন কৃষকগণ ভূমি কর্ষণ করিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্যের বীজ বপন করে, কিন্তু পর্জ্জন্য বর্ষণ না করিলে, শস্যসম্পত্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবগণ যে সকল সৎ বা অসৎ কর্ম্ম সম্পাদন

করে, ফলদাতা বিধাতার ইচ্ছা না হইলে তাহার শুভাশুভ ফল লাভ হয় না।

উক্ত মতে এই একটী আপত্তি হইতে পারে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আচরিত ভদ্রাভদ্র কার্য্যের ফল, জীবগণ পর পর জন্মে ভোগ করে, কিন্তু তাহার কিছুই জানিতে পারে না। কোন্ কার্য্যের নিমিত্ত কি প্রকার ফল হইল, তাহা না জানিলে জীব, কি প্রকারে আপন দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবে? উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন প্রকার অপরাধ করিলে নরপতি তাহার প্রতি কোন দণ্ডবিধান করেন না, কারণ সে, কর্ম্মের ফলাফল বুঝিতে অসমর্থ, সুতরাং দণ্ডভোগ করিয়া ভবিষ্যতে আত্মদোষ শোধনে যত্নও করিতে পারে না। জন্মান্তরের কর্ম্মফল বিষয়ে আমরা সকলেই ঐ উন্মত্তের ন্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপর একটী আপত্তি হইতে পারে যে যদি একই ব্যক্তি নিষ্ঠ আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে, অর্থাৎ স্বকর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তবে তদ্বিষয়ে তাহার কোন স্মৃতি কেনই বা হয় না? বিশেষ প্রণিধান করিলে উল্লিখিত আপত্তি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। প্রথমতঃ আর্য্যশাস্ত্রে জীবদিগের সুখ দুঃখাদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, দণ্ড বা পুরস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। জ্ঞানশূন্য পাগলই হউক আর অবোধ শিশুই হউক কোন কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল পাইবে, ইহা প্রকৃতির সুদৃঢ় নিয়ম। বিষপানে মৃত্যু হয়, অগ্নিস্পর্শে গাত্র দগ্ধ হয়, এই সকল ব্যাপারে যেমন কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ দেখা যায়, পুণ্য-পাপের ফলাফলেও সেই প্রকার কার্য্যকারণ ভাব আছে। অপর আমরা স্মরণ করিতে পারি না বলিয়া জন্মান্তর না মানাও যুক্তিসঙ্গত হয় না, কারণ কখন কখন রোগবিশেষে আক্রান্ত ব্যক্তি পূর্ব্বের বৃত্তান্ত অনেক ভুলিয়া যায়। তাই বলিয়া তত্তদ্ঘটনা হয় নাই এ কথা বলা যায় না। যদি রোগের জন্য ইহ জীবনে কৃত কার্য্যাদি বিস্মৃত হইতে পারে, তবে মৃত্যুরূপ ভয়ানক ঘটনার পর পূর্ব্বজীবনের ঘটনাবলী বিস্মৃত হইবে তাহা বিচিত্র কি?

একখানি ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তি পাঁচ ছয়টী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল, কিন্তু উৎকট ব্যাধিতে অভিভূত হইয়া মাতৃভাষা ব্যতীত সকলই বিস্মৃত হইয়া যায়। আরোগ্যলাভের পর তাহার মনে হইত যে সে কোন সময়ে তত্তদ্ভাষা জানিত। তদনন্তর বিশেষ অধ্য-বসায় সহকারে সেই বিস্মৃত ভাষাসমূহ পুনর্ব্বার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ একদিন পূর্ব্বাভ্যস্ত সমুদয় ভাষার জ্ঞান পুনরুদিত হইল। যেমন কোন রুদ্ধদ্বার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইলে তন্মধ্যস্ত সমস্ত বস্তু এককালে দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়, সেইরূপ তাহার লুপ্ত জ্ঞান সমস্তই পুনঃপ্রাপ্ত হইল। শাস্ত্রানুসারে প্রগাঢ় যত্ন করিতে পারিলে জন্মান্তর-বৃত্তান্ত সকলও উক্ত প্রণালীতে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের অষ্টাদশ সূত্রে লিখিত আছে "সংস্কার সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং" অর্থাৎ পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম জন্য সংস্কারের প্রতি চিত্ত সংযম করিতে পারিলে উদ্বোধক কারণ ব্যতীত ও পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্তের জ্ঞান হয়। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় এ প্রকার কথায় সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। যোগ শাস্ত্রোক্ত ঐ সাধনের কথা লেখা বা বলা যেমন সহজ তাহা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে যে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কিন্তু কর্ণেল অল্‌কটের ন্যায় সাহেবে ঐ প্রকার বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস খ্যাপন করায়, এতদ্দেশীয় অনেকে বিশ্বাস করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অল্‌কট সাহেব প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ করিতেছি এমন কেহ মনে করিবেন না। বাস্তবিক তাঁহাদিগের কথায় ও দৃষ্টান্তে অনেক সুশিক্ষিত, সুবুদ্ধি ও সাধুশীল হিন্দুসন্তানের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং অনেকে আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্য আচারে আস্থাবান হইয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত কর্ণেল ও তাঁহার দলভুক্ত সাহেবগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা আরও বলেন যে উদ্বোধক কারণ উপস্থিত থাকিলে, পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত ক্রিয়াবিশেষের স্মরণ হইতে পারে, যথা সদ্যজাত শিশুর স্তনপান প্রবৃত্তি। পূর্ব্ব জন্মের অভ্যস্ত ক্রিয়ার পুনঃ স্মরণ হইতে স্তন্যপানেচ্ছা হয়, ইহা স্বীকার করিলে, জীবের প্রথম জন্মে কি প্রকারে স্তন্যপান প্রবৃত্তি হইয়াছিল, একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে জন্মের আদি স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ জীব অনাদি ও সংসার অনাদি। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটী দৈহিক ব্যাপার অর্থাৎ পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট হইতে উত্তরাধিকার লব্ধ দেহ ধর্ম্ম বলিয়া নব্য বৈজ্ঞানিকেরা অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকগণ ইচ্ছাকে দেহধর্ম্ম বলেন না, উহা আত্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। সে যাহা হউক একমাত্র জন্মবাদী আর্য্যাতিরিক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত সমালোচনা উপলক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে

আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল মানিয়া জন্মান্তর অস্বীকার করিলে অনেক প্রকার অসঙ্গতিও অসামঞ্জস্য হয়।

এস্থলে জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে আর একটী মতের আভাস পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" পিতাই স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই শ্রুতিবাক্য এবং "জায়া যাস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ" পতিই পত্নীতে স্বয়ং জন্ম লাভ করেন, সেই জন্য পত্নীর নাম জায়া, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে বোধ হয় যেন, শাস্ত্রকারগণ দৈহিক এক প্রকার জন্মান্তর স্বীকার করিতেন। পিতা মাতা ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থা সচরাচর সন্তানেরা লাভ করিয়া থাকে। সন্তানগণ পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত ধন মানাদির ন্যায় তাঁহাদিগের অপকর্ম্মজনিত রোগাদি ভোগ করে। অতএব পিতামাতা প্রভৃতির ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগী সন্তানগণকে তাঁহাদিগের পর-জন্ম বলিলে অসঙ্গত হয় না। পরন্তু উক্ত দৈহিক জন্মান্তরের সহিত আধ্যাত্মিক জন্মান্তরের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন নহে। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, উভয়ের বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে। শ্রীভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে 'যোগসাধনে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ না করিয়াই যে উপরত হয়, সেই ব্যক্তি কি ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয়? অর্জ্জুনকৃত এই প্রশ্নে ভগবান বলিয়াছেন 'কোন কল্যাণকারী ব্যক্তি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। যোগভ্রষ্ট পুরুষ বহু বৎসর পুণ্যবান্‌দিগের লভ্য লোকে বাস করিয়া পবিত্র শ্রীমান্‌দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা জ্ঞানী যোগীদিগের গৃহে জন্মেন। তাদৃশ জন্মলাভ ইহলোকে দুর্ল্লভ। সেই জন্মে পূর্ব্বদেহের বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন'। অর্জ্জুন ও ভগবানের উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা উভয় ভাবের সামঞ্জস্য হইতেছে। যোগীর সন্তান যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় একথায় দেহধর্ম্মের প্রাধান্য ও কতকটা জড়বাদের অনুকূলতা প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আবার যোগাভ্যাস রত ব্যক্তি মরণানন্তর যোগীর গৃহে জন্মিয়া যোগসাধন দ্বারা সিদ্ধি লাভে যত্নবান্ হন, এ কথায় কর্ম্মানুসারে জন্মান্তর হয় এই মতই সমধিক সমর্থিত হইতেছে।

প্রবন্ধটী অধিক বিস্তৃত ও জটিল হইবে ভাবিয়া শাস্ত্রের বচন প্রমাণ সংগ্রহে বিশেষ চেষ্টা করি নাই, কেবল কতিপয় সরল যুক্তিমাত্র প্রদর্শিত

হইয়াছে। উপসংহারে শাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীভগবদ্গীতা হইতে এই প্রসঙ্গের কতক গুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥

দেহী যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহান্তর ও প্রাপ্ত হয়, ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহ প্রাপ্ত হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতিনরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনংছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽযমদাহ্যোঽযমক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽযমচিন্ত্যোঽযমবিকার্য্যোঽযমুচ্যতে॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, জল আর্দ্র করিতে পারে না ও বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম। আত্মা ছিন্ন, দগ্ধ, ক্লিন্ন, বা শুষ্ক হইবার বস্তু নহে। ইহা নিত্য সর্ব্বত্র ব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যাবন্দনা।

মানুষ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। সে একজন না একজনকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে চায়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু এবং এই সকলের অভাবে হয়, একটি বিড়ালছানা, নয় একটি হরিণ শিশু কিম্বা একটি তুলসীগাছকে ভালবাসিয়া মানুষ তাহার হৃদয়ের কি এক অভাব আছে তাহা পূরণ করিতে চায়। এই ভালবাসা লইয়াই সংসার, কিন্তু সংসারে যাহা দেখি তাহাতে বোধ হয়, ভালবাসাতে সুখ অপেক্ষা যন্ত্রণার ভাগটাই বেশী। আমি তোমাকে ভাল বাসিলাম তুমি ভালবাসিলে না, আমার হৃদয় পুড়িতে থাকিল; আমিও তোমায় ভালবাসি তুমিও আমায় ভালবাস কিন্তু তাহাতেও আমি সন্তুষ্ট নই আমি তোমাকে আমার করিতে চাই কিন্তু তুমি অপরের ধন, তোমাকে আমার করিতে পারিলাম না, দুই জনেই জ্বলিতে লাগিলাম। আমি তোমাকে আমার করিতে চাই যদি বা তুমি আমার হইলে তবুও ত আমার অভাব পূরে না। তোমাকে লইয়া সংসারে কত সুখ ভোগ করিব মনে মনে সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু সংসারক্ষেত্রে যখন তোমাকে পাইলাম তখন দেখিলাম যে আমার সেই আশা পূরণ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। আমি তবে কেন ভালবাসিতে চাই? এই সংসারে এই ভালবাসার খেলা কার খেলা? ইহার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছি। সম্মুখে একটি ফুলদানে একটি পদ্মফুল রহিয়াছে, উহার বৃন্তটি ফুল-দানের জলে ডুবান আছে, সেই জন্য পদ্মটি বেশ সজীব আছে। পদ্মের সৌন্দর্য্যে নয়ন আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টি কিছুকাল সেই দিকেই রহিল। তখন মনে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল যে এই পদ্মটির প্রাণ আছে কিন্তু ইহার মন আছে কি? ইহার ভিতর কি ভালবাসা আছে? পদ্ম কাহাকে ভালবাসে? পদ্মের ভালবাসার কি যন্ত্রণা আছে?

পদ্মটি বড় আনন্দময় দেখিলাম। পদ্মের এই আনন্দের ভোক্তা অবশ্য একজন আছে এই কথা মনে আসিল। তখন কে তিনি যিনি পদ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া পদ্মের সৌন্দর্য্য, পদ্মের আনন্দ ভোগ করিতেছেন তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এবং পদ্মের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া

থাকিতে থাকিতে আমি যেন অর্দ্ধস্বপ্নাবস্থায় পড়িলাম। তখন দেখিলাম পদ্মটি তাহার পাপড়িগুলি বিস্তার করিয়া সৌর-জ্যোতি আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতেছে। পদ্মের উপরি পতিত সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আমার মন আকাশস্থ সূর্য্যের কাছে চলিয়া গেল। তখন বোধ হইল যে সূর্য্যরশ্মিগুলি সূর্য্যের কর, সূর্য্য তাঁহার কর বিস্তার করিয়া পদ্মের পাপড়িগুলিকে ধরিয়া পদ্মের রূপ, রস, গন্ধ আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন এবং সেই রূপ রস গন্ধ সূর্য্য তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন এবং নিজের হৃদয় হইতে জ্যোতি পদ্মের কর্ণিকাতে ঢালিয়া দিতেছেন। আমার সামনে যে ছোট পদ্মটি দেখিতেছি এখন উহা আর বড় ছোট পদার্থ নহে। কোথায় কত লক্ষ যোজন দূরে আকাশে সূর্য্য রহিয়াছেন সেই সূর্য্যের সঙ্গে পদ্মের একটি তেজের আদান প্রদান হইতেছে, এই তেজের বিপুল যে চক্র ঘুরিতেছে সমস্তই এই পদ্মের শরীর বলিয়া বোধ হইল। সূর্য্য আকাশে থাকিয়া পদ্মের কর্ণিকার সামনে নিজের হৃদয় রাখিয়া কর বিস্তার করিয়া পদ্মকে ধরিয়া পদ্মের যা কিছু সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিতেছেন, ধারণ করিতেছেন এবং পদ্মের উপর তাঁহার হৃদয়ের তেজ ঢালিতেছেন। এই মহা মৈথুন ক্রিয়া ভাবিতে ভাবিতে সূর্য্যের আকর্ষণ ধারণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর প্রাণের পূরক কুম্ভক রেচক ক্রিয়া চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে পদ্মটির কর্ণিকার উপর সমস্ত কর্ণিকাটি ব্যাপিয়া একটি নীল দীপশিখা জ্বলিতেছে, পদ্মের বীজগুলির অগ্রভাগ যাহা কর্ণিকার উপরিভাগে দেখা যাইতেছিল সেইগুলি এখন সেই নীল জ্যোতিশিখার মধ্যে নীল আকাশের তারার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমার তখন মনে হইল পদ্মবীজে চেতনা প্রবেশ করিয়াছে। সূর্য্য মধ্যস্থ অগ্নিতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ঢালিয়া পদ্ম যে যজ্ঞ করিতেছিল বোধ হইল সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছে। পদ্মের কামনার সংবেগ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্মের সহিত সূর্য্যের এই পূরক কুম্ভক রেচক ক্রিয়া যতক্ষণ চলিতেছিল ততক্ষণ বোধ হইতেছিল যে পদ্ম আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছে। নির্ব্বাণ অবস্থায় সেই ধ্বনিটি যেন অনন্তে লয় পাইয়া গেল।

পদ্মের ঐ আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনিটি কি তোমরা হয়ত শুনিতে চাইবে কিন্তু উহা সকলকে আমি বলিতে পারি না। পদ্মের ন্যায় অনন্তের জ্যোতি পান

পিপাসা যদি কাহারও জন্মিয়া থাকে তিনি ভিন্ন ঐ ধ্বনির অর্থ কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ঐ ধ্বনি—জ্যোতি পানে মতোয়ারা হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছাস। ভালবাসার রহস্য জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম এখন বুঝিতেছি যে ঐ ধ্বনিই উহার রহস্য। যিনি প্রেমপিপাসু, যিনি প্রেমজিজ্ঞাসু, যিনি আর একজনের কাছে আপনাকে বলিদান দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সেই আর একজনকে খুঁজিতেছেন তিনিই কেবল এই ধ্বনিটি কি শুনিতে অধিকারী। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ঐরূপ অধিকারী থাকেন তবে কেবল তাঁহাকেই বলিতেছি যে ঐ ধ্বনিটি যোগীর সর্ব্বস্বধন, জীবের জীবন, অনন্ত রতন—প্রণব ধন।

সুনীল বর্ণের শান্ত জ্যোতি পদ্ম-হৃদয়ে দেখা দিবার পর একটি হিরণ্ময় জ্যোতিতে পদ্মটিকে ঘেরিয়া ফেলিল। পদ্মটি পূর্ব্বে যেন প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া স্বামী সঙ্গে রমণ করিতেছিল এখন যেন একটু বাহ্যজ্ঞান আসাতে লজ্জিতা হইয়া হিরণ্ময় জ্যোতির বসনে আপনাকে আচ্ছাদন করিল। ঐ জ্যোতি একটি ডিম্বের আকার ধারণ করিয়া পদ্মটিকে মধ্যে ধরিয়া রাখিল। ডিম্বটি ক্রমে ক্রমে একটি মনুষ্যাকার ধারণ করিল। তখন দেখিলাম একটি তেজঃপুঞ্জে ঘেরা একটি সুন্দরী বালিকা আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বালিকাকে দেখিয়া আমি স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলাম। আমার দুই হস্তের অঙ্গুলি দিয়া কাল কাল সব পদার্থ বাহির হইয়া বালিকা যে অগ্নিসম তেজে ঘেরা রহিয়াছেন সেই তেজে মিলিয়া জ্বলিয়া গেলেও তড়িৎসম একটি জ্যোতি বালিকার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আমার হৃদয়ে বালসূর্য্য প্রকাশিত হইলেন, আমি সূর্য্যোপস্থানের গান গাহিয়া উঠিলাম। এইবার আমার বাহ্যজ্ঞান আর নাই। আমি আনন্দে হৃদয়ে সূর্য্যকে ধরিয়া মনে মনে আনন্দে প্রণবধ্বনি করিতে লাগিলাম। তখন সেই সূর্য্যমধ্যে সেই বালিকাকে দেখিতে পাইলাম। বালিকা বলিলেন যে তুমি কাহাকে ভালবাস খুঁজিতেছ? তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি গায়ত্রী। আনন্দে বলিয়া উঠিলাম মা আনন্দময়ী মাতঃ ব্রহ্মযোনি তোমাকে নমস্কার। মা বলিলেন যে আমিই তোমার বুদ্ধির প্রবোধিকা-শক্তি, তোমার যে ভালবাসার প্রবৃত্তি উহা আমা হইতেই জন্মিয়াছে কিন্তু কাম তোমার বুদ্ধিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া

রাখিয়াছে বলিয়া তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই এবং প্রকৃত ভালবাসাও শিখ নাই। আজি আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় আমার তেজে তোমার শরীর নিঃসৃত কামসম্ভূত পাপরাশি জ্বলিয়া যাওয়ায় হৃদয়-মাঝে তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছ। আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিও ভালবাসার রহস্য বুঝিতে পারিবে এবং যাঁহার ভালবাসায় এই জগৎ চলিতেছে তাঁহাকে জানিতে পারিবে। এখন আর আমার আনন্দ ধরিতেছে না এই আনন্দ একা ভোগ করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না; এই জগতে যত জীব আছে সকলে এই আনন্দ ভোগ করুক এই ইচ্ছা হইল এবং এই ইচ্ছা বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলাম এস ভাই সকল জগজ্জননীর তেজ ধ্যান করি সেই তেজই আমাদের সকলের বুদ্ধির প্রবোধক। আমি তখন গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই জপ কিছুক্ষণ করার পর হৃদয় এত তেজে ভরিয়া গেল যে আমার এই দেহ যেন তত তেজ ধরিতে পারিতেছে না। আমার আলিঙ্গন তৃষ্ণা এইবারে শান্ত হইয়াছে। এই শান্ত অবস্থায় দেখি যে হৃদয় মধ্যে বালিকার যে রূপ দেখিতেছিলাম সে রূপ আর নাই কেবল তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে নীলবর্ণ দীপশিখাটি ছিল সেই দীপশিখাটি আমার হৃদয়-পদ্মে জ্বলিতেছে। আমার তখন জ্ঞান জন্মিয়াছে যে ঐ দীপ-শিখাটিই আমি। ঐ জ্যোতি-শিখা হইতে যে প্রণবধ্বনি হইতেছিল ঐ ধ্বনি তখন আমিই করিতেছি বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমার বোধ হইল যে সেই জন যিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ লোকান্ সমাহর্ত্তুং ইহ প্রবৃত্তঃ

তিনি আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমার আমিত্ব বুঝি এইবারে গেল এই রকম একটা ভাব ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয় উপস্থিত হইল। তখন ভগবানের উদ্দেশে ডাকিতে লাগিলাম গুরুদেব রক্ষা কর, গুরুদেব রক্ষা কর গুরুদেব রক্ষা কর। দয়াময় গুরু রূপে শান্ত মূর্ত্তিতে মস্তিষ্ক মধ্যে সহস্রদল কমলে দেখা দিলেন। আমি এক দুই তিন পাদ গমন করিয়া গুরুর কাছে বসিলাম। সেখানে দেখিলাম একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। গুরুদেব প্রণবধ্বনি করিলেন, তাঁহার ললাট নিঃসৃত জ্যোতি বাহির হইয়া শিখারূপী আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। আমি তখন একটি নূতন জ্যোতির্ম্ময় দেহ পাইলাম। তখন গুরুদেব একটি শঙ্খপূর্ণ সোমরস আমার হাতে দিলেন আমি

উহা অগ্নিতে আহুতি দিলাম। গুরুদেব বলিলেন আর ভয় নাই। এখন তুমি উপর দিকে চাহিতে পার। আমি নিমেষ মাত্র উপরি দিকে চাহিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইলাম এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলাম

ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।

এই নমস্কারের পর শান্তি উচ্চারণ করিলাম তাহার পর বাহ্জ্ঞান আসিল।

এস ভাই সকল হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়ে ধরিয়া প্রকৃত ভালবাসা কি শিখিতে চেষ্টা করি। হৃদয়ের ঐ ভালবাসা—আলিঙ্গনের ইচ্ছা, মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ বিশ্বরূপকে নমস্কার করিবার আবেগে পরিণত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(৯)

শ্রীভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন—

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৬অ, ২০

হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আসুরী (অধম) যোনিতে জন্মিয়া আমাকে না পাইয়া আরও অধম গতি লাভ করে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

সেই নরাধম নৃসংশ দ্বেষযুক্ত অশুভ জনগণকে ইহ সংসারে বার বার তির্য্যগ্ যোনিতেই নিক্ষেপ করি।

এখন গুণবিকারে যোনিভেদ নিশ্চয়। ভগবান কি বলেন ?

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুর্ণৈঃ॥ ১৮অ, ৪০

পৃথিবীতে, স্বর্গে বাঁ দেবতাগণের মধ্যেও এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত আছে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্বভূতকে ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ কর্ম্মে লিপ্ত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন।

অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ॥ মনু ১২অ, ১৫

এই পরমাত্মার দেহ হইতে উৎপন্ন লিঙ্গ শরীরাবচ্ছিন্ন জীব, (যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়) অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসংখ্যক নিঃসৃত হইয়া উত্তম অধম যোনিতে থাকিয়া নানা দেহকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রেরণ করে।

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥ ১৬

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের অংশে দুষ্কৃত কারীর পীড়ার অনুভবের কারণ জরায়ুজ আদি দেহ চতুষ্টয়ের অতিরিক্ত সুখ দুঃখ সহিষ্ণু পরলোকে একটি স্বতন্ত্র দেহ জন্মে, যাহাকে লিঙ্গ শরীর বলা যায়।

মনু তারপর বলিয়াছেন যে ঐ জীব ঐ শরীর দ্বারা যমযাতনা ভোগ করিয়া পাপ ফুরাইলে পুনরায় ভূতের অংশে লীন হইয়া অবস্থিতি করে। জীব পাপ ভোগের পর নিষ্পাপ হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল স্বরূপ জীব ইহলোকে ও পরলোকে সুখ দুঃখ অনুভব করে। জীব যদি মানবদেহ ধারণ করিয়া অধিক ধর্ম্ম করে অল্প পাপ করে তবে ভূত দ্বারা স্থূলশরীরী হইয়া পরলোকে অপবর্গ সুখ অনুভব করে। আর যদি অধর্ম্মের মাত্রা বেশী হয় তবে মৃত্যুর পর ঐ ভূত হইতে মরণান্তে দুঃখ সহিষ্ণু এক কঠিন দেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহের উপর যম-তাড়না ও যম-যাতনা হয়। ঐরূপ যাতনা ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া আবার নিজ কর্ম্মানুসারে মানব দেহাদি প্রাপ্ত হয়।

এতাদৃষ্ট্বাস্য জীবস্যগতীঃস্বেনৈব চেতসা,
ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ॥ ২৩

ধর্ম্ম জন্য ও অধর্ম্ম হেতুক স্বর্গ নরকাদির উপভোগের উপযুক্ত উত্তম অধম দেহ প্রাপ্তি হয়, ইহা অন্তঃকরণ দ্বারা বিবেচনা করিয়া মানবগণ ধর্ম্ম করিতে মনোনিবেশ করিবে।*

*উপেন্দ্রনাথ বসুর সংস্করণ। অনুমতি চাহিতেছি।

প্রবৃত্তং কর্ম্মসংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥ ৯০

প্রবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাসে দেবতাসমান গতি লাভ হয়, নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে শরীরারম্ভক পঞ্চভূতকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মোক্ষ হয়।*

এষ সর্ব্বানি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥ ১২৪

এই পরমাত্মা পৃথিব্যাদি পাঁচটি মূর্ত্তি দ্বারা সকল প্রাণী ব্যাপিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম জন্য জন্ম স্থিতি নাশ দ্বারা রথাদি চক্রের ন্যায় আবর্ত্তমান জীব সকলকে সংসারে প্রবৃত্ত করান, যে পর্য্যন্ত তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত না হয়, মোক্ষ পর্য্যন্ত সংসারী করান।*

এবং য সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদম্॥ ১২৫

এইরূপে যে ব্যক্তি সকল প্রাণীতে অবস্থিত পরমাত্মাকে আত্মা দ্বারা দর্শন করে সে সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষ সাক্ষাৎ করণান্তর শ্রেষ্ঠপদ যে ব্রহ্ম তাহা প্রাপ্ত হয়।*

এখন বিবেচনা করি, উপর্য্যুক্ত শ্লোকে স্বর্গ, ঈশ্বর বা ব্রহ্মের, ব্রহ্ম-শক্তির এবং মোক্ষের সুন্দর সূচনা হইয়াছে, আমার কার্য্য আপাতত সঙ্কলন হইলেও আয়াস-সাধ্য ও কষ্টানুশীলন। শক্তিতে কুলাইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হোক শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া যথাক্রমানুসারে স্বর্গ-সূচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১০)

যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বরাবর "মৃত্যুর পর" পাঠ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা জানেন স্বর্গ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। আর স্বর্গের সুখের কথা ছাড়িয়া দিয়া নরকযন্ত্রণার কথাই ভাল করিয়া বলিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি স্বর্গের কথা ছাড়া উচিৎ নহে। প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার ব্যত্যয় করিয়া লাভ কি? মোক্ষ বা বন্ধন-মুক্তি বুঝাইতে হইলে ত বন্ধন আগে বুঝাইতে হইবে? পাপ করিলে কর্ম্মফলে মানুষ লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় ও নরক ভোগ করে; সেইরূপ

*উপেন্দ্রনাথ বসুর সংস্করণ। অনুমতি চাহিতেছি।

ধর্ম্ম করিলে মানুষ সুবর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া যে স্বর্গ ভোগ করে তাহাত বুঝান উচিৎ। মাতঙ্গকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা চলে, আবার তেমন সখের-প্রাণ রাজা থাকিলে মাতঙ্গকে সুবর্ণশৃঙ্খলেও ত আবদ্ধ করিতে পারেন? লীলাময় হরি যে মানবের মনমাতঙ্গকে সেইরূপ নরকভোগ রূপ লৌহশৃঙ্খলে ও স্বর্গ-ভোগ রূপ সুবর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলে তবে ত মন মাতঙ্গ, বন্ধন-মুক্তির আশায়ে ছট্‌ফট্ করিবে। তবে ত গুরু মিলিবে? তবে ত আরব্য উপন্যাসের Open Sesame গুরুদত্ত মন্ত্রে শৃঙ্খল খুলিয়া পড়িবে? এই যে—মধুসূদনের—

কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি
দেবকুল অনুকুল তার প্রতি সদা,—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে?—

ব্যাপারটা কি দেখিবেন না?—বিশেষ যখন য়ুরোপ, আমেরিকায় পর্য্যন্ত ইহার বহুল চর্চ্চা হইতেছে।—

"মুনির বচনে যায় যমের ভবনে।
যমের সে পূর্ব্বদ্বার দেখে দশাননে॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যা দান।
সবা হইতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান॥
যে বিষ্ণু-কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাহার সম্পদ দেখি তুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দেন বসিতে আসন॥
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্গবাসে।
দিব্য দেহ ধরি তারে বসান সকাশে॥
যে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে॥
দেখিয়া লোকের সুখ হৃষ্ট লঙ্কেশ্বরে।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিমের দ্বারে॥

বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখে হরিষ রাবণ॥
রাবণ উত্তর দ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান লোক দেখে দশানন॥
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেবা রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যে বা নিজ প্রজা॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
মহৈশ্বর্য্য ভোগ তার দেখিল রাবণ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুয়ার সে উত্তর।
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখিল বিস্তর॥"

(কৃত্তিবাস রামায়ণ, পঞ্চানন ঘোষের সংস্করণ।)

এক্ষণে পাঠক মহাশয়কে শিবশর্ম্মার অপূর্ব্ব বিবরণ উপহার দিব। ইহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড হইতে সংগৃহীত। সপ্তপুরী তীর্থ দর্শন করিয়া শিবশর্ম্মা দেহ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুদূত সহ বৈকুণ্ঠ যাইতেছেন। সপ্ত পুরী কি কি?—অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, অবন্তী, কাঞ্চীপুর, দ্বারাবতী, হরিদ্বার।

রথধ্বজপরেতে গরুড় আরোহণ।
দেবকন্যা করে রথে চামর ব্যজন॥
পুণ্যশীল সুশীল যে চতুর্ভুজধারী।
শিবশর্ম্মা লৈয়া চলে বৈকুণ্ঠনগরী॥

রাক্ষস বা পিশাচ লোক।—যাইতে যাইতে প্রথমেই শিবশর্ম্মা রাক্ষস বা পিশাচ দর্শন করিলেন। ইহারা সংসারে কেবল নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়াছিল, অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নাই। দান করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল।

গুহ্যকলোক।—তাহারা মাটীতে ধন পুঁতিয়া রাখিত।

গন্ধর্ব্বলোক।—ইহারা সংসারে ধনের সদ্ব্যয় করিয়াছে, দান করিয়াছে। শ্রুতিপাঠ মঙ্গলাদি আচরণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। সর্ব্বদা গান করিত।

বিদ্যাধর পুরী।—যাহারা বিদ্যার্থীকে অন্নদান করে, পীড়িতকে ঔষধ দেয়, বিদ্যাগর্ব্ব ছাড়িয়া লোককে নানা শিক্ষা দেয়, সালঙ্কারে সৎপাত্রে কন্যা দেয়, ইষ্টদেবের পূজা করে, মৃত্যুর পর তাহাদের বাস বিদ্যাধর পুরে।

যমপুরী।—শিবশর্ম্মাকে যম সৌম্য-মূর্ত্তিতে সম্ভাষণ করিলেন। শিবশর্ম্মার প্রশ্ন শুনিয়া বিষ্ণুদূত বলিতেছেন—

গণে বলে শুন শিবশর্ম্মা মহামতি
স্বভাবত ধর্ম্মমূর্ত্তি হয় সৌম্যাকৃতি
পুণ্যরাশি তোমাদের হয় দরশন
ভয়ঙ্কর অন্যরূপ দেখে পাপীজন
ক্রোধে রক্ত নবে যেন পিঙ্গল লোচন
বিকট দশন সেই করাল বদন
ললিত বিদ্যুৎ যেন দেখে লাগে ভয়
ঊর্দ্ধ কেশ কৃষ্ণবর্ণ মহা ঘোর ময়
প্রলয় মেঘেতে যত করয়ে নিনাদ
কালদণ্ড হাতে উদ্ধ আছয়ে বিষাদ
ভ্রুকুটী করাল মুখে করয়ে শাসন
আনহ উহাকে ধরি করহ বন্ধন
প্রহার করহ মাথে লোহের মুদ্গর
পায়ে ধরি পাথরে আছাড় এই নর ॥*

শিবশর্ম্মা এইরূপে যমপুরে পাপীদের অশেষ তাড়না দেখিলেন। পূর্ব্বে যে নরকের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ইহাও তাই। বিশেষ বিবরণ সুতরাং আর দিবার আবশ্যকতা নাই। তৎপরে শিবশর্ম্মা যমপুরে ধার্ম্মিকও দেখিলেন ;—

ঔরস তনয় যেন প্রজাকে পালয়।
ধর্ম্মত বিচার করি প্রজাকে দণ্ডয় ॥
হেন সব রাজা ধর্ম্মরাজ সভাসদ।
যমপুরে নিরাপদে ভুঞ্জয়ে সম্পদ ॥
যে রাজার রাজ্যেতে যে বর্ণের আশ্রম।
আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম করে উপক্রম ॥
কালক্রমে মৃত হইয়া যায় যমপুরে।
শোক নাহি পায় সভাসদ সহ পরে ॥
যে রাজার রাজ্যে প্রজা দরিদ্র না হয়।
দুর্বৃত্তি আপদ শোক দুঃখ নাহি পায় ॥

*সীতানাথ বসু মল্লিক (দে এণ্ড ব্রাদার্স) অনুমতি চাহিতেছি।

সেই সব নরপতি ধর্ম্মের সভায়।
সভাসদ হইয়া পরম সুখ পায়॥

*　　　*　　　*

শিবশর্ম্মা হেন কথা করিয়া শ্রবণ।
অপ্সরা নগর তটে হৈল দরশন॥

অপ্সরাপুরী।—ইহারা দেব বেশ্যা। ক্ষীরোদ মন্থনে ৬০ হাজার বেশ্যার উৎপত্তি হয়। প্রধানা হইতেছেন—রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, লীলাবতী, কান্তিমতী, উর্ব্বশী, চিত্ররেখা, মনোরমা। এখানে মর্ত্তলোকে হইতে যাহারা আসে তাহাদের লক্ষণ—

মাস উপবাস ব্রহ্মচর্য্যায় ব্রাহ্মণী।
শ্রীবিষ্ণু ভক্তিতে রত কামব্রত গণি॥
যে সকল ব্রত নারী আরম্ভ করয়।
দৈবাধীন ব্রতভঙ্গ নিয়ম না রয়॥

ভুমণ্ডলের যত মুসলমান কোরাণ মানেন। তথা "হুরী" আছে।

সূর্য্যলোক।—তারপর সূর্য্যলোক দর্শন। সূর্য্যের রথচক্রের পরিধি নয় হাজার ক্রোশ। অরুণ সারথি। রথের গতি অর্দ্ধ নিমিষে দুই হাজার শত ক্রোশ। যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা অবশ্য এ গতিতে আশ্চর্য্য হইবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা করেন ও গায়ত্রী পাঠ করেন ও বিধি পূর্ব্বক নিত্য ক্রিয়া করেন ও ব্রহ্ম অনুষ্ঠান করেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের সূর্য্যলোকে গতি। যাহাদের বেদে অধিকার তাহারা উদয়াস্ত অর্ঘ্য দিলে প্রতি সংক্রান্তিতে সূর্য্য-পূজা করিলে, পৌষ মাসের ষষ্ঠী সপ্তমী ও মঙ্গলবারে নিয়ম করিয়া চান্দ্রায়ণ করিলে, এই সূর্য্যলোকে গতি হয়। অর্ঘ্যের বিশেষ মন্ত্র আছে আর তাহা ছাড়া জবা, দূর্ব্বা, রক্তচন্দন, করবী চাই। রবি সংক্রমণে সূর্য্যগ্রহণকালীন দানে ও—অন্ন, বস্ত্র, গো, স্বর্ণ দানে—এই স্থান লাভ হয়। শিবশর্ম্মা এখন একটু বিশ্রাম করুন।

ইন্দ্রপুরী বা অমরাবতী বা স্বর্গস্থান।—

ত্রিভুবন জিনি স্থান অমর নগরী
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি
সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন

শত যোজন স্বর্গপুরী আড়ে পরিসর
দীর্ঘে ওর নাহি তার বায়ু অগোচর
একেক যোজন এক দুয়ার গঠন
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ
সোণার কবাট খিল পর্ব্বতের চূড়া
সোণার হুড়কা তাহে নবরত্নে বেড়া
শত বৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী
শচী দেবকন্যা তথা পরম সুন্দরী
পদ্ম কোটী ঘর আছে পুরীর ভিতর
নানা রত্নে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা
দেবকন্যাগণ তাতে রূপে মনোহরা
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র তাহে করে খেলা
নাহি শোক নাহি দুঃখ অকাল মরণ
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবন মোহন
সদানন্দময় যে অমরাবতী নাম
যত দেব আসি তথা করেন বিশ্রাম। (রামায়ণ)

চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত মণি
পারিজাত পুষ্প আর শচী যার রাণী
সদা কাল আছে কামধেনু কল্পবৃক্ষ
ত্রয়স্ত্রিংশ কোটী দেবে শোভে সহস্রাক্ষ
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা বিদ্যাধরী যে অনেক
নৃত্যগীত নানা বাদ্য বর্ণিব কতেক
অমাকলা দিনে চন্দ্র প্রকাশ ইন্দ্রালয়
চন্দ্রের কিরণ অবশেষ নাহি হয়
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত বিরাজিত
নারদ প্রভৃতি সব মুনিতে বেষ্টিত
এই ইন্দ্ররাজপুরী স্বর্গস্থান নাম
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন অনুপাম

অশ্বমেধ অগ্নিহোত্র অগ্নিব্রত সার
তুলা পুরুষ দান করে অনশন আর
আর আর নিয়ম আছয়ে বহুমত
ব্রাহ্মণেরে ভক্তিভাবে পূজে অবিরত
এই পুরী বাস করে শচীর সহিত
ইহা সম ত্রিভুবনে আছে কি কিঞ্চিৎ। (কাশীখণ্ড)

ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর আলয়
নন্দনকাননে যান বীর ধনঞ্জয়
অতি সে সুন্দর বন মুনি মনোলোভা
প্রফুল্লিত কুসুম কানন অতি শোভা
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু
মত্ত হয়ে বিহার করয়ে মৎস কেতু
মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর ঝঙ্কার
কোকিলের রব বিনা শুনি নাহি আর
প্রতি ডালে কলরব করে নানা পক্ষ
মৃগ মৃগী মৃগেন্দ্র বিহরে লক্ষ লক্ষ
নানাপক্ষী শোভিত সুন্দর ফুলফল
মন্দ মন্দ সদাগতি বহে সুশীতল
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল
আনন্দে বিহ্বলচিত্ত পার্থ মহাবল।

গীতাতেও ঐ কথা আছেঃ—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা—
জজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগ্যান্॥

ত্রিবেদ বিহিত কর্ম্মকারী যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া সোমরস পান পুরঃসর নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে; তাহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্য দেব ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকম্প।

[দ্রষ্টব্য ১। নবজীবনের ১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসুর লিখিত "সঙ্কর্ষণাগ্নি-অনন্ত-বলরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ। ২। ৩১৮শ আষাঢ়ের দৈনিকে উদ্ধৃত ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশিত 'ভূমিকম্পের কারণ' শীর্ষক প্রবন্ধ। ৩। আষাঢ়ের জন্মভূমিতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালীর লিখিত ভূমিকম্প শীর্ষক প্রবন্ধ। আমার প্রবন্ধ, শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের পূর্ব্বে লেখা, সকল প্রবন্ধেরই সামঞ্জস্য হয়।]

উত্তানপাদের ঔরসে, সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম। ধ্রুব ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন পাইয়াছিলেন, ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ—ইঁহারা ধ্রুবকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করেন।

ইত্যাদি কথার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়।

১। পৌরাণিক বা আধিদৈবিক। এই ব্যাখ্যায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বুঝেন, যে পুরাকালে বাস্তবিকই ধ্রুব নামে এক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সত্যসত্যই ভক্তি বলে দেবতার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করেন; এবং এখনও ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। ঋষিরা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতার্থ হন।

২। দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক। উত্তানপাদ—কিনা কঠোর তপশ্চর্য্যা। সুনীতি—কিনা উত্তম-নীতি অর্থাৎ তপস্যা ও নীতি হইতে—কিনা যম; নিয়ম ইত্যাদি হইতে—ধ্রুব কিনা, নিষ্ঠা যোগের উৎপত্তি হয়। সেই যোগে সমাধি লাভ করা যায়।

৩। আধিভৌতিক বা জড় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষ বিশেষত আর্য্যাবর্ত্ত বিষুবরেখার অনেক উত্তরে, সেই জন্য মেরুরেখা বা পৃথিবীর অক্ষ-রেখা (Axis of the Earth) উত্তানপাদ বলিয়া মনে হয়; এই উত্তান পাদ অক্ষরেখা যেখানে খগোল স্পর্শ করে, সেই থানকার নক্ষত্রটি স্থির বা ধ্রুব বলিয়াই বোধ হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল এই উত্তর মেরুগত ধ্রুবকে কাযেই প্রত্যহ পরিবেষ্টন করে।

যিনি ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়া, ঐ তিন প্রকার ব্যাখ্যাই সমান ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যিনি না পারেন, তিনি প্রকৃত

হিন্দু নহেন। যিনি কোন একটিতে বা দুইটিতে বিশ্বাস করিয়া অপর ব্যাখ্যায় বা অন্য দুটি ব্যাখ্যায় উপহাস করেন, তিনি পাষণ্ড।

যিনি একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য শক্তি বা সত্তা স্বীকার করেন না, বা বুঝেন না, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলিতেছি, প্রকৃত হিন্দু আধি-দৈবিক, আধ্যাত্মিক, ও আধিভৌতিক—এই ত্রিধাশক্তিতে বা সত্তাতে বিশ্বাসবান্। হিন্দু কেবল জড়বাদী (বা Materialist) নহেন। কেবল অধ্যাত্মবাদী (বা Idealist) নহেন। এবং কেবল দৈব-বাদী (বা Pantheist) নহেন। হিন্দু মিশ্রবাদী—ত্রিধা সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্। এখনকার দিনে শিক্ষার দোষে এই বিশ্বাসে ব্যাঘাত লাগিলেও হিন্দু এখনও মোটামুটি তিনটি সত্তাই বিশ্বাস করে।

সূর্য্যের পুত্র যম; সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্য্যের পুত্র—কর্ণ। সূর্য্য দেবতা না বুঝিলে, এ সকল কথা বুঝা যায় না। সূর্য্য—দেবতা। আবার যদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিত বা পরিচালিত হয়, তিনও সূর্য্য বা সবিতা। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের কর্ত্তা। আবার ঐ যে অনন্ত জড়পিণ্ড হীরার থালার মত ধ্বক ধ্বক ঝকমক্ করিতেছে, উনিও ত সূর্য্য—এই জড় জগতের তাপ তেজঃ দাতা, গতি-শক্তি বিধাতা। জড় সূর্য্য, আধ্যাত্মিক সূর্য্য, দেবতা সূর্য্য—এক সূর্য্যে আমরা তিন সূর্য্যই বিশ্বাস করি। ইহারই নাম হিন্দুর প্রকৃত বিশ্বাস।

আজি একমাস হইল, এই বঙ্গদেশে বিশেষত উত্তরবঙ্গে এবং আসাম প্রদেশে মহা ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে। কত গ্রাম নগর উৎসন্ন গিয়াছে, কত সৌধ প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়াছে, নদী চর হইয়াছে, চরে প্রবাহ ছুটিতেছে, রাজা মহারাজা হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত—কতলোক লীলা সম্বরণ করিয়াছে, ধরিত্রী শত সহস্র ক্ষত মুখে রসধূম উদ্গীরণ করিয়াছেন—এ সকল কথা জানিতে কাহারও আর বাকি নাই। আজি কালি সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, ভূমিকম্পের কারণ কি ?

হিন্দুর মতে সকল বিষয়েরই কারণ ত্রিবিধ। আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক। ভূমিকম্পেরও অবশ্য ঐ ত্রিবিধ কারণ হইবে। কারণ অবশ্য একটাই হয়, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা সেই একটা কারণকেই তিন রকমে বুঝিয়া থাকি। তিন প্রকার কারণেই বিশ্বাস করিয়া থাকি।

ভূমিকম্পের কারণঃ—(১) আধিদৈবিক, বাসুকি দেবতা। বাসুকির জৃম্ভনে বা মস্তকের কম্পনে বাসুকি ধৃতা ধরণীর কম্পন হয়। (২) আধ্যাত্মিক, পাপের ভার—এমনই গুরুতর যে এমন, যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী সকলই সহ্য করেন, তিনিও বিষম পাপের ভার সহিতে না পারিয়া কাঁপিতে থাকেন, বিচলিত হন, তরঙ্গায়িত হন। (৩) আধিভৌতিক, ভূগর্ভস্থ অতীব উষ্ণ তরল পদার্থ রাশি উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই উৎক্ষেপের আবেগে ভূকম্প হইতে থাকে।

আমরা বলিতেছি—ঐ রূপ ত্রিবিধ কারণে বা একই কারণের ঐ রূপ ত্রিবিধ ব্যাখ্যায়-যিনি সমানে বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু।

এই কথাটা এখনকার দিনের ইংরাজি ওয়ালাকে বড় বিষম লাগিবে। তিনি জানেন, বাসুকির কথা মূর্খের কুসংস্কার। কাজেই মূর্খেই বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়, পাপের ভারের কথা, ও একটা কথার কথা মাত্র, লোকে মুখে দশবার বলে বটে, মনের মধ্যে কখন বিশ্বাস করে না। তৃতীয়, কথাই কথা। পৃথিবী জড় পদার্থ, জড় পদার্থের কোনরূপ বিপর্য্যয়েই পৃথিবী বিচলিত হয়।

বাস্তবিক বাসুকি দেবতায় বিশ্বাস করা মূর্খতা বা কুসংস্কারের পরিচায়ক নহে। যদি আগুণ ছাড়া অগ্নি-দেবতা, জল ছাড়া বরুণ-দেবতা, জড়পিণ্ড সূর্য্যের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এ সকলের কোন কিছু বুঝিতে পার, তাহা হইলে বাসুকি দেবতাও বুঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। আর যদি কোন দেবতাই না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বাসুকি বুঝিতে ত অবশ্য পারিবে না, তবে মনে মনে এইটি বুঝিবার চেষ্টা করিও, যে তুমি হিন্দু-সন্তান হইলেও হিন্দু নহ।

হিন্দু জড়শক্তি এবং আত্মশক্তি ভিন্ন, আর একটি তৃতীয় শক্তি, জানেন, বুঝেন ও মানেন। তাহার নাম দৈবশক্তি। এই দৈবশক্তি না বুঝিলে, জড়ে ও আত্মায় যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। আত্মশক্তি ও জড়শক্তির মাঝে দৈবশক্তি। আবার দৈব-শক্তি ও জড়শক্তির মাঝে আত্মশক্তি। মানব এই ত্রিশক্তি কর্ত্তৃক সমান চালিত।

প্রত্যেক ঘটনাতেই ত্রিবিধ শক্তির লীলাখেলা আছে, এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে, ঘটনা পরম্পরার কার্য্যকারণ ভাব বুঝা যেন একটু সহজ হইয়া পড়ে। এই ভূমিকম্পের কথাটাই ভাবুন। ভূগর্ভস্থ উষ্ণতরল পদার্থের অবস্থা বিপর্য্যয়ে ভূকম্পন হয়; বেশ কথা; সেই অবস্থা বিপর্য্যয় কখন কখন হয়? যখন পাপের ভার বেশী হয়, তখনই হয়। আচ্ছা তাই যদি হয়,—তা কখন পাপেরভার বেশী হইল, তা ভূগর্ভস্থ তরলপদার্থ রাশি জানিতে পারে—কি প্রকারে? দেবতায় অবশ্য জানিতে পারেন; তিনি নারায়ণ—তিনি অনন্ত—তিনি বাসুকি। সকল বিষয়েই হিন্দু এইরূপে চিন্তা করে,—এইরূপে মীমাংসা করে। আবার বলি ইহাই হিন্দুর হিন্দুত্ব।

পাপভরে ভূকম্প হয়। এই কথায় বিশ্বাস করা বড় কঠিন। কিন্তু এবারকার দুর্বৎসরের আর পাঁচটা ঘটনার সহিত ভাবিলে, তত কঠিন বোধ হইবে না। এ বৎসর অতি দুর্বৎসর। আমাদের দেশের কথাই অবশ্য বলিতেছি, কেন না অন্য দেশের কথা ভাল জানি না, ভাল বুঝি না। দেশে অন্নকষ্ট, জলকষ্টের সীমা নাই। নানা রোগের ও মারীভয়ের জ্বালায়-জ্বলাতন করিয়া রাখিয়াছে। এই জলকষ্ট, অথচ বর্ষারম্ভেই স্থানে স্থানে মহা জলপ্লাবন হইতেছে; শস্য দেখা দিতে না দিতে, পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে; স্থানে স্থানে কর্দ্দমবৃষ্টি হইয়াছে; কাবুলে, কলিকাতায়, পুনায়, পেশয়ারে অকারণ শত শত নরহত্যা—গুপ্তঘাতে রাজপুরুষ হত্যা হইতেছে। দুর্বৎসরের দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি এই সকল দুর্ঘটনাস্রোতের মধ্যে অকস্মাৎ ভীষণ ভূকম্পনে কত নরনারীর অকালে অপমৃত্যু, কত গৃহস্থলোকের গৃহনাশে তরুতল একমাত্র আশ্রয় হইয়াছে। এই অসংখ্য দুর্ঘটনার মধ্যে বোধ হয়, যেন এক খানা সুর বাঁধা রহিয়াছে। তীব্র সুর হইলেও বাঁধাসুর বটে। যে সুরের খরজ, সেই সুরেরই পঞ্চম বটে। অন্য জাতির এইরূপ মনে হয় কি না জানি না, হিন্দুর এইরূপই মনে হইয়া থাকে। যে সুরে এই সকল দুর্ঘটনা বাঁধা—হিন্দু সেই সুরকে, উপর সপ্তক ভাবিয়া বলে, দেবতার কোপ। নিম্ন সপ্তক ভাবিয়া বলে, মানবের পাপ। আমাদের যতকিছু কষ্ট দেখিতেছ—সমস্তই দেবতার কোপে, অথবা আমাদের পাপে। আমাদের পাপেই দেব-

তার কোপ হয়। আমাদের পাপে সুতরাং দেবতার কোপে, এই ভূকম্পন হইয়াছে। মধুসূদনকে স্মরণ কর।

যদি দেবতায় না নাচায়—দেবতায় না চালায়, তাহা হইলে, জড়ের কি সাধ্য যে জীবকে জ্বলাতন করে। জড় সমবায় বটে, দেবতা নিমিত্ত কারণ। আমরা হিন্দু, আমরা বিশ্বাস করি—নিয়মের রাজ্যে, শৃঙ্খলার রাজ্যে, ভগবানের রাজ্যে, আমরা বাস করি। এ বিশ্বরাজ্য সয়তানের রাজ্য নহে। ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থ বা অন্য কোন জড়পদার্থ আমাদের উপর অকারণ আধিপত্য করিতে পারে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই। আমরা পাপ করিলে, দেবতার কোপ হয়, তাহাতেই জড়ের বিপর্য্যয় ঘটে, আমাদের শাস্তির জন্য, আমাদের উপর উৎপাত—উপদ্রব হয়। চিরদিনই এইরূপ হইতেছে, এবার আমাদের পাপের ভার বড় বাড়িয়াছে, দেবতার কোপ সেই পরিমাণে অত্যধিক হইয়াছে। অতএব ভাই! পাপের পন্থা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা কর, মধুসূদনকে সর্ব্বদা স্মরণ কর তিনিই আমাদিগকে সহিষ্ণুতা ও শক্তি প্রদান করিবেন।

দেবতার—নিত্য সত্য চিন্ময় বিগ্রহ। সেই বিগ্রহের আমাদের চিদাকাশে ধারণা করিতে হয়। দেবতার অন্য নানারূপ বিগ্রহ আছে। ধাতুময়, শিলাময়, দারুময়, মৃণ্ময় বিগ্রহের বঙ্গবাসীকে পরিচয় দিতে হইবে না। ইতিহাস পুরাণে বিশ্বাস থাকিলে, দাশরথী, বাসুদেব প্রভৃতি অবতার বা নরবিগ্রহ বটেন। ঐ জ্বলন্ত জড়পিণ্ড সূর্য্যমণ্ডল সবিতাদেবতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ। ঐ ক্ষণে বারি-বর্ষণকারী, বজ্রধারী, ক্ষণে উজ্জ্বলসহস্রলোচনবিথারী নভোমণ্ডলও সেইরূপ পুরন্দরের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। ভূমিকম্পের নিয়ন্তা বাসুকিরও সেইরূপ জড়বিগ্রহ, আমরা দেখিতে না পাই, বুঝিতে পারি। সেই বিগ্রহ আধুনিক জড়বিজ্ঞান-সম্মত।

সেই বিজ্ঞানে বলে, পুরাকালে পৃথিবী তপ্ত তরল পিণ্ড ছিল। কালে তাপ বিকীরণ করিয়া উপরে কঠিন স্তর পড়িয়াছে। দুধের কড়ায় যেমন উপরে সর পড়ে, তেমনি উপরটা কঠিন হইয়াছে। ভিতরে তেমনই তরল পদার্থই আছে। নারীকেলের যেমন উপরে ছোবড়া, তাহার নিম্নে শক্ত নারিকেলের মালা, তাহার ভিতর জল, পৃথিবীও এখন কতকটা সেইরূপ। উপরে জল মাটী ছোবড়ার মত আছে; তাহার নিম্নে কঠিন প্রস্তর স্তর নারিকেলের

মালার মত। অভ্যন্তরে অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ, নারিকেলের জলের মত। এই তরল পদার্থ সর্ব্বদাই আলোড়িত, সর্ব্বদাই ঘূর্ণায়মান। মহাবেগে সেই তরল পদার্থ, নানা পথে সেই কঠিন প্রস্তর স্তর ভেদ করিয়া, ভূগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই বেগ কিছু অতিরিক্ত হইলেই ভূকম্পন।

সম্মুখস্থ ঐ চিত্র হইতে ভূগর্ভস্থ ঐ তরল পদার্থের প্রতিকৃতি ও গতি একরূপ মোটামুটি বুঝা যায়। পৃথিবীর হাজার হাজার ফাটাল দিয়া সেই তরল পদার্থ উপরে উঠিতেছে, কোথাও আগ্নেয় গিরির মুখ দিয়া বা ভূপৃষ্ঠ দিয়া, ধূমোদ্গীরণ করিতেছে। উহাই বাসুকির জড়বিগ্রহ। ঐ দেখ মহা-সর্পের ন্যায় মধ্যস্থলে মহাকুণ্ডলী। সেই কুণ্ডলী হইতে অনন্ত মস্তক অনন্ত দিকে উঠিয়াছে। এই সাগরাম্বর ভূধরভূষণা ধরিত্রীকে অনন্ত মস্তকে ধারণ করিয়া আছে। সমগ্র দেহ ঈষৎ নীলাভ শ্বেতবর্ণের। জৃম্ভনে ধূমোদ্গীরণ হইতেছে। মস্তকের ঈষৎ আলোড়নে পৃথিবী টলমল; উত্তরবঙ্গ—আসাম বিধ্বস্ত।

ইনিই বিষ্ণুর অনন্ত ফণধারী, অনন্ত মূর্ত্তি, বাসুকি বিগ্রহ। এই অভ্যন্ত-রস্থ উত্তাপের ফলেই উর্ব্বীর উর্ব্বরা শক্তি, কৃষকের কর্ষণ কৃতি। সুতরাং ইনিই হলধর বলদেব সংকর্ষণদেব। আইস ভাই ভীষণ ভূমীকম্পের ভয় ভাঙ্গিবার জন্য এই অনন্তের অর্চ্চনা করি। হে অনন্ত! বুঝিতে পারিলে, কে না তোমায় নমস্কার করিবে?

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্ব মনন্ত রূপ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মাসিক সাহিত্য।

(সমালোচনা।)

সাবিত্রী। (স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা) বিগত মাঘ হইতে প্রকাশিত হইতেছে, এই আষাঢ় পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক রামযাদব বাগ্‌চি এম্ ডি। সাবিত্রী বাঙ্গালিগৃহস্থের গৃহের সম্পূর্ণ উপযোগিনী। কি কুমারী, কি নব বধূ, আর কি প্রৌঢ়-গৃহিণী—সাবিত্রী, সকলকেই কিছু না কিছু শিখাইতে পারে। লেখা অতি পরিষ্কার। গদ্য অপেক্ষা পদ্যগুলির আরও প্রশংসা করিতে হয়। অতি সরল, প্রাঞ্জল—সে কালের মত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। সাবিত্রীতে নিয়মিত স্ত্রীলোকের নিত্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় কথা থাকে; পৌরাণিক-উপাখ্যান থাকে, গৃহিণীপণার উপদেশ থাকে, আর একটু একটু সংবাদ থাকে। প্রবন্ধের এইরূপ শৃঙ্খলাও সুন্দর। এখন সাবিত্রীর বহুল প্রচারের বন্দোবস্ত হইলে সাবিত্রী সার্থক হইবে। প্রত্যেক হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ কাপি করিয়া অনায়াসে লওয়া চলে। তাও কি হইবে না?

সমাজ ও সাহিত্য। ১৩০৩ ফাল্গুন ও চৈত্র। এই সংখ্যায় প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইল। এই বৎসর ১৩০৪ সালে, সমাজ ও সাহিত্যকে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে দেখিলে, আমরা বড়ই আহ্লাদিত থাকিব।

ভারতী। বৈশাখ, এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত মীর-কাসিম প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুকে তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক অনেকেরই গুরু-স্থানীয় হইলেও, তিনি যে কাহারও সমা-

লোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারেন না, একথা কেহই বলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বা রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র, ইহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা হইলে, সাহিত্যের সৌভাগ্যেরই কথা। কিন্তু সেই সমালোচনাতে ঝাল যেন না থাকে, বিষ যেন না থাকে। এইত, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নাম দিয়া আড়াইশত পৃষ্ঠা পরিমাণ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" নামক তিনখানি কাব্যের সুদীর্ঘ প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন; যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার অনেক গুলির যে সদুত্তর হইবে, এমন মনেই হয় না। কিন্তু কৈ ঝাল ত বড় দেখিলাম না। বিষ ত একেবারেই নাই। এমনইত হওয়া চাই। বিশেষ বঙ্কিম বাবু ইহলোকে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয়ের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

মৈত্রেয় মহাশয়ের একটি ভ্রম শিক্ষা হইয়াছে। তিনি বলেন, "ইতিহাস লইয়া কাব্য, উপন্যাস যাহা ইচ্ছা রচনা করিতে পারি, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতে আমরা চিরদিন বাধ্য।" আমরা বলি, তা নয়। ইতিহাস Traditional প্রাকৃত, কাব্য ideal অতি প্রাকৃত বা পরাকৃত। কাব্য কেবল মাত্র traditional প্রাকৃত হইলে, তাহাতে ideal অতি প্রাকৃত না থাকিলে, সে কাব্য অতি নিকৃষ্ট কাব্য হয়। বঙ্কিম বাবু সেরূপ কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান নাই, তিনি Romance লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, Novel লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং তিনি "ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য" ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থগুলি Historical Romance, Historical Novel নহে।

মৈত্রেয় মহাশয়ের কাব্য এবং ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রমশিক্ষা থাকায় চন্দ্রশেখরের *বিজ্ঞাপনের কদর্থ করিয়াছেন।* বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম বাবু যেন বলিয়াছেন, "এই গ্রন্থে যদি সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসের বিপরীত কিছু দেখিতে পাও ত মনে কিছু করিওনা, তাহাও ইতিহাস, তবে তোমার দুর্ভাগ্য বলিয়া দুর্লভ ইতিহাস পড় নাই।" ইহা বিজ্ঞাপনের কদর্থ। এইরূপ হইলে সদর্থ হইবে। "—মনে কিছু করিওনা, তাহার কতক দুর্লভ ইতিহাস মুতক্ষরীণে পাইবে—আর কতক অবশ্যই আমার কল্পনাপ্রসূত, কেন না

আমি কাব্য লিখিতেছি।” এইরূপ ভাবে বিজ্ঞাপনটি বুঝিলে, বঙ্কিম বাবু প্রধান চার্য্যে নিশ্চয়ই নিরপরাধ সাব্যস্ত হইবেন।

দ্বিতীয় চার্য্যে “বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন।” আমি ভরসা করি, জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার বহুতর মুসলমান ‘বন্ধু’র প্রত্যেকেই এই কথার প্রতিবাদ করিবেন। তিনি বিচারকার্য্যে প্রায় সমগ্র জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহার কাছে কার্য্য করিয়াছেন, এমন সমস্ত উকীল মোক্তার আমলারাও একথার প্রতিবাদ করিবেন; তিনি মুসলমানের অনুকূলে—প্রতিকূলে বিস্তর বিচার করিয়াছেন, কেহ কখন যে তাঁহার মুসলমান বিদ্বেষ দেখিয়াছে, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। সামাজিক ও বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রে এবং কবি বঙ্কিমচন্দ্রে যে এমন একটি গুরুতর বিষয়ে, বিষম বৈপরীত্যভাব ছিল, একথা আমরা মানি না। তাঁহার গ্রন্থে তিনি মীরকাসিমের উপর প্রচুর শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তাহার পর যদি সেই মীরকাসিমের চরিত্র পূরণ করিতে গিয়া, তিনি তাঁহাকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া থাকেন, তাঁহার গ্রন্থ গোল্লায় গিয়াছে, এ কথা দশবার বলিতে পার, কিন্তু তা বলিয়া বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন, এ কথা বলিওনা। মৈত্রেয় মহাশয়ের উপসংহারই আমাদের উপসংহার। “জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাও যেমন অন্যায় মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাও তেমনই অন্যায়—কাহারও সেরূপ অধিকার নাই।”

অনুসন্ধান। মাসিক সংস্করণ থাকিতে আবার সাপ্তাহিক হইল, তা চলিলেই ভাল।

সখা ও সাথী। জুবিলি সংখ্যা। এই সংখ্যায় রাজরাজেশ্বরীর পরিচয় ও চিত্রাদি প্রচুর আছে। চিত্রগুলি বেশ।

প্রভা। ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা। লেখা বেশ।

বীণাপাণি। ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। এখানিও বেশ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিদ্যোদয়ে ঋতুচিত্র, উণাদিবৃত্তি, হীরকজুবিলি, ব্যবস্থাসংগ্রহ প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি ৫৩টী সংস্কৃত শ্লোকে গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন করিয়াছেন। শ্লোকগুলির রচনা প্রাঞ্জল এবং রচয়িতার পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তাব্যঞ্জক। স্থানে স্থানে মহাকবি কালিদাসাদির ভাবছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

লেখকের দোষ নহে, বরং অন্যদীয় ভাবোপকরণে নবীন বস্তু নির্ম্মাণ করায় তাঁহার বিলক্ষণ রচনা-চাতুর্য্য ও কবিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয় সন্দর্ভে ব্যাকরণ ঘটিত বিষয় লিখিত আছে। তদ্বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই। তৃতীয় প্রস্তাবে মহামহিমান্বিত শ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর ষষ্টিবর্ষ ব্যাপক রাজত্ব-উপলক্ষে মহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। লেখক হিন্দুদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ রাজ-ভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধুশীলা দয়াবতী ভারতেশ্বরীর দীর্ঘজীবন ও অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়াছেন। শেষভাগের শ্লোকগুলি আনন্দের উদ্দীপক না হইয়া বরং কিছু করুণরসের উদ্দীপন করিতেছে, তাহাতে রচয়িতার দোষ কি? কর্ম্মফলদাতা বিধাতা দুষ্কৃতের ফল ভোগ করাইবার জন্য মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা ভারতবাসীদিগকে প্রপীড়িত করিতেছেন। সুতরাং এ মহোৎসবে তাহারা সমুচিত আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে নাই।

বামাবোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। রামগোপাল ঘোষের গল্পটা কেমন কেমন লাগিল। রামগোপাল সাহেবগুণ্ডাকে চাবুক মারিতেন বটে, বাঙ্গালি ভদ্র-লোককে কি ঐরূপে নির্য্যাতন করিতেন?

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। ১৩০২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই আষাঢ় মাসে প্রত্যুত্তর দিলেন। কিন্তু হায়! আড়াই বৎসর আমাদের কাহারও ঘরে কোন সাম-য়িক পত্র থাকে কি? না আড়াই বৎসর কোন কথা আমরা মনে করিয়া রাখিতে পারি কি?

আষাঢ়ের 'সসঙ্গিনী সজ্জনতোষিণী' এবং সনাতন-ধর্ম্মকণা। এই দুই খানিই বৈষ্ণবী পত্রীতেই সুন্দর উপদেশ আছে। সজ্জনতোষিণী হইতে যুগল-দর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তড়িত বরণী, চলে বিষ্ণুপ্রিয়া, রুণু ঝুণু বাজে পায়।
চন্দন তাম্বুল, কুসুমের হার, লয়ে ধীরে ধীরে যায়॥
নদীয়ার চাঁদ, অবনত মাথে, আত্মানন্দে ছিল ভোর।
রুণুঝুণু শুনি, চমক ভাঙ্গিল, ধরিল বালার কর॥
নিকটে আনিয়া কত না আদর, সোহাগ যতন করে।
দৈবের ঘটন, আদরে অধিক, প্রিয়াজি আতঙ্কে ডরে॥

'এত যে আদর, এ বুঝি ছলনা, রমণী ভুলান ফাঁদ।
এরূপ করিয়া, কোন্ দিন বুঝি, ঘটাইবে পরমাদ॥'
ভাবিতেই প্রিয়া, কম্পিত হইল, নয়নে ছুটিল জল।
"কি হ'ল কি হ'ল," বলে প্রাণেশ্বর "বল বল প্রিয়ে বল॥"
"কি হ'ল তোমার, কেন অকস্মাৎ, করিছ রোদন ধ্বনি!
অবশ্য তোমার, সে দুঃখ নাশিব, বল বল আগে শুনি॥"
"না না কিছু নহে," অশ্রুসিক্ত মুখে, বলে প্রিয়া ধীরে ধীরে।
অদ্ভুত সে ভাব, অপূর্ব্ব সে শোভা, লইলেন প্রভু কোরে॥
সুবর্ণের গাছে, সোণার লতিকা, কিবা শোভা পরকাশ।
প্রিয়ার ক্রন্দনে, সে শোভা হেরিল, অধম বৈষ্ণব দাস॥

(শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্ত্বনিধি।)

শোক-সংবাদ।

কবিবর হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ঈশানচন্দ্র ইহজগতে আর নাই। সেই ভীষণ ভূমিকম্পের রাত্রিতে ঈশান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, শুক্রবার, ঈশান ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার বেয়াল্লিস বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঈশানের অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত, তাঁহারই উৎসাহে এবং উদ্যোগে আমাদের পূর্ণিমা প্রকাশিত হয়, তিনি সেই অবধি পূর্ণিমার প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার আকস্মিক বিয়োগে অবসন্ন। তাঁহার প্রতিকৃতি এই সংখ্যার পূর্ণিমায় দেওয়া গেল।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩০৪ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

মানব-জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি ?

(৩)

তুমি ক্ষুদ্র জীব—যে অনন্ত শক্তি হইতে তোমার উৎপত্তি তাহা লক্ষ্য না করিয়া, নিজেকে জড়পদার্থে পরিণত করিতেছ, অতএব তুমি ক্ষুদ্র বই কি! তুমি আপনাকে ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করিয়া, অনাদি অনন্তবাহী—কাল-প্রবাহের কূলে বসিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ভাব," এবং কালের "আজ্" আর "কালের" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ গুনিতেছ। যদি চক্ষু খুলিয়া দেখ, তো দেখিবে, যে তোমার ওই "ভাব," ও "আজ" আর "কালের" শত সহস্র অযুত অসংখ্য ঢেউ তোমার চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, তুমি সেই তীরেই বসিয়া রহিয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার "আজ" আর "কাল" মিথ্যা, না, তুমি মিথ্যা! তুমি মিথ্যা নহ—কেন না, তোমার "আজ" আর "কাল" চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের রেখা মাত্র রহিতেছে না, কিন্তু তুমি রহিতেছ! তোমার এই "আজ" আর "কাল" ধরিয়া, উহাদের মূল নির্ণয় করিয়া দেখ দেখি! তখন বুঝিবে,—There is an Infinite and Eternal Energy from which everything proceeds. ইহাও ইউরোপের কথা। Herbert Spencer সাহেব এ কথা বলিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাক, তোমাদের John Stuart Mill সাহেবও বলিয়াছেন—I think it must be allowed in the present state of our knowledge, the adaptations in nature affords a large

balance of probability in favour of creation by intelligence." Spencer সাহেব যে অনাদি শক্তির অনুমান করিয়াছেন, এবং Mill সাহেব যে বুদ্ধির কল্পনা করিয়াছেন, তাহা এখনো শূন্যেই ভাসিতেছে। তাঁহারা তাহার প্রকৃত মূল খুঁজিয়া পান্ নাই।

মানব! তুমি যত বড়ই বুদ্ধিজীবী বা চিন্তাশীল হও—বিশ্বের আদি কারণ ভগবান ছাড়িয়া দিয়া, তুমি কোনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না। তোমার চিন্তার শক্তি বিচিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার চিন্তার প্রবাহের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, প্রবাহের পর প্রবাহ উঠিয়া, তোমার চিন্তা, মনুষ্য হইতে মনুষ্যান্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার মনোরাজ্য ভাসাইয়া আবার মনুষ্যান্তরে প্রবেশ করিতেছে। এক যুগের মনুষ্য হইতে যুগান্তরের মনুষ্যের মনোরাজ্য ভাসাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু এমন একস্থান আছে—যে স্থানে গিয়া, তোমার বুদ্ধির প্রবাহ—চিন্তার প্রবাহ—কল্পনার প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেই খানে মানব দুইটি চক্ষু বুজিয়া, বক্ষে দুই করতল চাপিয়া, ভূপতিত হইয়া অবনত মস্তকে বলিতে থাকে—"আমি অন্ধ! কে আছ আমায় পথ দেখাইয়া দেও।" ইউরোপের চিন্তা-প্রবাহও একদিন সেই অবরোধে পৌঁছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিন কবে হবে! ইউরোপের এই আমিত্বে সন্দেহ, ও তথাকার Nihilism রূপান্তরে প্রায় একই বস্তু, অথচ Nihilistদিগের উপর তদ্দেশের লোকেরা খড়্গাহস্ত কেন বুঝি না।

ইউরোপের কথা, এই পর্য্যন্ত থাক, এখন একটু ভারতের কথা বলি। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের হিন্দুশাস্ত্রে এ কথার যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার আছে জগতে অন্য কোন জাতীয় শাস্ত্রে সেরূপ নাই। দুঃখের বিষয় সংক্ষেপে সে সকল কথার আলোচনা করিতে হইতেছে, কারণ প্রবন্ধের কলেবর বড় বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে জড়েরও আদিকারণ আছে। তাহার নাম চিৎশক্তি। চিৎশক্তির আদিকারণ আছে, তিনি ভগবান। তিনি ইচ্ছাময়, লীলাময়, কেন সৃষ্টি করেন, কেন ধ্বংশ করেন, তাহা মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত। ভগবানের অস্তিত্ব প্রমান করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। হিন্দুশাস্ত্র বলেন—ভগবানও প্রত্যক্ষ, লোকে যে ভগবানকে খুঁজিয়া পায় না তাহার কারণ তাহারা

জানে না যে কি খুঁজিতেছে, কাহাকে খুঁজিতেছে। বাস্তবিক যাঁহাকে খুঁজি, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি-গুণ, তিনি কোথায় থাকেন, কি অবস্থায় থাকেন, ইত্যাদি না জানিলে, সে অনুসন্ধান বৃথা। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন এবং ভক্তিশাস্ত্র এ সকল শাস্ত্রই জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু, ইহাদের প্রত্যেকেরই জ্ঞাতব্য বিষয়, এবং তাহার ধ্যান-ধারণা ও সাধনা বিভিন্ন। জড়বিজ্ঞান, পরমাণু ও জড়শক্তির মূল অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাই তাহার ধ্যান ও ধারণা। সুতরাং সেই পরমাণু ও তাহার জড়শক্তি বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

মনোবিজ্ঞান খুঁজিতেছে—"ভাব" ও ভাবের আধার। তাহাই তাহার ধ্যান ও ধারণা। সুতরাং সে "ভাব" ও ভাবের আধার বই আর কিছুই দেখিতেছে না। দর্শনশাস্ত্র খুঁজিতেছে "কার্য্য" ও "কারণ"। তাহাই তাহার ধ্যান ও ধারণা। কাযেই সে "কার্য্য" ও "কারণ" ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছে না। ভক্তিশাস্ত্র খুঁজিতেছে—"ভগবান"। তিনিই তাঁহার ধ্যান ও ধারণা। সুতরাং সে শাস্ত্র কেবল ভগবানই দেখিতেছে।

ভারতেও একদিন এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক লইয়া ভারত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে প্রকৃত চক্ষুষ্মান দার্শনিক লেখনী ধারণ করিয়া দেখাইলেন যে ভগবান দ্রষ্টব্য। তাঁকে দেখিবার পথ, একবার দেখিতে পাইলে, আর কি জীব স্থির থাকিতে পারে। তখন ভারতবাসী তাঁকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে ভারতে ভক্তিশাস্ত্র সৃষ্ট হইল। এ সকল কথা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক, সুতরাং ইহাদের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন—জড়জগৎ অনিত্য কিন্তু জগতে নিত্য বস্তু রহিয়াছে। সৎ কিম্বা অসৎ বস্তুর যে প্রকাশ তাহাকেই মন কহে। তদ্ব্যতীত মনের অন্য কোন আকার নাই। * * অথবা সংকল্পকেই মন কহে। কারণ, যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল, ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ মনও কদাচ সংকল্প হইতে ভিন্ন নহে। যাহাতে সংকল্প করা যায়, তাহাতেই মন থাকে। ঐ সংকল্পের অবিদ্যা সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধ মল এবং তমঃ প্রভৃতি অনেক নাম আছে। দৃশ্য ব্যতিরেকে মনের অন্য কোন রূপই নাই। যেমন কমলিনী বীজের মধ্যে কমল মঞ্জরী অবস্থিতি করে সেইরূপ মহা চিৎ-স্বরূপ পরমাত্মার

মধ্যে জগতের দৃশ্যতা অবস্থিতি করিতেছে। প্রকাশ্য বস্তুতে আলোক, বায়ুতে চপলতা, এবং জলে তরলতা যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি স্বভাবতই অবস্থিতি করিতেছে। * * দ্রষ্টা এবং দৃশ্যতা পরস্পর অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। * * দৃশ্য বস্তুর অভাব হইলে দর্শন কর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে যে দৃশ্যভাব তিরোহিত হয়, তাহা কেবল কেবলীভাব বশতই হইয়া থাকে। * * সংকল্প সকল গলিত হইলে অবশেষে কেবল জীবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। * * প্রকাশ্য বস্তুর রূপাদি থাকিলে যেরূপ "তুমি" "আমি" ইত্যাদি ত্রিজগৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ দৃশ্যবস্তুর অবিদ্যমানতা হইলে দর্শন কর্ত্তার কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র প্রকাশ পায়। (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)

অতএব হিন্দুশাস্ত্র মতে, আমি আছি। আমি আছি বলিয়াই এই দৃশ্যমান জগৎ আমার পক্ষে রহিয়াছে। যখন আমার "আমিত্ব" লোপ হয় তখন আমার পক্ষে এই দৃশ্যমান জগতেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। আমি এই পরিদৃশ্যমান জগতেই আছি বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে এই জগৎ হইতে পৃথক ভাবেও থাকিতে পারি। কারণ, যখন কোন এক চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকি, তখন আমার সম্মুখে জাগতিক পদার্থ সমস্তই বিদ্যমান রহিলেও, আমার সে সকলের অস্তিত্বের কোন ধারণাই থাকে না। এমন কি আমার, অতি সন্নিকটে কেহ কোন কার্য্য করিলে বা কথাবার্ত্তা কহিলে, বা আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেও, আমাব তৎসম্বন্ধে সংজ্ঞা থাকে না। অতএব "আমি" আছি ইহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু আমি কি পদার্থ? আমি জড়? কেমন করিয়া বলিব আমি জড়! আমার আধার এই দেহ হইলেও, এই দেহটা আমি নহি। দেহ যখন সুষুপ্তি অবস্থায় রহিয়াছে, আমি তখন জাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছি, কারণ, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি – নিদ্রিত অবস্থায় হাসিতেছি —কাঁদিতেছি – কথা কহিতেছি। সুতরাং নিদ্রা যায় আমার দেহ ও ইন্দ্রিয়, আমি নিদ্রা যাই না। অতএব আমার ইন্দ্রিয়ও আমি নহি। আমার ইন্দ্রিয় জড়, কেন না, দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। কারণ দেখা গিয়াছে, যখন ডাক্তারে দেহের কোন অকর্ম্মণ্য অংশ ছেদন করিবার জন্য মনুষ্যকে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সম্পূর্ণ চৈতন্য রহিত করে, সে অবস্থায়ও অস্ত্রের আঘাতে মানব শিহরিয়া উঠে। সে ক্লেশানুভব মানবের দৈহিক, মানসিক নহে। মানসিক ও দৈহিক ক্লেশ যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা সহজেই অনুমেয়।

দৈহিক ক্লেশ হইতে মানসিক ক্লেশ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া দৈহিক ক্লেশই মানসিক ক্লেশ নহে। অতএব আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় জড় হইলেও, আমি জড় নহি। কারণ, আমি দেহও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি। উভয়ের অন্তর্ভূত হইয়াও আমি পৃথক। আমার দেহ একস্থানে অবস্থিতি করিতেছে, আমি কত স্থানে পর্য্যটন করিতেছি। কখন কখন আমি মর্ত্ত ছাড়িয়া শূন্যেও পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার চক্ষু একদিকে চাহিয়া আছে, আমি কোথায় গিয়া কত কি দেখিতেছি।

আমার দেহ বা ইন্দ্রিয় যদি "আমি" না হইলাম, তবে আমি কি? আমি কি আমার "মন"? মন, আমার ঘনিষ্ট-আধার হইলেও, "আমি" আমার "মন"ও নহি। কারণ এরূপ অনেক সময় হইয়া থাকে, যে, কাযে আমার মন নাই, অথচ আমি কাজ করিতেছি। তদ্ভিন্ন, "মন" কেবল মাত্র কল্পনা করে—কার্য্য করিবার শক্তি মনের নাই। প্রকৃত পক্ষে, আমার কার্য্য করিবার যে শক্তি তাহাই আমি। সে শক্তি চিদ্‌শক্তিতে বিরাজ করে। ফলতঃ চিদ্‌শক্তি নিষ্ক্রীয়। কর্ত্তা "আমি"*। অতএব আমি বলিয়া একজন রহিয়াছি বৈকি।

৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

*এই কর্ত্তা সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের মধ্যেও বিভিন্ন মত আছে। যথা,
গৌতম তন্ত্রানুসারিদিগের মতে, অহংকার দ্রব্য বিশেষ, ইহাই বিভু-জীবাত্মা। মন তাহার ইন্দ্রিয়। বুদ্ধি তাহার গুণ।
সাঙ্খ্য মতে, বুদ্ধি সাক্ষাৎ—সত্ব, রজ, এবং তমোগুণের প্রকৃতি, অহংকার সেই প্রকৃতির কার্য্যান্তর। মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত ইন্দ্রিয় বিশেষ।
চার্ব্বাকের মতে, বুদ্ধি শরীরের চৈতন্যগুণ, অহংকারই শরীর। মন শরীরের আত্মা।
জৈমিনীর মতে, মন দ্রব্য বিশেষ। বুদ্ধি জড় বোধাত্মক অহংকার-রূপ আত্মার চিদংশ।
অর্হিত মতে, চিৎ-স্বরূপ জীবের শরীরই অহংকার, বিষয়াভিলাষই মন ও বুদ্ধি অর্থনামে খ্যাত।
বৈশেষিক ও ন্যায়ের মত, প্রায় একই প্রকার। অর্থাৎ অহঙ্কার মন, সেই মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, অনুমান, তর্কবিপর্য্যয় ও সংকল্প এই কয় ভাগে বিভক্ত। ফলতঃ আমার "আমিত্ব" কেহই অস্বীকার করেন না।

মৃত্যুর পর।

(১০)

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা শিবশর্ম্মাকে সূর্য্যলোকে রাখিয়া আসিয়াছি। ভুবর্লোক সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত। সূর্য্যলোকের পর—

অগ্নিস্থান।—শিবশর্ম্মা তৎপরে অগ্নিস্থান দর্শন করিলেন। নর্ম্মদা নদী-কুলে নর্ম্মপুরে বিশ্বানর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অপুত্রক দ্বিজ কাশীতে বহুবৎসর তপস্যা করিয়া শিবের বরে গৃহপতি নামে এক পুত্র (শিবকে) প্রাপ্ত হয়েন। এই পুত্র কঠোর তপস্যা করায় ইন্দ্র তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসেন ও বর দিতে চাহেন। গৃহপতি বলেন শঙ্কর আমার বরদাতা। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র নিক্ষেপ করেন। বালক মূর্চ্ছা যায়। তখন হরপার্ব্বতী আসিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করান। শিবের বরে এই পুত্র সপরিবারে স্বর্গে অগ্নিপতি হইয়া বাস করেন। অগ্নির সাধন করিলে অগ্নিপুরে বাস হয়।

নৈর্ঋতদেশ।—পিঙ্গাক্ষ নামে এক পল্লিপতি চণ্ডাল নিজ প্রাণ দিয়া কাশী-যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সেই পুণ্যে নৈর্ঋত ঈশ্বর। হীনজাতি পরের উপকার করিলে এই স্থান প্রাপ্ত হয়।

বরুণপুরী।—কর্দ্দমমালীর পুত্র শুচীমান্। শুশুকে ধরিয়া সমুদ্রের নিকট লইয়া যায়। শঙ্করের এই পুত্র সম্বন্ধে অপর মতলব ছিল। শিবের ভয়ে সমুদ্র পুত্র ফিরাইয়া দিল। সে কৈলাসে যায় ও বরুণ হইবার জন্য বর পায়। উত্তরকালে বালক হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিবার পর বরুণত্ব লাভ করে। জলাশয়দান, জলছত্র, অশ্বত্থবৃক্ষ রোপণ, বা ছায়ামণ্ডপ, পথে বিশ্রাম ঘর দান, ব্রাহ্মণেরে যত্ন করিয়া ভোজন করাইয়া পাখা দান ও শীতল সামগ্রী দান, বৈশাখে দেবার্চ্চনা ও ঝারা দেওয়া, তীর্থের পথ সুগম করিয়া দেওয়া, ও ভয়ার্ত্তজনকে অভয় দেওয়া—এই সকল কার্য্যে বরুণলোক প্রাপ্ত হয়।

বায়ুপুরী।—কশ্যপ-তনয় পূতাত্মা অযুত বৎসর কঠোর তপস্যায় শঙ্করকে বশীভূত করেন ও বায়ুরূপ হইয়া কৈলাসে বাস করিবার অধিকার পান। যেন পদে ভক্তি থাকে এই বর চাওয়ায় এই ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন।

কুবেরপুরী।—যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণের গুণনিধি পুত্র। জুয়াখেলায় সর্ব্বস্ব

হারে। মাতা পুত্রকে আদর দিত। রাগে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। গুণনিধি তপস্যায় যায়। সমস্তদিন অনাহার। বনে জনকত লোক শিবপূজা করিতেছিল। সে দিন শিবরাত্রি। তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। প্রদীপ স্তিমিত। মিষ্টান্নের গন্ধে গুণনিধি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরিধান চিরিয়া সলিতা করিয়া প্রদীপ উজ্জল করেন। লোকেরা জাগ্রত হইয়া চোরজ্ঞানে অতিশয় প্রহার করাতে গুণনিধির মৃত্যু হয়। যমদূতের হস্ত হইতে শিবদূত লইয়া যায়। গুণনিধি কলিঙ্গ দেশের নরপতি হন। লক্ষ বৎসর তপস্যার পর হরপার্ব্বতী দর্শন দেন। বাম চক্ষে দেবী দর্শন করাতে চক্ষুটি অন্ধ হয়। পাদপদ্মে যেন মতি থাকে এই বর প্রার্থনা করায় যক্ষপুরে ধনেশ্বর হন। শিবভক্ত কুবের-লোক প্রাপ্ত হন।

ঈশানলোক।—শিবভক্ত তপোধনেরা বাস করেন।

চন্দ্রপুরী।—ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি। ঘোরতর যোগ ও তপস্যার বলে ইঁহার রেত চন্দ্ররূপে নির্গত হয়। চন্দ্র তপস্যার প্রভাবে চন্দ্রলোকে রাজা হইয়াছেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া এক কলা ললাটে ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে সংযম, চতুর্দ্দশীতে উপবাস, অমাকলার দিনে কাশীতে চন্দ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দান তর্পণ আদি করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়।

নক্ষত্রপুরী।—ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুলি হইতে দক্ষের উৎপত্তি, তাঁহার রোহিণী প্রভৃতি ৬০ জন মানস কন্যা। একভাবে ৬০ জন এক পুরুষান্বিত তপস্যা করিয়া শঙ্করের বরে চন্দ্রকে পতি পাইয়াছেন। নক্ষত্রের শিবলিঙ্গ পূজা করিলে নারী এই লোক প্রাপ্ত হয়।

বুধলোক।—চন্দ্রের ঔরষে তারার গর্ভে বুধের জন্ম। কঠোর তপস্যার বলে বুধ দ্বাদশ চক্রে স্থান পাইয়াছেন। বুধেশ্বরলিঙ্গ পূজিলে এই স্থান।

শুক্রপুরী।—ভৃগু হাজার বৎসর তপস্যা করেন। ভক্ষণ গোধূমরেণু। শঙ্কর তুষ্ট হইয়া মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র ভৃগুকে দেন। শিবগণের সহিত দৈত্যগণের যুদ্ধ হইলে মৃতদৈত্য সকলকে শুক্র পুনরায় প্রাণ দেন। শিবের আজ্ঞায় নন্দী শুক্রকে ধরিয়া আনেন। শিব উদরে স্থান দিলেন। এক বৎসর উদরে থাকিয়া বহু স্তবের পর শিবের লিঙ্গদ্বার দিয়া শুক্র বাহির হন। পরে শুক্র পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যাতেও কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন গোধূমরেণু খাইয়া আবার

হাজার বৎসর তপস্যা করিলেন পরে মহাদেব তুষ্ট হইয়া বর দেন। শুক্র পুর অধিপতি হইলেন। শুক্রবার অষ্টমীতে শুক্র স্থাপিত লিঙ্গ কাশীতে পূজা করিলে এই স্থান লাভ।

মঙ্গললোক।—অঙ্গারক ঋষি তপস্যার ফলে এই লোকেশ্বর হন। ইঁহারই নাম ছিল দ্বিমঙ্গল।

বৃহস্পতীপুরী।—আঙ্গিরস তপস্যার ফলে পুরপতি ও দেবগুরু হন।

শনিপুরী।—সূর্য্যের স্ত্রীর নাম সংজ্ঞা। তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া ছায়ার সৃষ্টি করেন। ছায়াকে রাখিয়া গহন বনে অশ্বিনী হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিল। স্বরূপার (ছায়া) গর্ভে সূর্য্যের ঔরষে কন্যা তপতী ও পুত্র শনি হয়। বিমাতার সহিত ঝগড়া করায় বিমাতার শাপে যমের পদের মাংস খসিয়া পড়ে। শনি কাশী গিয়া ঘোরতর তপস্যা করেন ও মহাদেবের বরে পুর অধিপতি হন।

সপ্তঋষিপুরী।—মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ট তপস্যার ফলে পুর পাইয়াছেন। সংভূতি, অনুসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নীতি, স্মৃতি ও উর্জ্জা সাত রমণী। অরুন্ধতী এই স্থানে।

ধ্রুবলোক।—ধ্রুব উপাখ্যান কাহারও অবিদিত নাই। তপস্যার ফলে ধ্রুব এই লোক পাইয়াছেন। স্বর্লোক শেষ হইল।

মহর্ল্লোক।—তৎপরে শিবশর্ম্মা মহর্ল্লোকে গমন করেন। নিষ্পাপী লোকের স্থান, যাঁহারা সদাকাল বিষ্ণু চিন্তা করেন।

জনলোক।—উর্দ্ধরেতার আবাস স্থান। দ্বন্দ্ব বিমুক্ত।

তপলোক।—যোগীগণের স্থান। বাসুদেব ধ্যান আর বাসুদেব জ্ঞান, আর যাঁহারা পঞ্চতপা করেন তাঁহাদের এই স্থান। এক মাস অন্তে কুশাগ্রে জল পান; ছয় মাস অন্তে ভক্ষণ; সম্বৎসর নিশি জাগরণ; শরীরে যাঁহাদের গুল্মলতা হইয়াছে, মাথায় যাঁহাদের পক্ষীতে বাসা করিয়াছে। বৃক্ষজ্ঞানে যাঁহাদের গাত্রে মৃগগণ গাত্র ঘর্ষণ করে, একপদে উর্দ্ধবাহু হইয়া উদয়াস্ত সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাঁহারা বহুকাল তপস্যা করেন তাঁহাদের জন্য এই স্থান।

সত্যলোক।—মহোজ্জ্বিল ব্রহ্মার পুরী। এখানে চন্দ্র সূর্য্যের তেজ

নাই। মণির আলোকে স্থান উদ্ভাসিত। পরোপকার আর অবিচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ এখানকার কার্য্য। স্থান এরূপী রম্য যে বর্ণনাতীত।

বৈকুণ্ঠপুরী।—

চন্দ্রসূর্য্য কিরণে প্রকাশ যতস্থান
ভূ-নামে ভারতস্থান দেবের প্রমাণ
ভূমণ্ডল সর্ব্বঊর্দ্ধে গগণমণ্ডল
ভূমি হইতে লক্ষ যোজনে ভানুস্থল
ভানু হইতে লক্ষ যোজনে নিশাকর
তা হইতে নক্ষত্র লক্ষ যোজন উপর
নক্ষত্র হইতে বুধ দ্বিলক্ষ উপরে
বুধ হইতে দুই লক্ষ শুক্র বাস করে
শুক্র হইতে দুই লক্ষ মঙ্গলের বাস
দ্বিলক্ষ মঙ্গল হইতে গুরুর প্রকাশ
গুরু হইতে দুই লক্ষ উপরেতে শনি
সপ্তর্ষি মণ্ডল শনি হইতে লক্ষ গণি
সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে লক্ষ ধ্রুব মান
ভূ র্ভূব স্বঃ তিন লোক হইল প্রমান
পাদগম্য বস্তু যত ধরণীমণ্ডলে
ভূলোক বলিয়া তারে সর্ব্বলোকে বলে
ভূলোক হইতে ভানু মণ্ডল যাবৎ
ভুবর্ল্লোক হেন খ্যাত জানহ ভারত
মহর্ল্লোক ক্ষিতি হৈতে কোটী যোজনেতে
জনলোক দ্বিকোটী যোজন ভূমি হইতে
চতুষ্কোটী ভূমি হইতে তপলোক জান
ক্ষিতি হইতে অষ্টকোটী সত্যলোক স্থান
সত্যলোক হইতে ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ নগর
ভূলোক হইতে কোটী ষোড়শ প্রহর
যেখানে বসতি করে শ্রীমতী সাক্ষাৎ
সতত অভয়দানে আছে ঊর্দ্ধ হাত
(লক্ষ কোটী যোজনেতে কৈলাশপুরী হয়
যথা বিশ্বনাথ বামে গৌরী বিরাজয়।) (কাশীখণ্ড)

শিবশর্ম্মা বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মার একবৎসর বাস করিয়া পরে নন্দীশ্বর (নন্দী-বর্দ্ধন) গ্রামে ভূপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধকালে কাশীতে গিয়া সস্ত্রীক বহু তপস্যার পর শঙ্কর দর্শন লাভ করেন ও তাঁহার বরে তবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। এ যাত্রায় হয় নাই।

তারপর শিবশর্ম্মা গণের সহিতে
বৈকুণ্ঠপুরীতে গেল মহা হর্ষ চিত্তে
বৈকুণ্ঠের শোভা কিবা করিব বর্ণন
অতি রম্য স্থান কোটী কন্দর্প বেষ্টন
ভগবান লক্ষ্মীসহ যথা বিরাজয়
গণ সঙ্গে শিবশর্ম্মা প্রণাম করয়।

বৈকুণ্ঠ বিস্তীর্ণপুরী শান্তিময় ধাম
দাসীরূপে শান্তি তথা করে দাসী কাম
গোপুর প্রাচীর পরি নাঁই তার সীমা
তাহার যে কত শোভা নাহিক উপমা
দীর্ঘ ও প্রস্থের তার নাহি নিরূপণ
এক ঠাঁই নবরত্ন শোভার মোহন
জগতেতে নবরত্ন কভু নাহি মেলে
বৈকুণ্ঠে সে নবরত্ন শোভে স্থলে স্থলে
অঙ্গন প্রাঙ্গনে সাজে সেই রত্নগণ
কাঞ্চনে জড়িত জ্যোতি শোভার মোহন
নবরত্ন কিরণেতে যেন নবশোভা
শ্বেত পীত নীল লাল অতি মনোলোভা
কোথা রামধনু কোথা চন্দ্ররেখা শোভে
হেরিলে গগণশোভা সদা মন লোভে
কোথা সৌদামিনীশোভা কোথা অহীমণি
শোভে সে বৈকুণ্ঠধামে শোভার মোহিনী
সদা নব নব জ্যোতি হয় সুপ্রকাশ
দিবানিশি নাহি শেষ একই আভাস

আছয়ে সপ্তম দ্বার বড়ই কঠিন
সপ্তম দ্বারেতে দুই দ্বারী সুপ্রবীণ
যমের সমান অঙ্গ দেখিতে ভীষণ
বিষ্ণুর সমান বেশ বিষ্ণুর দর্শন ॥*

সেই হরিভক্তগণে দিতে দরশন
হইলেন হেন মূর্ত্তি মানস মোহন
সে ছত্র চামর শোভা বলিব কেমনে
কত হীরা মতি চুণি শোভে অণুক্ষণে
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হইয়া শোভিত
চলিলেন দেব হরি প্রেম পুলকিত
যেন কোটী কোটী চাঁদ হস্ত পদ নখে
শোভে তারা অনুক্ষণ জ্ঞান হয় দেখে
অঙ্গজ্যোতি কোটী সূর্য্য কি বলিব আর
কণ্ঠে শোভে কণ্ঠমালা আর মণিহার
বক্ষে শোভে ভৃগুপদচিহ্ন মনোহর
বচনে পীযূস ক্ষরে মত্ত মধুকর
পীতবাস পরিধান মুখে মৃদুহাস
সে রূপ হেরিতে ভক্ত সদা করে আশ
তিলফুল জিনি নাসা কর্ণেতে কুণ্ডল
বিদ্যুতের জ্যোতি জিনি করে ঢল ঢল
মস্তকে কিরীট তাঁর শোভার মোহন
শ্বেত পীত নীল লাল মণির গাঁথন
কেমনে সে শোভা আমি করিব বর্ণন
তিনিই সৌন্দর্য্য সার পুরুষ রতন
ত্রৈলক্ষ মোহিনী লক্ষ্মী তাঁর পদতলে
সেবেন তাঁহার পদ অতি কুতূহলে

---

*তিনকড়ি বিশ্বাসের অনুবাদ। বাণেশ্বর ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। সবিনয়ে অনুমতি চাহিতেছি, ভরসা করি বৈষ্ণব হৃদয় অনুমতি দানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সেই নিত্য নিবঞ্জন ভক্তের ভক্তিতে
উদেন ভক্তের হৃদে মানস মোহিতে
ভক্তজন ভক্তিবশে সাজায় এ সাজ
মোক্ষময় মূর্ত্তি যাঁর ত্রৈলোকের মাঝ শ্রীমদ্ভাগবত*

কৈলাসপুরী—

লক্ষকোটী যোজনেতে কৈলাসপুরী হয়
যথা বিশ্বনাথ বামে গৌরী বিরাজয়
গুহ গণপতিলোকে সম্মুখে নন্দীশ্বরে
জটাভারে গঙ্গা কল কল ধ্বনি করে
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা করে ত্রিনেত্র বিশাল
ওষ্ঠ লাল মৃদুহাস প্রকাশ অনল
গলে দোলে সর্পহার ফণিভূষণ আর
হস্তেতে ডম্বুর আর ভস্মমালা সার
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান বৃষভ বাহন
লম্বোদর অতি সুললিত দরশন
পাদপদ্মে কিবা শোভা বর্ণনা অপার
ব্রহ্মা আদি বেদে অন্ত না পায় যাঁহার
সকলের সার দেবে চরিতে না পায়
লীলার কারণ মাত্র শরীরে ধরয় ॥†

তালিকা—

কৈলাসপুরী—বৈকুণ্ঠ হইতে ১৬ গুণ (মতান্তরে লক্ষকোটী)
বৈকুণ্ঠ—১৬ কোটী যোজন (ক্ষিতি হইতে)
সত্যলোক—৮ কোটী যোজন (ক্ষিতি হইতে)
তপলোক——৪ কোটী যোজন ঐ

*তিনকড়ি বিশ্বাসের অনুবাদ। বানেশ্বর ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। সবিনয়ে অনুমতি চাহিতেছি, ভরসা করি বৈষ্ণবহৃদয় অনুমতি দানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

†প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে বঙ্গবাসীর উপহার পুস্তক "কাশীখণ্ড" আমার হাতে পড়িল, ইহা পণ্ডিত প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। প্রথমে হাতে পড়িলে বড় ভাল হইত। ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইহা দৃষ্টে দুই চারিটা ভুল সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

জনলোক——২ কোটী যোজন (ক্ষিতি হইতে)

মহল্লোক——————ক্ষিতি হইতে ১ কোটী যোজন

স্বর্লোক—ধ্রুব—১ লক্ষ, সপ্তর্ষি—১ লক্ষ, শনি—২ লক্ষ, বৃহস্পতি—২ নিযুত (লক্ষ), মঙ্গল—২ লক্ষ, শুক্র—২ লক্ষ, বুধ—২ লক্ষ, নক্ষত্র—(লক্ষ যোজন) চন্দ্র হইতে, চন্দ্র—লক্ষ যোজন সূর্য্য হইতে, ঈশান, কুবের, বায়ু, বরুণ, নৈঋত, অগ্নি, ইন্দ্রপুরী। পরস্পরের দূরতা। বুধ দুই লক্ষ যোজন নক্ষত্রলোক হইতে। আবার চন্দ্র হইতে নক্ষত্রলোক লক্ষ যোজন। সূর্য্য হইতে চন্দ্রলোক লক্ষ যোজন। ধ্রুবলোক—১ লক্ষ; অর্থাৎ সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক ১ লক্ষ যোজন। পদ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করুন। বুঝিবার সুবিধার জন্য এই তালিকা দেওয়া হইল।

ভুবর্লোক—সূর্য্য, অপ্সরা, যমপুরী, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, পিশাচ বা রাক্ষস, সূর্য্য ক্ষিতি হইতে নিযুত যোজন (মতান্তরে লক্ষ)।

ভূর্লোক—পৃথিবী।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবের শিক্ষা।

(২)

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

এ জগত নশ্বর, জাগতিক সুখ কেবল জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী। অতএব ইহাতে মুগ্ধ না থাকিয়া যাহা নিত্য, যাহা জীবের চরম প্রয়োজন তাহাই লাভ করিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া তৎলাভের জন্য অনেকে নানারূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝা যায় যে মুক্তিলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। প্রেম-সাধনা দ্বারা ভগবৎ সম্মিলনই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মুক্তি কেবল প্রেমের একটী অবান্তর ফল মাত্র।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যই নিরাকার বাদ-প্রবর্ত্তক জীব তাঁহার সেই বাক্যে মোহিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত জীবের যে একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা বিস্মৃত হইয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সুদূরে পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক জ্ঞানানুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হায় জ্ঞান দ্বারা কি তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়? তিনি যে জ্ঞানাতীত, তিনি কেবল ভক্তেরই অধীন।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যদিও নিরাকার বাদ স্থাপন করিয়াছিলেন তথাচ তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাহার প্রমান স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি প্রদত্ত হইল।

সাকার শ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবিতদ্দোষং ক্ষন্ত মর্হসি॥
ত্বমেব জগতাংধাত্রী সাবদেহক্ষর রূপিণি।
তব প্রসাদাদ্দোবেশি মূকো বাচালতাং ব্রজেৎ॥
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্ত বিপর্য্যয়ম্।
দেবানাং যপ যজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনম্॥
স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূবি দুস্কৃতম্।
তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিনি॥
কৃতাঘ পরিহারায় তবার্চ্চাস্থাপিতাময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভূত সংপ্লবম্॥

ব্রহ্মাণ্ডগিরি কৃত সঙ্কর বিলাস।

নিরাকার বাদ প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য যদি স্বয়ং সেই মত পোষক করিতেন তবে তিনি দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া নিজে বেদের মুখ্যার্থ গোপন করিয়া গৌনার্থ প্রকাশের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দেবী-চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন কেন? ইহাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে কোন গুঢ় কার্য্য সিদ্ধির জন্যই মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এবম্বিধ আচরণ করিয়া থাকিবেন। অতএব শ্রীভগবানের বিগ্রহ অস্বীকার করিয়া শুষ্ক জ্ঞান লইয়া মুগ্ধ থাকা জীবের কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্বয়ং শ্রীভগবান গৌরাঙ্গদেব আবির্ভাব হইয়া জীবকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন সর্ব্ব-ধর্ম্ম সর্ব্ব-শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাহাই পালন করা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের সাধনতত্ত্ব কি?

তখন রামানন্দ রায় স্বধর্ম্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, সধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি প্রভৃতিকে ক্রমান্বয়ে সাধন-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু সে সমস্তকেই বাহ্য বলিয়া উপেক্ষা করতঃ তদপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিবার আদেশ করিলেন। যথা

"প্রভু কহে এও বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার। চৈঃ চঃ

এইবার প্রভু বলিলেন ইহা উত্তম কিন্তু ইহা অপেক্ষা যাহা উত্তম তাহাই প্রকাশ কর।

"রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।
প্রভু কহে এও হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।
প্রভু কহে এও উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।
প্রভু কহে এও উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব সর্ব্বসাধ্য সার॥"

অর্থাৎ পতিভাবে শ্রীভগবৎ আরাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য, কারণ ইহাতে শান্তি-রসের কৃষ্ণ-নৈষ্ঠিকতা, দাস্যরসের মমতা, সখ্যরসের বিস্রম্ভবতা, বাৎসল্যরসের স্নেহাধিক্য সমস্তই বর্ত্তমান, বিশেষতঃ মধুর রসে (কান্তভাবে) ঐ চারিটি গুণ সঙ্কোচ শূন্য হইয়া আরও মধুর হইয়াছে।

শ্রীভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজন করেন তিনিও তাঁহাকে তদনুরূপ প্রতি ভজন করিয়া থাকেন কিন্তু মধুর রসযুক্ত ভজনের অনুরূপ প্রতি ভজনে সমর্থ না হইয়া তিনি ব্রজাঙ্গনার নিকট নিজ পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং, স্ব সাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
যামা ভজন্ দুর্জয় গেহ শৃঙ্খলাঃ, সাংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা।

শ্রীমদ্ভাগবত। ১০—৩২—২২

যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য। চৈঃ চঃ

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরম মাধুর্য্য সম্পন্ন হইলেও ব্রজগোপী সংযোগে সে মাধুর্য্য আরও পুষ্টি হয় অর্থাৎ মণিকাঞ্চনে যোগ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে।

ভক্ত রামানন্দ রায়ের নিকট প্রভু ঐ পর্য্যন্ত অবগত হইয়া কহিলেন ইহা সাধ্যাবধি নিশ্চয় কিন্তু ইহার আগে যাহা কিছু আছে প্রকাশ কর। তখন রামানন্দ রায় শ্রীরাধার গুণ সকল বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিলেন। প্রভু তাহা শুনিয়াও বলিলেন ইহার আগে যাহা আছে তাহাই বল।

রায় এইবার বিচলিত হইলেন, ইহার উপর প্রশ্ন করিতে পারে এমন কেহ জগতে আছেন বলিয়া তিনি জানিতেন না। রামানন্দের চিত্ত ধীরে ধীরে প্রভুপদে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রেম-বিলাস বিবর্ত্তভাবের স্বীয় কৃত একটী গীত প্রভুকে শ্রবণ করাইলে প্রভু প্রেমাবেশে স্বীয় করে তাঁহার মুখাচ্ছাদিত করিয়া কহিলেন সমুদায় সাধ্যবস্তু নির্ণীত হইল, এখন তাহা পাইবার উপায় বল। রায় বলিলেন দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে ইহার গুঢ়ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। ইহাতে কেবল মাত্র সখীগণেরই অধিকার আছে, এবং সখীদ্বারাই এই লীলা পুষ্টি হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ব্রজগোপীর ভাব গ্রহণান্তর সাধন করিতে পারিলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্য বস্তু পাওয়া যায়।

এতচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু ইহাকেই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া রামা-নন্দরায়কে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং জিজ্ঞাসু হইয়া জীবের সম্মুখে সাধন তত্ত্বের উজ্জ্বল চিত্র ধরিয়া দিলেন ও সাধ্যবস্তু যদ্দ্বারা লাভ হয় তাহাও জানাইলেন তবুও অন্ধ জীব সাধনতত্ত্ব নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া কেন যে অমূল্য জীবনের অসদ্ব্যবহার করে তাহা কে বলিবে! হায় সম্মুখে বিমল স্রোতস্বিনী থাকিতে বারি প্রত্যাশায় মানব কেন যে সাহারায় ধাবিত হয় তাহাই বা কে জানে! প্রভু তুমি যে দয়ার দেবতা, তুমি যে পাপীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম ভিক্ষা করিয়াছিলে! এই সকল জীবকে কৃপা করিয়া স্বীয় চরণে আকর্ষণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের দুইটি তত্ত্ব আছে প্রথমতঃ বাসুদেবতত্ত্ব (ঐশ্বর্য্যভাব) দ্বিতীয়তঃ রসরাজতত্ত্ব (ব্রজের মাধুর্য্য যুক্ত) রসরাজ তত্ত্বের উপাসক বৈষ্ণব, মহাপ্রভু জীবকে এই উপাসনাই প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম নিষ্কাম। সর্ব্ব-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মাত্র তচ্চরণ প্রয়াসী হইয়া ভক্তিদেবীর সাহায্য গ্রহণান্তর ইহার অনুশীলন করিতে হয়। এখন দেখা যাউক ভক্তি লাভ হয় কিরূপে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
সাধু সঙ্গে তরে কৃষ্ণে রতি উপজয়।" চৈঃ চঃ

অতএব সাধুসঙ্গই ভক্তি লাভের মূল বুঝিতে হইবে। অতএব ভব-নিপীড়িত ব্যক্তিগণের ভক্তি লাভের জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত আবশ্যক।

সাধকের প্রথমাবস্থার ভক্তি মুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি কামনারূপ উপশাখা উদ্যাত হইয়া ভক্তিলতাকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করে এবং তাহার সংঘর্ষণে ভক্তিলতা বৃদ্ধির কিঞ্চিত অন্তরায় ঘটে।

"স্তব্ধ হ'য়ে মূল শাখা বাড়িতে না পায়।" চৈঃ চঃ

সেই সময় ধীরচিত্তে শ্রীভগবানে আত্ম নির্ভর করিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, গুরুপদে আত্ম নিবেদন প্রভৃতিরূপ খড়্গাঘাতে সেই উপশাখা সকল ছেদন করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া ভক্তি-লতা বৃদ্ধি পাইয়া প্রেমোৎপত্তি হইয়া গোলকধামে গমন করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে স্থান লাভ করে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতাবীজ।
মালীহঞা করে সেই বীজ আরোপন।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদী পর ব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল।" চৈঃ চঃ

ইহাই কৃষ্ণ প্রেমের ফল। দারিদ্র্য নাশ বা সংসারে স্বীয় ঈপ্সিত বস্তু লাভ প্রেমের ফল নহে। যথা—

প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভব নাশ পায়।
দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়। চৈঃ চঃ

আবার— "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়,
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।"

অর্থাৎ সাধন দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহা অনিত্য কিন্তু ইহা নিত্য সিদ্ধ। শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইয়া মায়ামেঘ মুক্ত হইলে তখনই কৃষ্ণ-প্রেমরূপ সূর্য্য উদিত হইয়া থাকে।

সাধনতত্ত্ব কি, এবং সাধ্য বস্তু কিরূপে লাভ হইয়া থাকে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য দ্বারা তাহা দেখান গেল। কিন্তু একটী কথা এই যে দীক্ষা ব্যতীত ভগবচ্চরণ লাভ হইতে পারে না। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুসেবন। চৈঃ চঃ

দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে একজন গুরুর আবশ্যক হইয়া থাকে কারণ গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। শ্রীনাম গুরুকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করা মহা পাতকের কার্য্য, গুরু যাহাই বলুন অবিচার্য্য চিত্তে তাহাই পালন করা ও "গুরু যাহা বলিবেন তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই" এরূপ বিশ্বাস রাখা একান্ত আবশ্যক। এমতে অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে কেন? অথচ গুরুভক্তি ব্যতীত ও জীবনের উদ্দেশ্য পালন হইবে না, অধিকন্তু পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত হইয়া মলিনাত্মা আরও মলিনতা প্রাপ্ত হইবে মাত্র। কিন্তু প্রবাদ আছে "কুল-গুরু ত্যাগ করিতে নাই" অথচ অনেক স্থলে দেখা যায় কুলগুরু দীক্ষা দানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ধর্ম্মরাজ্যের পথ আদৌ তাঁহার পরিজ্ঞাত নহে। তবে তিনি কিরূপে গুরু হইবেন? অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে?

শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে। চৈঃ চঃ

অর্থাৎ জীবকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহ রূপান্তর করিয়া অর্থাৎ ভক্তভাবে আবির্ভাব হইয়া থাকেন। সুতরাং যিনি ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ এরূপ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন—'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব পরিজ্ঞাত তিনিই গুরু হইবার উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণ জীব প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া পাছে ভ্রমে পতিত হয়েন সেই জন্য পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ সে শ্রেণীর ব্যক্তি নির্ব্বাচনের জন্য বলিতেছেন—

'যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ চৈঃ চঃ

অতএব কুলগুরু পরিত্যাগ করিতে নাই, ইহা কেবল কুলগুরুদিগের শাসন বাক্য মাত্র।

মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে তুলসী ও উর্দ্ধ পৌণ্ড্র অর্থাৎ মালা তিলক ধারণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু অধুনা অনেকেই তাহা বাহ্যাড়ম্বর বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন। ইহা কখনই সঙ্গত নহে, যদি তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মই গ্রহণ করিলাম তবে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা কোন মতেই বিধি নহে। আমাদের সাধ্বী হিন্দুমহিলাদিগের মধ্যে লৌহ ও সিন্দূর ব্যবহারের যে প্রথা আছে তাহাও ত বাহ্য, তাই বলিয়া রমণীগণ কি তাহা ত্যাগ করিবেন? আদালতের চাপরাশীদিগকে যে চাপরাশ ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় তাহা বাহ্য বলিয়া তাহারা কি তাহা উপেক্ষা করিতে পারে? বৈষ্ণব জগতে যে মালা তিলক প্রথা প্রচলিত, উহা গোলক রাজ্যের দাসত্ব চিহ্ন, প্রভু উহা ব্যবহারের জন্য আদেশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার দাসদাসীদিগকে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, তজ্জন্য বাহ্য অভ্যন্তর বিচারের প্রয়োজন কি? আর তাহা ধারণের জন্য লজ্জাই বা কি? চাপরাশীগণ কি চাপরাশ ব্যবহারে লজ্জিত হয়? শ্রীভগবানের দাসত্ব স্বীকার করিয়াও যিনি তদ্দত্ত দাসত্ব চিহ্ন ধারণ করিতে অসম্মত, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে অনেক দূরে প'ড়িয়া আছেন—তিনি নিতান্ত অজ্ঞ ঘোর পাষণ্ড। মহাপ্রভুর আদেশ জীবমাত্রেরই অবিচার্য্যচিত্তে পালন করা কর্ত্তব্য কেন না দুর্ব্বলজীবের অন্য গতি নাই।

এ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কেবল শ্রীকৃষ্ণ মানিলাম, শ্রীরাধা মানিলাম, তাঁহার অষ্টসখী মানিলাম, তাহা হইলেই বৈষ্ণব হইলাম এরূপ নহে, সেই সঙ্গে আর একজন আসিয়া আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া লয়েন। তিনি অন্য কেহ নহেন দীনের ঠাকুর ডোরকপিনধারী নদীয়ার গৌরহরি। শ্রীগৌরাঙ্গ না মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যাইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বে প্রবেশ না করিলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ কি বস্তু জীবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বিশ্লেষণ ভিন্ন যেমন আমরা মনুষ্যদেহের কিছুই জানিতে পারি না, সেইরূপ মহাপ্রভু ভিন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যে

আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি। আপনি আপনার প্রেমরস আস্বাদন করিয়া জীবকে প্রেম শিক্ষা দিতেছেন। রাধাকৃষ্ণ উপাসক ভগবৎ প্রেমের উপাসক। শ্রীভগবান নিজে সে প্রেম আস্বাদন করিয়া জীবের সম্মুখে না ধরিলে, জীব কিরূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত?

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম কি বস্তু তাহার স্বরূপ, প্রবাহ, বেগবত্তা, স্থায়ীত্ব ও মানব-মনের উপর কিরূপ আধিপত্য করে ইত্যাদি অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ মহাপ্রভুর লীলা-চরিত্রেই পাওয়া যায়। যে ভগবৎ প্রেম জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ তিনি স্বয়ং তাহারই সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত। আপনি নিজে উপদেষ্টা, উপদেশ, উপদিষ্টবস্তু। যখন কেবল কৃষ্ণ পূজা ছিল, তখন জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত পরিচয় অতি অল্পই বুঝিত। তখন একটা দাস্যভাব মাত্র পোষণ করিত, ভাবরসের কেহ ধারও ধারিত না। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার প্রেমে আপনি মাতিয়া, আপনার রস আপনি ঢালিয়া খাইয়া বিলাইয়া জগতে এক নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছেন। এমন গৌরাঙ্গ না বুঝিলে আমরা রাধাকৃষ্ণ কি বুঝিব? যখন রাধাকৃষ্ণের একীভূত সত্বাই শ্রীগৌরাঙ্গ, তখন গৌরাঙ্গ না মানিলে কখনই বৈষ্ণব হইতে পারা যাইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গ না বুঝিলে রাধাকৃষ্ণের কোন পরিচয়ই পাইবার সম্ভব নাই। গোটাকত লৌকিক ও বাহ্য পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র, স্বরূপগত কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে সংক্ষেপে যে সকল উপদেশ পাঠিকা-ভগিনীদিগকে উপহার দেওয়া গেল ভগিনীগণ তাহা গ্রহণ করিলে আপনাকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করিব। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীমতী—মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মসাধনে অধিকারি-ভেদ।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছেন, তন্মধ্যে হিন্দু ব্যতীত কোন সম্প্রদায় স্পষ্টবাক্যে ধর্ম্মের সাধন-প্রণালীতে অধিকারি-ভেদ স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে যখন পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা চরমে পরম শান্তি লাভ বা স্বর্গভোগাদি ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য তখন বালক ও বৃদ্ধ, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ, স্থিরমতি ও চঞ্চলচিত্ত, সকলের পক্ষে একই উপাসনা প্রণালী এবং একই প্রকার আচরণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই প্রতীতি হইতে পারে যে তাহা সম্ভব পর নহে। একই গম্যস্থানে যাইতে হইলে যাত্রীদিগের শক্তি, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও রুচি প্রভৃতির ইতরবিশেষ অনুসারে পথ সরল বা বক্র, সুগম বা দুর্গম হওয়া অনুচিত নহে। সবল, দৃঢ়কায়, ক্লেশসহিষ্ণু পুরুষ, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই কোন গম্য স্থানে যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল ও কোমলাঙ্গ ব্যক্তি সেই স্থানে যাইতে দীর্ঘতর হইলেও সুগম ও সমতল পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতে পারে।

ভগবদ্গীতার যে সকল উপদেশ শুনিয়া অর্জ্জুন হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া বলিয়াছিলেন "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে" অর্থাৎ তুমি সন্দেহোৎপাদক বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। তাদৃশ উপদেশ কি অরণ্যবাসী অসভ্য অথবা অবোধ বালকের বোধগম্য হইতে পারে। যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ মানবমণ্ডলীর বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ উপযুক্ত হইতে পারে। কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান বোধ হয় ভগবদর্জ্জুন সংবাদেই প্রথম জগতে স্পষ্ট ও বিশদরূপে প্রচারিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, জ্ঞানানুশীলন দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই ও কথঞ্চিৎ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হয় নাই, তাঁহাদিগের নিকট সূক্ষ্মতত্ত্ব ও নিষ্কাম ধর্ম্মসাধনের উপদেশ দিলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই বরং কিছু কুফল হইলেও হইতে পারে।

অজ্ঞ, কর্ম্মাসক্ত, ভোগাভিলাষীদিগের পক্ষে সকাম ধর্ম্মসাধনই উপযোগী। তাহারা "ধনং দেহি যশো দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি", বলিয়া

আরাধনা কালে ঐহিক সুখসৌভাগ্য চাহিবে, অথবা নন্দনকাননে বাস, অপ্সরাগণের নৃত্য দর্শন, কিন্নরগণের সঙ্গীত শ্রবণ ইত্যাদি প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের কামনা করিবে। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের মনে তৃপ্তিবোধ হইতে পারে না। দুগ্ধপোষ্য শিশু যেমন যুবকের উপযুক্ত আহার গ্রহণ করিলে পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না এবং তদ্দ্বারা তাহার দেহের কোন প্রকার পুষ্টিবর্দ্ধনও হয় না, সেইরূপ অজ্ঞ ও ভোগাভিলাষী নিকৃষ্ট অধিকারীর সম্বন্ধে উচ্চতর সাধন প্রণালী উপযোগী হইতে পারে না। যদি বল, তাহারা কি অনন্তকাল ঘানিগাছের চ'ক ঢাকা বলদের ন্যায় যাওয়া আসাই করিবে, সদ্গতির কি কোন উপায় হইবে না? অবশ্য হইবে। ভোগবাসনা চরিতার্থ হইলে অথবা ঐ প্রকারে সকাম কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে কিয়ৎ পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি হইলে, সৌভাগ্যক্রমে নিষ্কাম সাধনে প্রবৃত্তি হইতে পারে। এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য নিম্নে লিখিতেছি। 'মনুষ্য ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য, পুত্রকন্যাদি লাভ করিবার মানসে ও গৃহস্থালি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করে। যখন অত্যন্ত স্থবির দশায় উপস্থিত হয়, তখন আর পতিপত্নীর পরস্পর দ্বারা ঐ সকল কামনা পূরণের আশা ও সম্ভাবনা না থাকিলেও দীর্ঘকাল সাহচর্য্য বশতঃ সেই প্রগাঢ় প্রণয় স্থিরভাবে থাকে। তখন সেই প্রীতি নিষ্কামভাব ধারণ করে। সেই প্রকার অনেক কাল ব্যাপিয়া সকাম দেব পূজাদি করিয়া অভিলাষ পূর্ণ হইলে অথবা অন্য কারণে ভোগে বিরাগ জন্মিলে দেবতার প্রতি ভক্তি নিষ্কাম ভাব ধারণ করিতে পারে।'

জ্ঞান বা ধর্ম্মানুশীলনের ন্যূনাতিরেক বশতঃ যেমন ধর্ম্মসাধনে উত্তম, মধ্যম বা অধম অধিকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যগণের প্রকৃতির ভিন্নতা হেতুও ধর্ম্মসাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি সত্ত্বগুণ প্রধান এবং স্বভাবতঃ গূঢ়ানুসন্ধানে রত, তাদৃশ ব্যক্তিরা প্রায় যোগমার্গ মনোনীত করেন। তাঁহারা স্থির আসনে আসীন ও নাসাগ্রদৃষ্টি হইয়া হৃদয় পুণ্ডরীকে পরমাত্মার অনুসন্ধান করিয়া দিনের পর দিন, মাসের মাস, বৎসরের বৎসর অতিবাহন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অনুসন্ধিৎসা অতি প্রবল।

অন্য এক শ্রেণীর সাত্ত্বিক লোকের প্রকৃতিতে আনন্দের ভাব প্রবল। তাঁহারা আনন্দময়, ভগবানের বিষয় চিন্তা করিয়া একান্ত বিভোর ও বিহ্বল প্রায় হইয়া পড়েন। তাঁহারা কখন নাচিতেছেন, কখন গাইতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন ক্ষিপ্তের ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন, এইরূপ আনন্দে কাল অতিবাহন করেন। তাঁহাদিগের মনে ভগবান দুর্লভ বা দুর্গম বস্তু নহেন কিন্তু একান্ত অনুরাগ ও ভক্তি দ্বারা অনায়াস লভ্য এবং আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান হন।

অপর কোন সম্প্রদায় গুরুর নিকট হইতে উপনিষদাদি শাস্ত্র শ্রবণ ও তৎপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তনে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহারা মনে করেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বপ্নকল্পিতবৎ অলীক, কেবল ব্রহ্মই সত্য আর সমস্তই মিথ্যা। পৃথক চেতন বা জড় বস্তু কিছুই নাই, সকলই ব্রহ্ম। সর্ব্ব-প্রকার গুণ বর্জ্জিত পরব্রহ্মের সত্তাজ্ঞানই ইঁহাদিগের উপাসনা ও সাধনা।

আর এক প্রকার প্রকৃতির লোক সর্ব্ববিধ স্বার্থ ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই প্রধান সাধন মনে করেন। স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বভূতের হিতসাধন হইলেই বিশ্বরূপ ভগবান্ প্রীত হন এবং তাহাতেই জীবের সকল পুরুষার্থ লাভ হয়, এই তাঁহাদের বিশ্বাস।

পরন্তু যাঁহারা ধর্ম্মসাধনের উচ্চসোপানে আরোহন করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের অন্তরে যোগীর একাগ্রতা, ভক্তের প্রগাঢ় প্রীতি, জ্ঞানীর তত্ত্বানুসন্ধান ও তন্ময়ভাব এবং কর্ম্ম-যোগীর নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধন, এই সমস্ত গুণের সমাবেশ দেখা যায়, তাঁহারাই উত্তম অধিকারী এবং উন্নত সাধক।

উপরে যে সকল সাধন-পদ্ধতির বিষয় উল্লিখিত হইল সে সমস্তই সত্ত্বগুণ-প্রধান লোকদিগের অবলম্বনীয়। রজোগুণ-প্রধান ও তমোগুণ-প্রধান মনুষ্য-গণও আপন আপন প্রকৃতির অনুরূপ ধর্ম্মসাধন প্রণালী আশ্রয় করিয়া থাকেন। কেহ বাদ্যভাণ্ড ও মহান্ আড়ম্বর সহকারে পূজাদি সম্পাদন করেন, কেহ বা আপন প্রিয় মৎস্য, মাংস ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য-যোগে ইষ্ট-দেবতার আরাধনা করেন। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণও প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে যদি ঐ প্রকার সুপ্রণালী-বদ্ধ সাধন ব্যবস্থা না থাকিত, মনুষ্যগণ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে বিকটাকার এক প্রকার প্রণালী সৃষ্টি করিয়া লইত।

এ স্থলে একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে শাস্ত্রকার ঋষিগণ কিরূপে মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতির ব্যবহার ও জীব-হিংসা ধর্ম্মাঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিলেন? তাঁহাদিগের গূঢ় অভিপ্রায় অতি উৎকৃষ্ট, তাহা কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইতে পারে। যে সকল লোকের মদ্য মাংস প্রভৃতির প্রতি প্রবল ইচ্ছা, তাহাদিগকে তৎ-সমুদয়ের ব্যবহার করিতে একেবারে বারণ করিলে কোন ফল হওয়া সম্ভবপর নহে, একারণে ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে যজ্ঞবিশেষ বা দেবপূজা বিশেষের অনুষ্ঠান না করিয়া বৃথা মাংস ভোজন ও অশাস্ত্রবিহিতরূপে মদ্য পান করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে মদ্য মাংসের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। অনেক অর্থব্যয় ও অনেক দ্রব্যের আয়োজন করিতে না পারিলে সেই সকল পূজাদি সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইবে, সুতরাং অভিমত মদ্য মাংসাদির ভোগেচ্ছারও খর্ব্ব করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে "ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহা ফলা" এই ঋষি বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রবৃত্তিমার্গ পরিহার পূর্ব্বক নির্ম্মলতর সাধন-পন্থা আশ্রয় করিতে থাকিবে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যত অবান্তর ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই আপনাদিগের অবলম্বিত সাধন-পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। শাস্ত্রকারগণও তত্তৎ-প্রণালীর বর্ণন করিবার সময় কোনটীকে অনুত্তম বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত; কারণ আপন অবলম্বিত পন্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস না হইলে, আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে সাধন হইতে পারে না। কিন্তু এক দল যে অন্য দলকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ করেন, ইহা সর্ব্বথা অনুচিত।

যদি খৃষ্টানগণ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নরকের যাত্রী মনে করেন; কিংবা মুসলমানগণ হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতিকে অনন্তকাল নরকবাসের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন; তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐরূপ উক্তি আছে এবং তাহাতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস থাকাও অনুচিত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ স্বসম্প্রদায়ের বহির্ভূত অপর হিন্দুদিগকে একেবারে নরকের যাত্রী মনে না করুন, পরস্পরের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি কোন বিখ্যাত পণ্ডিত এক সভা-

স্থলে বক্তৃতা করিতে করিতে সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী লোকদিগকে ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক থাকিতে পারে, অনেক ভ্রষ্টাচারও থাকিতে পারে, কিন্তু আবার তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক অতি উন্নত সাধকও আছেন, তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রীতি ও নির্ম্মল ধর্ম্মভাব অতি উচ্চ। অল্পব্যয়ে পূজা করিয়া অধিক ধনের প্রার্থনা বা কিঞ্চিৎ তপঃ-ক্লেশ সহ্য করিয়া সুদীর্ঘকাল স্বর্গসুখ ভোগের ইচ্ছাকেই কেবল তাঁহারা কৈতব অর্থাৎ কপটতা বলিয়া মনে করেন, এমন নহে, মোক্ষের অভিলাষকেও প্রধান কৈতব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা আনন্দময়, সৌন্দর্য্যসাগর ভগবানের প্রতি প্রীতি করিয়া কোন ফল চান না। তাঁহাদিগের সেই অকৈতব প্রেম ভক্তির ভাব অতি উদার ও অতি মহান্। পক্ষান্তরে কোন কোন সুবুদ্ধি সুশিক্ষিত কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট যোগী ও জ্ঞানীর কথা উপস্থিত হইলে এমন ভাব প্রকাশ করেন, যেন ঐ সকল সাধক কেবল পণ্ডশ্রম করিতেছেন। এ প্রকার ভাব দোষাবহ। উপনিষৎ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে যে যোগ ও জ্ঞানমার্গের ভূরি ভূরি প্রশংসা আছে। সকল শাস্ত্রকার যাহাকে অত্যুৎকৃষ্ট সাধন-প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে তুচ্ছ করিলে আপনাকেই অবজ্ঞাস্পদ করা হয়।

ধর্ম্মসাধনের অপক্ক-দশাতেই ঐ প্রকার বিড়ম্বনা হইয়া থাকে। যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত যিনি যে প্রণালী অবলম্বন করুন, সিদ্ধ অবস্থায় তাঁহাদিগের কোন প্রকার ভেদ থাকে না, তখন সকলেই এক ভাবাপন্ন হন। ভক্তদিগের শিরোমণি প্রহ্লাদ কৃত স্তব পাঠ করিলে এ বিষয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। সেই অপূর্ব্ব স্তব হইতে এখানে কেবল কয়টীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতুমমাব্যয়ঃ॥

যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ং।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্ব সংশ্রয়ঃ॥

সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়োনিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥”

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১৯ অধ্যায়।

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য—যাঁহা হইতে জগৎ অভিন্ন সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি জগতের আদি কারণ, অব্যয় এবং একমাত্র ধ্যেয়। বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় যিনি এই অক্ষয় বিশ্বে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, সেই সর্ব্বাধার হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত, যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন, যিনিই এই বিশ্ব সেই সর্ব্বাশ্রয় বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। অনন্তের সর্ব্বগত্ব হেতু আমিই সেই বিষ্ণু, আমা হইতেই সকল হইয়াছে, আমিই এই বিশ্ব এবং সনাতন স্বরূপ, আমাতেই বিশ্ব অবস্থিত, আমিই পরমাত্মা, অক্ষয় ও নিত্য, আমি অগ্রে ব্রহ্মসংজ্ঞক ছিলাম এবং অন্তে পরম পুরুষ আমিই থাকিব।

দেখুন ভগবানের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত প্রহ্লাদ ও অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীর কোন ভেদ নাই। আবার তাঁহার বর প্রার্থনা শুনুন।

“নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

হে নাথ, হে অচ্যুত! আমি যদি সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করি, সেই সমস্ত জন্মে তোমাতে যেন সর্ব্বদা অবিচলিত ভক্তি থাকে। বিষয়াসক্ত বিবেকহীন লোকদিগের যেমন ভাগ্যবিষয়ে প্রীতি থাকে, আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতি প্রীতি যেন সেইরূপ অচলা হইয়া থাকে। ভক্তকুলতিলক প্রহ্লাদ স্বর্গভোগ, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠবাস বা মুক্তি চাহিলেন না, কেবল অচলা প্রীতি, অক্ষয় ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। কি অপূর্ব্ব, মনোহর ও মধুর হৃদয়ের ভাব!!

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারত-মহিলা সম্বন্ধে বিলাতী মহিলার মত।

'নিজগুণগরিমা সুখাকরোস্যাৎ পরমুখশ্রবণেন' একথা পাকা কথা তার আর ভুল নাই, তবে কিনা, পুত্র ছাত্র প্রভৃতির কাছে নিজের গৌরব বুঝাইয়া দেওয়াও সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়। সকল শিক্ষার মধ্যে আত্ম-গৌরব শিক্ষা, একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা। গুরুজনের আত্মগৌরব জ্ঞান, না বুঝিলে, পুত্রের বা ছাত্রের আত্মগৌরব শিক্ষা হয় না। এখনকার দিনে, আমাদিগের মধ্যে আত্মগৌরব জ্ঞান বড় কম। একটা মিছা বড়াই আছে প্রকৃত আত্মগৌরব বোধ নাই বলিলেই হয়। অতি শৈশব হইতে ছেলে মেয়েরা শেখে, যে, আমাদের ভাল বলিবার কিছুই নাই; যাহা কিছু আছে সমস্তই প্রায় মন্দ। এই বিষম শিক্ষার নিয়তই বিষময় ফল ফলিতেছে।

তবে আজিকালি একটু সুবাতাস এই পাওয়া যায়, যে মাক্ষমূলর বা মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌, অলকট্‌ বা বেসান্ত এইরূপ কোন বিদেশীয় আমাদের কোন বিষয়ের সুখ্যাতি করিলে, আমাদের তখন যেন চমক হয়; ভাবি, তাইত আমাদের অনেক ভাল জিনিষ আছে বৈকি ?

সম্প্রতি একজন বিলাতী বিবি আমাদের ভারত-মহিলা সম্বন্ধে, আমাদের বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে এবং আমাদের ছোট বড় সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিত্যাচারে সরল ব্যবহার সম্বন্ধে বিলাতী কোন সাময়িক পত্রে সুখ্যাতি প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার কথাগুলি শুনিলে, কাহারও না কাহারও আত্ম-গৌরব বৃদ্ধি পাইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, আমরা দুই চারিটি কথার ভাবানুবাদ করিয়া দিলাম।

লেখিকার নাম বিবি ষ্টীল্‌। তিনি পঞ্জাবের বালিকা-বিদ্যালয় সকলের একজন তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন, এবং ভারতবর্ষে ২৫ বৎসর বাস করেন। গত জুলাই মাসের হিউমানিটেরিয়ান নামক পত্রে, তাঁহার কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, কি ছোট, কি বড়, সকল ভারতবাসীরই আচার অতি সরল ও সামান্য। ইংরাজি শিক্ষায় এইটি নষ্ট হইতেছে। তাঁহার কথা গুলি এইরূপ—"তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে যে সভ্যতা বিরাজ করিতেছে, তাহাতে কারয়া লোকে বেশ সুখে ও শান্তিতে আছে। ভারত-বাসীরা কোনও বিষয়ে বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না। আমাদের সভ্যতার

আদর্শ—শারীরিক সচ্ছন্দতা বা বিলাসিতা। ভারতে এরূপ বিলাসিতার নাম গন্ধও নাই। ধনী বা দরিদ্রের আহারব্যবহারের ধরণধারণ প্রভৃতির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। রাজপ্রাসাদে যাও বা দরিদ্রের কুটীরে যাও—দেখিবে সেই অনাবৃত মেজে। আর একই রকমের ভোজনপাত্র উভয় স্থানেই ব্যবহৃত হইতেছে। এমনকি স্নানের জন্য টব বা টোয়ালে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় না। ধনী তাঁহার দরিদ্র ভ্রাতার ন্যায় উন্মুক্ত বায়ুতে নদীগর্ভে স্নান করেন ও রৌদ্রে আর্দ্র মস্তক বিশুষ্ক কবেন। রত্নগর্ভা ভারতের অধিবাসীগণ এইরূপ আড়ম্বর বিহীন জীবন যাপন করে। তাহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহিলাদের জন্য বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও রত্নালঙ্কার ক্রয় করিবে তথাচ স্বীয় আমোদ বা আরামের জন্য কপর্দ্দকও ব্যয় করিবে না। এই প্রাচীন সভ্যতা তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে এইরূপ সরলতাপূর্ণ জীবনযাত্রার পথ দেখাইয়াছে, আমাদের সভ্যতা কিন্তু পঞ্চাশৎবর্ষের মধ্যে সেই সকলের বিলোপ সাধন করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে।”

বিবি ষ্টীল আরও বলেন, যে হিন্দু-বিবাহ বড় শুভফলপ্রদ। তাঁহার কথা গুলির ভাব এইরূপ—“আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে ভারতে বিবাহের পরিণাম সচরাচর বড় সুখের হইয়া থাকে। ভারতে, স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের অপেক্ষা হিন্দুদের বিবাহের আদর্শ উচ্চ। হিন্দু নিজের সচ্ছন্দতার জন্য বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না, কেবল সন্তান লাভের জন্যই বিবাহ করে কারণ তাহাদের ধারণা, সন্তান অমরত্ব লাভের প্রকৃষ্ট সোপান।”

বিবি ষ্টীলের আর একটি কথা তুলিয়া আমরা শেষ কবিলাম। তিনি বলেন, গরীব-দুঃখী মেয়েদের লেখা পড়া শেখাইয়া, তাহাদের জীবনের সুখ-সচ্ছন্দতা নষ্ট করা হইতেছে, প্রকারান্তরে তাহাদের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে।

“ভারতে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। আমাকে বলিতেই হইবে যে বর্ত্তমান অবস্থাতে এই শিক্ষা বিস্তার তাহাদের পক্ষে শুভফলদায়ক হইতেছে না কারণ যে সকল অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত ইহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাদেব সহিত ইহাদের মনের বা মতের মিল হয় না। আমরা যে সকল নিম্নশ্রেণীর বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছি তাহাদের শিক্ষিত লোকের সহিত বিবাহ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নাই। আমি

বালিকাবিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়িকা থাকায় স্বয়ং অনেকস্থলে দেখিয়াছি যে শিক্ষাই অনেক বালিকার দুঃখের কারণ হইয়াছে।”

অদ্য এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। বালিকাবিদ্যালয়ের বিলাতী তত্ত্বাবধায়িকা, নিজে দেখে শুনে যাহা বুঝিয়াছেন, আমরাও নিত্যই আমাদের নগরপল্লীতে তাহাই দেখিতেছি, তবু যে আমাদের চেতনা হয় না ইহাই আশ্চর্য্য।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সমালোচনা।

পদ্যগ্রন্থ।

মর্ম্মগাথা—রমণীর হৃদয় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য। কবিতা রচনা তাঁহাদের স্বাভাবিক। অথচ এ পর্য্যন্ত সুসভ্য দেশেও পুরুষ কবির কাব্য অধিক সমাদৃত। শিল্পে প্রকৃতিকে সুন্দর করে। শিল্পীর শিক্ষার ও সাধনার আবশুক। এই শিক্ষা ও সাধনার অভাবে রমণীগণ কবিতা-কাননে আপনাদের প্রকৃত অধিকার এখনও অধিকৃত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা অতি অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পুরুষেরা পুস্তক লিখিয়া কোন রমণীর নামে প্রকাশ করিতেন। এখন আর সেদিন নাই। ইতিমধ্যে আমরা কামিনীকুমারী, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী ও প্রসন্নময়ীর মত সুলেখিকা লাভ করিয়াছি। কুমারী তরুদত্ত বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে কবি-সমাজে অতি উচ্চ আসন সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কামিনী ও মানকুমারীর গ্রন্থগুলি অদ্যাপি বৈঠকখানা সাজাইবার, দুই ঘণ্টা উপভোগ করিবার, চায়ের নেশা একটু বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিক্ষাচারীর পুস্তকশালায় এখনও তাহাদের স্থান হয় নাই।

কঠোর গদ্য কাব্যে এখনও কোন বঙ্গমহিলা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর নভেলগুলি ও ভারতীর প্রবন্ধ সকল উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে, রাজনীতি ও সমাজ-নীতির ক্ষেত্রে বঙ্গ-মহিলাকে মল্লবেশে শীঘ্র দেখিতে পাইব আমরা

আশাও করি না অভিলাষও করি না। সুকুমার সাহিত্যের চিত্রপটে কোমল তুলিকায় তাঁহাদের কারুপণা দেখিলেই আমরা পরিতৃপ্ত হইব। কিন্তু এখনও অলিফাণ্ট ও লিন লিণ্টনের মত সুলেখিকা পাইতে অনেক বিলম্ব আছে।

কবিতা-কাননে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা নূতন সমাগতা। সরলা বালিকার ন্যায়, নূতন সমাগতার ন্যায়, এখনও তিনি ধীরে ধীরে এক একটী পল্লব অবনত করিয়া ধীরে ধীরে এক একটী কুসুমের সুবাস সংগ্রহ করিতেছেন, নোলকের মত শিশিরের ফোটা কনক-কিরণে সুরাগে রঞ্জিত দেখিতেছেন, দধেলের প্রভাতী সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিত—কিন্তু লজ্জাসরমে এখনও চোখ দুটী আকর্ণ চাহিতে পারিতেছেন না, কাণের উপরের কাপড়খানি এখনও খুলে নাই। যে রাগে কপোলদেশ আরক্তিম, সখীর নিকট সে কথা এখনও ফুটিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্ব রাগ এখনও অভিসারে পরিণত হয় নাই। কামিনী ও প্রসন্নের কবিতায় একটু প্রৌঢ়তা, একটু মুখরতা, একটু রণরঙ্গতা প্রকাশ পায়। সে সাহস, সে মুগ্ধতা নগেন্দ্রবালার কবিতায় এখনও দেখা যায় না। কবিগৃহে নগেন্দ্র এখনও নব বধূ—লজ্জায় ভরা, আকণ্ঠ ঘোমটা দিয়া চাক্কি গাছা মলপায়ে ঝুনুর ঝুনুর করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছেন—ঘোমটার ভিতরেই অতি সাবধানে এক একবার এদিক ওদিক চাহিয়া লইতেছেন। প্রভাতের শিশিরসিক্ত সমীরণে কাঞ্চন-জ্যোতির তরুণ শোভা অতি মনোহর, মধ্যাহ্ন আকাশের প্রখর কিরণের নান্দিনী।

বস্তুতঃ নগেন্দ্রের শান্তশীলতায় কোমলতায় ও সরলতায় বৃদ্ধ চক্ষের তীব্রতা সুভাবের কুয়াশায় ঢাকিয়া ফেলে। এ কবিতায় ব্রাণ্ডির মাদকতা নাই—চা কপের মধুরতা আছে।

একটী আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় যে যে মহিলা কবিতা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন সকলেরই রচনা দুঃখের মর্ম্মগাথা। বাসরের আনন্দ কোলাহল ও শ্মশানের হরিধ্বনি, অমানিশার তামসী আঁধার ও মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড জ্যোতি—চিত্রফলকে উভয়েই পরিহার্য্য। গোধূলীর কোমল ছায়ায় কবিতার অভ্যুদয়—চাঁদের কিরণে ও শান্ত সমীরণে তাহার শ্রীবৃদ্ধি এবং অমিয় ফলে তাহার পরাকাষ্ঠা; কিন্তু পুরুষ কাব্যে যে উজ্জ্বলতা, মহিলার কবিতায় তাহার অভাব। হেমচন্দ্রের কবিতায় ওজস্বিতা, চণ্ডতা ও রণ মত্ততার পরিচয়—ভানুসিংহের কণ্ঠে বৃন্দাবনের মুরলীধ্বনি শুনা যায়, নবীন

বড় সাধ হয় মনে হয়ে আমি অশ্রুজল
সখা সম ব্যথিতের সাথে রব অবিরল।
বড় সাধ হয় মনে প্রণয় হইয়া আমি
পুরাব তাহার আশা যে জন হতাশ প্রেমী।

এ কুসুমকোমল হৃদয় খানিও সংসারের দাবানলে ঝলসিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যে কত যাতনা বীণার তুতিনটী ঝঙ্কারে উথলিয়া পড়িয়াছে।

আমি যে কি তোরা ভাই কেমনে জানিবি তাহা
ভাষায় পাই না খুঁজি আমি ভাই হই যাহা।
আমি নহি বসন্তের মলয়, জুড়ান প্রাণ,
মধুর বাঁশরী-রব রাগিণী পূরবী তান।
আমি নহি ভ্রমরের মধুর গুঞ্জিত স্বর,
নহিরে ফুলের হাসি পূর্ণিমার শশধর।
নহিরে চপলা আমি অট্টহাসি চপলার,
নহি আমি মেঘমালা চাতকিনী বরিষার।
নহি আমি লতাপাতা নহি আমি তৃণকণা,
এ ধরায় আমি যে রে অভাগিনী অতুলনা।
কি শুনিবি মোর কথা শুনি কি পাইবি সুখ?
কি বলিব কত তাপে ভরা যে এ পোড়া বুক।
তৃণকণা মোর চেয়ে ভাল যে রে শতবার,
এ জগতে আছে ভাই দাঁড়াবার ঠাই তার
মোর তরে বিন্দু ঠাই মিলে না এ ধরা দেশে
কালের অনন্ত স্রোতে কেবল যেতেছি ভেসে।
আমি যে কি তাহা তোরে কেমনে বুঝাব ভাই,
আমি যে কি আমি তাহা ভাবিয়া নাহিক পাই।
তবে এই মাত্র বুঝি এই মাত্র জানি ভাই,
আমি জগতের হেয় শুধু অপদার্থ ছাই।

এখন আলো ও ছায়া প্রণেত্রীর কয়েকটী বিষাদময় সঙ্গীত শ্রবণ করুন।

সকলি আমার মানসের ভ্রম?
বিষাদ বিকল আঁখির ভুল?

চন্দ্রের বৈঠকখানায় মদের প্লাস ও বারবিলাসিনীর কুৎসিৎ আবৃতি যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু কবিতার কোমল আবছায়া তাহাদের কাহারও নাই। বঙ্গমহিলাকবির কাব্য নাচে না। আনন্দের অট্টহাস্য তাহাতে নাই, একটা বিষাদের ছায়া সকলের মুখ ছায়াময় করিয়াছে, এক একটী নিশ্বাসে আমাদের অন্যমনস্ক করে, বাতাসে একটা হা হুতাসের আওয়াজ পাওয়া যায়।

মানকুমারীর কিসের "সাধ" একবার শুনুন।

মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।
ছুটো কথা না কহিতে, ছুটীবার না চাহিতে
অমনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।
শৈশবের সরলতা, যৌবনের মধুরতা
ছুদিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের।
সুখসাধ শান্তিগুলি, অকস্মাৎ পড়ে খুলি
নিভে যায় আশাবাতি চির আদরের।
বুকচেরা ধন নিয়া, পোড়ায় আগুণ দিয়া
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ-প্রণয়ের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।

কে জানে কি দিয়া প্রাণ গড়া মানবের।
জরা মৃত্যু স্বার্থ ভরা, শোকতাপে বেচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।
এবার তো কর্ম্মভোগ ভুগিলাম ঢের।
কালের তরঙ্গে ভাসি, ফিরে যদি ভবে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।

নগেন্দ্রবালার সাধ অন্যরূপ, একজন দিয়া ঠকিয়াছে আর একজন এখন বিশ্বকে হৃদয়ে স্থান দিতে চায়—

বড় সাধ হয় মনে মানবের ব্যথা রাশি
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি লব আমি দিবা নিশি,

আমার নয়নে সবাই কাঁদিছে,
পৃথীর বাতাসে শোকের ধূল।
মেঘের চরণে কাতরে কাঁদিছে,
চাতক নিদাঘে পিপাসাকুল
প্রভাতে ফুটেছি শুকাব সন্ধ্যায়,
বলি নতশিরে কাঁদিছে ফুল,
কি জানি কি বলে তটিনী কাঁদিছে,
ধীরে নিশ্বসিছে বিটপিকুল
আমারি নয়নে বিষাদের ছায়া
আমারি পরাণে ভুল।

আদরে স্নেহের মালা পরালি যা[illegible]র গলে,
তারাই গো গেল চলে দলে মা[illegible]দতলে;
যাদের অমিয় ভাষ ভাবিলি জুড়[illegible]ব কাণ,
তাদেরি নিঠুর বাণী চুরে দিল তা[illegible] প্রাণ;
সম দুঃখে যাহাদের অশ্রুরাশি পাবি যবে
উত্তপ্ত এ মরুভূমি ভাবিলি শীতল হবে,
তারাই তারাই হায় তারাই গো গেল চলে
তোর সে স্নেহের মালা ধূলে ফেলে পায় দলে।

মধুপুরে গিরিতটে শীতল সমীরে চাঁদের আলোয় সাঁওতালের বাঁশরির করুণ বিলাপে হৃদয় উদাসে পূর্ণ করিয়াছে, সান্ধ্যগগনে নদীতটে কল্লোলিনীর কুল কুল বীচীরবে কোন অসীম সাগরের অপর পারে অজ্ঞাতে প্রাণটা ভাসিয়া গিয়াছে, বৃন্দাবনের বিপীনে শ্যাম-সোহাগিনীর বিরহ রাগিণী, গো-চারণে সখাহীন সুদামের মুরলীরব, বিষাদের আবেশে মন প্রাণ নিঝুম করে, কামিনী কুমারীর নীরব রোদনে পঞ্জরের অস্থি জরিয়া যায়।

কি গাব? নূতন গীতি জানি না তো আর
পুরাণ সে গীতে বহে বিষাদের ধার।
হেথা এত হাসি খেলা, হেথা আনন্দের মেলা,
হেথা কেন নামাইব বেদনার ভার?

হাসি ভরা মুখশশী, আমি দেখি দূরে বসি,
খেলুক স্বপন শত প্রাণে একবার;
সপ্তমে তুলিয়া তান, গাহ হরষের গান,
হয়ত বা শুষ্ক নদে ছুটিবে জোয়ার।

"শুষ্ক নদে জোয়ার" আর ছুটিবে না। আলো অতীত হইয়াছে, আঁধার সামনে করিয়া সাগরের ধারে দাঁড়াইয়া আছি, আমার বিষাদ-গরলে অন্যকে কেন গরলিত করিব, অন্যের হাসিভরা মুখশশী কেন মেঘে ছাইব? আনন্দের মেলায় কেন বিষাদের ভার নামাইব? তাই নির্জ্জনে একাকী দাঁড়াইয়া আছি, যে ওপারে আগে চলিয়া গিয়াছে, সে তরণীখানি ফিরাইয়া আনে কিনা। চোখে দৃষ্টি নাই, ক'ণে শ্রুতি নাই, জীবনে প্রাণতা নাই। এ শুষ্ক হৃদয়ে আর কি জোয়ার ছুটে? ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে, এখন কেবল চিতায় সঙ্গিণীর অভাব।

বস্তুতঃ উচ্চশ্রেণীর হলা কবিগণের বিষাদ নীলিমা একটী রহস্য। আমরা আর দুইটী মহিলা বির সাক্ষাৎ পাইয়াছি এবং মাইকেলের জীবন-চরিত লেখক সুবিখ্যাত যোগীন্দ্রনাথের নিকট একটী সুবাসিত কুসুম স্তবক উপহার পাইয়াছি। তাঁহাদের চিত্রপটে এ বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীর—দেবীর ভাব-বিকাশ ও শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর নীহার-মালা পড়িয়া আমরা সুখী হই নাই। যাহাই লিখা যায় তাহাই ছাপাইতে হয় না। অনেক গুলির পাণ্ডুলিপি জ্বালাইয়া ফেলিলে তবে একখানি ছাপাইবার মত পুস্তক বাহির হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সংস্কৃত মাসিক পত্র।

জুলাই মাসের বিদ্যোদয়ে আটটী সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যতীর্থ বিরচিত শিবাষ্টক। শ্লোকগুলির ছন্দঃ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত শিবাষ্টকাদির সদৃশ এবং রচনা সরল ও সুললিত। দ্বিতীয় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীপতি কবিরত্ন প্রণীত "মহাপুরুষ চরিত" নামক কাব্যের চতুর্থ সর্গের শেষ ১৮টি শ্লোক মাত্র। একখানি বিস্তৃত গ্রন্থের অষ্টাদশ শ্লোকমাত্র পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের কবিত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, তথাপি ইহাতে কবিরত্ন মহাশয়ের রচনাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তৃতীয় প্রবন্ধ শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ষষ্টিবর্ষব্যাপক রাজত্ব উপলক্ষে আনন্দোল্লাস-প্রকাশক কবিতানিচয়। ঐ শ্লোকগুলি কাব্যরঞ্জনোপ নামক গোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন। বোধ হইতেছে যে ঐ মহোৎসব উপলক্ষে ভাটপাড়ায় যে সভা হইয়াছিল তাহাতে ঐগুলি পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে কবিরঞ্জন মহাশয়ের সংস্কৃতে সম্যক ব্যুৎপত্তি ও রচনা-চাতুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীপতি কবিরত্ন ভিক্টোরিয়াষ্টক নামক সন্দর্ভে শ্রীমতী রাজ্যেশ্বরীর গুণানুবাদ ও মঙ্গলকামনা করিয়াছেন। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল হইয়াছে। শ্রীমতী মহারাণীর সংক্ষিপ্ত-চরিত ও ভূমিকম্প এই দুইটী গদ্যময় প্রবন্ধের রচনা নির্দ্দোষ। "পণ্ডিত-চরিত" নামক বাঙ্গালা প্রহসনের ধরণে লিখিত গদ্য পদ্যময় সন্দর্ভে গুণধর তর্কবাগীশ নামক ব্রাহ্মণের ভোজন-প্রিয়তা ও স্ত্রৈণতা ও তাঁহার পত্নীর উগ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা-প্রণালী নূতনবিধ, কোনস্থলে লুচি, কচুরি, গোল্লা, গজা, জিলিপী প্রভৃতি দেশজ ভাষা শব্দযোগে সংস্কৃত কবিতা রচিত হইয়াছে। একস্থলে "অযৌক্তিকা যা কিল শাস্ত্রনোদিতা" এইরূপ অশুদ্ধি আছে। বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ অযৌক্তিকীর পরিবর্ত্তে "অযৌক্তিকা" হইয়াছে। এই পত্রিকার অবশিষ্টাংশ ব্যাকরণ ও অভিধান সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থের অংশ বিশেষ।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্য।

ভারতীতে (জ্যৈষ্ঠের) নয়টি প্রবন্ধ আছে—দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'নক্ষত্রের ক্ষমতা'। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক 'ফলিত জ্যোতিষ' সমর্থিত হইয়াছে। 'বরুণ' শীর্ষক পঞ্চম প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হর্শেল গ্রহ সম্বন্ধে গণিত-জ্যোতিষের যে সকল তথ্য সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, একে বাঙ্গালি বিজ্ঞান পড়িতে নিতান্ত নারাজ, তাহার উপর লেখা বেশ বিশদ না হইলে, নিশ্চয়ই সে লেখার ত্রিসীমায় কেহ যাইবে না। বিজ্ঞানের ভাষা আরও কিছু দিন ধরিয়া, ব্যাখ্যার ভাষার মত খুব এলাল এলান, বুঝান-সুঝানর মত হওয়া আবশ্যক; জমাট-নিরেট ভাষায় বিজ্ঞান লেখা এখন চলিতেই পারে না। ৭ম প্রবন্ধ—'আনন্দময়ী'। আনন্দময়ী, বিক্রমপুর জপসার বৈদ্যজমীদার রামগতি রায়ের কন্যা। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান্ ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উত্তম জানিতেন। তাঁহার পিতা রামগতি রায় এবং খুল্লতাতদ্বয় রাজনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায় সকলেই গ্রন্থকার। আনন্দময়ীও উত্তম কবিতা লিখিতেন। তাঁহার রচিত 'বাসি-বিবাহ' বর্ণনা, এই ভারতীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতার ছন্দ বেশ, সংস্কৃত পদপূর্ণ, এবং বেশ জমাট গাঁথনী। জয়নারায়ণ কৃত 'হরিলীলা' গ্রন্থ হইতে দুইটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আনন্দময়ীর সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। শ্লোক দুইটি এই—

"অত্রি-পুত্র জ্বর-নেত্র ষড়াননানন।
বসুমতী শাকে পুঁথী হল সমাপন॥"

* * *

"নারায়ণ প্রভুপদে করি দঢ় মন।
ষোড়শ চৌরান্নৈ শাকে পুস্তক লিখন॥"

এই 'ষোড়শ' পাঠ স্পষ্টত ভুল। 'ষোল শ' হইবে। লেখক তাহাই অবশ্য ধরিয়া লইয়াছেন। এবং ১৬৯৪ শাকে হরিলীলা গ্রন্থ লেখা হয় স্থির করিয়াছেন। কিন্তু "অত্রিপুত্র" ইত্যাদি শ্লোকের কোন অর্থই করা হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য অর্থ করিতেছি—অত্রি-পুত্র = চন্দ্র = ১। জ্বর-নেত্র = ৬ (জ্বর ত্রিশিরা, সুতরাং জ্বরের ছয়টি চক্ষুঃ)। ষড়াননানন = ষড়াননের আনন = ৬।

তা(১)"। ৬। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'শেলি'(২) ।স্ব।". ৭। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসু কর্তৃক পদ্যময় 'বর্ষা-সঙ্গীত'। ৮। ক্ত কালীনাথ দত্ত কর্তৃক "আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব-দর্শন"। ৯। শ্রীযুক্ত হারা- দত্ত কর্তৃক "সাহ আকবর ও শ্রীমচ্চৈতন্য সম্প্রদায়।(২)" [এই প্রবন্ধে এশ্রী হরিদাস স্বামী সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, শ্রীশ্রীব্রজবাউরা সম্বন্ধে আমরা তাহাই জানি। ৺বৃন্দাবন ধামের ব্রজবাউরার কুঞ্জে এই গল্পের পরি- চায়ক একখানি বিচিত্র চিত্র ছিল। ব্রজবাউরা কুঞ্জের অধ্যক্ষের নিকট আমরা জানি, যে সেই চিত্র আজি ২৫ বর্ষ হইল চুরি গিয়াছে।] ১০। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন রচিত 'দ্ ্টি পক্ষী' পদ্য। তাহার পর ১১ ও ১২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় ।ধুরী কর্তৃক "খোসামোদী" শীর্ষক প্রবন্ধ ও প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালো। ।

খোসামোদী প্রবন্ধে দেবী য় এখনকার রাজাপ্রজার পরিচয় দিয়া নিজ দুঃখকাহিনী যেরূপ বিবৃত ক ।াছেন, তাহা পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বুক ফাটিয়া যায়।

প্রভা। ২য় ভাগ, ৩য় সং । আষাঢ়, ইহাতে সংবাদ ও সমালোচনা লইয়া ৯টি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে 'পরমহংস দেবের উক্তি'গুলিই ভাল বলিতে হয়।

সসঙ্গিনী সজ্জনতোষিণী। শ্রাবণ, 'আহার শ্রীআচার্য্য প্রভুর উপ- দেশটি অতি সুন্দর।

বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সাহিত্য।

শব্দ সমালোচনা।

শ্রাবণের এডুকেশনগেজেটে কয় সপ্তাহ শব্দ সমালোচনা হইতেছে। পাঠ করিয়া, আমাদের পুরাতন গল্প সকল মনে পড়িল। 'হা! বড়া' বলিয়া বৃদ্ধারমণীর চীৎকার, শস্যগুলি 'কাল্ কাটা' বলিয়া সাহেবের নিকট কৃষকের পরিচয় দান, ইত্যাদি কথা অনেকেই অবশ্য জানেন। আবার হয়ত কেহ কেহ এরূপ গল্পও শুনিয়া থাকিবেন, যে ছোট ভাই বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিছু উপর-চালাক। নিয়তই দাদাকে প্রশ্ন করে, 'এটা কেন হইল;' ওটা কেন এরূপ হইল? দাদা ব্যতিব্যস্ত। একদিন সেই ছোটভাই সেই দাদাকে প্রশ্ন করিল, "দাদা আমাদের গ্রামের নাম আগড়পাড়া হইল কেন" দাদা বুঝাইয়া

বসুমতী=১। সুতরাং তক্ষস্থ বামাগতি বলুন, আর নাই বলুন—আ
শ্লোক হইতে পাইলাম ১৬৬১। অর্থাৎ ‘হরিলীলা’গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের অ:
মঙ্গলের ১৩ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। আজি হইতে ১৫৮ বৎসর হইল। পলা
যুদ্ধের ১৮ বৎসর পূর্ব্বে। এতকথা বলিয়া আনন্দময়ীর ‘বাসি বিবাহের’ দু
চারি ছত্র নমুনা না দিলে ভাল দেখায় না। যখন বর আসিয়া দাড়াইল,
তখন— “হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে, গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ় রূপা ও রূপে মজন্তী।
হসন্তী, স্খলন্তী, দ্রব ... পতন্তী॥”
বেশ নয়? শেষ দুই ছত্র যেন একটু উ... ড়ে।

সাহিত্য-সেবক। ২য় ভাগ ৬ষ্ঠ ...য্যা। প্রথম প্রবন্ধে পদ কর্ত্তা প্রেমদাসের পরিচয় আছে। তৃতীয় প্রব... গণিত ও জ্যোতিষ মতে ‘লগ্নের’ ফলাফলের যৎকিঞ্চিৎ বিচার।

বীণাপাণি। জ্যৈষ্ঠ। বেশ।

বামাবোধিনী। ৩৪ বর্ষ, আষাঢ় ...প্লব’ শীর্ষক প্রবন্ধে কনাকঞ্জলি রচয়িত্রী রচিত ভূমিকম্পের পদ্যময়ী বর্ণনা। বিগত ভূমিকম্পের ন্যায় একটি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক উৎপাতের একটি কবিত্বময়ী বর্ণনা দেখিতেই পাওয়া গেল না, তবু যে কনাকাঞ্জলি রচয়িত্রী বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করিয়াছেন, সেও ভাল।

সখা ও সাথী। আষাঢ়। বেশ।

নদীয়াবাসী। ২য় বর্ষ, ১০ সংখ্যা। এই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘দুখীর-দশা’ নামে গল্পটি অতি সুন্দর। সৎশিক্ষা, করুণা ও আনন্দ, ইহাতে বেশ মেশামিশি করিয়া আছে। মাসিক পত্রে যদি গল্প দিতে হয়, তবে এইরূপ গল্প দেওয়াই ভাল।

নব্যভারত। শ্রাবণ। এই সংখ্যায় অনেকগুলি ভাল প্রবন্ধ আছে। ‘১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কর্তৃক “ভারতীয় ইতিহাসের একাংশে” নুরজাহানের সবিস্তার বিবরণ। ২। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক “নেপালের পুরাতত্ত্ব, শেষ।” ৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক “খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম, প্রথম প্রস্তাব।” ৪। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রক্ষিত কর্তৃক সুদীর্ঘ ‘বর্ষার বিরহ গাথা’। ৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র কর্তৃক “বঙ্গভাষা ও

দিলেন, "দেখ্‌ছ না ভাই! একদিকে খড়দা, ওদিকে এঁড়েদা—কাজেই মাঝে আগড়পাড়া না থাকিলে খড় থাকে কৈ ভাই?" আমাদের কিশোর জীবনের একদিনের গল্প একটাও এই খানে বলি। তখন আমরা এণ্ট্রান্স শ্রেণীতে পড়ি, বয়স ১৫ বৎসর। হেড্‌মাষ্টার টি, পি মানুয়েল সাহেব, জাতিতে আরমাণি। ইংরাজি, ফরাসি ছাড়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী, আরবী, আরমানি প্রভৃতি এসিয়ার অনেক ভাষা জানিতেন। আমাদের (ছাত্রদের) সঙ্গে অতি আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতেন। আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পানফল' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? আমি ইংরাজি বিদ্যালয়ের 'বুদ্ধিমান' ছাত্র কাজেই কিঞ্চিন্মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অমনই বলিলাম। "পানের মত আকারের ফল।" তিনি বলিলেন, পানের আকারে ও পানফলের আকারে কি সাদৃশ্য আছে" আমি বলিলাম "আমাদের দেশে পানের খিলি যেরূপ আকারে সচরাচর প্রস্তুত [illegible], পানফলের আকার ঠিক তাহার অনুরূপ।" বস্ চুকিয়া গেল। আমার [illegible]ন রহিল, বেশ করিয়া সাহেবকে শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝাইয়াছি। এখন, [illegible]ই সময়ে পিতৃদেব ৺পূজাবকাশে বাটীতে ছিলেন, সন্ধ্যার সময় তিনি [illegible]ার মুখে এই গল্প শুনিয়া বলিলেন "সমস্তই ভুল বলিয়াছ পানফলের ব্যুৎপ[illegible] [illegible]নি-ফল = জলের ফল।" তখন আমি লজ্জিত হইয়া হেটমুখ হইলাম। [illegible] জীবনের প্রৌঢ় কালের একটি কথা এই সঙ্গে বলি। নিজের শ্লাঘার জন্য নহে, যে কথাটা বুঝাইবার জন্য এত কথা লিখিতেছি—সেই কথাটার জন্যই গল্পটা বলা। স্বর্গীয় ভূদেববাবু এডুকেশনগেজেটে, 'যবেস্থবে' কথার ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করেন। কতলোকে কত কি যে বলিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। শেষে আমরা বলি, 'ন যজ্ঞো ভাবে ন তস্থৌ ভাবে' হইতে 'যবেস্থবে' কথাটা হইয়াছে—তাহাই তিনি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন।

৮ই শ্রাবণের এ. গেজেটে একজন পত্র প্রেরক লেখেন, যে বাঙ্গাল' ভাষার ব্যুৎপত্তি সমালোচন হওয়া ভাল, হইলে অক্লেশে বালকদিগের জন্ম বেশ একখানি 'সাহিত্যামোদ-প্রদ' পাঠ্য-পুস্তক হইতে পারে। এই ভূমিকার পর, 'ছাড়পেকের বোঝা,' 'অস্থিত পঞ্চম,' মচ্ছিভঙ্গ, প্রভৃতি কয়েকটী চলিত কথার ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করেন। ২২শে শ্রাবণের গেজেটে দুই জন পত্র প্রেরক প্রশ্নগুলির আংশিক উত্তর দিয়াছেন। সেই উত্তরগুলি পড়িয়াই

আমাদের হাবড়া কাল-কাটার গল্প মনে পড়িয়াছিল। যেরূপ জ্ঞান, গবেষণা, চিন্তাশক্তি থাকিলে, বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি সমালোচনায় কথঞ্চিৎ অধিকার হইতে পারে, তাহার কিছুরই পরিচয়, পত্র-প্রেরকদ্বয়ের পত্রে পাওয়া যায় না। উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি॥ 'হাড়পেকের বোঝার' দুইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। (১) 'পাকা হাড়ের বোঝা।' (২) হাড়ো (নায়ক) পাইকের বোঝা। দ্বিতীয় অর্থটী বিশদ করিবার জন্য হাবড়ার মত একটি গল্প আছে। কিন্তু 'পেকে' যে কৃষক দিগের নিত্য ব্যবহার্য্য, মাথা হইতে গাপর্য্যন্ত ঢাকিবার একটা জিনিষ—সে জ্ঞানই পত্র প্রেরকের নাই। সেটা প্রকৃতই একটা বোঝা; তাহার উপর হাড়ের মত হইলে, নিতান্ত অসহনীয় বোঝা হইয়া পড়ে। কাজেই হাড়পেকের বোঝা' অর্থ অতি সহজ। 'জরাজীর্ণ দেহ ভার'ও নয়—অতিরিক্ত পরিশ্রমের কার্য্য নয়। কেবল মাত্র গুরুভার।

'অস্থির পাটীগণিত' 'অস্থির পঞ্চক'—পাটীগণিতের একপ্রকার অঙ্ক। 'অস্থির পাটীগণিত' ইংরাজিতে Arithmetic of Infinites. 'অস্থির পঞ্চক' Indeterminate Equation চারিজন সন্ন্যাসীর রুটি খাওয়ার অঙ্ক—অস্থির পঞ্চক। অস্থির পঞ্চককে কখন কখন অস্থির পঞ্চমও বলে। এরূপ কোন কথার উল্লেখ না করিয়া পত্রপ্রেরক 'পঞ্চম' অর্থ 'পঞ্চম সুর' ধরিয়া লইয়া—ফের এক হাবড়া গল্প দিয়াছেন। সেইরূপ 'মচ্ছি ভঙ্গে' মচ্ছি অর্থ মৎস্য ধরিয়া লইয়া ডানাভাঙ্গা মৎস্য আনিয়া একরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু 'মচ্ছি ভঙ্গ' বা 'মষ্যিভঙ্গ' অর্থ বিমর্ষ বা মর্ষভঙ্গ মাত্র।

শব্দের ব্যুৎপত্তির রীতিমত আলোচনা হয়, ভালই কিন্তু এরূপ সমালোচন বিড়ম্বনা না হওয়াই ভাল। ছেলেপিলে ইংরাজির কল্যাণে এমনই ভয়ানক ডেঁপো হইতেছে, তাহার উপর এই সব অপশিক্ষায় একেবারে অসার অকর্ম্মণ্য হইবে। এডুকেশন গেজেটের পরিচালকগণকে একান্ত অনুরোধ তাঁহারা যেন আর একটু দেখিয়া শুনিয়া, এরূপ আলোচনা পত্রস্থ করেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ।	ভাদ্র, ১৩০৪ সাল।	৫ম সংখ্যা।

মানব-জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি?

(৪)

"আমিত্বের" একরূপ আলোচনা করা হইল। এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য দ্বিতীয় প্রস্তাব—আমার একটা নিরপেক্ষ শক্তি অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে কি, না, তাহার আলোচনা করা যাক্। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তদ্দারাই আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমাদের নিজ শক্তি, যে দৈব বা অদৃষ্টের অধীন নহে, তাহার মীমাংসা কি? কারণ, জীবনে এমন ঘটনা অনেক ঘটিতেছে যে একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা অভিলষিত কার্য্য করিতে পারি নাই—কোথা হইতে একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি বল, যে পরিমাণে তোমার ইচ্ছা ছিল, সে পরিমাণে তোমার উদ্যম ছিল না, তাই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। কিন্তু সে কথা কেমন করিয়া স্বীকার করি। যে বস্তুকে আমার সর্ব্বাধিক সুখকর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, যাহা লাভ করিতে পারিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিতাম—যাহার জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, তাহা লাভের জন্য আমি সমুচিত চেষ্টা করিব না—ইহা কি সঙ্গত? এরূপ স্থলে মনে হয়, আমার নিজের একটা শক্তি থাকিলেও, সে শক্তির অতীত, আর একটা শক্তি আমার উপর আধিপত্য করিতেছে। সে প্রবলতর শক্তি অতিক্রম করিবার সাধ্য আমার নাই। একথা যদি স্বীকার করা যায় তবে আমার নিজের কোন শক্তি থাকা না

থাকা, উভয়ই তো সমান। যদি অন্য শক্তির অধীন হইয়াই আমায় নিজ শক্তি পরিচালনা করিতে হইল, তবে আমি আমার কার্য্যাকার্য্যের জন্য দায়ী কেন হইব? এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র বলেন, যে ইচ্ছা সত্ত্বেও তুমি যে সিদ্ধকাম হও নাই, সে কেবলি তোমার দৈব, বা, অদৃষ্ট বশত। কিন্তু দৈব, বা অদৃষ্টের মূল বিধাতা নহেন। তোমার স্বকর্ম্মই তোমার দৈব, এবং সেই দৈবেরই নাম অদৃষ্ট। নতুবা "দৈব" বা "অদৃষ্ট" বলিয়া কোন পৃথক বস্তু নাই। তোমার স্বকর্ম্মের শক্তি এতদূর যে বিধাতাকেও তাহার বশে থাকিতে হয়।

নমস্যামোদেবান্ ননু হতবিধে তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্বং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপিন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

(শান্তিশতক।)

ইহা দ্বারায় ইহায় বুঝায়, যে ভেবেচিন্তে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মই মনুষ্যের সকল ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

গীতায় ভগবান নিজেও বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

অর্থাৎ—গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কর্ম্ম করিবার যে উদ্যম, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষকার বলিয়াছে। এ পুরুষকার জীবমাত্রেই বিদ্যমান, নতুবা মনুষ্য কোন কর্ম্মই করিতে পারিত না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই নাই যাহা পুরুষকার দ্বারা তুমি লাভ করিতে না পার। এ যে বড় বিস্ময়কর কথা। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তো আপনাকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে তো আমার অসাধ্য কিছুই নাই। ইহা অপেক্ষা আশার কথা, মানব-জীবনে আর কি হইতে পারে? যে আমি আমাকে নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম ভাবিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিতেছি, সেই আমার পক্ষে যদি কিছুই অসম্ভব না থাকে, তবে তো জীবন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড! মনুষ্য একটা প্রকাণ্ড জীব! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার যদি এরূপ শক্তিই রহিয়াছে, তবে আমার এত দুঃখ কেন? —— এত —— এত শোক, এত অশান্তি, আমি কি সাধ করিয়া দুঃখ

বহন করিতেছি? আমি কি রাজরাজেশ্বর হইয়াও, ইচ্ছা করিয়া কাঙালের কাঙাল হইয়া রহিয়াছি? সাধ করিয়া কেহ কি দুঃখ ভোগ করিতে চাহে? এই অনন্ত অভাব লইয়া, এই অদম্য সুখেচ্ছা সত্ত্বেও আমি নিশ্চেষ্ট কেন? এ নিশ্চেষ্টতা কোথা হইতে আসিল? আর একজনের চেষ্টা রহিয়াছে, আমারই বা চেষ্টা নাই কেন? সাধারণত লোকে ইহার কারণ অদৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুত ইহার কারণ অদৃষ্ট নহে। অদৃষ্ট বা ভাগ্য বলিয়া কোন অখণ্ডনীয় বিধি নাই তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিধি নিয়োজিত সেরূপ কোন বিধি আছে বলিলে ভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। কিন্তু অনুমান প্রণালীর দ্বারা ভগবৎ কার্য্য যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তদ্দারা বোঝা যায় যে তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ কিছুতেই অর্শিতে পারে না। আমাদের অভাব, আমাদের দুঃখ—আমরাই সৃষ্টি করিতেছি। আকাঙ্খা না থাকিলে অভাব থাকে না, সংস্কার না থাকিলে সুখদুঃখের কোন অনুভূতিও থাকে না। এই আকাঙ্খা ও সংস্কার উভয়ই আমাদের কল্পনা। সে কথা এখন থাক্। এখন আমাদের নিশ্চেষ্টতাও তজ্জনিত কার্য্যের নিষ্ফলতার কথা বলি। আমাদের আত্মদৃষ্টির অভাব বশতই এই নিশ্চেষ্টতা ও কার্য্যের নিষ্ফলতা ঘটিতেছে। তুমি আপনার প্রতি দৃষ্টি করিতেছ না—তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছ না যে তুমি কি উপাদানে গঠিত। যদি দেখিতে, যদি বুঝিতে, তোমাতে কি আছে তাহার মূল কি? তাহার প্রকৃতি কি? তাহার শক্তি কতদূর—তাহা হইলে এখনি তুমি তোমার জড়তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্ব-বিজয়ী পুরুষের ন্যায় ধাবিত হইতে। সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, একান্ত সাধনার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবে। এক জড়শক্তির সাধনা করিয়া মানব কতই না অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ওই দেখ স্থূলদৃষ্টি জড়-বাদি, সাধন বলে জড়শক্তির উপর কিরূপ আধিপত্য করিতেছে। ইন্দ্রের বজ্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাকে তারের মধ্যে পুরিয়া আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিয়াছে, বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া একমাসের পথ একদিনে অতিক্রম করিতেছে—ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতেছে। আবার শুনিতে পাই নাকি, সৌরলোকে গমনাগমনের পথও আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও কি মনে হয় যে মানবের পৌরুষ বা নিজের একটা স্বাধীন শক্তি নাই। জন্মান্তরবাদ মতে আমাদের যে কর্ম্মফল বা দৈব বা অদৃষ্ট,

তাহা এই পুরুষকারের দ্বারাই খণ্ডিত হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এমন ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে, যে ব্যক্তি বাল্যাবধি নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল, সদুপদেশ গ্রহণ কবিয়া, সৎসঙ্গ ও সৎ সাধনায় সে সম্পূর্ণ পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। অতএব, আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তি আছে তাহা জড়-শক্তির বা দৈবের বা অদৃষ্টের অধীন নহে।

আমাদেব বিচার্য্য তৃতীয় কথা আমাদের বিবেক-শক্তি আছে কি না? ইহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ। আমাদের বিবেক-শক্তি আমরা নিয়ত অনুভব করিতেছি। বিবেক-শক্তির বলেই আমরা অপবের কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতেছি। অন্যকে যদি আমরা কোন গর্হিত বা অনিষ্টকর কার্য্য করিতে দেখি, তবে সে কার্য্য অন্যায় ভাবিয়া, সে ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হই। তাহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হই। অন্যের বেলা বিবেকশক্তি প্রয়োগ করিতেছি —আব নিজের বেলা সেরূপ কোন শক্তি নাই বলিলে চলিবে কেন? যদি বল ন্যায় অন্যায়ের ধারণা প্রচলিত সংস্কার হইতে জন্মিয়া থাকে। সে কথাও ঠিক্ নহে। প্রচলিত সংস্কারের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সংস্কারক প্রচলিত প্রথাব দোষগুণ বিচার করিয়া, তাহা পরিবর্ত্তন কবিতেছেন। তিনি কোন পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার অনুগামী হইয়া নুতন প্রথা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। তাঁহাব বিবেক-শক্তির দ্বারায়, প্রচলিত প্রথাব দোষ দেখিয়াই তাহার পরিবর্ত্তনেব জন্য প্রয়াসী হইতেছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝা যায় যে আমাদের বিবেকশক্তি রহিয়াছে। পদার্থের সৌন্দর্য্য বিচাব করিবার সময় আমাদেব বিবেক-শক্তির দৃষ্টান্ত আরো স্পষ্টতর। শিশুরও একটা স্থূল বিবেক-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটা সুন্দব, আর একটা কুৎসিত বস্তু তাহাব সম্মুখে ধরিলে, সে সেই সুন্দর বস্তুটি লইতেই উৎসুক হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যদ্বারা বোঝা যায় আমাদের স্বাভাবিকি একটা বিবেক-শক্তি আছে এবং অনুশীলনে সে শক্তির উন্নতি এবং উপেক্ষায় তাহার অবনতি ঘটিয়া থাকে।

এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য চতুর্থ কথা। আমরা পূর্ব্বে যে কার্য্য করিয়াছি, সে কার্য্যের কর্ত্তা যে আমি, এবং বর্ত্তমান অবস্থায় যে আমি, উভয়েই একই ব্যক্তি কি না। রাগের বশীভূত হইয়া একজনকে প্রহার করিয়া বসিয়াছি। হিংসার বশীভূত হইয়া একজনের অনিষ্ট করিয়াছি। তাহার পরবর্ত্তীকালে

আমার রাগ হিংসা বিদূরিত হইয়া আমার মনে সাম্যভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই রাগ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছিল—সেই ব্যক্তি, ও এখনকার আমি, সময়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে, অপরিবর্ত্তিত থাকি কি না। অথবা, জন্মান্তর স্বীকার করিলে, পূর্ব্ব জন্মে যে আমি ছিলাম, ইহ জন্মেও সেই আমিই আছি কি না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বা মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তনে আমার আমিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটে না, তাহার মীমাংসা কি? প্রথমে দেখা যাক্, মৃত্যু ঘটিলেও আমাদের "আমিত্বের" কোন পরিবর্ত্তন ঘটে কি না। ইউরোপ প্রাধানত জড়বাদি হইলেও তদ্দেশের কবি সেক্ষপীর বলিয়াছেন—We only shuffle off the mortal coil. যে কবি এ তথ্য বুঝিয়াছিলেন, তিনি সুধু কবি নহেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক—শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, এবং হয়তো শ্রেষ্ঠ মানব। সেক্ষপীরের এই কথা, ও হিন্দুশাস্ত্রের কথা মূলত একই। জন্মান্তর বাদে এ কথার পরিষ্কার মীমাংসা আছে। জন্মান্তরের কথা আলোচনা করিতে বসিলে, প্রবন্ধের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুশাস্ত্রের সারসংগ্রহ জগতে অতুল্য গ্রন্থ গীতা বলিতেছেন

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥

অর্থাৎ আত্মা অবিনাশি সর্ব্বময় অব্যয়। আত্মাকে কেহই নাশ করিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

অর্থাৎ জীর্ণবাস পরিহার করিয়া, মানব যেমন নবীন বসন গ্রহণ করে, দেহী সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে। শরীরটে নূতন বটে, কিন্তু ব্যক্তিটে অপরিবর্ত্তীত।

অতএব দেহান্তেও যদি আমার আমিত্বের পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে, দেহ বর্ত্তমানে, The I of to-day is the I of yester-day—অদ্যকার আমিও যে, গতকল্যকার আমিও সে। রাগ দ্বেষাদি রিপুর বশীভূত হইয়া যে আমি, রাগ দ্বেষাদি রিপু বিমুক্ত হইয়াও সেই আমি।

যদি বল গীতা হইতে দুই পংক্তি উদ্ধার করিলেই পূর্ব্ব জন্মের "আমি" যে আবার ফিরিয়া আসি, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাহার প্রণালী বলিতে হইবে। তাহার প্রণালী ও ব্যাখ্যা হিন্দুশাস্ত্রে অতি পরিষ্কার আছে। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে, জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা সম্প্রতি যে একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি।

Professor Wiessman বলেন—The germ of one—celled animals never die. They absorb nutriment, and grow by multiplying. তিনি আরো বলেন যে Any individual of the one celled species living on Earth to-day, is far older than mankind, and as old as life itself. জড়-বিজ্ঞানে যদি জড়ের অবিনশ্বরতার এইরূপ নিদর্শন দিতে পারে, তাহা হইলে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি কি হইতে পারে? এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহা দেখিলে মহাকবি সেক্ষপীরের কথা মনে পড়ে।

There are more things in heaven and earth Horatio
Than are dreamt of in your philosophy.

হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে দেহ পঞ্চভৌতিক জড়-পদার্থে রচিত। মৃত্যু ঘটিলে দেহের সে পঞ্চভৌতিক উপাদান পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, দেহ ধ্বংশ হয়। কিন্তু আমি, অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম আমি অবস্থিতি করি, তাহার ধ্বংশ নাই। কারণ সে "আমি" জড়-পদার্থে রচিত নহি। সে "আমির" জীবন, আমার চিদ্‌শক্তি। সে "আমির" দেহ, আমার কামনা বা মন ইহাদের কাহারই ধ্বংশ নাই। যদি বল মন বা কামনার ধ্বংশ নাই, তাহার প্রমাণ কি? এমন মহাত্মা এখনো বর্ত্তমান আছেন, যিনি যোগ বলে—ইহজীবনের স্থূল দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইউরোপের ক্লেয়ারভয়েন্‌স যদি সম্ভব হয়, তবে কি ইহা সম্ভব হইতে পারে না? জন্ম মাত্রই যে জীব কাঁদিয়া ওঠে, তাহারও কি কোন অর্থ নাই। সে অর্থ আবিষ্কৃত হইলে বোঝা যাইবে যে পূর্ব্ব জন্মের কোন স্মৃতি পরজন্মে থাকিতে পারে কি, না। এ বিষয়ে তর্ক করিয়া কোন ফল নাই, শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলি। মরণান্তে, আমার চিদ্, আমার কামনা, বা আমার

মন, সংস্কাররূপে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। পরে, যে জীবের সহিত সে সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (affinity) থাকে, সেই জীবের দেহে, প্রবিষ্ট হয়, এবং তৎ-কর্তৃক দেহ লাভ করিয়া সেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার খণ্ডন করে। পুরুষকার, সে সংস্কার খণ্ডনের উত্তর সাধক। পৌরুষ অবলম্বন ব্যতীত, সে সংস্কারের খণ্ডন কিছুতেই সম্ভব নহে। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কামনা করিব, বা যেরূপ কার্য্য করিব—ইহজন্মে তদ্রূপ প্রকৃতিই লাভ করিতে হইবে, ইহা অলঙ্ঘ্য বিধি। সে বিধি অতিক্রম করিবার শক্তি, আর কাহারো নাই, কেবল মাত্র পুরুষকা-রের আছে। অতএব ইহজীবনের আমিও যে, পূর্ব্বজীবনের আমিও সে। অথবা ইহজীবনের আমি, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের মূর্ত্তিমান আকৃতি মাত্র। ইহজীবনে আবার যেরূপ সংস্কার লাভ করিব, জন্মান্তরে তদনুযায়ী প্রকৃতিই লাভ করিব। এইরূপে সংস্কারের পর সংস্কার, জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। যতকাল, সংস্কারের খণ্ডন না হয়, ততকাল পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, যে এক জীবনেই খণ্ডিত হইবে, তাহা নহে। একই জন্মের কর্ম্মফল জন্য হয়তো শতসহস্রবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। হয়তো অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, আমাদের কার্য্যের গুরুত্ব, ও দায়িত্ব কতদূর!

আমাদের বিচার্য্য পঞ্চম কথা, আমাদের কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবার অধিকার অন্যের আছে কি না। আমরা যতক্ষণ সমাজের মধ্যে থাকি, ততক্ষণ সমাজ ও সমাজের প্রভু রাজার, অবশ্য সে ক্ষমতা আছে। কারণ আমি যতক্ষণ সমাজের অন্তর্গত, ততক্ষণ, আমি এবং সমাজ ও রাজা, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই তিনের একের অনিষ্ট ঘটিলে সকলেরি অনিষ্ট। আমাদের দেশের রাজা, আমাদের সমাজের প্রভু নহেন, বোধ হয় সেই জন্যই হিন্দু-সমাজের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। ইহলৌকিক বিচারের কথাই বলিলাম পারলৌকিক বিচরের বা দণ্ডের কথা, "আমরা কার্য্যাকার্য্যের জন্য কাহার কাছে দায়ী" সেই তথ্য বিচারের সময় আলোচনা করিব।

আমাদের বিচার্য্য ষষ্ঠ কথা, দুষ্কর্ম্মের জন্য আমাদের দণ্ড দিবার প্রয়ো-জনীয়তা কি? যখন ইহলৌকিক দণ্ডের কথা বলিতেছি, এবং আমরা যখন

ইউরোপের শাসনাধীন, তখন এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় নীতিই প্রশস্ত।*

যখন বাহ্যজগতের শান্তি-রক্ষার জন্য এরূপ বিচার ও দণ্ডনীতির আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন অন্তর্জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, বিচার ও দণ্ডপদ্ধতির আবশ্যকতা নাই কি? আমাদের বিচার্য্য সপ্তম কথা—আমাদের কার্য্যাকার্য্যের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (standard) আছে কি না? না—তাহা নাই, তাহা থাকিতেও পারে না। আমাদের ধর্ম্মে, যাহাকে পাপ বলে অন্য এক জাতির ধর্ম্মে তাহা পাপ না হইতেও পারে। আবার এক জাতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেও, আকৃতি প্রকৃতি জ্ঞান বুদ্ধি অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে শাস্ত্রোক্ত আচারের বিভিন্নতা রহিয়াছে। তবে যে দেশের যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে মানবের আপন আপন কর্ত্তব্য স্থির করাই যুক্তি সঙ্গত। গীতা বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

অর্থাৎ পরের ধর্ম্ম যদি গুণ সম্পন্ন সহজ সাধ্য বা সুখকরও হয়, এবং নিজ ধর্ম্ম যদি বিগুণ ও কষ্টসাধ্যও হয়, তথাপি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। আপনার পালনীয় ধর্ম্মে মরিতে হয় সেও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম ততোধিক ভয়াবহ বলিয়া জানিবে। হিন্দুর পক্ষে এ স্বধর্ম্মের অর্থ, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদিষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম্ম, বৈশ্য, বৈশ্যের ধর্ম্ম, শূদ্র, শূদ্রের ধর্ম্ম, পালন করিবে।

আমাদের বিচারের অষ্টম প্রস্তাবে আমরা আমাদের কার্য্যাকার্য্যের জন্য কাহার নিকট দায়ী।

অন্যান্য জাতীর শাস্ত্রের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রের এইখানে সম্পূর্ণ মতভেদ হইয়াছে। অন্যান্য জাতীর শাস্ত্রে বলে, মানব পাপপুণ্যের জন্য ভগবানের

---

*Judicial punishment can never be inflicted simply and solely as a means to forward a good other than itself whether the good be the benefit of the criminal or civil society, but it must be at all times inflicted on him for no other reason than because he has acted criminally That is the maxim of the Pharisees,—' It is expedient that one man should die for the people and that the whole nation should perish not, but if Justice perisheth them it is no more worth that man should live upon the Earth Even if a civil society were to dissolve itself by vote of all its members (e g if a people inhabiting an island were to dissolve to separate from one another and scatter themselves over the surface of the globe) nevertheless before they go, the last murderer in the prison must be executed And this that every man may receive what is due of his deeds and the guilt of his blood may not rest upon a people which have failed to exact the penalty, for in that case the people may be considered as perpetrators in this public violation of justice —*Kant*

নিকট দায়ী বা জবাবদিহি করিতে বাধ্য। ভগবান অন্তরিক্ষে আদালত পাতিয়া বসিয়া আছেন—জীবের মৃত্যু হইলেই (constable) পাইক আসিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া সেই আদালতে উপস্থিত করে। সে আদালতে কাউনসিল উকীল বা মোক্তার কিছুই নাই, সাক্ষীর জবানবন্দী করার নিয়ম নাই, ফরিয়াদি উপস্থিত থাকিবার নিয়ম নাই, Ex-parte বা একপক্ষ বিচার হইয়া, ভগবানের আদেশমত দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন—ভগবানের কোন নির্দ্দিষ্ট আদালতও নাই, তিনি কোন বিচার আচারো করেন না। মানবকে তাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য ভগবানের কাছে কোন জবাবদিহি করিতে হয় না। স্বর্গ ও নরক, সাধারণ মানবকে ধর্ম্মে উত্তেজিত করিবার, ও অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে। আমাদের কার্য্যাকার্য্যের বিচার-স্থান এই সংসার। চিত্তের উৎকর্ষতাই পুণ্য, সেই পুণ্যই সৎকার্য্যের পুরস্কার, এবং চিত্তের অপকর্ষতার নামই পাপ, সেই পাপই দুষ্কর্ম্মের দণ্ড। তদ্ভিন্ন পাপপুণ্যের অন্য অর্থ নাই। চিত্তের উন্নতি লাভ করিলে দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি থাকিবে না সুতরাং তাহাকে সকলেই স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে, সেরূপ ব্যক্তি সংসারে সুখী। তাহার কর্ম্মের ভাবী ফলও শুভজনক। চরিত্রের অবনতি ঘটিলে দুষ্কর্ম্মে রত হইতে হইবে, সকলে ঘৃণা করিবে—সমাজ ও রাজা দণ্ড দিবেন সুতরাং তাহার জীবন ক্লেশকর। পরজন্মেও, তাহার সেইরূপ সংস্কার হইবে এবং তদ্রূপ ক্লেশকর-জীবন বহন করিতে হইবে। এই পুরস্কার বা দণ্ড, এই সংসারেই প্রাপ্ত হইতে হয়, নতুবা, স্বর্গ বা নরক বলিয়া শূন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। অতএব হিন্দুশাস্ত্র মতে মানব পাপপুণ্যের জন্য কেবল নিজের কাছেই দায়ী।

বিশ্বনিয়ন্তা নিজে বিচার কার্য্য করেন না, নিজে বিচার কার্য্য করিতে হইলে—দুষ্কর্ম্মান্বিত জীবকে নিত্য কঠোর দণ্ড দিতে হইবে—তাহা কি সেই পরমকারুণিক জগদীশ্বরের প্রাণে সহ্য হয়? না, তদ্রূপ নিষ্ঠুরতা তাঁহার পক্ষে সম্ভব? সেই জন্যই তিনি জীবের এই জন্মান্তর ও সংস্কার প্রথা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আবার মনুষ্যকে তাহার নিজের কাছেই জবাবদিহি করিয়া মানব-জীবনের অতুলনীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। মানব যেমন তাঁহার

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তদুপযুক্ত গৌরব, গুরুত্ব, গভীরতা, অসীমতা ও দায়িত্ব মানব-জীবনে প্রদান করিয়াছেন। যে শাস্ত্র ভগবানের অভিপ্রায় এরূপ অনুভব করিয়াছে, সে শাস্ত্র ভগবানের প্রকৃত মহিমাই উপলব্ধি করিয়াছে। জগতের আর কোন জাতীর ধর্ম্ম জগদীশ্বরের এরূপ মহিমা অনুভব করিতে পারিয়াছে কি?

তুমি বলিতে পার ভগবান যদি এতই দয়ার্দ্র, তবে তিনি অসতের সৃষ্টি করিলেন কেন? তিনি তো সর্ব্বশক্তিমান—মনে করিলেই তো জগৎকে নিরবচ্ছিন্ন সৎরূপে সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তবে অসৎ সৃষ্টি কেন করিলেন। এই মায়ামুগ্ধ দুর্ব্বল জীবের আশেপাশে অসৎ প্রলোভন ছড়াইয়া রাখিলেন কেন? কেন এ ক্ষুদ্র জীবের উপর এত গুরুতর দায়িত্ব স্থাপন করিলেন? তাঁহাকে দয়াময় কি করিয়া বলিব? তিনি নিজে দণ্ডকর্ত্তা না হইলেও, তৎকৃত বিধির ফলে যে অনন্ত ক্লেশ বহন করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিয়াই বা কিরূপে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিব? ইহার উত্তর, তুমি যাহাকে অসৎ বলিতেছ, বস্তুত তাহা অসৎ নহে। তাহা তোমার মঙ্গলেরই উত্তরসাধক। অসৎ না থাকিলে সতের ধারণা থাকে না। কটু আস্বাদন কিরূপ তাহা না বুঝিলে, মিষ্টির মিষ্টরস উপলব্ধি হয় না। তুমি পরম মধুর রস উপভোগ করিবার উপযোগী হইবে বলিয়াই, তিনি নানা প্রকার অধম রস ক্রমান্বয়ে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার পর, তাঁহার দয়া? ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার দয়ার অবধি কি খুঁজিয়া পাওয়া যায়? তোমার দুষ্প্রবৃত্তির সংস্কার, তোমাতে যেরূপ একান্ত লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে ইহলোকে সামাজিক বা রাজদণ্ডে তাহার মূলোৎপাটিত হয় না, শাখা-প্রশাখাদি খণ্ডিত হয় মাত্র। অসৎ প্রবৃত্তিগুলি অনন্তমূলী অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় নির্ম্মূল না করিলে উহাদের বিনাশ নাই। তোমার সে দুষ্প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবার জন্যই, তোমার জন্মান্তরে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের বিধি নিরূপিত করিয়াছেন। যদি তোমার পুরুষকারের সহায়তায় তুমি জ্ঞান লাভ করিয়া অসৎ প্রবৃত্তির মূল ধ্বংশ করিতে না পার, তাহা হইলে, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ দুষ্কর্ম্ম করিয়া তৎকার্য্যে যে সুখ, তাহার অবসাদ জন্মিলে তোমার সেই অসৎ প্রবৃত্তির মূল একেবারে বিনষ্ট হইবে। জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইতেছে বলিয়াই, তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য শব্দরূপে ঋষীবাক্যে প্রকাশমান হইয়া, তোমার কর্ত্তব্য

নির্দ্দেশ করিতেছেন, জ্ঞান (conscience)রূপে তোমার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া তোমার সদাসৎ জ্ঞান উৎপাদন করিতেছেন, রাজা দেশে দণ্ডরূপে আবির্ভূত হইয়া, তোমার অসৎকার্য্যে ভীতি প্রদান করিতেছেন—বিধিরূপে মানব-সমাজে অবস্থিত হইয়া তোমার অসৎকার্য্যের অন্তরায় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন, এতোতেও যখন মানব নিরস্ত না হইতেছে—যখন মানব সংসার বাসনায় একান্ত অভিভূত হইয়া সদাসৎ কার্য্যের প্রভেদ বুঝিতে অক্ষম হইয়া উঠিতেছে, যখন মানবের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে তখন তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য মানবরূপ ধারণ করিয়া ধরাতলে প্রকাশ হইতেছেন। একবার নয়, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, এইরূপ করিতেছেন। গীতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধুময়ী গীতা।

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ।

দৈবী ও আসুরী সম্পদ—অহঙ্কার বশতঃ অজ্ঞানীর প্রলাপ চিন্তা—কাহাদের আসুরী জন্ম হয়—কর্ত্তব্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ।

শ্রীভগবান কহিলেন—

আত্মনিষ্ঠা, নির্ভয়তা, দান, প্রসন্নতা,
সংযম, স্বাধ্যায়, তপঃ, সত্য, সরলতা,
অহিংসা, ঔদাস্য, যজ্ঞ, লোভ, মান, রাগ,
পরনিন্দা-কুপ্রবৃত্তি-চপলতা ত্যাগ,

দয়া, শান্তি, তেজঃ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, নম্রভাব,
অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি নির্ম্মল স্বভাব,—
এই সমুদয় পার্থ তিনি মাত্র পান
দৈবী-সম্পদাভিমুখী জিনি সত্ত্ববান। ১, ২,
দম্ভ, দর্প, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অভিমান,
আসুরী সম্পদ সুখী লোকেরাই পান, ৪
দৈবী মোক্ষহেতু, বন্ধ আসুরীতে যত;
কি শোক? পাণ্ডব, তুমি দৈবী মুখে জাত। ৫
দৈবাসুর দুই ভাব ইহলোকে হয়;
কহিয়াছি দৈব, কহি আসুর তোমায়। ৬
যাদের আসুরভাব শৌচাচার হারী,,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্ম্ম জানে না তাহারা; ৭
বলে—"সৃষ্টি অনীশ্বর, অসত্য সকল,
নরনারী কামনায় জনমে কেবল"। ৮
হেন দৃষ্টি নিয়া তারা উগ্রকর্ম্মা হয়,
জনমি কেবল করে জগতের ক্ষয়। ৯
করিয়া দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয়,
দম্ভ মান ক্রোধযুক্ত হয় দুরাশায়,
থাকিয়া অশুচিব্রতে*ক্ষুদ্র দেবতার,
করে মাত্র আরাধনা নাহি জানে আর। ১০
মরণ পর্য্যন্ত চিন্তা দিবস রজনী;
"কাম ভোগ" পুরুষার্থ—সারমাত্র জানি, ১১
শত শত আশাপাশে বদ্ধ মন প্রাণ,
ক্রোধান্ধ কামুক ক্ষিপ্ত পশুর সমান,
চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াও করিবে নিশ্চয়,
কামভোগ তরে তারা অর্থের সঞ্চয়; ১২
ভাবে তারা নিশিদিন উন্মাদের মত,—
"দেখ মোর অদ্য লাভ হইয়াছে কত!—
মনোরথ পূর্ণ আজ হইবে আমার!—
এই ধন আছে মোর, হইবে আবার!" ১৩।

ভাবে পুন—এই শক্র হইয়াছে নাশ,
আমিই অপর শক্র করিব বিনাশ!
পুনঃ ভাবে—"ঈশ্বর কি? আমিই ঈশ্বর!
আমি ভোগী—আমি সিদ্ধ—আমি পরাৎপর,—
বলবান, ধনবান, গুণবান, আমি!—১৪
কি সুখী!—কুলীন আমি!—কোথাকার তুমি?—
আমার মতন কেবা?—সব ভণ্ড তারা—
এবারে করিব ধর্ম্ম সবচেয়ে সেরা!
দান যজ্ঞ করি আমি!—হর্ষ প্রাপ্ত হব!"—
এই তারা ভাবে পার্থ। অধিক কি ক'ব, ১৫

বিমোহিত অজ্ঞানের মৃগতৃষ্ণিকায়,
কামাসক্ত ক্ষিপ্তচিত নরকেতে ধায়! ১৬

নিজে নিজে পূজ্য হয়, নম্রতা না জানে,
নাম মাত্র যজ্ঞকরে, ধন অভিমানে! ১৭

অহঙ্কারে বলদর্প কাম ক্রোধে মাতি,
দেহস্থ চিদংশ মোরে হিংসা করে অতি!
সাধুদের গুণে তারা সদা দেয় দোষ,
"আপনার মত কেবা?" বলিলে সন্তোষ। ১৮

হিংসাকারী সেই সব নরাধম নরে,
পাণ্ডব, আসুরী জন্ম দিয়াছি সংসারে। ১৯

পাইয়া আসুরী জন্ম না পায় আমায়,
জন্মে জন্মে মূঢ়গণ অধোগতি পায়! ২০

কাম-ক্রোধ-লোভ তিন নরকের দ্বার,
আত্মার ঘাতক, তিনে কর পরিহার। ২১

এই তিন দ্বার হ'তে মুক্ত হন যিনি,
সাধনে পরমাগতি প্রাপ্ত হন তিনি। ২২

যে জন যথেচ্ছাচারী শাস্ত্র ত্যজি যায়,
তত্ত্ব-জ্ঞান, শান্তি, মোক্ষ, কিছুই না পায়। ২৩

কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ,
মর্ম্ম জানি কর পার্থ, কর্ম্ম অনুষ্ঠান। ২৪

ইতি দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

কাঙ্গাল-হরিনাথ সম্বন্ধে আমার স্মৃতি।

সাহিত্য-সেবক সাধক-প্রবর স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় এক বৎসরের অধিক হইল মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হরিনাথের চিঠিপত্রাদি যাহা আমার নিকট আছে, এপর্য্যন্ত তাহা সংগ্রহ করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। যতদূর মনে আছে তাহাই লিখিলাম। ভরসা করি ইহাতেই পাঠক তাঁহার চরিত্রের মহত্ব এবং জীবনের উন্নতি কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা ১২৮৫ সালে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) হরিনাথের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। মৎপ্রণীত ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক "শরদবকাশ" ছাপাইতে কুমারখালি যাই। মথুরানাথ-যন্ত্র হরিনাথের, এবং তাহা তাঁহার বাড়ীতেই স্থাপিত। এই সময়ে হরিনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর, আমার ষোল বৎসর মাত্র। হরিনাথকে দেখিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মহত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার বুঝিবার শক্তিই বোধ হয় তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। আর বয়সের পার্থক্যে হরিনাথের সম্মুখে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারি নাই। বিজয়বসন্তের রচয়িতা, গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকার সম্পাদক, আর মথুরানাথ-যন্ত্রের স্থাপয়িতা বলিয়া হরিনাথের নাম পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। সেই প্রৌঢ় পুরুষের সম্মুখীন হইয়া সঙ্কোচ পরিহার করিতে পারিলাম না। তথাপি মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলাম তাহাতে প্রবীণত্ব এবং সরলতার সংমিশ্রণ। সঙ্গে সঙ্গে এক জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব। দেহের সৌন্দর্য্য এবং মাধুরী দেখিয়া মনে হইল এমন মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের বংশে হইলে ঠিক হইত।

ইহার কয়েক মাস পরে শরদবকাশ মুদ্রিত হইলে, আমি আর একবার কুমারখালিতে গিয়াছিলাম। হরিনাথ তখন অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম।

দুই তিন বৎসর পরে পুনরায় হরিনাথের সাক্ষাৎ লাভ করি। সে বারে আমার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় সঙ্গে ছিলেন। আমি অধ্যয়নার্থ এবং তিনি বিষয়কার্য্যোপলক্ষে উভয়ে কৃষ্ণনগরে যাইতেছিলাম, গ্রীষ্মাবকাশের পরে কলেজ খুলিবে এই সময়ে—আষাঢ় মাসে আমরা যাইতেছিলাম।

অপরাহ্নে আমরা হরিনাথের ভবনে উপস্থিত হই, এবং রাত্রির গাড়ীতেই বগুলায় যাই। যে কয়েক ঘণ্টা হরিনাথের সঙ্গে ছিলাম, তাহাতেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমার আত্মীয় বাল্যে কুমারখালি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া হরিনাথকে জানিতেন, হরিনাথ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন না। আর আমার সঙ্গে পরিচয় সেই শরদবকাশের মুদ্রাঙ্কন সময়ে। এমন কি হরিনাথের ওখানে যাইব কি না এ বিষয়ে আমরা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সামান্য পরিচয়ে হরিনাথ আমাদিগকে যেমনভাবে আদর করিলেন, দূরস্থ কোন আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে আসিলেও বোধ হয় অনেক গৃহস্থ তেমন করেন না। সে আদর বড়ই সরলতামাখা।

এবারেও আমি হরিনাথের সহিত তেমন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারি নাই। কিন্তু আমার আত্মীয়ের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা সমস্তই শুনিয়াছিলাম এবং তাহার অনেকাংশ এখনও মনে আছে। হরিনাথ আমাদিগকে জলযোগে অতি সুস্বাদু আম্র দিয়াছিলেন। আমার আত্মীয় সেই আম খাইয়া কহিলেন বড়ই সুমিষ্ট আম। হরিনাথ কহিলেন আর বুঝি কুমারখালিতে গরীবের ভাগ্যে ভাল আম যুটে না। আমার গ্রামবার্ত্তা উঠে গেছে—আর গরীবে আম খাবে কি ? হরিনাথের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। আমার আত্মীয় গ্রামবার্ত্তার সহিত লোকের আম খাইবার কি সম্বন্ধ বুঝিতে না পারায় নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?" হরিনাথ উত্তর করিলেন "পাবনা এবং উত্তর অঞ্চল হইতে এই সব আম কুমারখালিতে আসিয়া থাকে। মহকুমা এখানে না থাকায় স্থানীয় কতকগুলি লোকে আমওয়ালাদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করে। ঝাঁকার ভাল আমগুলি তুলিয়া নিয়া কখনও অল্প দাম দেয় কখনও বা দেয়ই না। এই অত্যাচার নিবারণার্থ আমি গ্রামবার্ত্তায় লিখিয়া লিখিয়া আম এবং ইলিস মাছের নিমিত্ত বিশেষ পুলিস পাহারা করিয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তা উঠিয়া গিয়াছে, শাসনেরও শিথিলতা ঘটিয়াছে। পুনরায় পূর্ব্বরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে গরীবেরা ভাল আম পায়ই না। খারাপ যাহা পায় তাহাও অত্যধিক মূল্য দিয়া; কেন না আমওয়ালারা সেই অপহৃত আম গুলির দাম পোষাইয়া লয়। ক্রমে হয়ত আর আমওয়ালা এ বাজারে

আসিবেই না। হরিনাথ হৃদয়ের যে গভীরতার সহিত এই কথাগুলি কহিয়াছিলেন, আমার দুর্ব্বল লেখনীর সাধ্য নাই যে তাহা সম্যক্ বুঝাইয়া দেই।

জলযোগান্তে গ্রামবার্ত্তা উঠিয়া যাওয়া সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। হরিনাথ কহিলেন গ্রামবার্ত্তার জন্য তিনি অনেক টাকা ঋণ করিয়াছেন। গ্রাহকগণের নিকট যদিও ঋণের তিনগুণ পরিমাণ টাকা পাওনা রহিয়াছে তথাপি তাহা আদায়ের আশা নাই। যাঁহাদিগের দিবার ইচ্ছা ছিল তাঁহারা সকলেই পত্রিকার মূল্য দিয়াছেন। অন্য অনেককে চিঠি লিখিয়া ত্যক্ত করাতেও কোন ফল হয় নাই। দুএক কথার পরে আমার আত্মীয় কহিলেন দুএকজন গ্রাহকের নামে নালিশ করিলে হয় না? হরিনাথ শিহরিয়া উঠিলেন—কহিলেন "তাহলে কি ভদ্রতা থাকে? আমার বুঝিয়া লওয়া উচিত যে গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকায় সমাজের আর প্রয়োজন নাই; তাই আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি। যাঁহারা চারিপাঁচ বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল কাগজ লইয়া দাম দেন নাই, তাঁহাদের ভদ্রতার ত্রুটি আছে, আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া আমি অভদ্রতা করিব কিরূপে?"

হরিনাথের সহিত আমার আত্মীয়ের আরও অনেক কথা হইয়াছিল। যে গৃহবিবাদ উপলক্ষ করিয়া তিনি "চিত্তচপলা" লিখিয়াছিলেন হরিনাথ আমাদের দেশস্থ সেই পরিবারের নাম করিয়া ঘটনাংশ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। সম্প্রতি নূতন কিছু লিখিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় হরিনাথ তাঁহার শিরঃপীড়ার কথা উল্লেখ করেন এবং কহেন "বর্ষা আসিতেছে, এই সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে।" আমার আত্মীয় কহিলেন, ইংরাজী-বিজ্ঞানে পড়িয়াছি মেঘের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ আছে। আকাশে মেঘ হইলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে না। হরিনাথ এই কথা শুনিয়া যেন কিছু দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন দেখুন আজকালি অনেক সময়েই আমরা ইংরাজী বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া থাকি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক শিখাইয়াছে, এবং শিখাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পুর্ব্বপুরুষেরা কি জানিতেন, কি না জানিতেন, তাহা জানিয়া লাভ আছে। নিজের পিতৃদত্ত সিন্ধুকে কোন জিনিষ থাকিতে তাহা পরের কাছে ধার করিতে যাওয়ার প্রয়োজন কি? আপনি কি জানেন না যে আকাশে মেঘ থাকিলে টোলের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ থাকে? ব্রাহ্মণের উপনয়ন স্থগিত হয়? এ সবই মস্তিষ্কের

ব্যাপার। মেঘের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ জানিতেন বলিয়াই আর্য্যগণ এ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমার আত্মীয় নির্ব্বাক রহিলেন। আমি হরিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম পৈত্রিক সিন্ধুকের কোথায় কি আছে তাহা জানিবার ইচ্ছা ইহার বড়ই প্রবল। সেই ইচ্ছা কতদূর সফল হইয়াছিল হরিনাথ শেষজীবনে কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

নিরূপিত সময়ে আমরা হরিনাথের গৃহ ছাড়িয়া ষ্টেষণাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বিদায়কালে হরিনাথ আমাদিগকে যে কয়েকটী কথা কহিয়াছিলেন তাহা আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে। তিনি কহিলেন আপনাদের দর্শন পাইতে পারি এমন সৌভাগ্য কিছুই নাই। কেবল বাড়ীর কাছে রেলওয়েষ্টেষণ আছে এই। ইহাতে যদি আমাকে এ সুখে বঞ্চিত করেন বড়ই দুঃখিত হইব। যখনই কুমারখালি হইয়া যাইবেন একবার যেন দর্শন পাই। কোথায় আমরা তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইলাম—তাঁহার ব্যবহারে ও আতিথ্যে পরমাপ্যায়িত হইলাম, আবার কিনা তিনিই আমাদিগকে এইরূপ বিনয় এবং সৌজন্যের সহিত বিদায় দিয়া পুনরাগমন প্রার্থনা করিলেন! বস্তুতঃ আমি তাঁহার আচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকিয়াই যেন একরূপ ঘনিষ্টতা জন্মিয়া গেল। বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বেই রঘুবংশে পড়িয়াছিলাম—"সম্বন্ধমাভাষণ পূর্ব্বমাহুঃ"
মনে হইল এ কথা কেবল সাধুদিগের সম্বন্ধেই খাটে। হরিনাথ এতই মহৎ প্রকৃতিসম্পন্ন যে তিনি আমাদের ন্যায় লোককেও অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার করিয়া লইতে পারেন। আসিবার সময়ে হরিনাথ আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। সে আলিঙ্গন বড়ই প্রাণভরা। ইহার পর যতবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে হরিনাথ প্রতিবারেই আমাকে এই ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন। শেষজীবনে যখন তিনি সাধনরাজ্যে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত। হরিনাথ তখনও আমাকে আলিঙ্গন দানে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে আমি তাঁহার শেষ আলিঙ্গন লইয়া ময়মনসিংহে আসি।

হরিনাথের শেষ অনুরোধ আমার আত্মীয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। উপরের লিখিত ঘটনার কিছুকাল পরেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আমি হরিনাথের অনুরোধ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতাম, এবং ইহার পরে যতবার কুমারখালি গিয়াছি দুএকবার ব্যতীত হরিনাথকে না দেখিয়া কুমারখালি ত্যাগ করি নাই। অনূ্ন বিশবার তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং প্রতিবারেই তাঁহার ব্যবহারে ও মুখনিঃসৃত বাক্যে কত জ্ঞান কত উপদেশ লাভ করিয়াছি! সকল কথা স্মরণ করা অবশ্য দুঃসাধ্য।

একবার হরিনাথের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছি, নিকটে বাড়ীর এবং পাড়ার কতকগুলি স্ত্রীলোকেরা শুভচণ্ডী পূজা করিতেছেন। পূজা শেষ হইলে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমাদের শ্রুতিগোচরে কথা কহিতে কহিতে বাড়ী যাইতেছিলেন। দেবতার নিকট তাঁহার শেষ প্রার্থনা আমরা শুনিতে পাইলাম। তিনি কহিতেছেন "মা, শুভচণ্ডী আমার ছেলেটীর চাকরি হ'ক্; বউকে দুখানা গয়না দি'ক।" হরিনাথ কহিলেন, "শুনিলেন? আমাদের মা নাই। মা না থাকিলে উন্নতি আসিবে কোথা হইতে? যে জাতির মাতার প্রার্থনা এইরূপ, সে জাতির উন্নতি বহুদূরে। বউকে দুখানা গয়না দিলেই জীবনের সার্থকতা হইল!" পাঠক দেখিবেন অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও হরিনাথ কেমন ভাবে লক্ষ্য করিতেন। "আমাদের মা নাই" এ কথা তিনি অনেকদিন অনেক ভাবে বলিয়াছেন। চিরদিন তিনি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

হরিনাথের প্রাণ অতিশয় কোমল ছিল। সামান্য বিষয় বা কথাতেই তাহাতে আঘাত লাগিত এবং সামান্য আঘাতেই তাহাতে দাগ বসিত। একদিন সন্ধ্যার পরে হরিনাথ ও আমি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গান শুনিতেছি। সেখানে আরও দুচারিজন ভদ্রলোক ছিলেন। একটী গানের শেষ চরণ ছিল "রাধাকৃষ্ণ যুগল বিরাজে"। এই অংশ গীত হইবা মাত্রই হরিনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন। গান শেষ হইলে দুতিনবার ঐ কথাটীই কহিলেন "রাধাকৃষ্ণ যুগল বিরাজে"। শেষে বলিলেন বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা এই মধুর বাক্যের কি কদর্থই করিয়াছে। আমরা যতজন গান শুনিতেছিলাম "রাধাকৃষ্ণ যুগল বিরাজে" এ কথা কাহারই প্রাণে অমন ভাবে লাগে নাই।

মধ্যে কিছুকাল "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটী কৃতবিদ্য যুবক লেখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনাথ নিজে

কিছুই লিখিতে পারিতেন না। একদিন আমি হরিনাথকে কহিলাম "গ্রাম-বার্ত্তা" আবার বাহির হইল। হরিনাথ কহিলেন আর না বাহির হওয়াই ভাল ছিল। আমি বলিলাম কেন? তিনি কহিলেন "ভাষার শ্রাদ্ধ হইতেছে"। কিঞ্চিৎ এর স্থলে "কথঞ্চিৎ" ব্যবহৃত হইতেছে। ক্রিয়ার বিশেষণকে বিশেষ্যের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। হরিনাথ তৎক্ষণাৎ একখানি গ্রামবার্ত্তা আনাইলেন, এবং আমাকে "কথঞ্চিৎ" এর দূষিত প্রয়োগ দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম এই সামান্য ভ্রম দেখিয়াই তিনি বিলক্ষণ দুঃখিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার দুঃখিত হইবার কারণ ছিল। হরিনাথ বাল্যে অতিকষ্টে বাঙ্গালাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। চিরদিন বাঙ্গালা ভাষারই চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার পুস্তকাদি পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন হরিনাথ কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন এবং ভাষায় তাঁহার কেমন ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল। হরিনাথ ইংরাজী জানিতেন না এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। একবার আমাকে কহিয়াছিলেন "গ্রামবার্ত্তায় আমি যাহা লিখিতাম তাহা প্রায়ই আমার মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিতে হইত; কেন না ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। হরিনাথ এইরূপ দুঃখ করিতেন বটে এবং ইহাই তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়ার অন্যতর কারণ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে শৈশবে ইংরাজী শিখিলে তিনি এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন না। আজকালি আমাদের মত অল্প ইংরাজী অল্প বাঙ্গালা জানা লোকে বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়াইত বাঙ্গালায় আর্ষ প্রয়োগের ছড়াছড়ি হইতেছে। দেশে খাঁটি বাঙ্গালা লিখিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

আমার মনে আছে হরিনাথের বাড়ীতে আমি একদিন অন্ন পাক করিতেছিলাম। রন্ধনে তেমন পটু ছিলাম না বলিয়া একটী ভাত উঠাইয়া একজনকে দেখাইতেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম "হইয়াছে কি না?" তিনি কহিলেন "আর একটু হ'বে, এখনও একটু মাইজ আছে।" হরিনাথ নিকটেই বসিয়াছিলেন। কথাটী শুনিয়াই আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন "মাইজ—মধ্যভাগ—সার; মস্জ্ ধাতু, যা' থেকে মজ্জা।" আমি নীরবে শুনিয়া গেলাম। হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, তাইত?" আমি কহিলাম আমরা অমনভাবে বাঙ্গালা পড়ি নাই যা'তে প্রত্যেক কথার

ধাতু বলিয়া দিতে পারি। হরিনাথ হাসিলেন। এমন আবৃত্তি তাঁহার মুখে আরও শুনিয়াছি। ঠিক পণ্ডিতের মত তিনি আবৃত্তি করিতেন। হরিনাথ বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেব কাজও করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান প্রবৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল। এই জন্যই ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন হরিনাথ চিরদিনই ক্লেশ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। বড়ই সহিষ্ণু লোক ছিলেন বলিয়া তিনি কাহাকেও ইহা জানিতে দিতেন না। তথাপি দুএক সময়ে মনের আবেগ বাহির হইয়া পড়িত। হরিনাথ অমিতব্যয়ী ছিলেন না। ভোগবিলাস কাহাকে বলে জানিতেন না। দেশের জন্য তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন। দেশ তাঁহার জন্য কিছুই করে নাই। মানুষ ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। হরিনাথের মনে এমন ক্ষোভ আছে ইহা আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের প্রায় দশবৎসর পরে জানিতে পারি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রামে ছিলাম। একদিন শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত সঙ্গীত মুক্তাবলী পড়িতেছি সহসা হরিনাথ প্রণীত দুএকটী বাউলসঙ্গীতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। একটী গানের আরম্ভ এইরূপ—

"ওরে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশাকি, মনে একবার ভেবে দেখ্‌লে।"

ইহারই ভনিতায় হরিনাথ লিখিয়াছেন—

কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে।
বুড়ো বলদেব মত, কষ্ট কত, যায়গা না পায় কোন স্থলে॥

গানটী পড়িয়াই আমার প্রাণ ফাটিয়া গেল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল। হরিনাথকে আমি নিজেই ছিন্নবস্ত্র এবং ভগ্ন কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার কবিতে দেখিয়াছি! এ সবই মনে পড়িল। সেই দিনই হরিনাথকে এক চিঠি লিখিলাম। ইহার পূর্ব্বে দুই বৎসরের অধিক কাল আমি হরিনাথকে দেখি নাই। আমার পত্র পাইয়া হরিনাথ যে উত্তর লিখিয়াছিলেন, পাঠকদিগকে তাহা দেখাইবার বড় সাধ ছিল। ঐ পত্র বড়ই দীর্ঘ, বড়ই উপদেশপূর্ণ, বড়ই ভালবাসা মাখা। হরিনাথ তখন "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদ সম্বন্ধে পত্রে অনেক কথা ছিল। সে সবই ধর্ম্মের কথা, প্রাণের কথা। পড়িয়াই বুঝিলাম হরিনাথ সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতেছেন। ইহার পরে হরিনাথকে যতবার দেখিয়াছি সাধক ভাবেই দেখিয়াছি। আর তাঁহাকে সাংসারিক অভাবের নিমিত্ত ক্ষোভ করিতে দেখি

নাই বা শুনি নাই। বোধ হয় সংসারের নির্দ্দয় ব্যবহার হরিনাথের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত করিবার অন্যতর কারণ।

হরিনাথ সাধক হইয়াও বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তিদিগকে ভুলিয়া যান নাই। পুত্রকলত্রাদিকেও পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিতেন। তবে আপনার পার্থিব অভাব যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়া আনিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি যাহা আহার করিতেন, তাহা একটী শিশুর পক্ষেও পর্য্যাপ্ত খাদ্য নহে। হরিনাথ আমাকে একদিন বুঝাইয়াছিলেন "আহার একবারে কমান সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লঘু হইতে লঘুতর আহারেও শরীর ধারণ করিতে পারা যায়। আহার যত লঘু হয় মস্তিষ্ক ততই পরিষ্কার থাকে। কোন একটী নূতন জটিল তত্ত্ব বুঝিতে হইলে গুরু আহারে তাহার বড়ই প্রতিবন্ধকতা করে।" যাঁহারা কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন হরিনাথ কত জটিলতত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া হরিনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে নানা কথার পর হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানে লোকের প্রাণ আছে ত? ইহার পরে তমলুক এবং জামালপুর হইতে আসিয়া যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি হরিনাথ ঠিক আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হরিনাথের প্রাণ থাকার অর্থ এই যে লোকের ধর্ম্মে মতি আছে কি না। হরিনাথ কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে মৃত্যুর অর্থ করিয়াছিলেন যে যাঁহারা কেবল সংসার লইয়াই ব্যস্ত, ঈশ্বরের দিকে যাঁহাদের গতি নাই তাঁহারাই মৃত। তিনি বুঝাইয়াছেন যে নদী সমুদ্রমুখে যায়, তাহাই জীবিত। আর যাহা কারণ বিশেষে বদ্ধ, তাহাই মৃত। তাহারই নাম মরা নদী। তেমনই মানুষও ঈশ্বরমুখে না গেলেই সে মরা মানুষ।

হরিনাথ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড়ই উদারমত পোষণ করিতেন। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। বিদ্বেষ ছিল কেবল কপটতার প্রতি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদে বুঝাইয়াছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াই ব্রহ্মাণ্ডপতির তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। সকল ধর্ম্মই এই চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহার নকলে যেটুকু ভুল হইয়াছে, সেই অংশই পরিত্যাজ্য। নকল ঠিক হইলে সকলই গ্রাহ্য। হরিনাথ কতবার আমাকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ দেখাইয়াছেন হরিনাথ প্রথম ও মধ্য জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন শেষ জীবনে হিন্দু

হইয়াছিলেন। হরিনাথ যখন যাহাই থাকুন ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মভাব চির-দিনই তাঁহার অচল এবং অটল ছিল। হরিনাথ এক সময়ে কুমারখালির ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সেই হরিনাথই শেষ জীবনে ব্রহ্মাণ্ডবেদে সাকার উপাসনার সুন্দর সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বুঝাইতে গেলে এই প্রবন্ধে স্থান কুলাইবে না। বিস্তৃত জীবনীলেখক একথার আলোচনা করিবেন সন্দেহ নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি হরিনাথে কোন দিনই ধর্ম্মের ভাণ ছিল না। তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন। আমি বঙ্গের এক পরিবারে দুই সহোদর দেখিয়াছি, একজন গোঁড়া হিন্দু আর একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। কে ভাল কে মন্দ বলিতে পারিব না। দুজনেই কিন্তু খাঁটি জিনিষে পরিপূর্ণ। নকল কাহাতেও নাই। সারাংশ গ্রহণ করিলে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এক হরিনাথের একথার এই এক প্রমাণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিনাথ এক একটী সামান্য ঘটনা হইতে এক এক অসাধারণ সত্য উদ্ঘাটন করিতে পারিতেন। সাধনরাজ্যে উন্নতি লাভ করি-বার পর তাঁহার এই ক্ষমতা যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হরিনাথকে একদিন আমি আমার লিখিত সৎকথা পড়িয়া শুনাইতেছিলাম হরিনাথ বলিলেন "এ ত আমার ব্রহ্মাণ্ডবেদের অংশ হইয়াছে"। আমি কহিলাম "মনে করিতেছি ছাপাইয়া দিব।" হরিনাথ বলিলেন "তাহাতে আবার দ্বিধা কেন? যাহা কিছু লিখিবেন তাহাই প্রকাশ করিবেন। প্রকাশ করাই চৈতন্যের লক্ষণ। তদ্বিপরীত ভাবই জড়ত্ব। দেখুন, অল্পবয়স্ক শিশুরা ধূলা কাদা দিয়া যদি কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাহা হইলেও উহা কিছু হউক আর না হউক সকলকেই দেখাইবে, কহিবে "দেখ, আমি কি একটা গড়েছি।" শিশুতে চৈতন্যের অল্প পরিস্ফুরণ মাত্র। আর দেখুন যাঁরা কোন ধর্ম্ম মানেন তাঁরাই বলিবেন ভগবান সমস্ত সৃষ্টি করিয়া শেষে মানুষ সৃষ্টি করেন। যাহা করিলাম ইহা বুঝিবে কে, এই ইচ্ছা হইতেই মনুষ্যের সৃষ্টি। তাই আপনার অংশ দিয়া মনুষ্য নির্ম্মিত। আমরা যাহা কিছু গড়ি, তাহাই অন্যকে দেখাই-বার জন্য।"

দুঃখের বিষয় এই যে হরিনাথ এমন গঠিত জিনিষ অনেকটা পৃথিবীকে দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থাভাবে ব্রহ্মাণ্ডবেদের অনেকাংশ এখনও অপ্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া হরিনাথ

লিখিয়াছিলেন কোন মূকব্যক্তি এক উৎকৃষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে না পারায় যে যন্ত্রণা ভোগ করে কাঙ্গাল তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশ করিতে না পারিয়া সেই যাতনা অনুভব করিতেছেন। ধন্য আমাদের দেশ যে ব্রহ্মাণ্ডবেদের ন্যায় জিনিষ প্রকাশ করিতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য মিলিল না। বলা কর্ত্তব্য যে দেশের কতকগুলি বড়লোক হরিনাথকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এবং ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশার্থ অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-বেদে ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার আছে। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি ব্রহ্মাণ্ডবেদের গ্রাহক সংখ্যা অতি অল্প ছিল। যাঁহারা গ্রাহক ছিলেন তাঁহা-দের মধ্যেও কেহ কেহ নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন নাই। গ্রামবার্ত্তায় সর্ব্বস্বান্ত হরিনাথের শেষ জীবনে এমন সম্বল ছিল না যে তিনি নিজ ব্যয়ে ব্রহ্মাণ্ডবেদ মুদ্রিত করেন।

একদিন রবিবারে হরিনাথের বাড়ীতে আমি স্বয়ং রন্ধন করিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিতেছি, হরিনাথ সম্মুখে বসিয়া আছেন। আমি কহিলাম আপ-নার বাড়ীতে এই হবিষ্যান্নও কি এত মিষ্ট লাগে? হরিনাথ কহিলেন "আমার বাড়ীর কিংবা আমার প্রদত্ত তণ্ডুলের কোনই গুণ নাই। আপনি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়াই মিষ্টত্ব। বাড়ীতে অন্যে রন্ধন করিয়া দিতেন। এই জন্যই প্রবাসের অন্ন বড় মিষ্ট। প্রবাসে পরিশ্রম করিতে হয়। যাহা পাইতে যত পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহার মিষ্টত্ব ততই অনুভব করা যায়। দেখুন এই জন্যই ভগবান তাঁহাকে পাইবার পথ এত দুর্গম করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার চেয়ে মিষ্ট কিছুই হইতে পাবে না। তিনি সহজে ধরা দিলে মানুষ তাঁহার মিষ্টত্ব বোধ হয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিত না।" আমি ভাবিলাম কি সামান্য কথা হইতে কত উচ্চ সত্য প্রতি-পন্ন হইল। হরিনাথ এমন কত কথাই হয়ত কতজনকে কহিয়াছেন। সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহাতেই এক মূল্যবান পুস্তক হইতে পারে।

হরিনাথ সাধক হইলেও দেশের এবং সমাজের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি চির-দিন সমান ছিল। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি যখন তাঁহাকে শেষবার দেখিয়া ময়মনসিংহে আসি তখনও তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন। বালকদিগের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি কহিলেন "দেখুন, ৮।৯ বৎসরের বালককে জ্যামিতি পড়ানো

আর মাথনের উপর পাথর ভাঙ্গা একই কথা। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক ভবিষ্যতের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়ঃ আর আমি এখন বৈশাখ মাসেও ছেলেদিগকে পায়ে মোজা দিতে দেখিতে পাই। দেখুন, আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ। এখানে দ্বাদশ পা বাড়ালেই পা ধুইতে হয়। ইহাই ছিল সেকালের নিয়ম। এখনও পুরোহিতঠাকুরেরা লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিতে আসিয়া একপাড়ার প্রতি যজমানের বাড়ীতে যাইয়াই পা ধুইয়া থাকেন। ইহাতে পবিত্রতা ও স্বাস্থ্য দুইই আছে। ইহার পর হরিনাথ কহিলেন আমরা যে এখন মধ্যাহ্নে কাজ করি ইহাতেই আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। আমাদের দেশে কাজের উপযুক্ত সময় পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন। দেখিবেন এখনও যাঁহারা জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সকলেই নীরোগ ও দীর্ঘজীবি।" হরিনাথ শেষ জীবনেও যে দেশের ভাবনা পরিত্যাগ করেন নাই এই সমস্ত কথাই তাহার প্রমাণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিনাথের সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। ইহজগতে আর সে সুন্দর প্রশান্ত দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তেমন মধুময় জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলি আর শ্রবণ করিব না। একজন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে শেষজীবনে হরিনাথের গৈরিকবসনাবৃত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে দেবদূত বলিয়া ভ্রম হইত। কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদেই পড়িয়াছি সাধনায় কতকদূর অগ্রসর হইলে শরীর হইতে একরূপ দিব্যগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। হরি-নাথের দেহে এইরূপ গন্ধ আমি অনুভব করিয়াছি। অনেকে এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপহাস করিতে পারেন। তাহাতে আমার দুঃখ নাই। হরিনাথ কি উচ্চ-প্রকৃতির লোক ছিলেন আর তিলির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সাধন-রাজ্যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণার্থ আমি আর একটী মাত্র কথা বলিব। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভারতবিখ্যাত সাধক-প্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরিনাথের দেহত্যাগের পরে হৃদয়ের গভীর শোকোচ্ছ্বাসময়ী "শ্মশানে কাঙ্গাল" নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার একচরণ এই— "তোমায় শাসনে ভাবি পিতৃসম, সাধনে ডাকি দাদা বলে।" চরিত্রে কত মহত্ত্ব থাকিলে এবং সাধনায় কতদূর সিদ্ধিলাভ করিলে শিবচন্দ্রের ন্যায় সিদ্ধতাপস হরিনাথকে উদ্দেশ করিয়া এমন কথা কহিতে পারেন পাঠক স্বয়ং তাহা বিবেচনা করিবেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। হরিনাথের কথা লিখিতে গেলে ফুরায় না। বৎসরান্তে বা দু'বৎসর পরে একবার যাইয়া হরিনাথের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার পবিত্রতাময় দরিদ্রকুটীরে যে শান্তি পাইতাম অনেক ধনীর প্রাসাদে তাহা পাই না, পাইব না। নিদারুণ সংসার-রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া দিনেকের তরে সেই মহাপুরুষের শীতল ছায়ায় যাইয়া উপবেশন করিতাম। ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের ৫ই তারিখে সে সম্ভাবনা শেষ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ।	আশ্বিন, ১৩০৪ সাল।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

যৌনসার।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা হিমাচল নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যে আবৃত ও প্রায়ই জনমানবশূন্য। মানচিত্র দেখিলে কতকটা এইরূপই প্রতীতি হওয়া সম্ভব, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় পল্লী ও জনপদ সাধারণ মানচিত্রে প্রদর্শিত হয় না। এ ধারণা কিন্তু প্রকৃত নয়। বনভূমি নাই এমন নয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক লোকালয়ও প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল পর্ব্বতবাসীদিগকে আমরা সমষ্টিভাবে পাহাড়ী বলিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা সকলেই এক জাতিভুক্ত নয়। ব্রহ্মদেশপ্রান্তে ছিন্দ্বিন প্রভৃতি,—আসামসান্নিধ্যে সিংফো, মিশ্‌মী, আবর, আকা প্রভৃতি ভুটানে ভুটিয়া, সিকিমে লেপ্‌চা, নেপালে গুর্খা বা নেপালী, কুমাউনে কুমাউনী, গাড়বালে গাড়বালী, এইরূপে ক্রমান্বয়ে বুশায়র, চম্বা, কুলু, কুনাবর, লাহোল, কাশ্মীর, লাদাক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বসতি। এই সকল বিভিন্ন নামধেয় প্রদেশ প্রায়ই ক্ষুদ্রায়তন, বস্তুতঃ দেশ যতই বন্ধুর হয়—লোকের পক্ষে দূর দুরান্তর যাতায়াত করা ততই কষ্টকর হইয়া উঠে, সুতরাং সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া ততই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ সংস্থাপন করিয়া কতকটা কূপমণ্ডূকবৎ বাস করাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই কারণে পর্ব্বতসংকুল ক্ষুদ্র সুইজরল্যাণ্ড ২২টি জেলায় বিভক্ত, কোনও কোনও জেলার লোকসংখ্যা ২০ হাজার অপেক্ষাও অল্প, আর ক্ষুদ্র স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য অংশের আদিম অধিবাসীরা বহুসংখ্যক স্বাতন্ত্রপরায়ণ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল।

হিমালয়ের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রপ্রদেশের মধ্যে যৌনসার অন্যতম এবং তদ্দেশ-বাসিগণ যৌনসারী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধে কেবল দেশের পরিচয়ই দিব।

যৌনসারের পরিমাণফল ৩৪০ বর্গমাইল মাত্র। ইহার উত্তরসীমা মিত্র-রাজ্য গাড়বালের পশ্চিমদক্ষিণ সীমায় মিলিত, পূর্ব্বসীমা যমুনানদী, এবং পশ্চিম ও দক্ষিণসীমা টন্‌স বা তমসানদী। এই তমসানদী যমুনার উৎপত্তি-স্থলের অনতিদূরে একই পর্ব্বতশৃঙ্গের অপরপার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। তমসা প্রথমে দক্ষিণপশ্চিমবাহিনীভাবে গাড়বালপ্রদেশ ভেদ করিয়া, কিয়ৎ-দূরে তৎপ্রদেশের পশ্চিমসীমানির্দ্দেশক পামর বা পাবরনদের সহিত মিলিতা হইয়াছে, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া এবং যৌনসার প্রদেশকে বেষ্টন করিয়া হরিপুর নামক স্থানে যমুনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পাবরসঙ্গমের নিম্নে তমসার দক্ষিণতীরে আরও তিনটি মিত্ররাজ্য অবস্থিত; তাহাদের নাম যথাক্রমে উৎরোচ, জুব্বল ও শিরমূর; এগুলি পঞ্জাব গবর্ণ-মেণ্টের আদেশাধীন।

বহুপূর্ব্বকালাবধি যৌনসার শিরমূররাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু শিরমূররাজ নামমাত্র রাজ্যেশ্বর থাকিয়া সামান্যরূপ কর গ্রহণ করিতেন মাত্র—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই রাজ্যশাসন করেন নাই। শাসনকার্য্য কিরূপ সহজসুপ্রণালীতে সুসম্পন্ন হইত, তাহা 'যৌনসারী' নামক প্রবন্ধে বিবৃত হইবেক। শিরমূররাজবংশীয়েরা রাজস্থানের যশল্মীরের ক্ষত্রীয়রাজবংশ-সম্ভূত। ইহাদিগের শাসনাধীনে যৌনসার বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই সুখ সমৃদ্ধির তিরোধান হইয়াছিল। ইংরাজের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে নেপালাধিপতি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। গুর্খারা প্রথমে গাড়বালরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া অবশেষে তাৎকালিক শিরমূরাধিপতি দুর্ব্বুদ্ধি কর্ম্মপ্রকাশকে করায়ত্ত করিয়া সমস্ত প্রদেশ নেপালরাজ্যভুক্ত করিয়া ফেলিল। গুর্খাদের অত্যাচারে কৃষিজীবী যৌনসারীদের কৃষিকার্য্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল, অভাগারা কতক অনশনে, কতক গুর্খার খুকুরীমুখে, আর কতক ভারবাহীরূপে অন্যত্র প্রেরিত হইয়া জীবলীলা সংবরণ করিতে লাগিল। রক্ষা এই যে গুর্খারাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজের সহিত তৃতীয় বারের সমরের অবসানে ১৮১৫ খৃঃ

অব্দে নেপালরাজ কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমগ্র গাড়বাল ও শিরমুর রাজ্য ইংরাজপদপ্রান্তে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হয়েন। অতঃপর রাজা কর্ম্ম-প্রকাশ স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিকল্পে ইংরাজ সমীপে আবেদন করেন, কিন্তু তিনি নীচাশয় ও দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া তৎপুত্র ফতেসিংহকে ইংরাজেরা তৎসিংহা-সনে অধিরূঢ় করেন, এবং গুর্খাযুদ্ধের খরচা বাবদে যৌনসার প্রদেশ নিজ-আয়ত্তে রাখেন। ওদিকে গাড়বালের বিতাড়িত রাজা সুদর্শনসাহ অতি দীনভাবে দিনপাত করিতেছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বরাজ্যের কিয়দংশ মাত্র প্রত্যর্পণ করা হইল, দেহরাদূনের উপত্যকাভূমি ও অলকনন্দা নদীর বামপার্শ্বস্থ সমস্ত ভূভাগ ইংরাজাধীন রহিল। পুরাতন রাজধানী শ্রীনগর অলকনন্দার বামতীরে অবস্থিত বলিয়া ইংরাজকরায়ত্ত হইয়া গেল সুতরাং নবপ্রতিষ্ঠিত রাজা ভাগীরথীতীরে টিহরী নামক স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর প্রায় ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত, উভয়ই ইংরাজ শাসনাধীন হইলেও, দেহরাদূন ও যৌনসার পৃথকভাবে শাসিত হইতেছিল; পরে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে যৌনসারকে দেহরাদূন জেলার উপবিভাগে পরিণত করা হয়। পরে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে চাকরাটা নামক স্থানে সেনানিবাস সংস্থা-পিত হওয়ায়, তদবধি ছাউনীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ যৌনসারের প্রধান রাজপুরুষের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইহাই যৌনসারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যৌনসারের দুইপার্শ্বে দুইটি বৃহৎ নদী প্রবাহিত; ইহাতেই, যিনি কখনও পার্ব্বত্যপ্রদেশ দর্শন করিয়াছেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে উভয়ের মধ্যস্থলে নিশ্চয়ই একটি পর্ব্বতশ্রেণীর ব্যবধান আছে। প্রকৃতই তাই। হরিপুরের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে একটি ক্রমোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী মেরুদণ্ড-রূপে সমস্ত যৌনসারকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এই মেরুদণ্ডস্থিত তিন চারিটি উচ্চচূড়া স্বাস্থ্যান্বেষী ইংরাজ গিরিবিহারীদিগের সুপরিচিত। তন্মধ্যে দেববনই সুবিখ্যাত। এই স্থানটি চাকরাটা ছাউনীর সন্নিকটে, এবং এখানে বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে—উচ্চতা সাগরবক্ষঃ হইতে ৯৩৩১ ফিট্। কিন্তু উচ্চতাকল্পে করম্বাশৃঙ্গই সর্ব্বপ্রধান, ইহার ১০০৭৫ ফিট্ উচ্চ গর্ব্বিত-চূড়া সর্ব্বোপরি কিরীটরূপে বিরাজমান। মেরুদণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বামে ও দক্ষিণে প্রায়শঃ ক্রমনিম্নভাবে তমসা ও যমুনাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত। এইরূপ একটি শাখাপর্ব্বতের উপরে আধুনিক প্রধান নগর চাকরাটা নির্ম্মিত

হইয়াছে; এবং অপর একটিতে লোকাণ্ডী ও ময়লা নামক দুইটি বিখ্যাত পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। ইহারা উচ্চতায় প্রায় দেববনের সমকক্ষ। চাকরাটা ৭০০০ ফিট উচ্চ। উচ্চতাহিসাবে দার্জিলিং, নাইনীতাল, মস্থরী, চাকরাটা ও সিমলা প্রায় সমান। মেরুদণ্ডনিষ্ক্রান্ত প্রত্যেক দুইটি শাখার সন্ধিস্থলে যে গভীর নিম্নভূমি উহাই শাখানদীরূপে তমসা বা যমুনায় মিলিত। পর্ব্বত শাখার বহু প্রশাখা অনুশাখা আছে, সুতরাং শাখানদীগুলিও বহুকরদা-সংগমে ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালিনী। মেরুদণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বে নিপাতিত সমস্ত বৃষ্টিবারি তমসাভিমুখে ধাবিত, আর দক্ষিণ ও পূর্ব্বপার্শ্ববাহী সমস্ত সলিলধারা যমুনায় জীবনোৎসর্গতৎপরা। যে সকল গিরিসন্ধি প্রায়ই শুষ্ক থাকে তাহাদিগকে পশ্চিমহিমালয়ের পাহাড়ীরা খড্ বলে; আর যে গুলিতে সর্ব্বদাই জল চলে তাহাকে যৌনসারীরা গাড্ বলিয়া থাকে, অন্যান্য পাহাড়ীরা প্রায়ই নদী বলে।

প্রাকৃতিক নিয়মে পর্ব্বতের উচ্চতানুসারে উদ্ভিজ্জের তারতম্য হয়। যৌনসারের উচ্চতা দেখা যাইতেছে দেড়হাজার ফিট্ (হরিপুর) হইতে দশ-হাজার ফিট্ (করম্বা) পর্য্যন্ত, সুতরাং উদ্ভিজ্জ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী হইবারই কথা। হরিপুর সান্নিধ্যে—শাল পিয়াল পাটলী খদির বদরী ধাতকী; অসন অম্র অম্রাতক অশ্বত্থ সুবর্ণক ভল্লাতক; ধাত্রী বিল্ব মন্দারক হরীতকী বিভীতক; বট পর্কটী গাম্ভারী কাঞ্চনাড় শোভাঞ্জন; শিরীশ তিনিশ শেলু শাল্মলী শিংশপা ধব; তুন্ন তিন্দুক নির্গুণ্ডী কম্পিল্লক উডুম্বর; মদন ঝিঙ্গিনী জম্বু কুটজ কাকডুম্বর; শেফালী কেলিকদম্ব ধারাকদম্ব ধর্ম্মণ প্রভৃতি দ্রুমরাজির অহিংস্রা মাধবী কুন্দ ভদ্রবল্লী শ্যামা-লতা প্রভৃতি বিবিধবল্লরী ও আবর্ত্তনী শালপর্ণী ভাণ্ডীর করমর্দ্দক প্রভৃতি অগণিত গুল্মসংযোগে, ঘনবিন্যস্ত নিবিড় বন দেখিতে পাওয়া যায়। হরিপুর অথবা যমুনা ও তমসাতীর হইতে যতই উর্দ্ধে উঠা যায়, একে একে উহাদের প্রায় সকল গুলিই বিদায় গ্রহণ করে এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইনাই, তেজপত্র, অক্ষোট, কটফল প্রভৃতি কতকগুলি অভিনব বৃক্ষের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ক্রমে আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিলে আর এক প্রস্থ নূতন গাছের সঙ্গে পরিচয় করিতে হয়, ইহাদের মধ্যে বান, বুরাঁস, আয়ার, সুপ্রসিদ্ধ ক্বচিৎ অতি দীর্ঘায়তন 'সরলদ্রুমের' বৃক্ষবাটিকার ন্যায় পাৎলা বনও দেখিতে পাওয়া

যায়। আরও ঊর্দ্ধে ইহাদিগকেও আর দেখিতে পাওয়া যায় না; তখন বানের স্থানে উহারই ভ্রাতৃস্বরূপ মরু, সরলের ভ্রাতা কাইল ও জ্ঞাতি দেবদারু আর রাই, স্থান বিশেষে বা থুনের ও লিউরী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে সর্ব্বোচ্চ শিখরসমূহে বান মরু ও ইনাইয়ের অন্যতম ভ্রাতা খরশুরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে কোথাও রাই ও কোথাও মরিণ্ডা উহারই সখারূপে মিলিত থাকে। ক্বচিৎ ভূর্জপত্রও দৃষ্ট হয়। ইহার চিক্কণ ত্বক্ দ্বারা এদেশের লোকে আমাদের দেশের তালপাতার ছাতার ন্যায় এক প্রকার ছাতা প্রস্তুত করে। গুল্মের মধ্যে দারুহরিদ্রা, হেমপুষ্পিকা প্রভৃতি কয়েকটি সমধিক সুশ্রী ও লতার মধ্যে সেবতী সর্ব্বাপেক্ষা রূপসী ও গুণবতী। সেঁউতীর পীতপরাগশোভিত শ্বেতপুষ্প দেখিতে অতি সুশ্রী, আর উহার সৌরভ বোধ করি উদ্যানজাত সর্ব্ববিধ গোলাপ অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক।

পাহাড়ের অধিকাংশ বৃক্ষই চিরশ্যামল তথাপি বসন্তসমাগমে নূতন ও পুরাতন পত্রের সমাবেশে সকলেই অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। চটকের হিসাবে বুরাঁসেরই বাহার বেশী। কতকটা আমাদের দেশের কাঁটালের পাতার ন্যায় ইহার পাতা গাঢ় হরিদ্বর্ণ ও ঘনরচিত, গাছগুলিও বড় বড় আমগাছের ন্যায় উচ্চ। বসন্তকালে রক্তজবার ন্যায় সুবৃহৎ পুষ্পগুচ্ছ প্রতি পল্লবের অগ্রভাগে সমুদ্গত হয়, এই ফুল দুই তিন মাস পর্য্যন্তও শুকায় না, শুকাইলেও বর্ণের বিকৃতি হয় না, গাছের দিকে চাহিলে চক্ষুঃ ঝলসাইয়া যায়, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ অন্য কোনও বস্তুতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাও লোহিত রঞ্জিত বোধ হয়। মরিণ্ডাও অতি সুন্দর গাছ, আকারে বোধ করি ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ১৬।১৭ হাত পরিধিবিশিষ্ট ও ১৫০ হাত উচ্চ, উচ্চ মরিণ্ডা দুষ্প্রাপ্য নয়, কলিকাতার মনুমেণ্টের প্রায় দ্বিগুণ উচ্চ নমনশীল ক্রমক্ষুদ্র শাখাগুলি ঊর্দ্ধে না উঠিয়া নিম্নাভিমুখে ঝুলিতে থাকে, গাঢ় হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র পত্রনিচয় অতি উজ্জ্বল, রবিকরে নিরন্তর ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। বসন্তে প্রতি পল্লবাগ্রে সোণার জরির থোপনার মত পীতবর্ণের নবপত্র উদ্গত হইয়া অমানিশাকাশশোভী তারাদলবৎ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যে সকলেই পরাস্ত, দেবদারুর নিকটে। এ দেবদারু আমাদের দেশের দেবদারু নয়, প্রকৃতই দেবদারু—"পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভ-

ধ্বজেন”। অমরাবতীর শোভা বৰ্দ্ধনার্থে দেবগণ ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে যখন মন্দাকিনী ভূতলে আগমন করেন, এই দেবদারুর বীজ তদীয় পূতবারিতে ভাসিতে ভাসিতে মর্ত্তে আসিয়া থাকিবে, সেই জন্ম জগতের অন্য কোনও বৃক্ষের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই—তুলনাও হয় না। দেবদারু যথার্থই চিরসুন্দর, ছোট চারাটি হইতে মুমূর্ষকাল পর্য্যন্ত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্ব্বিশেষে সমান সুন্দর। সে যে কি অনুপম সৌন্দর্য্য, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার নয়। শীতে স্তরবিন্যস্ত শাখাবলী হিমানীভারাক্রান্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, বসন্তে সতত স্পন্দনশীল নমিতাগ্র বিকচ নব-কিশলয়সমূহ মন্দমারুতসহ অবিরত কেলীতৎপর, আর প্রাবৃটে গুচ্ছীকৃত সূচিবৎ পত্রনিচয়ের অগ্রভাগে মুক্তাফলসদৃশ অগণিত বারিবিন্দু সংবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করে; দিবসে প্রখর রবিকরে সে যেন কেমন সচেতন মাধুরী,—নিশায় নির্ব্বাত মেদুর চন্দ্রালোকে সেই এক অপরূপ ঘুমন্ত হাসি। এ সুষমা কবি ও ভাবুকের চক্ষে দেখিয়া উপভোগ করিতে হয়, না দেখিয়া কেবল বর্ণনা পাঠ করিয়া উপলব্ধি করা অসম্ভব।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও কিঞ্চিৎ আভাস দিব—কিন্তু কেবল আভাসই মাত্র, কারণ সে মহনীয় সৌন্দর্য্যরাশিকে বর্ণনাধীন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সেই আভাসটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রিয়পাঠককে কল্পনারথে আরোহণ করিয়া একটিবার করম্বাশিখরে উপনীত হইতে হইবে। তথা হইতে নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে প্রায় সমগ্র যৌনসারই দেখিতে পাই-বেন, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, বনের পর বন, রজতরেখাসদৃশ অগণিত গিরিনদী, সকলই নিম্নে মানচিত্রের ন্যায় দেখিবেন। তথায় মাধ্যাহ্নিক প্রখর রৌদ্রেও অত্যন্ত শীতানুভব হয়, মৃদুপবনের তরলস্পর্শে প্রাণমনঃ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সত্যসত্যই উড়িবার নিমিত্ত উৎকট বাসনা জন্মে, মনে হয় এই সুখস্পর্শ বায়ু-সাগরে গাছাড়িয়া দিয়া শিখরে শিখরে উড়িয়া বেড়াই। যদি অনতিপূর্ব্বেই বৃষ্টি হইয়া গিয়া থাকে, তবে পাঠক দেখিতে পাইবেন সদ্যোসঞ্জাত শুভ্র মেঘ-শিশুগুলি পর্ব্বতের বিপুলাঙ্গে গাঢালিয়া দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া কখন উর্দ্ধে কখন নিম্নে ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখন সুশ্যামল দ্রুম-রাজির পত্রান্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে, কখন দূরস্থ সুনীল গিরিচূড়াকে বেষ্টন করিয়া গিরিবরের শিবস্ত্রাণরূপে শোভা পাইতেছে, আবার তখনই হয়ত না-

জানি-কোথা হইতে আসিয়া আপনাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই কুজ্ঝটিকারূপী মেদুর মেঘশিশু ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। মুহুর্মুহুঃ বংশীধ্বনি ও দূরসংব্যাপ্ত সঙ্গীতরাগ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক, কিন্তু বাদক ও গায়ক কোথায় তাহা দেখিতে পাইবেন না, এমনকি স্বরলহরী কোন্‌দিক হইতে আসিতেছে হয়ত তাহাও বুঝিতে পারিবেন না, যেন আকাশের সঙ্গীত, অথবা যেন স্বয়ং বনদেবী প্রকৃতিসুন্দরীর প্রীতিকামনায় সঙ্গীতালাপ করিতেছেন।

কিন্তু এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি যৌনসারেই আবদ্ধ ছিল। ঊর্দ্ধে উত্তরাস্তে ও কি মহনীয় দৃশ্য! যতদূর দৃষ্টি চলে চিরহিমানীমণ্ডিত অগণিত গিরিশৃঙ্গ-সমবায়ে উজ্জ্বলরজতপ্রভ নিরবচ্ছিন্ন গিরিপ্রাকার। উচ্চতা ও উজ্জ্বলতা নিবন্ধন শৃঙ্গগুলি অতি নিকট বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় যেন এখনই গিয়া উপরে বসিতে পারা যায়, কিন্তু করম্বাশিখর হইতে উহাদের নিকটতম শৃঙ্গের দূরত্বও সরলরৈখিকভাবে ২৫ ক্রোশের অধিক। ঐ সকল ধবলশৃঙ্গের উচ্চতা ২২০০০ হইতে ২৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত, সুতরাং হিমানীমুকুট ৭ হইতে ১০ হাজার ফিট ব্যাপী, কারণ ১৫০০০ ফিটের উপরে বরফ কখনই গলে না। বরফরাশি মধ্যাহ্ন-রবিকিরণে সুমার্জ্জিত রজতস্তূপবৎ এবং প্রাতে ও সায়াহ্নে কাঞ্চনাভ প্রতীয়মান হয়। কখন কখন শুক্লবর্ণা কাদম্বিনী অতি মন্থরভাবে ধবলশৃঙ্গ সমূহকে আলিঙ্গন করিয়া আকাশরেখাকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে, তখন পর্ব্বতে মেঘভ্রম এবং মেঘে পর্ব্বতভ্রম উপজাত হয়, শৃঙ্গগুলি যেন মেঘান্তরালে 'লুকোচুরি' খেলিতে থাকে। আবার কখনও ভ্রমরবিনিন্দী কালমেঘ পর্ব্বত-মূল হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে—ক্রমে কতক অংশ মেঘাবৃত হওয়ায়, সে এক অপূর্ব্ব হরিহররূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।
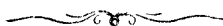
কুমারসম্ভবের উমা।

কালিদাস উমাচরিত্রে কোনরূপ দেবভাব আরোপিত করেন নাই। যদিও পূর্ব্বজন্মের যোগবিসৃষ্টদেহা সতীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি উমাতে অতিমানুষ অথবা অলৌকিক কোন ক্ষমতা আরোপ করেন নাই। এই জন্যই উমাচরিত অধিক মনোজ্ঞ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। এমন কি উমাচরিত সম্পূর্ণরূপে নারীজাতির আদর্শস্থানীয় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি প্রচলিত হরগৌরী উপাখ্যান হইতে উমাচরিত্র এরূপ কাব্যোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তাহা হইতে হিন্দুনারীর চরিত্র জন্ম হইতে পরিণয়ক্রিয়া পর্য্যন্ত কিরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া উচিত বেশ বুঝা যায়। উমা একদিকে অতি মৃদুস্বভাবা, বিনীতা, ভক্তিমতী, আর একদিকে বিদ্যাবতী, প্রখর বুদ্ধিমতী এবং কঠোর তপঃস্বিনী। কবি আবার তাঁহাকে শকুন্তলাদির ন্যায় অতিশয় কোমল-তনু করিয়াছেন; তপস্যা শকুন্তলাকেও যেমন সাজে না উমাকেও তেমনি সাজে না। প্রচলিত উপাখ্যানের উমা এত কোমলা, মৃদুস্বভাবা নহেন। আমরা গিরীশ-গৃহিনী গৌরী বলিলে একটু উগ্রচণ্ডমূর্ত্তি বলিয়া বুঝি। আমাদের দেশে এরূপ বুঝিবার কতকগুলি কারণ আছে। অস্মদ্দেশপূজিতা আশ্বিনের অম্বিকাদেবী উগ্রচণ্ডমূর্ত্তি মহাশক্তি; বাসন্তী অন্নপূর্ণাও জগতের অন্নদায়িনী বলিয়া মহাশক্তিশালিনী। আরো একটী কারণ আছে। বাঙ্গালীর প্রিয়কবি ভারতচন্দ্র মহাদেবীকে বিধিবিষ্ণুহরের প্রসূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইঁহাতেই সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়াছেন। গুণাকরের শিবঠাকুর শিবানীর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলের ন্যায় হইয়াছেন। কালিদাসের উমা ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

উমার বাল্যলীলা বড়ই সংক্ষেপে কিন্তু ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা খুব সাদাসিদে। অলঙ্কারের পারিপাট্য নাই। শৈলবধূ মুনিগণেরও মাননীয়া মেনকাদেবী শুভদিনে কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। বন্ধুজনেরা কন্যার নাম পর্ব্বতরাজপুত্রী বলিয়া পার্ব্বতী রাখিলেন; কিন্তু তাঁহার উমা নামই প্রসিদ্ধ হইল। তাহার একটু কারণও ছিল। তপস্যা করিতে যাইওনা মাতার এই নিষেধবাণী হইতে উ এবং মা এই দুই শব্দের যোগে উমানামের উৎপত্তি হইল। ভারতচন্দ্র উমানামের আর এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন;

"উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে স্ত্রী তাঁর।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥"

তারপর বালিকা দিনে দিনে চান্দ্রমসীলেখার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। সখীসমেতা হইয়া মন্দাকিনী-পুলিনে পুত্তল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার সময় হইল। কিন্তু বিদ্যাভ্যাসের সময় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। বালিকা মেধাবিনী ছিলেন; পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত বিদ্যাও সহজে তাঁহার আয়ত্ত হইল। কালিদাস জন্মান্তরবাদী ছিলেন। হিন্দুমাত্রেই জন্মান্তরবাদী। মহাকবি সময়ে সময়ে তাঁহার কাব্যমধ্যে এই জন্মান্তরবাদ বড়ই মধুররূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শকুন্তলায় বলিয়াছেন;

'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতী যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবাস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি॥"

আজকালকার শিক্ষিত হিন্দুও বোধ হয় জন্মান্তর মানিয়া থাকেন। গীতায় ভগবদুক্তির মর্ম্মও এইরূপ

"তত্রতং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যত তে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"

এই জন্মান্তরের কথাটি বড়ই কবিতাময়। একজন্মবাদী খৃষ্টান-ভাবুক কবিরাও প্রতিভাবলে সময়ে সময়ে এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। ভাবুক কবি Wordsworth এর "আত্মার অবিনশ্বরতাসম্বন্ধে গীতিকবিতা" ইহার দৃষ্টান্ত। কবিগণ প্রায়ই কাব্যের নায়কনায়িকাদের বাল্যজীবনের বর্ণনা করেন না। তাহা সর্ব্বজনবিদিত এবং প্রায়ই বিশেষত্ববিহীন। কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে ঘটনাচক্রে ফেলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রদর্শন করান। কালিদাস উমার বাল্যলীলা এবং যৌবনের ধারাবাহিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে কালিদাস পরিণয় পর্য্যন্ত আদর্শনারীর কিরূপ চরিত্র হওয়া উচিত ইহাই কুমারসম্ভবে দেখাইতেছেন, এইজন্য বাল্যকৈশোরের বর্ণনার অবতারণা। আর একটু বিশেষ কারণ আছে। স্বার্থান্ধ দেবতারা এবং স্বয়ং মদনদেবও এই উমারূপের উপর বড়ই নির্ভর করিয়াছিলেন। সেইজন্য উমারূপের এত তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা। যে সে সৌন্দর্য্য নয় অলোকসামান্য দেহ সৌন্দর্য্য দ্বারাও আদর্শ পতি-প্রেম

পাওয়া যায় না। এই প্রেমের অধিকারিণী হইতে হইলে মানসিকবৃত্তিগুলির সৌন্দর্য্যও সম্যক স্ফুর্ত্তি চাই। এই জন্য কবি প্রথমে উমার বাল্যরূপের বর্ণনা করিয়া ১৭টি শ্লোক দ্বারা উমার যৌবনের চূড়ান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। অনুপম সৌন্দর্য্যময় যৌবনের বর্ণনা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। অলঙ্কার গুলিও বড় সুন্দর। পাৰ্ব্বতী যৌবনে পদার্পণ করিলেন; কবি বলিলেন, "নবযৌবনে উমাদেহ চতুরস্রশোভি হইয়া উদ্ভাসিত হইল; যেন তুলিকা দ্বারা চিত্র উন্মীলিত হইল; যেন সূর্য্যাংশু নলিনীকে বিকসিত করিল"। ইহার পর নারদমুনি একদা হিমালয় সমীপে তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী একপত্নী হইবেন। গিরিরাজ সেইজন্য কন্যা প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছে দেখিয়াও বরান্তরের অনুসন্ধান করিলেন না। কিন্তু মহাদেব নিজে স্বকন্যার পাণিপ্রার্থী হন নাই বলিয়া উমার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে পারিলেন না। গিরিরাজ ভরসা করিয়া নিজে শিবের কাছে গেলেন না। তাঁহার ভয় হইল পাছে মহাদেব তাঁহার কথা না রাখেন। সে কালের লোকেরা বোধ হয় আজকালকার মত কন্যাদায়ভীতিগ্রস্থ ছিল না। কন্যার অভিভাবকেরা বোধ হয় বরান্বেষণে তত ব্যস্ত হইতেন না; বরেরাই স্বয়ং দেখা দিতেন। পশুপতি সতীর দেহত্যাগের পর আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি মন্দাকিনীবিধৌত হিমাচলের কোন অধিত্যকা প্রদেশে নিয়তচিত্ত হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন; কি ফল উদ্দেশে তপস্যা করিতেছিলেন তিনিই জানিতেন; কারণ তিনি নিজেই অন্যকে তপস্যার ফল প্রদান করিবার বিধাতা। অদ্রিনাথ স্বয়ং এই দেবাদদেবের পূজা করিয়া কন্যাকে ইঁহার আরাধনা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। জয়া বিজয়া সখীদ্বয়কেও এই কার্য্যে সহায়তার জন্য উমার নিকট রাখিয়া দিলেন। ভূতনাথ বালিকাদিগকে তাঁহার সেবা করিতে মানা করিলেন না। তপস্বীর কাছে রমণীর অবস্থান সমাধির অন্তরায় জন্মাইতে পারে বটে; কিন্তু ধূর্জ্জটি সেরূপ তপস্বী নহেন। সহস্র অন্তরায়ও তাঁহার মত ধীরের চিত্তবিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। এদিকে পাৰ্ব্বতীও প্রত্যহ গিরিশের পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি পূজার ফুল তুলিতেন, সম্মার্জ্জন দ্বারা বেদি পরিষ্কার করিতেন। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের জল ও কুশ আনিতেন, এইরূপে প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া মহেশ্বরের শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিলেন।

পিতৃনিদেশে নগেন্দ্রকুমারী গিরিশের পূজায় প্রবৃত্তা হইলেন। রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া রাজকন্যোচিত ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া গৌরী মন্দাকিনী-তীরে কোথায় এক দেবদারুবনে মহাদেবের পূজা করিতে আসিলেন। সঙ্গে মাত্র দুইটি সখী। আর যাঁহার পূজা করিবেন তাঁহার অনুচর প্রমথগণ। এই সময় হইতেই কবি উমাচরিত্রের চরমোৎকর্ষ এবং মাহাত্ম্য দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সত্য বটে পিতার আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয় এবং উমাও হিন্দু-রাজপুত্রী। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দ্বারা দেখা যায় যে কেবল কর্ত্তব্যবোধে নয় উমা প্রীতিপূর্ব্বক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও ত্যাগস্বীকার করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত আরম্ভ করিলেন। এখন হইতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে এই কুসুমসুকুমার কমনীয় দেহখানি কঠোর তপশ্চর্য্যার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ও অধি-কারী হইবে। পিতা দেখাইয়া দিলেন এই মহাদেব তোমার অনুরূপ বর, তুমি ইঁহার যোগ্যা হইতে চেষ্টা কর; ইঁহার পূজা কর, হয়ত সফলমনোরথ হইবে। উমা মেধাবিনী এবং বিদুষী। উমা বুঝিলেন কুমারীজীবনের একটি অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভের চেষ্টা। আরো দেখিলেন মহেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর ত্রিভুবনে আর কেহ নাই; এবং ব্রতাদি অনুষ্ঠান ব্যতীত এই ভর্ত্তৃলাভের অন্য কোন উপায় নাই; "অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং, তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ"। এই জন্য আনন্দিত মনে হরপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব যে এই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই হরগৌরী আদর্শদম্পতী। এই মহাদেব পুরুষোত্তম; আর এই গৌরী আদর্শকুমারী। মহাদেব কেন আদর্শ পুরুষ, এবং এই গৌরী কেন আদর্শ রমণী, ইঁহাদের পরস্পরের মিলন, পরিণয়ক্রিয়া কি উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে, হিন্দুনরনারীর পরিণয় কার্য্য কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মের বন্ধন, কি মহান্ বিরাট ব্যাপার এই সকল বুঝাইয়া দেওয়াই কাব্যের উদ্দেশ্য। এই কাব্যে হরগৌরীর যে অপূর্ব্ব প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহার পবিত্রতা স্বর্গীয়, তাহার গভীরতা অপরিমেয়; ইহা সম্পূর্ণরূপে কামগন্ধবর্জ্জিত। ইহাতে রূপজ মোহ থাকিতে পারে না; ইহাতে বাহ্যজগতের প্রভাব থাকিতে পারে না। মদনের সম্মোহন বাণ ইহার নিকট ব্যর্থ; মদনভস্ম দ্বারাই ইহার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রেম ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না; রোমিও জুলিয়েটের প্রেম ইহার সমকক্ষ নয়; দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার

প্রেম ইহা হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে কেবল এক পতিদেবতা সীতা এবং লোকোত্তরচরিত রামচন্দ্রের প্রেম। পতি পত্নীর প্রেম এইরূপই হওয়া উচিত। এই অপূর্ব্ব প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্যই কবি উমাকে এই কঠোর ব্রত ধারণ করাইলেন। এরূপ না করিলে কি পতিপত্নীর স্বর্গীয় প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে? হাবভাব কোর্টসিপে এই প্রেম লাভ হয় না। অশেষ গুণশালিনী নারীর সহিত সর্ব্বগুণাধার পুরুষের মিলন হইতে হইলে কঠোর ব্রতের আবশ্যক। চিরস্থায়ী প্রেম সহজসাধ্য নয়; কঠোর ব্রতসাধ্য। এই জন্য উমার যৌবনের প্রারম্ভেই নিয়মব্রতানুষ্ঠান। তারপর তপস্যা এবং বহুকষ্টের পর তপস্যার ফললাভ। এই অপূর্ব্ব মিলনেই অসুরবিজয়ী কার্ত্তিকেয়ের সম্ভব হইতে পারে। অন্য দম্পতী হইতে কুমার-সম্ভব সম্ভবপর নহে। পশুপতির ন্যায় পতি পাইবার জন্য এবং কুমারের ন্যায় পুত্রলাভ করিবার উদ্দেশে উমার এই ব্রতানুষ্ঠানকে আদর্শ করিয়া কুমারী হিন্দুবালিকারা আজও পর্য্যন্ত অতি শৈশব হইতে যথাবিধি নিয়মপূর্ব্বক শিবপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

উমা এইরূপে শিবপূজায় নিরতা রহিলেন। এদিকে দেবতারা এক মহাগণ্ডগোল বাধাইল। তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়া দেবতা প্রভৃতিকে বড়ই সন্তাপিত করিতেছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, সরিৎ, সাগর, ভূধর, প্রভৃতি সকলেই মহা পীড়িত। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, দেবতাদিগের দেবত্ব বিলুপ্তপ্রায়। দেবতারা তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ম্লানমুখে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া কমলযোনির স্তব আরম্ভ করি-লেন। পিতামহ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "তোমরা কিছুদিন প্রতীক্ষা কর; তোমাদের মনোরথ সফল হইবে; এই বিষবৃক্ষ আমি নিজে বাড়াইয়াছি; নিজে ইহার উচ্ছেদ করিতে পারি না। ভগবান্ নীললোহিতের আত্মজ ব্যতীত কেহই এই দৈত্যকে পরাজয় করিতে পারিবে না। সেই পরাৎপর পুরুষ এক্ষণে সমাধি নিমগ্ন হইয়া আছেন। তোমরা এক্ষণে উমারূপের সাহায্যে তাঁহার মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর। উভয়ে উভয়ের যোগ্য। এই যোগ্য দম্পতীর পুত্রই তোমাদের সেনাপতি হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিতে পারিবে"। দেবতারা সৎপরামর্শ পাইয়া নিজস্থানে গমন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই

মন্মথদেব কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তারপর মোসাহেবী আরম্ভ করিলেন এবং নিজের খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। বড়াই করিতে করিতে ফুলধনু বলিয়া ফেলিলেন, "আমি প্রিয়সখা বসন্তের সাহায্যে পিণাকপাণি মহেশ্বরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারি"। দেবতারা তাঁহাকে পাইয়া বসিলেন। দেবরাজ বলিলেন, "ঠিক তাহাই করিতে হইবে; হরগৌরীর মিলন করিতে হইবে; নতুবা দেবলোক ধ্বংস হইয়া যায়"। তারপর সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, খোসামোদ করিয়া সুরপতি মধুমন্মথকে হরযোগাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইবে, উমারূপের মোহে তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিতে হইবে। পুষ্পধনু প্রথমে বড়াই করিয়া ধরা পড়িয়াছেন। অগত্যা স্বীকৃত হইয়া চলিলেন; সঙ্গে সভয়ে চলিলেন প্রিয়সখা বসন্ত আর প্রিয়তমা বধু রতিদেবী।

এদিকে এই মহাষড়যন্ত্র হইল, কিন্তু উমাদেবী ইহার কিছুই জানিলেন না। উমাচরিত্র শুদ্ধ পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। অবৈধ উপায় অবলম্বন করা এই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাজে কাজেই এই ষড়যন্ত্রের বিষয় উমাকে কিছুই জানান হইল না। যখন ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইল তখনই কেবল তিনি প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি যেমন সখীগণের সহিত পুষ্পপত্র জলাদি আহরণ করিয়া পশুপতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন সেইরূপ করিতে লাগিলেন। বনস্থলীমধ্যে মধুমন্মথের আকাস্মক আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিলেন না। সদ্যোসমাগত বসন্তপ্রভাবে দ্রুমপুষ্পাদিতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িল। বসন্তের সমাগমে অশোক ফুটিল, সহকার মঞ্জরিল, কর্ণিকার, পলাশ, বিকশিত হইল; মলয় বহিল। পিয়ালের মঞ্জরীকণায় মৃগেরা অন্ধবৎ হইয়া বনস্থলীর শুষ্কপত্রের উপর বিচরণ করিতে লাগিল।* তারপর

*বর্ত্তমান লেখক এই মনোহর দৃশ্যটি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে চাঁইবাসা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে শাল, পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষের নিবিড় বন আছে। বিগত বসন্তের শেষে কয়েকটি বন্ধুর সহিত এই পথ দিয়া চলিবার সময় দেখিলেন দুটি মৃগশিশু রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে দ্রুতবেগে পিয়ালের জঙ্গল মধ্যদিয়া চলিয়া গেল। পিয়ালের বৃক্ষে তখন মঞ্জরী ছিল। পিয়ালের গাছ দেখিতে কতকটা ছোট শালগাছের ন্যায়। মঞ্জরী ঠিক আম্রমুকুলের ন্যায়। ফল দেখিতে ঠিক বৈঁচের

রতিমন্মথের প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম সকলেরই দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভৃঙ্গমিথুন এক কুসুমপাত্রে মধুপান করিতে লাগিল; কৃষ্ণসার শৃঙ্গস্পর্শে মৃগীর মন মোহিত করিল। গজমিথুন, চক্রবাক-চক্রবাকী অনুরাগসূচক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। শুধু তাই নয়; উদ্ভিদ্-জগতেও অনুরাগের সঞ্চার হইল।

"পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ, স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ, বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥"

কিন্তু মহাদেব কি করিলেন। চিত্ত যাহাদের বশ, বাহ্যবিঘ্ন তাহাদের কি করিতে পারে। অপ্সরোসঙ্গীত শুনিয়া মহেশ্বর আত্মানুসন্ধান-তৎপর হইলেন; আর তাঁহার অনুচর নন্দিকেশ্বর হস্তে হেমদণ্ড ধারণ করিয়া দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলিসঙ্কেতে নন্দী প্রমথগণের চাপল্য নিবারণ করিলেন। তাঁহার শাসনে বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভৃঙ্গ নিশ্চল, পক্ষিসরীসৃপেরা ভয়ে শব্দ করে না, মৃগেরা প্রশান্তভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে; জীবসঙ্কুলা কাননভূমি যেন আলস্যে চিত্রবৎ রহিয়াছে। মহাদেবের অলৌকিক কঠোর তপঃপ্রভাব যেন বাহ্য-প্রকৃতিতেও প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। কেবল মহাদেবের দেহ হইতে নয়, তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ জড়প্রকৃতি হইতেও যেন তপস্যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। কামদেব এমনি সময় ভূতনাথের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন দেবদারুবেদিতে শার্দ্দূলচর্ম্ম বিছাইয়া পশুপতি সমাধিতে নিমগ্ন আছেন। বীরাসনে বসিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার দেহোর্দ্ধভাগ নিশ্চল; উভয় অংশদেশ সন্নমিত। তাঁহার পরিধানে কৃষ্ণমৃগাজিন; জটাকলাপ ভুজঙ্গম বেষ্টিত। তাঁহার নেত্র স্পন্দহীন, দৃষ্টি নাসাগ্রনিবিষ্ট। প্রাণবায়ুর নিরোধ বশতঃ তাঁহাকে নিবাতনিষ্কম্প-প্রদীপবৎ বোধ হইতেছে। তিনি মনকে হৃদয় নামক অধিষ্ঠানে স্থাপন করিয়া আপনাকে আপনি ধ্যান করিতে-ছেন; কারণ তাঁহার পক্ষে অন্য পরমাত্মা নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মন্মথ ভয়ে

ন্যায়; খাইতে খুব সুমিষ্ট, অম্লমধুর। পিয়ালের ফলের উৎকৃষ্ট শরবৎ হয়। অমরকবি এই বসন্তবর্ণনায় নিজের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল চিত্রেও কবি নিজের অত্যাশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। মন্মথের প্রভাব, তপোনিরত মহাদেবের আশ্রম, বীরাসনে পশুপতির সমাধি, ব্রতধারিণী পার্ব্বতীর প্রবেশ, মদনভস্ম প্রভৃতির বর্ণনায় যেরূপ কবিত্ব আছে তাহা জগতে দুর্ল্লভ।

মোহগত হইলেন, তাঁহার হাত হইতে শরাসন শর পড়িয়া গেল; তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন পর্ব্বতরাজপুত্রী সখী-ভূতা বনদেবতাদিগের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি অশোককর্ণিকার প্রভৃতি বসন্তকুসুমাভরণে ভূষিতা; অরুণবর্ণদুকূল পরিধানা বলিয়া তাঁহাকে সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতার ন্যায় দেখাইতেছিল। উমাদেহ বিলাসবিভ্রমে মণ্ডিত নহে। শুদ্ধচারিণী কুমারীর দেহ বাহ্যহাবভাবে পরিপূর্ণ নয়। বাহ্য-সুষমাময় জড়দেহের সৌন্দর্য্যে উমাদেবী মহাদেবকে বশ করিতে যান নাই। কুমারীসুলভ সরলতা ও পবিত্রতাদ্বারা, সেবাশুশ্রূষাদ্বারা, যমনিয়মদ্বারা, তিনি পশুপতিকে পতিত্বে বরণ করিতে গিয়াছিলেন; গুণের দ্বারা গুণের আধারকে আকৃষ্ট করিতে গিয়াছিলেন। তাই উমার দেহযষ্টি নিরাভরণা; কেবলমাত্র পবিত্র বনকুসুম ভূষিতা। সেই পবিত্র অলৌকিক সুন্দরমূর্ত্তি দেখিয়া কুসুমায়ু-ধের বলবীর্য্য কতকটা ফিরিয়া আসিল; নিজের কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া যেন কতকটা আশার সঞ্চার হইল। ক্রমে উমা শম্ভুর আশ্রমদ্বারদেশে উপ-নীত হইলেন। সেই সময়ে ভগবান্‌ও যোগবলে পরমাত্মসংজ্ঞ পরমজ্যোতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দধারা অনুভব করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল; বীরাসন শিথিল হইল। নন্দী প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, শৈলসুতা শুশ্রূষার জন্য আসিয়াছেন; পরে দেবাদিদেব ভ্রূক্ষেপ দ্বারা অনুমতি প্রকাশ করিলে, দেবীকে প্রবেশ করাইলেন। তার-পর প্রত্যহ যেমন হয় সখীরা প্রণতিপূর্ব্বক বসন্তপুষ্পরাজি শিবের পাদমূলে ছড়াইয়া দিল। উমাদেবীও বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিলেন; তাঁহার অলক-রাশির মধ্য হইতে নবকর্ণিকার পড়িয়া গেল; কর্ণ হইতে পল্লব চ্যুত হইল। ধূর্জ্জটি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহি"। কুমারীকে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ করা যায় না। কুসুমশর অবসর বুঝিয়া শরাসনে জ্যা আরোপন করিলেন। পতঙ্গের অগ্নিপ্রবেশের পথ পরিষ্কার হইল। অহো কি বিড়ম্বনা! নির্ব্বোধ দেবতারা কামের সাহায্যে প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল! তারপর গৌরী মন্দাকিনীপদ্মবীজের জপমালিকা গিরিশকে অর্পণ করিলেন। ত্রিলোচন যেই তাহা গ্রহণ করিতে যাইবেন অমনি মন্মথ শরাসনে সম্মোহনবাণ সন্ধান করিলেন। চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি যেমন ঈষৎ সংক্ষুব্ধ হয় চন্দ্রশেখর তেমনি ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, বিম্বাধরা

উমার মুখের পানে একবার তাকাইলেন। শৈলসুতাও বিকসনোন্মুখবাল-কদম্বকুসমবৎ ঈষৎ কণ্টকিতা হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখী হইয়া রহিলেন। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বর পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়সংক্ষোভ নিবারণ করিয়া কেন এমন হইল জানিবার জন্য চারিদিকে একবার চাহিলেন। দেখিলেন

"—দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
—চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥"

অমনি তপোবিঘ্নহেতু ক্রোধে ভ্রূভঙ্গ হইল; ললাট নেত্র হইতে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর মদনকে কে রাখিতে পারে।

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি, যাবৎ গিরঃ খেমরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্র জন্মা, ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥"

বজ্র যেমন বনস্পতিকে সমূলে উন্মূলিত করে, ভূতনাথ সেইরূপ তপস্যার অন্তরায়ভূত কামদেবকে ভস্মীভূত করিলেন; এবং স্ত্রীসন্নিধান পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া ভূতগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়-জয় হইল। প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা হইল। পতিপত্নীপ্রেমের যথার্থ স্বরূপ দেখাইবার অবসর হইল। উমাচরিত্রের বিকাশের পথ পরিষ্কার হইল।

মদনভস্ম কুমারসম্ভবের প্রধান ঘটনা। এই মদনভস্মের উপর উমা-শম্ভুর অপূর্ব্ব চরিত্রের ভিত্তি সংস্থাপিত। কামের ভস্ম না হইলে হরগৌরী-চরিত্র অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কামভস্ম না হইলে হরগৌরী-মিলন ধর্ম্ম-পরিণয় হইতে পারে না। মন্মথের বিনাশে একদিকে পশুপতির মহা অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল, আর একদিকে উমার তপস্যারূপ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অবসর হইল। মদনভস্মের জন্য উমার দায়িত্ব কিছুই নাই। উমা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। পিতা হিমাচলও ইহার বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না। যাকিছু দোষ দেবতাদের। কিন্তু তথাপি উমারূপের উপর দেবতারা নির্ভর করিয়াছিল বলিয়া পার্ব্বতী নিজের রূপের উপর কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি নিজে রূপে ভুলাইয়া মহাদেবকে বশ করিতে আইসেন নাই। যমনিয়মের অনুষ্ঠান করিয়া, হৃদয়কে বিনীত করিয়া, রূপের গৌরব ভুলিয়া গিয়া, বিলাসবিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া শুশ্রূষারূপ নারীধর্ম্ম দ্বারা পশু-পতিকে পতিত্বে বরণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। দেবতারা বাদ সাধিলেন। অতর্কিতভাবে রূপের উপর যেন একটু দোষ আসিয়া পড়িল। অবশ্য নিজের রূপের জন্য কেহ দায়ী নয়।

বিধাতা যদি কাহাকেও অলৌকিক রূপরাশি দেন আর সেই রূপরাশিতে যদি কাহারও চিত্তচাঞ্চল্য হয় তাহা হইলে রূপের অধিকারিণীর কোন দোষ বা দায়িত্ব নাই। যাহার চিত্ত বিকার হয় সেই সম্পূর্ণ দোষী। উমারূপে অবশ্য মহেশ্বরের চিত্তবিকার হয় নাই; এবং উমাও তাঁহাকে রূপ দেখাইয়া বশ করিতে যান নাই। কিন্তু তথাপি তৃতীয় পক্ষীয়েরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রূপকে প্রাধান্য দিয়াছিল বলিয়া পার্ব্বতীরূপকে ধিক্কার দিলেন। "নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী"। সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিনশ্বর-রূপের নিগ্রহ করিবেন; তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির রোধ করিবেন; চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা, অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য দ্বারা, দেবাদিদেবের বরলাভ করিবেন। এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি মদনভস্মের দ্বারা পার্ব্বতীচরিত্রের ক্রমোন্নতি দেখাইলেন। আদর্শনারীর—আদর্শকুমারীর এইরূপ রূপগর্ব্ব দূরে নিক্ষেপ করিয়া, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা, গুণরাশি দ্বারা, সর্ব্বগুণশালী পতিলাভের চেষ্টা করা উচিত। এই আদর্শপতিই আবার কি মহান্ উন্নত চরিত্রের। তিনি "অরূপহার্য্য," অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের দ্বারা বশীকরণীয় নহেন। মদননিগ্রহ দ্বারা তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। কি কঠোর সংযমী; কি অলৌকিক ইন্দ্রিয়নিরোধ ক্ষমতা। ইহা ব্যতীত তাঁহার প্রাচীন বীরত্ব-কীর্ত্তি, অবদানপরম্পরাও অসংখ্য। কিন্নররাজকন্যারা তাঁহার প্রাচীন শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী গান করিয়া থাকে। তিনি অলোকসামান্যচরিত; তিনি নিষ্কাম। তিনি দরিদ্র হইয়াও সম্পদের আকর, তিনি শ্মশানবাসী হইয়াও ত্রিলোকীনাথ, তিনি ভীমাকার হইয়াও সৌম্যমূর্ত্তি। এরূপ স্বামী বিনা তপস্যায় কে পাইতে পারে। কবির এই মহাদেবচরিত্র সৃষ্টি অত্যাশ্চর্য্য ও অতি মহান্। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন কোন পুরাণকার এবং দু এক জন প্রাচীন বাঙ্গালীকবি এই আদর্শ চরিত্রকে যথেচ্ছভাবে চিত্রিত করিয়া দেবচরিত্রের অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছেন। এমন কি কবিবর গুণাকরও পশুপতির এক অত্যন্ত কদর্য্য ছবি আঁকিয়াছেন। মদনভস্মের বর্ণনাতেই ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

"কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান,
যে করে কামের শর।
শিহরিল অঙ্গ, ধ্যান হইল ভঙ্গ,
নয়ন মেলিলা হর॥

কামশরে ত্রাস্ত, নারীলাগি ব্যস্ত,
নেহালেন চারিপাশে।”

শুধু তাই নয়;

“মরিল মদন, তবু পঞ্চানন,
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া, নারী তপসিয়া,
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর,
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া, পশ্চাৎ তাড়িয়া,
ফিরেন শিব চঞ্চল॥”

কি ভয়ানক অবনতি ও অধোগতি। ভারতচন্দ্র শিব গড়িতে গিয়া এক অপূর্ব্ব জীব গড়িয়াছেন। আমরা কালিদাসের আদর্শ জিতেন্দ্রিয়মূর্ত্তি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। হৈমবতী ক্রমে এই আদর্শ পতির উপযুক্তা হইয়াছিলেন। এই আদর্শদম্পতী, হরগৌরী, হিন্দুসাহিত্যে আছে বলিয়া হিন্দুর এত গৌরব। হিন্দুর বিবাহও এই জন্য এক মহান্ বিরাট ব্যাপার, ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব মহা-বন্ধন। যতদিন কালিদাসের এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য হিন্দুনরনারীর মধ্যে গৌরবের সামগ্রী বলিয়া সমাদৃত হইবে, ততদিন হিন্দুজাতির বিবাহপ্রথা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং জগতের সর্ব্বত্র অনুকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইবে।

মদনভস্মের দ্বারা মহাকবি দেখাইলেন যে পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম মদনের সাহায্যে বিকাশ পাইতে পারে না। দম্পতীর প্রেম পবিত্র পুণ্যময়; ইহাই জগতের প্রকৃত প্রেম। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম। এই মদন মহাপাপ। পাপের সাহায্যে পুণ্যের সঞ্চার হইতে পারে না। হিন্দুনরনারীর বিবাহের পূর্ব্বে কামভাব আদৌ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। কামে যাহার উৎপত্তি কামেই তাহার লয় হইবার সম্ভব। কাজে কাজেই দাম্পত্য-প্রেমের উৎ-পত্তিতে কামের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বে ইউরোপীয় কোর্টসিপ্ প্রথা নাই। ইউরোপীয় কোর্টসিপে আছে, হাবভাব, বিলাস, বেশভূষা, গন্ধমাল্য, রহস্যালাপ, নৃত্য, গীত, প্রভৃতি কামের পূর্ব্বানুচর। আরো একটু বিশেষত্ব আছে। পরস্পরের দোষ চাপিয়া

রাখিয়া গুণের ভাগটি বিশেষ করিয়া পরস্পরকে দেখান ইহার প্রকৃত লক্ষণ। যৌবনের আবেশে নরনারীর অন্তর্দৃষ্টি তত সুতীক্ষ্ণ হয় না। তারপর কোর্টসিপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে পরস্পরের দোষগুণ ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর হয় না। তার উপরে আবার উভয় পক্ষ হইতে আত্মদোষ গোপন করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা। কাজে কাজেই উভয়ে উভয়কে পছন্দ করিতে গিয়া চন্দনতরুর পরিবর্ত্তে বিষলতার আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রেমের পরিবর্ত্তে কামের স্ফূর্ত্তি হয়; ক্ষণিক সুখের পর চিরবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। কখন কখন প্রেম Divorce আদালতে গিয়া ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য Courtshipএর প্রেমমাত্রই যে কামজপ্রেম হইবে এমন নয়। ইয়োরোপেও পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমেরও সহস্র সহস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে প্রেমের পবিত্রতা আছে সেখানে কামের আবির্ভাব থাকিতে পারে না। আমাদের হিন্দুমতেরও একরকম কোর্টসিপ্ হইতে পারে। পার্ব্বতীর তপস্যান্তে মহাদেব তাঁহাকে যেরূপে ছলনা করিয়াছিলেন, ইহাও একপ্রকার কোর্টসিপ্। কিন্তু ইহা হিন্দু কোর্টসিপ্। ইহাতে দোষের গোপন নাই; ইহাতে পরস্পর পরস্পরকে নিজের দোষগুণময় চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া দেখান। পরস্পরের যাকিছু দোষ আছে তাহা সমস্ত অকপটভাবে প্রকাশ করিয়া বলাই এই কোর্টসিপের লক্ষণ। ব্রহ্মচারিবেশে মহাদেব নিজের সমস্ত দোষভাগ উল্লেখ করিয়া দেখিলেন গৌরী বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা কি না। যদি এইসকল দোষ দেখিয়াও গৌরী তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরক্তা থাকেন তাহা হইলেই উভয়ের মিলন হইবে, নতুবা নহে। গৌরীও আপনাকে অতি দীনা অযোগ্যা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ভরসা কেবল তপোবল অর্থাৎ ব্রতনিয়মাদি দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা, মহাদেবের যোগ্যা হইবার চেষ্টা। এই জন্যই গৌরী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,

> "যথাশ্রুতং বেদবিদাং বর ত্বয়া
> জনোঽয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
> তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং
> মনোরথানামগতির্নবিদ্যতে॥"

যদি কোর্টসিপ্ করিতে হয় ত এইরূপ। এই হরগৌরীর Courtshipই হিন্দুর অনুকরণীয় হইবার যোগ্য।

বিবাহরূপ ধর্ম্মবন্ধনে কামের বিনাশ হওয়াই আবশ্যক। কবি প্রথমে মদনের প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। পরে দেখাইয়াছেন এরূপ মদনের বিনাশ হওয়াই উচিত। হরগৌরীকে প্রেমেবদ্ধ করা ইহার কাজ নয়। মদনের কীর্ত্তিকলাপ তাহার নিজমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি পাতিব্রতার ব্রতভঙ্গ করেন, ইন্দ্রের অবৈধ প্রণয়ের সাহায্য করেন, তপস্বীর তপোভঙ্গ করেন, চতুর্ব্বর্গপ্রার্থীর ধর্ম্মাদির পীড়ন করেন। দেবতারা এই অদ্ভুত বীরকে মহাদেবকে গৌরীবিবাহে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবৈধ প্রণয় সংঘটন করাই যাহার প্রকৃতি, পবিত্র হরগৌরীপ্রেমের সে কি ধার ধারে। কাজেই মদনভস্ম অবশ্যম্ভাবী। মদনভস্মের আর একটা কারণ ছিল, প্রজাপতির শাপ। সেও একটা অতি কুৎসিত কুকার্য্যের জন্য। সে যাহাই হউক এই মদন, সৌন্দর্য্যের—বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। বাহ্যসৌন্দর্য্যের সাহায্যে পবিত্র-প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় না। কবি মদনভস্ম দ্বারা এইটি বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এদিকে আবার অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত উমাচরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পাছে উমাচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে এইজন্য উমা নিজে বাহ্যসৌন্দর্য্যে পশুপতিকে বশীভূত করিতে যান নাই। দেবতাদিগের নিজের প্রয়োজন ছিল। তাঁহারাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহ্য-জগতের সৌন্দর্য্যের সাহায্যে—মদনের সাহায্যে মহাদেবকে প্রেমাসক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা নিষ্ফল হইয়াছেন। এই ঘটনা দ্বারা একথাও বুঝিতে হইবে যে, রমণী যদি নিজেও এইরূপ রূপের মোহে, পুরুষকে মোহিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টাও এইরূপ বিফল হইবে। কেবল হরপার্ব্বতীর প্রেমের আদর্শে যে পবিত্র প্রেমের বিকাশ হইবে তাহাই চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভব।

এই আদর্শনারী উমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইবার জন্যই আমাদের দেশের কুমারীকন্যারা অতি শৈশব হইতেই শিবপূজার ব্রত করিয়া থাকে। তাহারা সুকুমারদেহে উপবাসাদি অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করে। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, মনোবৃত্তিগুলির বিকাশ হইয়া থাকে। ইহা পার্ব্বতীর তপস্যার একপ্রকার অনুকৃতি। এগুলির অধিকাংশের উদ্দেশ্য শিবেরমতন বর পাওয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আদর্শ-পত্নী হওয়া। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কুমারীদিগের এই সকল ব্রতনিয়মাদি ক্রমশঃ দেশ

হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। এগুলির পুনরুজ্জীবন অবশ্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। এগুলি স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার প্রাণভূত অঙ্গ স্বরূপ। অহঙ্কার, অভিমান, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পরিহার করিতে হইলে, যমনিয়মাদির আবশ্যক। নীরস বিদ্যালয়ের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় কোনই সুসার হয় না। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলে দুর্জ্জয় ভোগবাসনারিপুর সহিত সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। কি নারী, কি পুরুষ সকলেরই এই জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পুরুষের প্রথমাশ্রম এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। নারীরও কর্ত্তব্য গৌরীর ন্যায় তপস্বিনী হওয়া। তাহা না হইলে দুর্জ্জয়বাসনারিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। এই কাম মহাবৈরী। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্"। ইহাই মদনভস্মের অর্থ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

যোগমায়া।

(পূজার গল্প)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। চক্রধরপুর গ্রামের এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে, মৃণ্ময় দীপাধারে একটি প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরটি নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর উত্থিত হইতেছে "মা! আমি কোথায়?" স্বরে অনুমিত হইল রমণীর কণ্ঠস্বর। সেই অস্তমিত আলোক ভেদ করিয়া দেখা গেল যে কুটীরের একধারে পত্রশয্যায় এক অন্যূন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী শায়িতা; পার্শ্বে, দীর্ঘ শ্মশ্রু—জটাজুট বিলম্বিত গৈরিক বসন পরিধৃত এক ষষ্টিবর্ষীয় সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ধীর গম্ভীর। মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী স্বহস্তে তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতেছেন ও তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "মা! আমি কোথায়?" সন্ন্যাসী ধীরভাবে উত্তর করিলেন "মা! তুমি নিরাপদে"। রমণী একবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পুনরপি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "মহাত্মন্ আমি এখানে

কিরূপে আসিলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আর আপনিই বা কে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া স্থান দিয়াছেন।”

সন্ন্যাসী। বৎসে! স্থির হও, বেশী কথা কহিলে পীড়া বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা; তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এবং একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।

রমণী। পিতঃ আপনার অনুগ্রহে আমি এক্ষণে অনেক সুস্থ হইয়াছি, আমার আর কোন পীড়া নাই। কিন্তু আমি কোথায়?

স। বৎসে! তোমার কোন চিন্তা নাই যখন তুমি আমার আশ্রয়ে আছ তখন ইহা তোমার আলয় বলিয়া জানিও। আমার কথা শুন, স্থির হইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা কর।

রমণী আর কোন প্রশ্ন করিল না স্থির দৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন রমণীর নয়নকোণে অশ্রুধারা। অতঃপর সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া বনৌষধির সহিত মিশ্রিত করিয়া রমণীকে পান করাইয়া দিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে রমণী নিদ্রিতা হইল।

কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী সেই রমণীর পার্শ্বে বসিয়া স্থিরনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মনের মধ্যে কি এক অভূতপূর্ব্ব করুণা ও স্নেহের উদয় হইয়া হৃদয়ে কি যেন এক তাড়িৎপ্রভা ছুটাইয়া দিল, সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহাতেও মনের সে বেগ প্রশমিত হইল না, অধিকন্তু তাহা আরও উথলিয়া উঠিতে লাগিল; তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একবারে নদীর উপকূলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন পতিতপাবনী গঙ্গা কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। সন্ন্যাসী গদ্গদস্বরে বলিলেন “মা পতিত-পাবনী একি তোমার লীলা, সংসার বিরাগী অভাগার হৃদয়ে একি মায়ার সঞ্চার করিলে? বহুকাল হইতে পুত্রকলত্রহীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি—অপত্যস্নেহ হৃদয় হইতে বহুদিন অপসৃত হইয়াছে কিন্তু মা! আজ একি তোমার লীলা, এ মায়া কোথা হইতে হৃদয়ে ঢালিয়া দিলে?” সহসা দিগন্ত কম্পিত করিয়া এক বিকট হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল; সন্ন্যাসী ফিরিয়া দেখিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আবার হাস্যধ্বনি। সন্ন্যাসী কাতরস্বরে বলিলেন “মা! একি মায়া” মুহূর্ত্তমধ্যে কে যেন বিকট হাস্যে বলিয়া উঠিল “মায়া—মায়া কোথা হইতে দূর হইবে? যেদিন সংসারের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে—হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে সেই দিন মায়া ভুলিব,

জীবন থাকিতে মায়া কাটাইতে পারিব না। মা—মা——এইত সেই স্থান। সন্ন্যাসী দেখিলেন এক পাগলিনী ছুটিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে গা' ?

পাগলিনী। মা—মা—কৈ এইত সেই স্থান?

সন্ন্যাসী দেখিলেন রমণী শোকগ্রস্ত—উন্মত্তা। তখন তিনি তাঁহার যোগবলে রমণীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অয়ি! বামলোচনে দেখিতেছি তুমি নিতান্তই শোকগ্রস্ত; স্থির হও বিপদে অধীর হইলে কখন তাহা আশু শুভফল প্রদান করে না। তবে যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তাহা আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

পাগ। মহাত্মন্! দেখিতেছি আপনি সন্ন্যাসী বলিতে পারেন কি আমার যোগমায়া কোথায়? আজ দুদিন হইল তাহাকে হারাইয়াছি; দেব! আমার মায়াকে দেখাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী। (স্বগত) বোধ হইতেছে ঐ বালিকাই ইহার কন্যা হইবে। (প্রকাশ্যে) দেবি! স্থির হও, বুঝিয়াছি ভয় নাই আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি। শুন, গতকল্য সন্ধ্যার সময় এই নদীর উপকূল হইতে একটি পূর্ণ বয়স্কা বালিকাকে জল হইতে অর্দ্ধমৃতা অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছি। যত্নে তাহাকে নিকটস্থিত কুটীরে লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ করিয়াছি, অতএব আমার সঙ্গে আইস, বোধ হয় সেই বালিকাই তোমার কন্যা হইবে। এই বলিয়া তাহারা উভয়ে কুটীর অভিমুখে গমন করিল।

অতি অল্পক্ষণ মধ্যে উভয়ে কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। রমণী তাহার একমাত্র কন্যাকে ঈদৃশ অবস্থায় দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বসাইলেন এবং যথামত উপদেশ দ্বারা তাহার চিত্তকে প্রশান্ত করিতে লাগিলেন।

রমণীর চীৎকারে সহসা বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, এবং মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "মা আমি জীবিত আছি, এই মহাত্মা আমার প্রতি দয়া করিয়া জীবন দান করিয়াছেন।" এইরূপে কিয়ৎকাল উভয়ে কথাবার্ত্তার পর বালিকা বলিল "মা আমি এতক্ষণ বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—যে মাতা সিংহবাহিনী আমায় কোলে লইয়া কতই যত্ন করিতেছিলেন, নানা বেশভূষায় বিভূষিত করিয়া দিয়া যেন বলিয়া দিলেন যে তিনি অতি শীঘ্রই আমাদের বাটীতে আসিবেন আর সেই সময় তিনি আমার

স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন।"

তাহার জননী এইরূপ বাক্য শুনিয়া গদ্গদস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হায়! অভাগিনী তোর স্বামী—মা জগদম্বে! হায়! সে কি তবে জীবিত আছে"?

এমন সময় সহসা তাহাদের দৃষ্টি সন্ন্যাসীর দিকে পড়িল। সংসারের সুখদুঃখ নিস্পৃহ ব্রহ্মচারী যোগাসনে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তাহাদের এবম্বিধ বাক্যে তিনি একবার তাহাদের দিকে দৃষ্টি করিলেন; এমন সময় রমণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেব এইটি একমাত্র আমার কন্যারত্ন, অতি অল্প বয়সে এক বর্দ্ধিষ্ট কুলীনের ঘরে ইহার বিবাহ দিই, কিন্তু বিবাহের অত্যাল্পদিবস পরে তাঁহারা সপরিবারে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। অদ্য প্রায় ১৪ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গেল তাহাদের কোনই সংবাদ পাই নাই জানি না তাঁহারা জীবিত আছেন কি না?" এই বলিয়া রমণী ক্রন্দন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিলে পর রমণী আবার বলিতে লাগিল "আমার স্বামী সিংহবাহিণীর পূজা প্রতিবৎসরে করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি তদুপলক্ষে নানা স্থানে শিষ্যবাটী হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য গিয়াছেন, তাঁহারও প্রত্যাগমনের সময় হইয়া আসিয়াছে। দয়াময় আমি বড় ভাগ্যবতী যে আপনার অনুগ্রহে এ সময় আমি আমার কন্যারত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। আপনি ইহার জীবনদানে আমার জীবন দান করিয়াছেন। এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাহারা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ব্রহ্মচারী আর কোন বাক্য প্রয়োগ করিলেন না, কেবল মাত্র তাঁহার নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রু দেখা গেল—সন্ন্যাসীর একি মায়া?

(২)

অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে বাঙ্গালা এখনকার মত সুশাসিত হয় নাই, স্থানে স্থানে ডাকাইতের অত্যাচারের কথা প্রায়ই শুনা যাইত। সন্ধ্যার পর পল্লি-গ্রামে জনমানবের সমাগম প্রায়ই ছিল না। রাজসরকারগণেরও চেষ্টা ও যত্নে অনেক সময়ই প্রায় কোনই ফল দর্শিত না। হুগলী জেলার অন্তর্গত গ্রামে প্রায়ই এই সকল অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। আমাদের এই আখ্যায়িকা সেই সময়ের বলিয়া এস্থলে কিঞ্চিন্মাত্র তাহার আভাষ দেওয়া গেল।

কার্ত্তিকমাস সন্ধ্যার প্রাক্কাল, এমন সময় সপ্তগ্রামের সম্মুখস্থিত এক অরণ্যের মধ্য দিয়া একটি পঞ্চাশৎ বর্ষীয় ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণটি দেখিতে যদিও বলিষ্ঠ ও সাহসী কিন্তু সমস্ত দিবস পথভ্রমণজনিত নিতান্ত ক্লান্ত ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে তথাপি কিসে এই অরণ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে এই ভাবিয়া দ্রুতপদে চলিতেছে। কারণ তৎকালের বাঙ্গালার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ডাকাইত বৈদ্যনাথের আধিপত্য বিশেষরূপে ছিল। এ স্থানটিও উপস্থিত তাহার অধিকৃত স্থান বলিয়া পরিগণিত।

এস্থলে বৈদ্যনাথের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে আমরা বলিব। বৈদ্যনাথ কোন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের একমাত্র পুত্র। বৈদ্যনাথ বাল্যকালে পিতামাতার একমাত্র আদরের সামগ্রী ছিল, এবং সেই হেতু যদৃচ্ছাচারণ করিয়া বেড়াইত। ক্রমে ৮ বৎসরের হইলে তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বৈদ্যনাথের তাহা আদৌ ভাল লাগিত না। গ্রামের অন্যান্য বালকদিগের সহিত অসদাচরণ করিয়া বেড়াইত, সন্ধ্যারপর গৃহস্থদিগের উদ্যানে গিয়া নারিকেল কলা ইত্যাদি অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল। বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্রব্যাদি চুরি করিয়া আনিত। ক্রমে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ জানিতে পারিয়া তাহার পিতার নিকট অভিযোগ করিল। পিতা তাহাকে বিস্তর শাসন করিলেন কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইল না, অধিকন্তু আরও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল; তখন তাহার পিতা অন্য কোন উপায় না পাইয়া তাহার স্ত্রীর পুত্রবৎসলতাহেতু, নানা উপরোধ করিলেও তাহাকে বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে বৈদ্যনাথের মনে কিছুমাত্র দুঃখ বা কষ্ট হইল না, অধিকন্তু তাহাতে আরও তাহার লুণ্ঠনাদির সুবিধা হইবে জানিয়া মনে মনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যাহা হউক বৈদ্যনাথ যখন বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায় তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বর্ষ হইবে। বৈদ্যনাথের সকল দোষ সত্ত্বেও তাহার মেধাশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। ফলতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে কলাপ পানিনী ইত্যাদি ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনাও বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর বৈদ্যনাথ কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাদের সুশিক্ষিত

করিয়া একটি ডাকাইতের দল স্থাপনা করিল এবং অরণ্যের মধ্যে গড়খাই করিয়া গৃহাদি আবাস স্থান করিয়া তথায় প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিল। এসময়ে বৈদ্যনাথের বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশবর্ষ। বৈদ্যনাথের নাম ক্রমে হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নদিয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানে সাধারণের ভীতিস্থল হইয়া দাঁড়াইল। তৎকালে পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়া ইহার কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিত না।

অতঃপর আমাদের পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও ক্লান্ত হইয়া দ্রুতপদে চলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে পাছে কোনদিক হইতে বৈদ্যনাথের লোক আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার ইষ্টমন্ত্রের কোনই ফল দর্শিল না। সহসা পার্শ্বস্থিত অরণ্য হইতে ৫।৬ জন ভীমাকার দস্যু আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং "নমস্কার দাদাঠাকুর" বলিয়া উপহাসচ্ছলে অভিবাদন করিল। ব্রাহ্মণ তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে, তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কি যেন এক ধারা বহিতে লাগিল; ব্রাহ্মণ শুষ্কপত্রমিব ভয়ে কম্পমান। ভয়ে ভীত হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল "মা রক্ষা কর" এবং সজল নয়নে কাতরকণ্ঠে তাহাদিগকে কতই অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল কিন্তু সে কঠিন হৃদয় কিছুতেই সিক্ত হইল না। অতঃপর তাহারা ব্রাহ্মণের পূজার সংগৃহীত অর্থগুলি কাড়িয়া লইয়া অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎকালের জন্য ব্রাহ্মণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন তাহার হৃদয় হইতে অন্তরাত্মা বহির্গত হইয়া গিয়াছে; কাষ্ঠপুত্তলিকারন্যায় স্থির নিস্পন্দ। সহসা, ব্রাহ্মণ ব্যাধবিতাড়িত মৃগের ন্যায় দিগ্বিদিক হারাইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল; বৃক্ষশাখায়, কণ্টকে দেহ, হস্ত, পদ, ক্ষতবিক্ষত করিয়া ঘুরিতেছে কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। এইরূপে কিছুকাল ইতস্তত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সহসা জঙ্গলের মধ্যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীর নিকট আসিয়া পৌছিল, কিন্তু প্রবেশের পথ না দেখিতে পাইয়া পুনরায় ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। অবশেষে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিন্মুক্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাইয়া বেগে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া দেখিল একটি সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ যোগাসনে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তিনি ইহার এতাদৃশ আশ্চর্য্য প্রবেশে চমকিত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য

করিতেছেন। ইহার পার্শ্বে একখানি তরবারী পতিত কিন্তু তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপও করিলেন না। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ বাষ্পবিগলিত নেত্রে গদ্‌গদস্বরে কহিতে লাগিল "ওহো! আপনারই নাম না বৈদ্যনাথ—হাহাঃ আমি জানি আপনিই সেই হায়! মহাশয় আমাকে রক্ষা করুণ। আপনার দুরন্ত দস্যু-দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুণ"। এই বলিয়া বৈদ্যনাথের সম্মুখে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ তাহার ঈদৃশ ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এবং তিনি কি প্রকারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ। মহাশয় জানি না আমি কি প্রকারে এখানে আসিলাম, বোধ হয় মা জগদম্বা আমাকে আনিয়াছেন। হায়! আমি প্রায় ছয় মাস ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া ২০০৲ টাকা উপায় কবিয়া মায়ের পূজার জন্য বাটী যাইতে ছিলাম পথিমধ্যে আপনার দস্যুরা আমাব সমস্ত অপহরণ করিয়াছে, আমি সমস্ত হারাইলাম। মহাশয়! আপনি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আজ আমি আপনার আশ্রিত আমার রক্ষা করুণ। যদ্যপি আমি এই অর্থ না পাই নিশ্চয়ই আমি মারা যাইব"। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রোদন করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "যদি আপনার এই ঘটনা সত্য হয় আমি প্রতিশ্রুত হইলাম যে আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব। অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করুণ এবং আমার ইচ্ছা যে অদ্য এইখানে আহারাদি করিয়া আমাকে সুখী করিবেন। আমি সুব্রাহ্মণ নৈকোষ্য কুলীন তাহা আপনি বোধ হয় জানেন; অতএব আমার এক্ষণে আহারাদি করায় আপনার কোন আপত্তি হইতে পারে না। অতঃপর আমি কখন প্রাণীহত্যা করি না অথবা আমার শিষ্যগণও করে না। প্রারব্ধ কর্ম্ম আমায় এই পথে আনয়ন করিয়াছে। আমি বড়লোকের হরণ কবি কেবল গরীবদিগকে দান করিবার জন্য। শাস্ত্রে বলে যাহার যাহা অভাব তাহা অপেক্ষা তাহার বেশী থাকা ন্যায়মতে চুরি; ফলতঃ চোরের চুরি করা ধর্ম্মত কখন পাপ স্পর্শে না; এই বলিয়া বৈদ্যনাথ তাহার এক শিষ্যকে বলিলেন "দুর্গাদাস ব্রাহ্মণের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও"। গুরুর আজ্ঞামাত্র দ্বাবিংশ বর্ষীয় এক সুন্দর যুবা পার্শ্বস্থিত গৃহ হইতে গাড়ু গামছা আনিয়া দিল। হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর বৈদ্যনাথ তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে

আরম্ভ করিলেন।

বৈদ্য। মহাশয়ের নাম?

ব্রা। ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বৈদ্য। নিবাস?

ব্রা। সিংহপুর। এখান হইতে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ পশ্চিমে।

বৈদ্যনাথ আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন "আপনি সিংহপুরের ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়! ওঃ আমি আপনার নাম অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আপনি জগন্মাতার একজন প্রধান ভক্ত। আপনার সাক্ষাতে আমি বড়ই কৃতার্থ ও পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমি বড় ভাগ্যবান যে ভবাদৃশ মহোদয়ের সহিত অদ্য আমার সাক্ষাৎ হইল। যাহা হউক আর কিছু বলিতে হইবে না, আমি আপনার বিষয় সমস্ত অবগত আছি। কিন্তু আপনার একজন ধনী ভ্রাতা আছেন না?

ব্রা। হায়! মহাশয়! আজ যদি সেই সহোদর আমার সহায় থাকিত বা আমাকে দেখিত তাহা হইলে আমি ভিক্ষায় যাইব কেন? তিনি সংসারে একা ও একমাত্র সহধর্ম্মিণী। আমি সংসারে স্ত্রী ও কন্যা লইয়া দুঃখে শিষ্য-বাটী হইতে যাহা সংগ্রহ করি তাহাতেই বৎসরের যথাকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন হয়। একে সংসারের জ্বালায় অস্থির তাহার উপর এক কন্যা। দুঃখের বিষয় বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আদ্যোপান্ত সমস্ত তাঁহাকে বলিলেন। ক্রমে কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইয়া গেল। বৈদ্যনাথ তাহাকে আহার করাইয়া বলিলেন অদ্য আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যান কল্য প্রাতে আপনি আপনার অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

(৩)

তমিস্র রজনী; দ্বিতীয় প্রহর অতীত, জগৎ নিস্তব্ধ। সহসা এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাঝের গ্রামের একটি ক্ষুদ্র বাটীর গৃহদ্বারের নিকটে একটি দৃঢ়স্বর উত্থিত হইল "দ্বার উদ্ঘাটন কর"; এই বলিয়া এক দিব্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সেই গৃহদ্বারে পুনঃপুন আঘাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামী গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন "কেও"? ব্রাহ্মণ সেই একভাবে বলিতে লাগিলেন "দ্বার খোল আমি তোমার শ্বশুরালয় হইতে আসিতেছি, বড় মন্দ সংবাদ, তোমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত"।

"আচ্ছা অপেক্ষা কর"; এই বলিয়া গৃহস্বামী তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "বুধন দ্বার খুলিয়া দাও, বিদ্‌পাড়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে"। মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অনতিবিলম্বে সেই ব্রাহ্মণ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অন্য কোন বাধা পাইবার পূর্ব্বে তিনি সেই ভৃত্য পাইককে বন্ধন করিয়া তাহার মুখ বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে একটি দুইটি করিয়া নিঃশব্দে আরও ৪।৫ জন প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এই সকল কার্য্য এত শীঘ্র এবং এত সুচারুভাবে সম্পন্ন হইল যে অন্যলোকে কিছুই তাহা অনুভব করিতে পারিল না। অতঃপর ব্রাহ্মণ গৃহস্বামীর শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামী তাহার শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা এরূপ দৃশ্য অবলোকনে নিতান্ত আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাকে অন্য কোন কথা কহিবার সুযোগ না দিয়া পূর্ব্ববৎ ইহাকেও আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন; এবং স্থির ও গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "শুন! আমার আগমনের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু আমার সময় অত্যন্ত অল্প। ইহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র যে আমার নাম বৈদ্যনাথ—বিখ্যাত দস্যু। তুমি হতভাগ্য কৃপণ এবং তোমার অত্যন্ত দুরদৃষ্ট, নচেৎ তোমার এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন! এক্ষণে তোমার এবং তোমার ভার্য্যার বৃদ্ধকালের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ রাখিয়া বাকী অর্থ হরণ করিয়া লইবার জন্য অদ্য আমার আগমন। আমি সকল সন্ধান জানি ফলতঃ তোমাকে পীড়ন করিবার আমার প্রয়োজন নাই"। এই বলিয়া তিনি জনৈক দস্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যাও উপাধানের নিম্নে চাবি আছে, লইয়া বাক্স উদ্ঘাটন কর"।

তৎক্ষণাৎ একজন দস্যু চাবি বাহির করিয়া বাক্স খুলিয়া ফেলিল এবং তন্মধ্যে যে সকল অর্থাদি ছিল সকল বাহির করা হইলে দেখা গেল কেবল মাত্র সুবর্ণ মোহর। অতঃপর ব্রাহ্মণ কহিলেন এই পাষণ্ড চোরের সম্মুখে নিঃশব্দে শীঘ্র শীঘ্র গণনা করিয়া ফেল"। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে পাঁচ জন দস্যু তাহা গণনা করিয়া ফেলিল। গৃহস্বামী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল।

বৈদ্য। কত গণনা করিলে? দস্যু। ৪১২১ স্বর্ণমুদ্রা।

বৈদ্য। আচ্ছা উহা হইতে ১০০০৲ মাত্র ঐ বাক্সে রাখিয়া বাক্স বন্ধ কর এবং যথাস্থানে চাবি রাখিয়া দাও। এই বলিয়া বৈদ্যনাথ গৃহস্বামীকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মূর্খ! শুন এজগতে মনুষ্য অধিক ধনের অধিকারী হইলে যথার্থ সুখ তাহার থাকে না অর্থশালী লোক কচিৎ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে, ফলতঃ অর্থে প্রকৃত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সুখ হয় না। এই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের উভয়ের যাবজ্জীবনের স্বচ্ছন্দোপায়; এতদ্ব্যতিত তোমার বাটী ও জমী আছে; যাহা রহিল ইহাতে তুমি অনায়াসে রাজার ন্যায় সুখে থাকিতে পারিবে। অতঃপর এই অপহৃত বিষয়ের জন্য অনর্থক দুঃখ করিও না যেহেতু ইহা পুনঃপ্রাপ্তি দুরাশা মাত্র। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিও এই অর্থ দ্বারা অনেক মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে; কখন অপাত্রে ন্যস্ত হইবে না। আমি কখন কাহারও অনিষ্ঠ করি নাই এবং তোমার যাহাতে অনিষ্ট তাহাও করিতে ইচ্ছুক নহি। এই সকল যাহা বলিলাম সকলি তোমার মঙ্গলের জন্য। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিও পরিণামে ইহা হইতে শুভফল প্রদান করিবে। আর এক কথা ভবিষ্যৎ গণনা কিয়ৎ পরিমাণে আমার জানা আছে, তদ্দ্বারা দেখিতেছি তোমার জীবনের আব অতি অল্পদিন বাকী আছে; এ পৃথিবীতে তুমি আর দেড় বৎসর মাত্র জীবিত থাকিবে। ফলতঃ ধর্ম্মে মতি রাখিয়া কার্য্য করিও। এক্ষণে আমি চলিলাম"। এই বলিয়া তাহারা সকলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

(৪)

উষার স্নিগ্ধবায়ু বৃক্ষের পত্র সঞ্চালিত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। শিশিরস্নাত পত্রগুলির উপর বালসূর্য্যের আভা পড়িয়া এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে; তরুশাখায় বসিয়া পক্ষিগণ মধুর সঙ্গীতে বনস্থলীকে শান্তিময় নিকেতন করিয়া তুলিতেছে। এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভবানিপ্রসাদ বৈদ্যনাথের স্পর্শে "দুর্গে দুর্গতিনাশিনী" বলিয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হইল, এবং সহসা বৈদ্যনাথকে গৃহাভ্যন্তরে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি প্রকারে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন? দ্বার ত রুদ্ধ রহিয়াছে?

বৈদ্য। মহাশয়! আশ্চর্য্য হইবেন না, আপনি কি বিস্মৃত হইলেন যে আমরা ডাকাতি করিয়া থাকি! এইরূপ কিম্বদন্তী আমরা প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম। বোধ হয় আপনি লক্ষ্য করেন নাই যে এই গৃহের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ পথ আছে। যাহা হউক গতকল্য আপনার আহারাদি

ভালরূপ কিছুই হয় নাই তজ্জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হউন এবং আপনার পুঁটলি ও অর্থ গ্রহণ করুন; একটি কপর্দ্দকও ইহার অপহৃত হয় নাই, আপনি ইহা গণিয়া লইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ তাহার অপহৃত দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিল। এবং ডাকাইতের এরূপ সত্যতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৈদ্যনাথের মস্তকে হাত দিয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল "মহাশয়! আপনার মাহাত্ম্য দর্শনে আমি অত্যন্ত চমকিত হইয়াছি এবং আপনার কৃপায় আমার হৃতধন পুনঃপ্রাপ্তে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে অক্ষম; আশীর্ব্বাদ করি মা জগদম্বা আপনার মঙ্গল করুন। হায়! মহাশয় আমি ইতিপূর্ব্বে কি মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—যেন মাতা সিংহবাহিনী বলিতেছেন 'বৎস ভয় নাই আমি আপনিই তোমার বাটীতে যাইতেছি অতএব শীঘ্র আইস ভবিষ্যতে সুখ ও আনন্দ সন্মিলন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে', অতএব মহাশয় এক্ষণে আমায় বিদায় দিন আগামী পরশ্ব পূজা আরম্ভ হইবে, আমি",—

বৈদ্যনাথ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "মহাশয় আর একটি নিবেদন এই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমি আপনার মায়ের পূজার জন্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, ভরসা করি অনুগ্রহ করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর অর্থ লইয়া আমাকে সুখী করিবেন।" এই বলিয়া তিনি তাহার সম্মুখে সহস্র মুদ্রার একটি তোড়া রাখিয়া দিলেন। ভবানীপ্রসাদ তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর করিলেন "মহাত্মন মার্জ্জনা করিবেন ইহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই আমি অর্থ অপেক্ষা দরিদ্রতা ভালবাসি, যেহেতু, দরিদ্রতায় মাতার কৃপা সুলভ, সংসারে সকল দ্রব্য অপেক্ষা আমি আমার মাতার চরণ ভালবাসি।"

বৈদ্য। সাধু! আপনি মাতার যথার্থ ভক্ত, এরূপ মহতান্তঃকরণ সংসারী লোকের নিকট দুর্ল্লভ। কিন্তু মহাশয়! আমি আর উহা প্রতিগ্রহণ করিতে পারি না যেহেতু আমি উহা মাতার নামে অর্পণ করিয়াছি, উহাতে আমার আর কোন অধিকার নাই। আপনি উহা অন্যায় মনে করিবেন না এবং যদ্যপি উহা মাতার পূজায় দিতে কুণ্ঠিত হন, পূজা উপলক্ষে দীনদরিদ্র-দিগের ভোজনের জন্য ব্যয় করিতে পারেন।

ভবা। না মহাশয় আমি উহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারিব না, যেহেতু ইহা ডাকাইতির ফল, একথা অবশ্য আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

বৈদ্যনাথ ব্রাহ্মণের এবম্বিধ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল অতঃপর ভাবে গদ্গদ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিল মহাশয় আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সৌজন্যের জন্য আমি আপনাকে অন্তরের সহিত পূজা করি; কিন্তু অর্থ আমি পুনঃগ্রহণ করিতে পারিব না। অতএব যদ্যপি আপনি একান্ত স্বহস্তে লইতে অসম্মত হন তজ্জন্য আমি অন্য প্রকারে ইহার উপায় করিতেছি। গতকল্য আপনি যে আমার প্রধান শিষ্য দুর্গাদাসকে দেখিয়াছেন তাহাকে আমি আপনার সমভিব্যহারে পাঠাইয়া দিতেছি যাহা কর্ত্তব্য হয় সে তাহা করিবে। ঐ বালকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান; আমি তাহাকে বৈদ্যনাথ পর্ব্বতের সনিকট কোন এক অরণ্য হইতে কুড়াইয়া আনি, তখন উহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮।১০ বৎসর। তাহার মেধা ও বুদ্ধি দর্শনে চমকিত হইয়া তদবধি তাহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে যথামত শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়াছি; এক্ষণে এই যুবা জ্ঞানী ও সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী। অতএব আমার ইচ্ছা ইহার একটি শুভবিবাহ দিই কিন্তু এখানে থাকিয়া তাহা ঘটিয়া উঠা অসম্ভব-জ্ঞানে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইহাকে কিছুদিন আপনার ভবনে রাখিয়া ইহার বিষয় অবগত হইয়া কিছু উপায় করিতে পারেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।”

ভবা। আপনার এরূপ উদারতা ও সৌজন্যতার জন্য আমি আপনার নিকট “ইহা করিব বলিয়া” প্রতিশ্রুত হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনি দস্যুদলে থাকিয়াও এতাধিক মহৎগুণে বিভূষিত। সংসারে যদি সকলেই আপনার ন্যায় হইত তাহা হইলে ইহা কতই সুখের হইত? এক্ষণে আমি চলিলাম; কোথায় দুর্গাদাস?

বৈদ্যনাথ দুর্গাদাসকে ডাকিলেন এবং গোপনে কতকগুলি উপদেশ দিলেন। অতঃপর ভবানীপ্রসাদকে নমস্কার করিয়া বলিলেন “বোধ হয় আপনার দ্বারা আমার ডাকাইতির বিষয় কখন কাহার নিকট প্রকাশ পাইবে না”। ভবানিপ্রসাদ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন “মহাত্মন! অধিক বলা বাহুল্যমাত্র, বোধ হয় ভবৎ সদৃশ মানব সংসারে অতি বিরল। আমি

আপনার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম"। এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৫)

সিংপুর। বেলা তৃতীয় প্রহর; আমাদের আখ্যায়িকার নায়িকা যোগমায়া এখন ভালরূপে আরোগ্য হয় নাই; গৃহে শয্যায় শায়িতা। তাহার জননী যত্নসহকারে সুশ্রূষা করিতেছেন। আর সেই ব্রহ্মচারী, কি জানি কি তাহার অমানুষিক বাৎসল্যহেতু ইহাদের ভবনে আগমন করিয়া তিনিও তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। স্বহস্তে বনোষধি অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করাইতেছেন; যোগমায়ার মাতা স্থিরভাবে এই সকল মিশ্রণ-প্রণালী অবলোকন করিতেছেন। অতঃপর রমণী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তাহার একটিরও উত্তর করিলেন না, অধিকন্তু একমনে আনত-বদনে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

রমণী তাঁহার এবম্বিধ ব্যাপারে আরও আশ্চর্য্য হইল এবং ব্যগ্রতাপূর্ব্বক বলিতে লাগিল "মহাত্মন্! সহজে চঞ্চলা, রমণীর প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন; এবং একান্ত যদ্যপি আপনার পরিচয় না দেন তবে অনুগ্রহ করিয়া এইমাত্র বলুন আপনি কি প্রকারে এখানে আগমন করিলেন, আমরা পূর্ব্বেত আপনাকে এগ্রামে কখনও দেখি নাই।" ব্রহ্মচারী ধীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "কেবলমাত্র গতকল্য, এবং আপনার কন্যাকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার ঠিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি আগমন করিয়াছিলাম।"

রমণী। গতকল্য! তবে আপনি কি প্রকারে আমাকে উহা আপনার গৃহ বলিয়াছিলেন, ঐ গৃহ কি আপনার?

ব্রহ্ম। না, আমি ব্রহ্মচারী, আমার আবাস স্থানের স্থিরতা নাই যখন যে স্থানে থাকি তখন সেই স্থানই আমার। গতকল্য যখন আপনার যোগমায়াকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া আনি সে সময় তাহাকে কোথায় রাখিব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঐ গৃহটি সহসা দৃষ্টিপথে পড়ায় তথায় উহাকে আনয়ন করিয়া রাখি এবং যোগবলে কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ করিয়া স্বাস্থ্যকর ঔষধির জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হই; ঘটনাক্রমে তথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে,—"

এমন সময় সহসা বাটীর দ্বার খুলিয়া ভবানীপ্রসাদ ও দুর্গাদাস বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সস্নেহে, ভবানীপ্রসাদ, "যোগমায়া" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। যোগমায়া পিতার কণ্ঠ-স্বর জানিতে পারিয়া আহ্লাদে উঠিয়া বসিল, এবং পিতাকে দেখিয়া গদ্গদ-স্বরে বলিতে লাগিল "পিতঃ গতকল্য আমি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, এই মহাত্মাই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

ভবানীপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন তিনি অনিমিষলোচনে, প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান, দুর্গাদাসের প্রতি চাহিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মচারী ক্ষিপ্রের ন্যায় দৌড়িয়া দুর্গা-দাসকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পবিগলিত নয়নে বলিতে লাগিলেন "বৎস্য এত দিন কোথায় ছিলে? তোমা বিনা আজ আমি সন্ন্যাসী, তোমার দুঃখিনী জননী তোমায় হারাইয়া জীবনত্যাগ করিয়াছেন, হায় পুত্র! হায় যোগেশ!

এই অভিনব ব্যাপারে ভবানীপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং দেখিলেন ব্রহ্মচারী দুর্গাদাসকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রোদন করিতেছেন। ভবানীপ্রসাদ কিয়ৎপরিমাণে এই বিষয় অবগত হইয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন "হায় এই কি সেই, দেখ দেখ নিস্তারিনী এই বুঝি তোমার সেই হারাণ-রতন!" অতঃপর ব্রহ্মচারীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এই বালক কে? এবং আপনিই বা কে"? ব্রহ্মচারী যোগেশকে ত্যাগ করিয়া এবং "ভবানীপ্রসাদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি কে? ভাই! তুমি কি ভুলিয়া গেলে, তোমার বন্ধু-বৈবাহিক-নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুলিয়া গেলে? হায়! আমরা ইহাকে বৈদ্যনাথতীর্থে হারাইয়াছিলাম। অলঙ্কারের লোভে একদল দস্যু ইহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহার জননী পুত্রশোকে ভগ্নান্তঃকরণ হইয়া তৎপরদিবসে ইহলোক পরিত্যাগ করে কেবল আমি অভাগা পৃথিবীর সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এই সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে আজ দ্বাদশ বর্ষকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু হায়! আজ তুমি আমার হারাণ-রতণ দিয়া আমার জীবন দান করিলে"। ভবানীপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি প্রকারে এখানে আগমন করিলেন?"

নবীন। আজ কয়েকদিবস পূর্ব্বে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করি যেন এক রক্তবসনা, দিব্যাঙ্গনা বামা আমার মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "যাও বৎস স্বদেশে প্রত্যাগমন কর অতি শীঘ্রই তোমার সন্তানকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাই গতকল্য আমি এখানে আগমন করিয়াছি; এবং ঘটনাক্রমে স্নান করিতে গিয়া একটী স্ত্রীলোককে জলে ভাসমান দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া নিকটস্থ এক গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রাখিয়া তাহার পরিচর্য্যা করি। অতঃপর নদীকূলে সন্ধ্যাকালে তোমার স্ত্রীর হৃদয়ভেদী রোদনে সকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কন্যারত্ন প্রত্যার্পণ করি; এবং তৎপ্রমুখাৎ অপরাপর বিষয় অবগত হইয়া অদ্য প্রাতে এইস্থলে আসিয়াছি। এক্ষণে ভাই আজ কি আনন্দের দিন আমি তোমার নিকটে চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম।" এইরূপে সুখদুঃখের কথাবার্ত্তায় এবং আগামীকল্য পূজার আয়োজনাদির কিরূপ হইবে তাহা লইয়া সে দিবস এক প্রকারে অতিবাহিত হইয়া গেল।

উপসংহার।

পরদিবস মহা সমারোহের সহিত ভবানীপ্রসাদ মা সিংহবাহিনীর পূজা সম্পন্ন করিলেন। এরূপভাবে তিনি আর কখন সমারোহ করিতে পারেন নাই। গ্রামবাসী সকলেই এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিল; অধিকন্তু যোগেশ ও তাহার পিতার প্রত্যাগমন সংবাদে তাহারা সকলে মহল্লাসে মত্ত। যোগেশ বৈদ্যনাথ প্রদত্ত সহস্র মুদ্রা হইতে এই উপলক্ষে গ্রামবাসী ও তদ্ব্যতীত সহস্র দরিদ্র ভোজনের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিল। তাহারা আহ্লাদে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ ও ঈশ্বরের নিকটে নব দম্পতির দীর্ঘজীবন ও মঙ্গলকামনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণডাকাইত বৈদ্যনাথও আসিয়া আমোদে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক মা জগদম্বার প্রসাদও পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের এই সুখসম্মিলনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং প্রত্যাগমনকালীন উভয়কে যৌতুকস্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া যান। পরে এইরূপ জানা যায় যে তিনি এই সকল ত্যাগ করিয়া বামাশ্রম-পথ অবলম্বন করিয়া মহাপ্রস্থান যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

সমালোচনা।

পুস্তক।

অনাথবন্ধু। উপন্যাস। হুগলি বুধোদয়যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত মূল্য ১৷০ পাঁচসিকা। এই গ্রন্থের ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"উপন্যাসখানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু যেরূপ প্রশংসা হইল, ও যেরূপ বিক্রয় হইল, তত ভাল নয়। আর ইতিহাসখানি, যাহা অধিক পরিশ্রমের এবং অনেক পাণ্ডিত্যের ফল—যাহা বাঙ্গালা ভাষার একটি বিশেষ আদরের জিনিষ হইবার কথা—তাহার বিক্রয় হইল না"। অন্য স্থানে আছে—"এদেশে বেদ প্রচারককেও এক সময়ে নাটক লিখিয়া বেদ মুদ্রণের খরচা তুলিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল"।

আমরা বোধ করিতেছি, এইরূপ দুর্দ্দশার জন্যই—'অনাথবন্ধু' গ্রন্থ উপন্যাসচ্ছলে এবং উপন্যাস পরিচয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক অনাথবন্ধু উপন্যাস নহে—ইতিহাস। কিন্তু পাছে তোমরা ইতিহাস নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠ, এই জন্য একটা গল্পের কাঠাম খাড়া করিয়া, তাহারই উপর ইতিহাসের গড়ন পিঠন, চিত্রবিচিত্র করিয়াছেন। গল্পটি এই—রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র ও এক কন্যা। অনাথবন্ধু জ্যেষ্ঠ, রজনী মধ্যম এবং সংসার কনিষ্ঠ। কন্যার নাম নলিনী। জামাতার নাম আনন্দনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় দু পয়সা করিয়াছেন। অনাথবন্ধু উকীল, রজনী ডাক্তার, আর সংসার যদিও ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ৺কাশীধামে একরূপ অধ্যাপনাই করিতেন। অনাথবন্ধুর স্ত্রী মহামায়া, রজনীর স্ত্রী কিরণশশী।

রামজয় চট্টোপাধ্যায়দিগের, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়দিগের এবং কিরণশশীর পিতা মাতা ভ্রাতা, ভগিনীপতি প্রভৃতির পারিবারিক সুখদুঃখের কয়েক বৎসরের বিবরণ এই গ্রন্থের গল্প বা কাঠাম। অল্প বয়সে বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়া, এবং চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ও যশস্বী হইয়া—অমায়িক বিনয়ী যুবক ডাক্তার রজনীনাথের হঠাৎ অপমৃত্যু—গ্রন্থের মূল ঘটনা। বালবিধবা কিরণশশীর পিতৃপরিবার হইতে প্রাপ্ত প্রবৃত্তির ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন, এই বালবিধবার পারিবারিক চরিত্র ধীরে ধীরে সঙ্গঠন, এই গ্রন্থের লক্ষ্য এবং

গ্রন্থকারের কৃতিত্ব। গ্রন্থের গল্প অতি সামান্য, নগণ্য বলিলেও চলে, কিন্তু গ্রন্থের প্রক্রিয়া পদ্ধতি সত্যসত্যই অসামান্য। সমস্ত প্রকরণই শাস্ত্রসঙ্গত, সময়োচিত, সমাজোপযোগী এবং একান্ত ঐতিহাসিক। গ্রন্থে কল্পনার লীলা-লহরী অতি অল্প থাকিলেও, ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণদর্শন ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান।

'অনাথবন্ধু' যদি গল্পের গ্রন্থ, তবে তাহা ইতিহাস হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—কাব্য বল, নাটক বল, উপন্যাস বল, ইতিহাস বল, এইরূপ গ্রন্থ লিখিবার শক্তি দ্বিবিধা। এক, সৃষ্টি-শক্তি; আর দৃষ্টি-শক্তি। সৃষ্টিশক্তিতে নবনব সৌন্দর্য্যের উন্মেষণ হয়, সেই সৌন্দর্য্যে লোকে আকৃষ্ট হয়, নিজে সুন্দর হয়। গ্রন্থকার চরিতার্থ হন। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা সংসারের গতি-মতি, আলোক, ছায়া, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ—লোককে দেখাইয়া দেওয়া হয়; লোকের বিবেচনাশক্তি খেলিতে থাকে, লোকে মন্দ ছাড়িয়া ভালদিকেই যায়। এই দুই শক্তির মধ্যে 'জ্যেঠ কণিঠ লখই না পারই'। বাল্মীকি, বেদব্যাস—সেক্সপিয়র, বিক্টর হুগোতে—সৃষ্টিশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি উভয়ই সমান প্রখরা। তাঁহাদের গ্রন্থগুলিও তেমনই প্রোজ্জ্বলা।

কাব্য উপন্যাসে সৃষ্টিশক্তির, ইতিহাস বিজ্ঞানে দৃষ্টিশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কাব্য উপন্যাসে সৃষ্টির প্রাধান্য বলিয়া কাব্যাদি সর্গে বিভক্ত। ইতিহাস বিজ্ঞানে দৃষ্টির প্রাধান্য বলিয়া ঐ সকল সংস্কৃতে দর্শন বলিয়া অভিহিত। কবি-সৃষ্টিকারক; দার্শনিক দৃষ্টিকারক। সৃষ্টি ও দৃষ্টি লইয়াই সমগ্র সাহিত্য শাস্ত্র।

সামাজিক ঘটনা পরম্পরার উপর দৃষ্টিশক্তি সঞ্চালিত হইলে, হয়—ইতি-হাস। এইজন্য রামায়ণ মহাভারত পূর্ণ ইতিহাস। এমন দুইখানি ইতিহাস জগতে আর নাই।

বাঙ্গালায় ইতিহাস রচনা অতি অল্পই হইয়াছে বা হইতেছে। ইংরাজির অনুকরণে যে সকল স্কুলপাঠ্য 'ইতিহাস' সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে 'ইতিহ' 'অস' কোন একটি সমাজের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাই না। যৎ কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়—'আলালের ঘরের দুলালে' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়'।

'অনাথবন্ধু' গ্রন্থে বর্ত্তমান্ বঙ্গসমাজের মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারের ইতিহাস প্রচুরপরিমাণে আছে। এখনকারদিনের ভদ্রপরিবারের, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিপদ, সম্পদ, রোগ, শোক, সদাচার, অনাচার, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি—প্রকৃত

ফটোগ্রাফ্ ইহাতে ধারাবাহিকরূপে দেওয়া হইয়াছে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সী, সকলেই 'অনাথবন্ধু' হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা করিতে পারেন। আজিকালিকার গৃহস্থ বাঙ্গালিকে, শাস্ত্রসঙ্গত, সমাজনীতিসঙ্গত গৃহস্থালি-শিক্ষা দেওয়াই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য, আমরা বেশ বলিতে পারি সে উদ্দেশ্য সম্যক্ চরিতার্থ হইয়াছে।

মাসিক পত্র।

বিশেষ উদ্দেশ্যে কয়েকখানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে—তাহার মধ্যে 'বিশ্বজীবনই' প্রধান। বিশ্বজীবন আপনার পরিচয় দিয়াছেন, "জীবনবৃত্ত বিষয়ক ধারাবাহিক পত্র"। ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা হইতে ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পাঁচখানিতে পাঁচজন পণ্ডিতের শেষের দুইখানিতে দুইজন পণ্ডিতার জীবন-বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। ১। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ২। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ৩। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ৪। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ৫। পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ৬। পণ্ডিতা উভয়ভারতী। ৭। পণ্ডিতা লীলাবতী। লেখা ভালই হইতেছে।

বীণাবাদিনী নামে সঙ্গীত প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, সম্পাদিত। এখানিরও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। স্বরলিপি সাহায্যে বাঙ্গালা-সঙ্গীত প্রকাশই সেই উদ্দেশ্য—সঙ্গীত সমালোচনাও অল্পস্বল্প আছে। "সমবেত বাদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য"গুলি ভাল। সম্পাদক আমাদের সঙ্গীতের বিশেষত্বের দিকে যে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, ইহা আমরা পরম লাভ মনে করি।

দারোগার কাহিনীরস্তায়—আমরা 'গোয়েন্দা-কাহিনী' বা 'ভীষক্-কাহিনীর'ও পক্ষপাতী নহি। কেন তাহা আর বারবার বলিব না।

আষাঢ় মাসের ভারতীর প্রথম প্রবন্ধ 'সতীর-খেলা'—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ লিখিত। এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বীভৎস, বিকৃত রুচির পরিচায়ক একরূপ উন্মাদের প্রলাপ। ভারতীতে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। শ্রীঅপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এডুকেশন গেজেটে এই প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। তিনি দুঃখ

করিয়া বলিয়াছেন "আর মর্ম্মাহত হইয়াছি বঙ্গসাহিত্যের দুরবস্থায়"। বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইবারই কথা। আজিকালি ভাল কাগজে, ভাল ছাপায় এত এলোমেলো কথা ছাপা হইতেছে, যে তাহাতে বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। যাঁহারা সমাজ, সাহিত্য ভাষা বা ব্যাকরণ—ইহার কোন একটির ধার ধারেন না, তাঁহারা সকলেই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। একথা 'আমি' বলিলে অনেকে হয়ত রাগ করিবেন, অনেকে আমাকে দাম্ভিক বলিবেন, তা বলুন, আমাকে যাহাই বলুন, আমি দুঃখ প্রকাশ না করিয়া এই কয়বৎসর কাটাইয়াছি; কিন্তু এখন সেই জন্য আমার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যের দুরবস্থার কথা ভাবিতে গেলে, বাস্তবিকই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। আমার সম্মুখে 'ভারতী' এখনও খোলা রহিয়াছে, এই ভারতী হইতে আরও দুই চারিটি দুঃখের কথা বলি।

'প্রবাদ-প্রসঙ্গে' খয়ে বন্ধনের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—'অগ্রপশ্চাৎ সকল দিকেই অসুবিধা পড়া', ইংরাজিতে Between two fires বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই।" কিন্তু 'খয়ে বন্ধন' বলিতে ওরূপ অর্থ হয় না। 'খয়েবন্ধন' বলিতে বোকার বা বোকামির বন্ধন। যাঁহারা ভারতীর মত পত্রে প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহারা যে এরূপ ভ্রম করিতে পারেন, সে জ্ঞানই আমার ছিল না। অভিনব জ্ঞান লাভে আমি মর্ম্মাহত।

এই ভারতীতে 'কবির মালঞ্চ' আছে। তাহার আরম্ভ—

"হাসরে—ফোটরে,
হাসি হাস ফোটরে,
অত জড়সড় হয়ে, কেন তুমি থাকরে?
কেন, কেন ফল?
সোণার বরণ ধরে হোসরে আকুল?

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির—ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের ভাষার কি এই পরিণাম হইল? কাঁদিতে ইচ্ছা করে না?

আমাদের সাহিত্য-সেবক কিরূপ সাহিত্য সেবা করিতেছেন তাহা প্রথম প্রবন্ধ রথযাত্রা রহস্যের প্রথম দুই পৃষ্ঠা পড়িলেই বুঝা যায়।—"জগন্নাথ দেব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অদ্ধ বিকাশ বলিলে বলা যায়। গণেশ পুরাণের মতে এই উৎসব (রথযাত্রা) বৌদ্ধধর্ম্মানুগত বলা অন্যায় নহে।" কিছুই বুঝা গেল না, অথচ ইহারই নাম সাহিত্য-সেবা!

পরপৃষ্ঠায়, "শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরো রগৈঃ।
সেব্যমানং সদা দারু কোটি সূর্য্য সমপ্রভং॥

কোটী সূর্য্য সদৃশ লাবণ্য অথচ জগন্নাথদেবের কৃষ্ণমূর্ত্তি। অনুমান হয়, বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইবার পর পূর্ব্ব কথা চাপা পড়িয়া থাকিবে।" এইরূপ লেখা ছাপিয়া মাসিক পত্র লিখিয়া কি সাহিত্যের সেবা হইতেছে? অতঃপর সাহিত্য-সেবকের সমালোচনা করিতে আমরা আর পারিব না।

চিকিৎসক ও সমালোচক; ৩য় খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। খণ্ড গ্রন্থের সমালোচনাও চলে না।

বামাবোধিনী। শ্রাবণ। "পরার্থের সূত্রপাত—বিবাহ" প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে; "যেমন মানুষ যতশিশু ততই স্বার্থপর, তেমনই যে জাতির যতই বাল্যভাব, সে জাতি ততই স্বার্থপর।" এসকল কথা বাস্তবিক কি আমরা বুঝিতে পারি। 'বৃদ্ধ জাতি' 'বালক জাতি' সত্যসত্যই বুঝি কি! কুকী, নাগা প্রভৃতি যাহারা শত সহস্র বর্ষ প্রায় একরূপই রহিয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ? না, বালক? আর রুষ জর্ম্মান প্রভৃতি যাহারা পতঙ্গের মত নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহারা বালক না বৃদ্ধ? তাহার পর কুকীনাগা বেশী স্বার্থপর? না, রুষ জর্ম্মান বেশী স্বার্থপর? সত্যসত্যই কি এসকল কথার আমরা উত্তর দিতে পারি? না কেবল ইংরাজির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ গলাধঃকরণ করিতে গিয়া, কেবল আত্মাদর নষ্ট করি? আমার মতে আমাদের মত আদার বেপারীদের জাহাজের খবর রাখা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র।

দুর্ব্বৎসরের বোধন।

আগমনী—গীতি।

দুর্ব্বৎসরে দুর্গে তোরে করি আবাহন।
উঠ মা, উঠ মা, দুর্গে, কর আগমন॥
চারিদিকে আর্ত্তনাদ, রাজায় প্রজায় বাদ,
বিড়ম্বনা বিসম্বাদ পূরিত ভুবন।
যমজ্বালা রোগ শোক, ত্রাহি ত্রাহি করে লোক,
কেবল নরকভোগ, নরের জীবন॥
দেবরাজ হরে বৃষ্টি, স্রষ্টা নাশে নিজ সৃষ্টি,
রাজা করে কোপ-দৃষ্টি বহ্নি বরিষণ
হৃদয় শতধাচূর্ণ, অন্ন বিনা ক্ষীণক্ষুণ্ণ,
অন্ধকার হেরি শূন্য, প্রলয়ে যেমন॥
তোমাবিনা কোথা যাই, কার মুখপানে চাই,
কোথা গিয়া স্বস্তি পাই, জুড়াই যাতন?
তোমারি এ জন্মভূমি, দুর্গতিহারিণী তুমি,
তাই তোরে করি আমি, অকালে বোধন॥

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩০৪ সাল।	৭ম সংখ্যা।

মধুময়ী গীতা।

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধা—ঐ তিন প্রকার
আহার—ঐ তিন প্রকার যজ্ঞ—তিন প্রকার
তপস্যা—তিন প্রকার দান—ওঁ তৎসৎ বাক্য।

অর্জ্জুন কহিলেন—

লঙ্ঘিয়া শাস্ত্রের বিধি, কেবল শ্রদ্ধায় যদি,
কেহ করে উপাসনা, কিবা নিষ্ঠা তার ?—
সত্ত্ব, রজঃ, কিম্বা তমঃ ? কহিয়া আমার ভ্রম,
ঘুচাও হে জনার্দ্দন, কৃপাতে তোমার। ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার সার, রাজস, তামস, আর,—
এতিন প্রকার শ্রদ্ধা স্বাভাবিক হয়। ২
সত্ত্বগুণ যার যত, শ্রদ্ধা হয় তার তত,
পূর্ব্বজন্মভাব নিয়া জনমে ধরায়। ৩
সাত্ত্বিক স্বভাব যার, দেব আরাধনা তার ;
রাজসিকগণ পূজে যক্ষ-রক্ষগণে ;
তামসিক শ্রদ্ধা নিয়া, ভূতপ্রেত পূজা দিয়া,
উল্লাসে প্রফুল্ল হিয়া, নাচে মূঢ়জনে। ৪

অভিলাষ অহরহঃ, আসক্তি-আগ্রহসহ,
অহঙ্কারে কেহ কেহ, অবিবেকী হন,
করি বৃথা উপবাস, কৃশকায় বারমাস,
সে দেহে আমার বাস, না করে স্মরণ।
অবিহিত ঘোরতর, তপস্যায় কলেবর,
ক্লেশে হয়ে জরজর, করে যারা সার,
অতি ক্রূর-কর্ম্মা তারা, ধর্ম্মপথে ধৈর্য্যহারা,—
নিষ্কাম হইলে তারা স্বল্পে মোক্ষ পায়। ৫, ৬
অতি প্রিয় যে আহার, তাহাও তিন প্রকার;
যজ্ঞ, তপঃ, দান আর, ত্রিবিধ সকল,— ৭
উৎসাহ-আরোগ্য কর, প্রীতি সুখ-বৃদ্ধি কর,
স্নিগ্ধ, রসযুত, বৃদ্ধি করে আয়ুবল,
দর্শনেই তৃপ্তি, আর দেহে স্থায়ী যার সার,
সাত্ত্বিকের অতিপ্রিয় এরূপ আহার। ৮
অতি কটু অম্লময়, উষ্ণতিক্ত অতিশয়,
লবণাক্ত, রুক্ষ, দাহ-দুঃখ-যুত আর,
রোগপ্রদ যে আহার, রাজসিকগণ তার,
অতিশয় প্রিয় পার্থ;—তামসিক যারা ৯
শীতল নীরস বাসি, দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট রাশি,
অখাদ্য যা', তাহারই অতি প্রিয় তারা। ১০
ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য জন, কেবল কর্ত্তব্যে মন,
করেন বিহিত যজ্ঞ, সে যজ্ঞ সাত্ত্বিক; ১১
কর্ম্মফল-আশা ভরে, মহত্ত্ব প্রচার তরে,
যে যজ্ঞের আরম্ভ, সে যজ্ঞ রাজসিক। ১২
শ্রদ্ধা-মন্ত্র বিধিহীন, দক্ষিণা-অন্ন বিহীন,
যে যজ্ঞ আরম্ভ, বলে তামস তাহায়, ১৩
দেবদ্বিজ পূজাকার্য্যে, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্যে,
"শারীর তপস্যা" বলে শৌচ অহিংসায়। ১৪
বাক্য অনুদ্বেগ কর, সত্য, প্রিয়, হিতপর,
বেদাভ্যাস,—বাক্যময় তপস্যা এসব; ১৫

প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌন আর নির্ম্মমতা,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, এই মানসিক তপ। ১৬

শ্রদ্ধায় নিষ্কাম মনে, যোগিগণ-অনুষ্ঠানে,
এতিন তপস্যা হ'লে, সাত্ত্বিক বলিবে; ১৭

সৎকার বা পূজা তরে, মানার্থে বা দম্ভভরে,
যে তপস্যা, রাজসিক তাহারে জানিবে। ১৮

পরের নিধন স্মরি, কিম্বা আত্মপীড়া করি,
অজ্ঞানীর তপস্যা, সে তপঃ তামসিক; ১৯

অর্জ্জুন ঔচিত্যজ্ঞানে, পুণ্যকালে পুণ্যস্থানে,
যথার্থ ব্রাহ্মণে দান, সে দান সাত্ত্বিক। ২০

করিতে প্রত্যুপকার, ফলের উদ্দেশে আর,
ক্লেশে দান করা, সেই রাজসিক দান; ২১

অপাত্রে সৎকারশূন্য, তাহে তিরস্কার পূর্ণ,
করে সে তামসদান যাহারা অজ্ঞান। ২২

গভীর জ্ঞান বিশেষ, পরমাত্মার নির্দ্দেশ,—
"ওঁ তৎসৎ" বাক্যে হ'ল নিরূপণ,
সেই বাক্যে পুরাকালে, বিধির বিধান বলে,
ব্রাহ্মণ ও বেদ, যজ্ঞ, হইল সৃজন। ২৩

তেঁই 'ওঁ' উচ্চারণ, করি ব্রহ্মবাদিগণ
করেন সর্ব্বদা যজ্ঞ তপঃক্রিয়া দান; ২৪

নিষ্কাম মোক্ষার্থিগণে "তৎ" শব্দ উচ্চারণে,
করে তপঃ ক্রিয়া দান—যজ্ঞ-সমাধান। ২৫

পুত্রাদির জন্মোৎসবে, সাধুকর্ম্ম হয় যবে,
মাঙ্গলিক কার্য্য সবে, কহি শুন আর— ২৬

যজ্ঞদান তপোধর্ম্ম, তার তরে যে যে কর্ম্ম,—
সকলেই "তৎ" শব্দ হয় ব্যবহার। ২৭

অশ্রদ্ধায় তপস্যায়, যে হবন দান হয়,—
শ্রদ্ধাহীন যাহাকিছু "অসৎ" সকল,
কিবা তা'তে ইহলোকে, কিবা হ'বে পরলোকে,
শ্রদ্ধা না থাকিলে পার্থ সকলি বিফল। ২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয় যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পর।

(১১)

পাঠক মহাশয় বোধ হয় আমাকে বটতলার পুস্তক হইতে—কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে, তথা কাশীখণ্ড হইতে—বাঙ্গালা পয়ার উদ্ধার করিতে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাতে দোষ কি? বিষয়টি যে ঠিক্। সংস্কৃতেরও অভাব নাই।

সুনন্দ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোরদ্ভুত কর্ম্মণঃ।
বিরাড়্রূপস্য সংস্থানমাখ্যানং মহদদ্ভুতং॥
যাবতী ভূঃ সমুদ্দিষ্টা সসমুদ্রাদ্রিকাননা।
প্রতিভাতা মহারাজ কিরণৈশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥
বিয়চ্চ তাবদুপরি বিস্তার পরিমণ্ডলং।
পঞ্চবিংশতি কোট্যস্তু যোজনানাস্তু তৎ স্মৃতং॥
নবতীনাং সহস্রানি যোজনানি মহীপতে।
ভূমেরূর্দ্ধঞ্চ লোকানাং সিদ্ধচারণ রক্ষসাং॥
যে চ বিদ্যাধরা যক্ষরক্ষো গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেষাং তৎস্থানমীরিতং॥
ততো রাহুর্ম্মহাবাহো ত্রয়োদশ সহস্রকং।
যোজনানাং প্রবিস্তারং মণ্ডলং তস্য কথ্যতে॥
স্মরন্ বৈরং পুরাপ্রাপ্তং যঃ পর্ব্বণি মহাগ্রহঃ।
গ্রাসায় ধাবতি ক্রোধাৎ পুষ্পবন্তৌ মহীপতে॥
তদৈব ভগবচ্চক্রং সহস্রার্কোপমদ্যুতি।
উপতিষ্ঠতি তদ্ভীত্যা পুনরেব নিবর্ত্ততে॥
উপরাগং বদন্ত্যেবং পুণ্যকালশ্চ কথ্যতে।
লক্ষ যোজনতো ভানুর্ভূমেরেষ ব্যবস্থিতঃ॥
ভানোঃ সকাশাদুপরি লক্ষে লক্ষ্যঃ ক্ষপাকরঃ।
নক্ষত্র মণ্ডলং চন্দ্রাল্লক্ষযোজন মুচ্ছ্রিতং॥

নক্ষত্রমণ্ডলাৎ সৌম্য উপরিষ্টাদ্দিলক্ষতঃ।
বধাৎ শুক্রো দ্বিলক্ষে তু শুক্রাদ্ভৌমোদ্বিলক্ষকে ॥
মঙ্গলাদুপরিষ্টাচ্চ গীষ্পতির্লক্ষকদ্বয়ে।
দ্বিলক্ষ যোজনোৎসেধঃ সৌরির্দ্দেবপুরোহিতাৎ ॥
শতাযুত সমুচ্ছ্রায়ং সৌরেঃ সপ্তর্ষি মণ্ডলং।
সপ্তর্ষিভ্যঃ সহস্রানাং শতাদূর্দ্ধং ধ্রুবস্থিতিঃ ॥
পদগম্যং হি যৎকিঞ্চিদ্বস্তুস্তি ধরণীতলে।
তদ্ভূর্লোক ইতিখ্যাতং শাকদ্বীপাদি কাননং ॥
ভূর্লোকাচ্চ ভুবর্লোকঃ সূর্য্যাবধিরুদীরিতঃ।
আদিত্যা দাধ্রুবং রাজন্ স্বর্লোক কথ্যতে বুধৈঃ ॥
মহর্লোকঃ ক্ষিতেরূর্দ্ধ মেককোটি প্রমানতঃ।
কোটিদ্বয়ে বর্ত্তমানো জনো ভূর্লোকতো নৃপ ॥
উপরিষ্টাৎ ক্ষিতেরষ্টৌ কোটয়ঃ সত্যমীরিতং।
সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠো যোজনানাং প্রমানতঃ ॥
ভূর্লোকাৎ পরিসংখ্যাতঃ কোটিরষ্টাদশ প্রভো।
যত্রাস্তে শ্রীপতিঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেষামভয় প্রদঃ ॥
বৈকুণ্ঠাদুত্তরে শৈবো লোকঃ ষোড়শকোটয়ঃ।
তির্য্যগেব মহারাজ কৈলাসাখ্যস্ত পর্ব্বতঃ।
পার্ব্বত্যা সহিতঃ শম্ভুর্যত্রাস্তে স্বগণৈর্ব্বৃতঃ ॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ভূম্যাদিলোক বর্ণন ৬ অধ্যায়।

প্রায় এই কথাই পূর্ব্বে বাঙ্গালা পয়ার উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে। ভাল, এখন চাপ্‌রাস হইল।

সে যাহা হউক ইন্দ্রের অমরাবতী বা স্বর্গের ব্যাপার একটু ভাল করিয়া বুঝুন। এক্ষণে স্বর্গের গুণ দোষ বলিব।

সুবাহুরুবাচ।

স্বর্গস্য মে গুণান্‌ব্রূহি সাম্প্রতং দ্বিজসত্তম।
এতৎ সর্ব্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥

জৈমিনিরুবাচ।

নন্দনাদীনি দিব্যানি রম্যাণি বিবিধানি চ।
তত্রোদ্যানানি পুণ্যানি সর্ব্বকাম শুভানি চ ॥

সর্ব্বকাম ফলৈ র্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সমন্ততঃ।
বিমানানি সুদিব্যানি পরিতান্তপ্সরোগণৈঃ॥
সর্ব্বত্রৈব বিচিত্রাণি কামগানি রসানি চ।
তরুণাদিত্য বর্ণানি মুক্তাজালান্তরাণি চ॥
চন্দ্রমণ্ডল শুভ্রাণি হেমশয্যাসনানি চ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাশ্চ সুখদুঃখবিবর্জিতাঃ॥
নরাঃ সুকৃতিনস্তে তু বিচরন্তি যথা সুখং।
ন তত্র নাস্তিকা যান্তি ন স্তেয়া নাজিতেন্দ্রিয়াঃ॥
ন নৃশংসা ন পিশুনাঃ কৃতঘ্নান চ মানিনঃ।
সত্যাস্তপঃ স্থিতাঃ শূরা দয়াবন্তঃ ক্ষমাপরাঃ॥
যজ্বানো দানশীলাশ্চ তত্র গচ্ছন্তি তে নরাঃ।
ন রোগো ন জরা মৃত্যুর্ন শোকো ন হিমাদয়॥
ন তত্র ক্ষুৎপিপাসা চ কস্য গ্লানির্ন দৃশ্যতে।
এতে চান্যে চ বহবো গুণাঃ সন্তি চ ভূপতে॥
দোষাস্তত্রৈব যে সন্তি তান্ শৃণুষ্ব চ সাম্প্রতং॥
শুভস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নং ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে।
ন চাত্র ক্রিয়তে ভূয়ঃ সোঽত্র দোষো মহান্ শ্রুতঃ॥
অসন্তোষশ্চ ভবতি দৃষ্ট্বা দীপ্তাং পরশ্রিয়ং।
সংপ্রাপ্তে কর্ম্মনামন্তে সহসা পতনং তথা॥
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ফলং তত্রৈব ভুঞ্জতে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং রাজন্ ফলভূমি স্বসৌ স্মৃতা॥

পদ্মপুরাণ ভূখণ্ড ৯০ অধ্যায়।

অতঃপর স্বর্গের স্বরূপ ও কর্ম্মবিশেষে স্বর্গবিশেষ গমনের কথা শ্রবণ করুন।

সূত উবাচ।

স্বর্গস্থানং মহা পুণ্যং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে।
ভারতে কৃতপুণ্যানাং দেবানামপি চালয়ং॥
মধ্যে পৃথিব্যামদ্রীন্দ্রো ভাস্বান্ মেরুর্হিরণ্ময়।
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতিঃ সমুশ্রিতঃ॥

প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ধরণ্যাং ধরণীধরঃ।
তাবৎ প্রমানা পৃথিবী পর্ব্বতশ্চ সমন্ততঃ॥
তস্য শৃঙ্গত্রয়ং মুর্দ্ধণি স্বর্গো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতং॥
মধ্যগং পশ্চিমং পূর্ব্বং মেরোঃ শৃঙ্গাণি ত্রীণি বৈ।
প্রযুতোশ্রিত মাত্রাণি দ্বেশৃঙ্গে তস্য মধ্যতঃ॥
মধ্যস্থং স্ফাটিকং শৃঙ্গং বৈদূর্য্য করকাময়ং।
ইন্দ্রনীলময়ং পূর্ব্বং মাণিক্যং পশ্চিমং স্মৃতং॥
যোজনানাং সহস্রাণি নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
উচ্ছ্রিতং মধ্যগং শৃঙ্গং স্বর্গো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
প্রযুতান্তরিতং শৃঙ্গং মুর্দ্ধণি চ্ছত্রাকৃতি স্থিতং।
পূর্ব্বপশ্চিমশৃঙ্গানাং সকলং মধ্যমস্য চ॥
ত্রিপিষ্টপো নাকপৃষ্ঠো অপ্সরঃ শান্তি নির্ব্বৃতী।
আনন্দোঽথ প্রমোদশ্চ স্বর্গাঃ শৃঙ্গে চ মধ্যমে॥
শ্বেতশ্চ পৌষ্টিকশ্চৈব উপশোভন মন্মথৌ।
আহ্লাদঃ স্বর্গরাজশ্চ স্বর্গাঃ শৃঙ্গেতু পশ্চিমে॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সৌভাগ্যশ্চাতি নির্মলঃ।
সৌখ্যশ্চ নির্ব্বৃতিশ্চৈব পুণ্যাহশ্চ তথা দ্বিজ॥
স্বর্গাশ্চৈতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বশৃঙ্গে সমর্থিতাঃ।
একবিংশতি যে স্বর্গা নিবিষ্টা মেরুমূর্দ্ধনি॥
অহিংসা দানকর্ত্তারো যজ্ঞানাং তপসাং তথা।
তেষু তেষু বসন্তিস্ম জনাঃ ক্রোধবিবর্জিতাঃ॥
জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসঃ।
ভৃগুপ্রপাতে সৌখ্যন্তু রণে চৈবাস্য নির্ম্মলঃ॥
অনশনে তু সন্বাসে মৃতো গচ্ছেত্রিবিষ্টপং।
ক্রতুযাজী নাকপৃষ্ঠমগ্নিহোত্রী চ নির্ব্বৃতিং॥
তড়াগ কূপকর্ত্তা চ লভতে পৌষ্টিকং দ্বিজ।
সৌবর্ণদায়ী সৌভাগ্যং লভেৎ স্বর্গং মহাতপাঃ॥
শীতকালে মহাবহ্নিং প্রজ্বালয়তি যো নরঃ।
সর্ব্ব সত্ত্ব হিতার্থায় স্বর্গং চাপ্সারসং লভেৎ॥

হিরণ্য গো প্রদানেন নিরহঙ্কার মাপ্নুয়াৎ।
ভূমিদানেন শুদ্ধেন লভতে শাশ্বিকং পদং॥
রৌপ্যদানেন শুদ্ধেন স্বর্গং গচ্ছতি নির্ম্মলং।
অশ্বদানেন পুণ্যাহং কন্যাদানেন মঙ্গলং॥
দ্বিজেভ্য স্তর্পণং কৃত্বা দত্বা বস্ত্রাণি ভক্তিতঃ।
শ্বেতস্তু লভতে স্বর্গং যত্র গত্বা ন শোচতি॥
কপিলা গোপ্রদানেন পরার্দ্ধে চানুভূয়তে।
গোবৃষস্য প্রদানেন স্বর্গং মন্মথ মশ্নুতে॥
মাঘমাসে সরিৎস্নায়ী তিলধেনু প্রদস্তথা।
ছত্রোপানহদাতা চ স্বর্গং যাত্যপ শোভনং॥
দেবায়তনকর্ত্তা বৈ শুশ্রূষণপরস্তথা।
তীর্থযাত্রাপরশ্চৈব স্বর্গরাজে মহীয়তে॥
একান্নভোজী যো মর্ত্ত্যো নক্তভোজী চ নিত্যশঃ।
উপবাসী ত্রিরাত্রাদ্যৈঃ শান্তি স্বর্গসুখং লভেৎ॥
সরিৎস্নায়ী জিত ক্রোধো ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ।
নির্ম্মলং স্বর্গমাপ্নোতি তথা ভূত হিতেরতঃ।
বিদ্যাদানেন মেধাবী নিরহঙ্কার মাপ্নুয়াৎ।
যেন যেনহি ভাবেন যদ্‌যদ্দানং প্রযচ্ছতি॥
তত্তৎ স্বর্গমবাপ্নোতি যদ্‌যদিচ্ছতি মানবঃ।
যস্ত সর্ব্বাণি দানানি ব্রাহ্মনেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
স প্রাপ্য ন নিবর্ত্তেত দিবং শাস্তমনাময়ং॥
শৃঙ্গস্তু পশ্চিমং যচ্চব্রহ্মা তত্রস্থিতঃ স্বয়ং।
পূর্ব্বশৃঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণু র্মধ্যে চৈব শিবস্থিতঃ॥

(স্বর্গ গমনের অনেকগুলি পথ আছে এবং কোন্ দেবতা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কোন্ পথ রক্ষা করিয়া থাকেন।)

অতঃ পরন্তু বিপ্রেন্দ্র স্বর্গাধ্বানমিমং শৃণু॥
বিমলং বিপুলং শুদ্ধমুপর্য্যুপরিসংস্থিতং।
প্রথমে তু কুমারস্তু দ্বিতীয়ে মাতরঃ স্থিতাঃ॥

তৃতীয়ে সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তর্য্যে বিদ্যাধরা দ্বিজ।
পঞ্চমে নাগরাজশ্চ ষষ্ঠেতু বিনতাসুতঃ॥
সপ্তমে দিব্যাপিতরো ধর্ম্মরাজস্তথাষ্টমে।
নবমেতু তথা দক্ষ আদিত্যা দশমে পৃথি॥

নৃসিংহপুরাণ ৩০ অধ্যায়।

তবেই দেখা যাইতেছে কোন্ গ্রহ কতদূর কারপর কোন্ গ্রহ, ভূর্লোক কি, মহর্লোক কি, এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে পদ্য উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। বিষয়টি স্থূলত ঠিক্ আছে। তারপর দেখা যাইতেছে স্বর্গের সুখ কি কি? সুন্দর সুন্দর রম্য উদ্যান, তাহাতে কল্পতরু আছে; উত্তম দিব্য নানা প্রকারে সজ্জিত অপ্সরা পরিশোভিত যথেচ্ছ গমনকারী বিমানগুলি আছে। সুবর্ণের শয্যা আসন। সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ সর্ব্বদুঃখ বিবর্জিত আত্মাগণ বিরাজ করিতেছে। নানা প্রকার পুণ্যকারী লোকের জন্যই স্বর্গ—নাস্তিকের জন্য, নৃশংসের, নিষ্ঠুরের, কৃতঘ্নের, বৃথাভিমানীর জন্য নহে। সেখানে জরা মৃত্যু রোগ শোক নাই, ক্ষুৎপিপাসা নাই। সেখানে কেহ কাহারও গ্লানিকারী নাই। এই সমস্ত স্বর্গের সুখ বটে কিন্তু দুঃখও আছে। পৃথিবীতে লোক সুকার্য্য, পুণ্যকার্য্য করিতে পারে কিন্তু স্বর্গে কোন কার্য্য নাই, যাহা পুঁজি লইয়া গিয়াছ তাহাই—বাড়াইবার যো নাই বরং ভোগের দ্বারা সেই পুণ্য দিন দিন ক্ষয় হইবে পরে একদিন সম্পূর্ণ পুণ্য ফুরাইলে সহসা পতন। পৃথিবীতে কৃত সুকার্য্যের ফলভোগের জন্যই স্বর্গ। আরও স্বর্গে অসন্তোষ আছে, পরশ্রী দেখিয়া, ইন্দ্রের সৌভাগ্য দেখিয়া আর নিজের অবস্থা তুলনা করিয়া। সে অসন্তোষ ভাল, প্রাণী মনে করে কেন আমি আরও ভাল কাজ করি নাই তাহা হইলে ত আমার অবস্থা আরও উন্নত হইত?

তৎপরে স্থূলত স্বর্গের স্বরূপ ও কর্ম্ম বিশেষে স্বর্গবিশেষ গমন দেখা যাইতেছে। হিরণ্ময় মেরু পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ—মধ্য শৃঙ্গ, পূর্ব্ব শৃঙ্গ আর পশ্চিম শৃঙ্গ, মধ্যের শৃঙ্গটি আবার দুইভাগে বিভক্ত। মধ্যের শৃঙ্গ স্ফাটিক ও বৈদূর্য্য করকাময়, পূর্ব্বটি ইন্দ্রনীল মণিতে বিরচিত, পশ্চিমটি মাণিক্যময়। এই কয়টি শৃঙ্গের উপরে ছত্রাকারে স্বর্গ অবস্থিত আছে। ২১টি বিশেষ বিশেষ স্বর্গ এই তিনটি শৃঙ্গের উপরিভাগে অবস্থিত। তাহাদের নাম যথা—ত্রিপিষ্টপ, নাকপৃষ্ঠ, অপ্সর, শান্তি, নির্ব্বৃতী, আনন্দ, প্রমোদ—মধ্য শৃঙ্গে। পশ্চিম-শৃঙ্গে

শ্বেত, পৌষ্টিক, উপশোভন, মন্মথ, আহ্লাদ, স্বর্গ, স্বর্গরাজ। পূর্ব্ব-শৃঙ্গে—নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সৌভাগ্য, অতি নির্মল, সৌখ্য, নির্ব্বৃতি, পুণ্যাহ। আনন্দ-স্বর্গ—জলপ্রবেশী এই স্থান পায়। প্রমোদ—বহ্নিসাহস (ইহার মধ্যেই সতী-দাহ পড়িতেছে নয়?) সৌম্য—ভৃগুপ্রপাত যিনি করেন অর্থাৎ অতি উচ্চ-স্থান হইতে ভগবানের নামে ঝম্প দিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। নির্ম্মল—রণে মৃত্যু হইলে, শুদ্ধ রৌপ্যদানে। ত্রিপিষ্টপ—ক্রমে অনশনে প্রাণত্যাগ, অবশ্য ভগবানের নাম করিয়া। নাকপৃষ্ঠ—ক্রতুযাজী, যাঁহারা সর্ব্বদা যজ্ঞ করেন। নির্ব্বৃতি—অগ্নিহোত্রী। পৌষ্টিক—তড়াগ কূপকর্ত্তা। সৌভাগ্য—সুবর্ণদান। স্বর্গ—মহাতপকারী। অপ্সর—শীতকালে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া যে সকলের সুখ জন্মায়। নিরহঙ্কার—হিরণ্য গো প্রদানকারী, বিদ্যাদান। শান্তি—ভূমিদান, উপবাস করিয়া ধর্ম্মকারী। পুণ্যাহ—অশ্বদান। শ্বেত—তর্পণ করিয়া বস্ত্রদান। মন্মথ—গো বৃষ দান। উপশোভন—মাঘমাসে শারৎস্নান, তিল, ধেনু, ছত্র দান। স্বর্গরাজ—তীর্থকারী, দেবায়তন কর্ত্তা, শুশ্রূষা পরায়ণ। (অতি) নির্মল—জিতক্রোধ, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভূতহিতে রত।

মনুষ্য যে যে ভাবে যাহা যাহা ইচ্ছা করিয়া কার্য্য করিবে মৃত্যুর পর সেইরূপই স্থান প্রাপ্ত হইবে। পশ্চিম-শৃঙ্গে ব্রহ্মা, মধ্যে শিব, পূর্ব্ব শৃঙ্গে বিষ্ণুর অবস্থিতি।

তারপর স্বর্গ গমনের যে দশটি পথ আছে—১ম পথে, কুমার (কার্ত্তিক) আছেন। ২য়, মাতৃগণ, ৩য়, সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব, ৪র্থ, বিদ্যাধর, ৫ম, নাগরাজ, ৬ষ্ঠ, বিনতাসুত, ৭ম, দিব্য পিতৃগণ, ৮ম, ধর্ম্মরাজ।

পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় শঙ্কর দেব দেব মহাদেব কেন হইলেন তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। পূর্ব্বেইত দেখাইয়াছি কিরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে দেবতাগণ সৃষ্টি করেন। পরে আপন সমুদয় ঐশ্বর্য্য শ্রীহরিকে সমর্পণ করিয়া, নিজে শ্মশান ও ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিলেন। হরি যে শিবের গুরু।

লক্ষকোটি যোজনেতে কৈলাসপুরী হয়।
যথা বিশ্বনাথ বামে গৌরী বিরাজয়॥

*　　　*　　　*

সকলের সার দেবে চরিতে না পায়।
লীলার কারণ মাত্র শরীরে ধরয়॥

জগতের এক বস্তু সাধনে না পায়
হৃদয়ে থাকিয়া সব প্রকাশিত হয়
সকল দমন কর্ত্তা সর্ব্ব গুণাতীত
সত্ব রজ তম তিন গুণে বিরাজিত
গুণ ক্রমে সৃষ্টি পালে সংহার করয়
সর্ব্বকর্ত্তা স্বেচ্ছাময় সব প্রকাশয়
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাত্র কিছুতেই নয়
অমূর্ত্তি পরমব্রহ্ম সদা শ্রুতি কয়
ব্যাপ্ত ব্রহ্ম নিত্য ব্রহ্ম সর্ব্বাদি পর্য্যায়
সকল কারণ কর্ত্তা পরাৎপর হয়
আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হয় নিরময়
সমাধি যোগেতে যাতে নিবৃত্তি আশ্রয়
ঈশ্বর পরম জ্যোতি হৃদয়স্থ রহে
যোগগম্য এক বস্তু নানা মূর্ত্তি কহে
সচ্চিদানন্দ রূপ মহিমা অপার
বেদ বিধি সর্ব্বশাস্ত্রে হয় সারাৎসার
মহা প্রলয়েতে তিনি অন্ধকার ময়
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তেজ উচিত করয়
কৈলাসেতে পঞ্চ বক্তৃ ত্রিনেত্র ধরয়
শক্তিতে ত্যজিয়া শক্তি ভাবাতীত হয
তারপর মহাদেব বৈকুণ্ঠে আসিয়া
ব্রহ্মা আদি যতেক দেবতা আনাইয়া
আপন ঐশ্বর্য্য সব নারায়ণে দিল
সর্ব্বকর্ত্তা করি রাজা অভিযুক্ত কৈল
দেবলোক গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আদি যত
মঙ্গলাচরণ করে বিধি বিধিমত
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের এক কর্ত্তা স্থূল
জগৎ কারণ সেই জগতের মূল
সর্ব্বৈশ্বর্য্য মহাদেব হরিতে অর্পিল
শ্রীহরিশঙ্কর প্রেমানন্দেতে ভাসিল

যথাবিধি নমস্কার শিবকে করিল
তারপর ব্রহ্মাণী হরিকে প্রণমিল
শঙ্খ শারঙ্গধনু দিল গদাধরে
একাত্মজ এক অঙ্গ হৈল হরিহরে
নারায়ণ প্রতি বর দিলেন শঙ্কর
তোমাকে যুদ্ধেতে জয়ী হইবে সত্বর
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি সবে
বিষ্ণুর মায়াতে মুগ্ধ জগৎ হইবে
তবভক্তজনে আমি মুক্তিপদ দিব
নারায়ণ প্রতি এই বর দিল শিব
তারপর বাসুদেবে করি আলিঙ্গন
কৈলাসেতে সদাশিব করিল গমন
নিত্যানন্দ সুখময় আনন্দে ভাসিল
হর্ষযুক্ত সর্ব্বদেব স্ব স্ব স্থানে গেল।

(কাশীখণ্ড)

এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জীবের উদ্ধারের জন্য কিছু বলিয়াছেন কি? শঙ্কর ত বলিতেছেন "তব ভক্তজনে আমি মুক্তিপদ দিব"। শিবই জগৎগুরু শিবই তন্ত্র বলিয়াছেন, শিবের হাতেই চাবিকাঠি, শিবই গুরুদত্ত "বীজের" সৃষ্টিকর্ত্তা, শিবই সংহারকর্ত্তা। ভগবান বলিয়াছেন বৈকি? শ্রীভগবান বলিয়াছেন অর্জ্জুনকে—যেমন করিয়া বলিয়াছেন এমন করিয়া কেহ কখন বলেন নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই গীতা, শ্রীগীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা করিলে, গীতোক্ত কার্য্য করিলে মনুষ্যকে আর নরকভোগ করিতে হয় না, আর স্বর্গভোগ করিতে হয় না, কি লৌহ কি সুবর্ণ কোন শৃঙ্খলেই আর বদ্ধ হইতে হয় না। জীব একেবারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১-৯অ

ত্রিবেদ বিহিত* কর্ম্মকারী যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া সোমরস পান পুরসর নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে; তাহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্য দেবভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করে। ২০

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্তাভুমে প্রবেশ করেন এবং উক্ত বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করত কামনা পরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করেন। ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩
অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি যুক্তৈ্বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪-৯অ
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪-৮অ
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

অনন্যচিত্তে নিষ্কামভাবে যাহারা আমায় উপাসনা করে নিত্য অবহিত সেই সকল ব্যক্তির যোগ-ক্ষেপভার আমি বহন করি। ২২

হে কৌন্তেয় যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া ভজনা করিয়া থাকে তাহারা অবিধানে আমারই ভজনা করিয়া থাকে। ২৩

আমি যজ্ঞ সমূহের আহুতি ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু তাহারা যথার্থরূপে আমায় জানে না এজন্য তাহারা বার বার গতায়াত করিয়া থাকে। ২৪

দেবযজ্ঞ পরায়ণ ব্যক্তি দেবলোকে, পিতৃযজ্ঞ পরায়ণ ব্যক্তি পিতৃলোকে, ভূত-

যজ্ঞ পরায়ণ ব্যক্তি ভূতলোকে এবং আমা পরায়ণ ব্যক্তি আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। ২৫

মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসক হও এবং আমায় নমস্কার কর, মৎ পরায়ণ হইয়া সমাহিত হইলে আমাকেই পাইবে। ৩৪-৯অ

সর্ব্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে নিত্য স্মরণ করে হে পার্থ সেই নিত্য যুক্ত যোগীদের পক্ষে আমি সুলভ। ১৪-৮অ

মহাত্মারা (ভগবদ্ভক্তেরা) আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আগার অনিত্য জন্ম-লাভ করেন না, তাঁহারা পরম সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৫

হে অর্জ্জুন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনশীল কিন্তু হে কৌন্তেয় আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ১৬

কিরূপে মৃত্যুর পর ভগবান প্রাপ্তি হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিলে এই প্রবন্ধের সার্থকতা হয়। আর মৃত্যুর পর ভগবান প্রাপ্তি হইলে সেই মরণের সার্থকতা হয়। কিরূপে মরিতে হইবে ভগবান তাহাও শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়॥ ৫-৮অ
যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯
প্রয়ান কালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্॥ ১৩

অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি কলেবর ত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমার ভাবই পাইয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৫

হে কৌন্তেয় যিনি যে যে ভাব ভাবিতে ভাবিতে অন্তকালে কলেবর পরিত্যাগ

করেন; সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে হৃদয় আবিষ্ট থাকায় তাহাই পাইয়া থাকেন। ৬

সর্ব্বজ্ঞ অনাদি, অনুশাস্তা, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম, সকলের পালনকর্ত্তা, মলিন মনো-বুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পর বর্ত্তমান, এবং সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এ হেন পুরুষকে অন্তিম দশায় ভক্তিভাবিত অন্তঃকরণে যোগ বলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সমাবেশিত করিয়া যিনি চিন্তা করেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে পাইয়া থাকেন। ৯।১০

ইন্দ্রিয় দ্বার সকল প্রত্যাহার করিয়া মনকে হৃদয়ের মধ্যে নিবদ্ধ করত ভ্রূর মধ্যে প্রাণবায়ুকে রক্ষা করিয়া যোগ ধারণায় আশ্রিত হইয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও আমার অনুস্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান তিনি পরমপদ পাইয়া থাকেন। ১২।১৩

এই গেল শ্রীভগবানের কথা আর লোকের কথা হইতেছে—"জপ তপ কর কি মর্‌তে জান্‌লে হয়।" নহিলে উকিলকে আপীল সওয়াল জবাব করিতে করিতে মরিতে হইবে, ডাক্তারকে প্রেস্‌ক্রুপসন্ বলিতে বলিতে মরিতে হইবে, আর খেলোয়াড়কে কিস্তি দিতে দিতে স্বয়ং "মাৎ" হইতে হইবে।

পাঠক মহাশয় হয়ত বলিবেন "কিন্তু এ যে দেখিতেছি—যোগ।" আমিও বলি, যোগ বই কি? যোগ নহিলে মৃত্যুর পর সুযোগ হইবে না। কার্য্যটা ও কথাটা নিতান্ত সোজা কেন হইবে? ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ যে জীবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসা? যোগী রামপ্রসাদ কি বলে শুনুন।

ষট্ চক্র ভেদ।

রাগিণী বিভাস। তাল-একতালা।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে॥
একস্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্যে বরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, থ, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোলস্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্ত্য এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ
যং রং লং বং হং হোং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপা দৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও মনের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশশত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে॥

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

আলেখ্য দর্শনে।

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন এদেশ ইংরাজের মুলুক হয় নাই। মোগলসম্রাটগণ দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন। তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালার মসনদে বিরাজমান। মুর্শিদাবাদ সুবে বাঙ্গালার নূতন রাজধানী হইয়াছে।

প্রতাপপুর ভাগীরথীতীরে একটী ছোট পল্লীগ্রাম। সেখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বসবাস করেন। অবশিষ্ট অধিবাসীগণ ইতর জাতীয়। এই গ্রামের মধ্যে বোসেরাই খুব বড়লোক ছিল কিন্তু এখন তাহাদের ভাঙ্গটা পড়িয়াছে। তাহাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে কিন্তু তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। অর্থাভাবে গৃহের আবশ্যকীয় মেরামতও ঘটিয়া উঠে না। বৈঠক-খানা-বাড়ী যাহা পূর্ব্বে কত বিচিত্ররঙ্গে চিত্রিত ছিল, আজ তাহাতে বৃষ্টি-ধারা পতিত হইয়া শ্যাওলা পড়িয়াছে, যে গৃহ দিবারাত্রি আমোদ-প্রমোদ ও উচ্চহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, আজ তাহা পারাবত ও পেচকের আবাসস্থান হইয়াছে; নিশিযোগে পেচকের কর্কশ চিৎকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া পার্শ্বস্থ জনগণের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিত। যেখানে সুপ্রসস্ত মনোহর পুষ্পোদ্যান ছিল, আজ তাহা কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিণত। এতবড় অট্টালিকা মনুষ্যপরিত্যক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে। বাহিরবাটী পার হইয়া অন্দরমহলের এক প্রকোষ্ঠে একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা তাহার মাতার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছে, মাতা একখানি ছিন্নবস্ত্রে 'তালি' দিতেছেন। বালিকার মাতা বিধবা, বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, মুখ ম্লান, কপালে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহ নাই, এই বালিকাকে লইয়াই তিনি সংসারী। তাঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভালই ছিল কিন্তু বিধির বিপাকে সর্ব্বস্ব গিয়াছে—আছে কেবল সেই ভগ্ন অট্টালিকা আর ভগ্ন মন। সম্পদের সময় তাঁহাদের অনেক আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ছিলেন কিন্তু বিপদের সময় কেহ তথায় বড় একটা পদার্পণ করেন না। বালিকার মাতার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইত কিন্তু

ক্রমে সকলই সহিয়া গেল। সংসারের স্বার্থপরতায় ও নির্ম্মম ব্যবহারে নিষ্পেষিত হইয়াও তিনি অবিচলিত রহিলেন। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ কায়ঃক্লেশে কন্যাকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

(২)

আজ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। অতি প্রত্যূষে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে এক জঙ্গলের ভিতর একটী বালিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বনকুসুম চয়ণ করিতেছে, দেখিতে দেখিতে একটী বালক আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল ও দুইজনে একরাশি ফুল তুলিয়া ফেলিল। বালকটির বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাদশ বর্ষ, বালিকাটী অষ্টম বর্ষীয়া। ফুল তুলিতে তুলিতে দুইজনে কত গল্প করিতে লাগিল। গল্প চলিতেছিল কিন্তু বালকটী অন্যমনস্ক। ক্রমে গাছপালা রৌদ্রে ঢাকিয়া ফেলিল। অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া বাড়ী যাইবার জন্য বালিকা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে ফুলগুলি একজায়গায় গুছাইয়া লইয়া বলিল 'প্রফুল্ল আজ তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন?' প্রফুল্ল কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ যেন তাহা বন্ধ করিল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বালিকা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে বলো না'। প্রফুল্ল অনেক কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল 'নলিনী, পরশুদিন তোমাদের সব ছেড়েছুড়ে আমায় কাকার সঙ্গে সহরে যেতে হ'বে, তাই ভাবছি কেমন করে তোমাদের ছেড়ে যাব, তোমাকে একদিন না দেখলে, তোমার সঙ্গে খেলা না করিলে আমার কত কষ্ট হয়' বালক আর বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকার কচি কচি চক্ষু দুটী জলে ডব্ ডব্ করিতে লাগিল, দুই এক ফোঁটা অশ্রু মুক্তার ন্যায় গণ্ড বহিয়া ভূমে পতিত হইল। পুষ্পগুলি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল চক্ষু মুছিয়া ফুলগুলি তুলিয়া নলিনীকে দিল। তারপর পূজার সময় আবার আসিবে, দুজনে খেলা করিবে, সহরের কত গল্প বলিবে প্রভৃতি আশ্বাসবাক্যে বালিকাকে সান্ত্বনা করিল।

(৩)

মুর্শিদাবাদ নূতন সহর হইয়াছে। নবাবের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, সহরময় বড় বড় অট্টালিকায় কত আমির ওমরাহ বাস করিতেছেন। প্রসস্ত রাজবর্ত্ম তাহার উভয় পার্শ্বে নানা দেশজাত পণ্যবীথিকা।

প্রফুল্ল তাহার খুল্লতাত রামযাদব ঘোষের সহিত এখানে আসিয়া সহর দেখিয়া তো অবাক্। এরূপ বড় বড় বাড়ী, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি একস্থানে এত অধিক সে কখনও দেখে নাই কিন্তু এই সকল একা দেখিয়া তাহার যেন বেশ সুখ হইতেছিল না, নলিনীকে আনিয়া দেখাইতে পারিলে, তাহার যেন ষোলআনা সুখ হইত। প্রফুল্ল এখানে একজন মৌলবীর নিকট পার্সি ও আরবী শিখিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। রামযাদব নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার অধীনে ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। প্রফুল্ল দিন দিন কাজে উন্নতি করিতে লাগিল। রামযাদবের পুত্র বা কন্যা ছিল না। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্লকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। এখন প্রফুল্লকে কৃতকর্ম্মা দেখিয়া তাহাকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি ৺কাশীবাসী হইলেন। প্রফুল্লের কার্য্যতৎপরতা শীঘ্রই নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি উচ্চ পদ প্রদান করিলেন।

রামযাদব খুব হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ পূজার্চ্চনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না কিন্তু প্রফুল্ল সে দিকে বড় ঘেঁসিত না, হিন্দুয়ানীতে বড় শ্রদ্ধাও ছিল না, রামযাদব তাহা বুঝিয়াও তাহাকে বড় একটা কিছু ধর্ম্মের কথা বলিতেন না। ভাবিতেন, 'হিন্দুবছেলে হিন্দু থাকিবে, এখন বয়স ও বুদ্ধি অল্প, বড় হইলে স্বধর্ম্মে মতিগতি আপনা হইতেই হইবে'।

প্রফুল্ল মুসলমানদের সহিত মিশিতে বড় ভালবাসিত। পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের প্রতি তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোল্লাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে তাহার আনন্দবোধ হইত। ক্রমে তাহাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুসন্তান প্রফুল্ল পৈতৃক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হিন্দুনাম ঘুচিয়া এখন তাহার নাম হইল আলি মহম্মদ। প্রফুল্ল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে শুনিয়া নবাব অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে খেলাৎ ও জায়গীর প্রদান করিলেন ও এক ওমরা-হের কন্যার সহিত তাহার পরিণয়কার্য্য মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করাইলেন। প্রফুল্ল! নলিনীকে মনে আছে কি? না পিতৃধর্ম্মের সহিত তাহাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছ। দিয়াছ বৈকি।

(৪)

নলিনী এখন আর বালিকা নাই, তাহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কে তাহার বিবাহ দিবে? কে তাহাদের সহায় সম্বল? নলিনীর মাতা কন্তার বিবাহের জন্য অতিশয় উদ্বিগ্না ছিলেন কিন্তু কন্যা বিবাহে ইচ্ছুক না থাকায়, তিনি আর কোনও চেষ্টাও করেন নাই, আর অনাথা বিধবা একা চেষ্টাই করিয়াই বা কি করিতেন?

নলিনীর মাতার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল, প্রত্যহই অল্প অল্প জ্বর হয়, ক্রমে রোগ কঠিণ হইল, কন্যা বহু সেবাসুশ্রূষা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—তিনি এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নলিনী মাতৃশোকে অভিভূতা হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল, যখন জ্ঞান হইল দেখিল তাহার স্নেহের জননী তাহাকে সত্য সত্যই ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। তখন কোথা হইতে মনে বল আসিল, চক্ষের জল শুখাইল। সে মাতার শব স্কন্ধে করিয়া ভাগীরথীতীরে আসিল। ইতরজাতীয় কয়েকজন লোক এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহারা পূর্ব্বে বোসেদের প্রজা ছিল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সনাতন পোদ্দার বোসেদের বিষয়আশয় খরিদ করিয়া লইয়াছে। তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বোসেদের উপর তাহার দৃষ্টি যেন একটু বেশী প্রখর —তাহার ভয়ে ইহারা বোসেদের সাহায্য করিতে পারিত না। কিন্তু আজ সে ভয় চলিয়া গেল, এ দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয়, আর সামান্য কয়েকজন ইতর জাতীয় লোকের হৃদয় আর্দ্র হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। তাহারা চিতার আয়োজন করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চিতা জ্বলিয়া উঠিল—অগ্নি ধূধূ করিতে লাগিল—আর নলিনী পাগলিনীর ন্যায় সেই প্রজ্জ্বলিত চিতায় ঝম্প প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহা দেখিয়া কয়েকজন কৃষক-রমণী তাহাকে ধরিয়া রাখিল। ক্রমে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। সব ফুরাইল।

নলিনী বাড়ী গেল, গিয়া দেখিল সোনাতন পোদ্দারের লোকজন তাহার বাড়ী দখল করিয়াছে। তাহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিল না। তাহারা বলিল 'এবাটী সোনাতন পোদ্দার অনেক দিন হইল খরিদ করিয়াছে, তোমার মাতা বর্ত্তমানে এতদিন দয়া করিয়া দখল লওয়া হয় নাই, তোমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবার হুকুম নাই।'

নলিনী বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে শ্মশানে আসিয়া মাতার ভস্মস্তুপের নিকট পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য মাতার উদ্দেশে কত কথা বলিল। নলিনীর ক্রন্দনে কয়েকজন কৃষক রমণী তথায় আসিয়া তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল। কৃষক-রমণীদের সহবাসে থাকিয়া নলিনী ক্রমে একরূপ শান্ত হইল। কয়েকমাস এইরূপে কাটিল।

নলিনী প্রফুল্লকে ভুলিতে পারে নাই। সে প্রফুল্লকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। তাহার কথা সর্ব্বদাই ভাবিত—তাহার বিষয় মনে মনে কত আলোচনা করিত—তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিত। প্রফুল্লকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইত। নলিনী এক একবার ভাবিত প্রফুল্ল আমায় ভুলিয়া গিয়াছে, আবার ভাবিত 'না না প্রফুল্ল কি আমায় ভুলিতে পারে?' এইরূপ প্রফুল্লের আলোচনায় তাহাব মনের মধ্যে যেন সুখের এক তড়িৎপ্রবাহ ছুটিত—মন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিত—অন্তরে বাহিরে সকল স্থান প্রফুল্লময় দেখিত।

এদিকে সোনাতন পোদ্দার আজ্ঞা প্রচার করিল, যে বোসেদের নলিনীকে আশ্রয় দিবে তাহার ভিটামাটি উচ্ছন্ন যাইবে। কৃষকেরা ভীত হইল। তাহারা নলিনীকে সকল কথা জানাইয়া বলিল "যদি কোথাও আপনার কোনও আত্মীয় থাকেন বলুন আমরা তথায় আপনাকে রাখিয়া আসিব নতুবা আপনাকেও রক্ষা করিতে পারিব না, আমরাও ধনেপ্রাণে মারা যাইব।" নলিনী ভাবিয়া চিন্তিয়াও কোনও আত্মীয় পাইল না। অবশেষে স্থির করিল প্রফুল্লের নিকট যাইবে। নলিনী পূর্ব্বে শুনিয়াছিল সহরে প্রফুল্লের একটা খুব বড় চাকুরী হইয়াছে। সব ঠিক হইল। নলিনী পরদিবস প্রত্যূষে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ রওনা হইল।

(৫)

নলিনী মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রফুল্লের অনুসন্ধান করিল, প্রথমে কেহ কোনও সন্ধান দিতে পারিল না, অবশেষে একজন বলিল 'সেই যে হিন্দু-ছোকরাটী মুসলমান হ'য়ে নবাবের বড় প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছে তাহার নাম প্রফুল্ল নয়' তখন সকলে তাহার কথায় সায় দিয়া নলিনীকে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল। এই লোকদের কথা শুনিয়া নলিনীর মনে একটা

খট্‌কা লাগিল, প্রফুল্লের বাড়ীতে গিয়া তাহার সন্দেহ দূর হইল। নলিনী অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রহরী, পরিচারক প্রভৃতি সকলেই মুসলমান। নলিনী বহির্ব্বাটীতে প্রফুল্লকে না দেখিয়া কয়েকটী প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া একটি সুপ্রসস্ত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপনীত হইল। তথায় সহচরী পরিবৃতা, নানালঙ্কারে বিভূষিতা, ম্লেচ্ছ পরিচ্ছদ পরিধানা, গর্ব্বিতা এক যুবতী উপবিষ্টা। পরক্ষণেই সেই প্রকোষ্ঠে একখানি প্রকাণ্ড আলেখ্যের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। আলেখ্য দেখিয়াই নলিনী চিনিল—এই যে তাহার প্রফুল্ল কিন্তু তাহার পার্শ্বে - ও কে?—নলিনী শিহরিয়া উঠিল, সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না – তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, জগৎ অন্ধকার দেখিল, সে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল—মনে হইল যেন তাহার শরীর হইতে জীবনী-শক্তি বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল অল্প অল্প জ্ঞান হারা হইল – মনের আবেগে অস্পষ্টভাবে কয়েকবার প্রফুল্লের নাম উচ্চারণ করিল। কিয়ৎকাল পরে নলিনী উঠিল – উঠিয়া একবার আলেখ্যে রমণীমূর্ত্তির প্রতি, একবার উপবিষ্টা যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষন করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল, সে ভুল করিয়া এবাটীতে আসিয়াছে কিন্তু প্রফুল্লের চিত্রপট দেখিয়া তাহার ভ্রম দূর হইল। সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

নলিনী দ্রুত পদবিক্ষেপে রাজপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল, দূরে অশ্বের খুরধ্বনি শুনিল—সে দিকে চাহিবামাত্র দেখিল একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছেন – অশ্বারোহী নলিনীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। চারিচক্ষু মিলিত হইল। নলিনী অশ্বারোহীকে বোধ হয় চিনিল কিন্তু বাক্যস্ফুরণ করিল না, অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী অদৃশ্য হইলেন। অশ্বারোহী নলিনীকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যেন এমুখ পূর্ব্বে কবে কোথায় দেখিয়াছেন, যেন একটা অতীত যুগের আবছায়া মনে আসিয়াও আসিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে সবই মনে পড়িল 'এই কি সেই নলিনী যাহার সহিত গল্প ও খেলা করিয়া আমি বাল্য-জীবন কত সুখে অতিবাহিত করিয়াছি, যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে আমি অস্থির হইতাম, পাঠশালায় গিয়া ছুটীর জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতাম, ছুটী হইবামাত্র বাড়ী না গিয়াই যাহার সহিত খেলায়

যোগ দিতাম—এই কি আমার সেই শৈশব সঙ্গিনী নলিনী—না—না—সে এখানে কেমন করিয়া আসিবে, আসিবে তো পদব্রজে একা রাজপথ দিয়া কোথায় যাইতেছে—ইহা অসম্ভব, আর কেহ হইবে। অশ্বারোহী এই বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু এ বালির বাঁধ টিকিল না। শৈশবের কত কথা মনে হইতে লাগিল। কত সুখস্মৃতি হৃদয়পটে সমুদিত হইতে লাগিল। মনে হইল সহর হইতে প্রথম যখন বাড়ী যাই নলিনীব কতই আনন্দ, আমি সহরের গল্প বলিতাম সে আগ্রহে শুনিত ও এক একবার সহর দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কবিত। শেষবার যখন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি তখনকার হৃদয়বিদারক দৃশ্য এখন একে একে মনে পড়িতেছে। নলিনীর সেই অকৃত্রিম ভালবাসা, সেই কাতরোক্তি, সেই বাষ্প-বিগলিত সরলতা মাখা মুখখানি—অশ্বারোহী আর ভাবিতে পারিলেন না। তিনি কোথায় যাইতেছেন স্থিরতা নাই অশ্ব যেদিকে লইয়া যাইতেছে সেই দিকে যাইতেছেন। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল দেখিয়া চমক ভাঙ্গিল তিনি অশ্বের বল্গা ধরিয়া গতি ফিরাইলেন ও বাটীর দিকে চলিলেন।

অশ্বারোহী বাড়ীতে গিয়া বিবিজীর নিকট শুনিলেন যে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক তথায় আসিয়াছিল ও তাঁহার ছবি দেখিয়া পাগলের ন্যায় 'প্রফুল্ল প্রফুল্ল' বলিতে বলিতে চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই স্ত্রীলোকটীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, উত্তর শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল—কেমন একরূপ বিমর্ষ হইলেন। বিবিজী ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করিল। স্ত্রীলোক সতত সন্দিহানচিত্ত ভাবিল তবে আলিমহম্মদের সহিত সেই বাঙ্গালী-স্ত্রীলোকের কোনওরূপ অবৈধ সম্বন্ধ আছে না কি? পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, আলিমহম্মদ পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দু ছিল, এই কি তবে সেই কাফের ছোকরা 'প্রফুল্ল' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিবিজীর মনে ক্রোধ, ঈর্ষা ও ঘৃণার সঞ্চার হইল। স্থির করিল যদি একথা প্রকৃত হয়, পিতার নিকট গিয়া ইহার একটা মীমাংসা করিব, আমি কাফের ছোকরার বাঁদি হইয়া থাকিতে পারিব না।' বিষ বৃক্ষের ফল ধরিল।

(৬)

মুঙ্গেরের নিকট একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, নাম পালসী, সেখানে ভাগীরথী তীরে একটী শিবমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসিনীকে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ভালবাসিত। সন্ন্যাসিনী যেন সকলেরই আপনার লোক। যেখানে রোগী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যাও দেখিবে সন্ন্যাসিনী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। কত সান্ত্বনা-বাক্যে তাহার মন প্রফুল্ল রাখিতেছেন। রোগী তাঁহার অমৃত-বাণী শুনিয়া রোগ ভুলিয়া যাইতেছে। এইরূপ সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যে কত লোকের কত প্রকার উপকার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। সকলেই মনে করিত বুঝি কোনও দেবী তাঁহার সন্তানগণের উপর কৃপা বিতরণ করিবার জন্য তথায় অবতীর্ণা হইয়াছেন।

মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর। হঠাৎ সন্ন্যাসিনীর পীড়া হইল। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনীর বিকার উপস্থিত। তিনি অজ্ঞানাবস্থায় আপন মনে কত কি বলিতেছেন, কেহ বড় একটা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। এক একবার চমকাইয়া উঠিয়া বলিতেছেন "প্রফুল্ল, প্রফুল্ল এসেছ, এস, এস, না না, তুমি যবন, আমাকে স্পর্শ করিও না।"

(৭)

প্রফুল্লের মনে সুখশান্তি নাই। বিবিজী কয়েকদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিল না, পরে একদিন সেদিনকার কথা উত্থাপন করিয়া কলহ করিল—অশ্রাব্য কটুকাটব্য বলিতে লাগিল। ধৈর্য্যের সীমা আছে, প্রফুল্ল এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। গর্ব্বিতা ওমরাহদুহিতার তাহা অসহ্য হইল, সে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া প্রফুল্লের বক্ষে পাদুকাসহ পদাঘাত করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। প্রফুল্ল কিছু বলিলেন না।

তাঁহার মনে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যবনীর পাণিগ্রহণ করার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল। তিনি অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন, এতদূর আত্মগ্লানি হইল, মনে করিলেন গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিয়া এ জগতের খেলা শেষ করিবেন। বাটী হইতে বাহির হইলেন, গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন, এমন সময় মনে হইল, তাইত এত পাপরাশি লইয়া কোথায় যাইব—নরকের কথা মনে হইল, প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ঝাঁপ দেওয়া হইল না। বাড়ী ফিরিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না।

নলিনীর কথা মনে পড়িল, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু নলিনী কোথায় তাহার স্থিরতা নাই। তিনি স্থির করিলেন, সন্ন্যাসীর বেশে, দেশে দেশে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে ভ্রমণ করিবেন, যদি কখনও নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবেন, মনে হইল যেন নলিনী ক্ষমা করিলে, তাঁহার সকল পাপ ক্ষালন হইবে।

(৮)

আজ পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার আলোকে জগত পুলকিত। বৃক্ষে, পত্রে, অট্টালিকায় জ্যোৎস্না পড়িয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। নদীবক্ষে জ্যোৎস্নার আলোক কেমন মনোহর। ঈষৎ বাত্যাতাড়িত হইয়া অম্বুরাশি আন্দোলিত হইতেছে—মনে হইতেছে যেন আকাশের চাঁদ নদীর জলের সহিত 'লুকোচুরি' খেলিতেছেন। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। ভাগীরথাতীরে সন্ন্যাসিনী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। গ্রামস্থ কয়েক ব্যক্তি তথায় ম্লানমুখে উপবিষ্ট। সন্ন্যাসিনী বিকারে বলিয়া উঠিলেন 'মা যাই-যাই দাঁড়াও, একবার প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, প্রফুল্ল—প্রফুল্ল।" ঠিক এই সময় হঠাৎ একি! কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন 'নলিনী আমি এসেছি'। "কে প্রফুল্ল এসেছ এস-এস আমার কাছে এস" বলিয়া সন্ন্যাসিনী তাকাইলেন। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনী প্রফুল্লকে দেখিয়া চিনিলেন। তাঁহার অধরোষ্ঠে হাসির রেখা প্রকটিত হইল। নলিনী বলিল "প্রফল্ল প্রতাপপুর মনে আছে, সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, এমনই চাঁদনির রেতে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বসিয়া কত গল্প, কত কথা হইত, পাখীদের রাজার নিকট হইতে দুজোড়া পাখা নিয়ে উড়ে উড়ে চাঁদের নিকট যা'ব বলে দুজনে ঠিক করে—ছিলাম মনে আছে কি? আজ আমি সেখানে চল্লাম, সেখানে আবার দুজনের দেখা হবে, প্রফুল্ল বিদায় দাও, আমি যাই, মা অপেক্ষা কচ্ছেন—আর দেরী করিব না—জল জল" পার্শ্বস্থ জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটু গঙ্গার জল মুখে দিলেন। প্রফুল্ল নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, কি বলিতে যাইতেছিল আর বলা হইল না। প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। সন্ন্যাসিনী প্রফুল্লের সম্মুখে মা জগদম্বার নাম করিতে করিতে হাস্যমুখে মহাপ্রস্থান করিলেন।

কাশীখণ্ড ও পাটুলির শূদ্রমণি।

১৩০২ সালের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা সাহিত্যে বাবু দীনেশচন্দ্র সেন ভূকৈলাশের রাজকবি নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহাতে দীনেশ বাবু লিখিয়াছিলেন যে ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশী-বাসকালে কাশীখণ্ডের একখানি অনুবাদ "সঙ্কলিত" করিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হইয়াছিল যে ইহা কালে জয়নারায়ণের স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ইহাও বলা হইয়াছিল যে "ভূকৈলাসের রাজবংশ বঙ্গদেশে বহুমান্য; এইবংশে এক কালে মহাজনের উদয় হইয়াছিল। সেই বংশের এক-জন "রাজকবির" এই কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া দীনলেখক কৃতার্থ হইয়াছেন"।

সঙ্কলনকারীকে বিবিধ বিশেষণে দীনেশ বাবু ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদ গ্রন্থখানি রচনা কাহার? এবং তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দেওয়া হইল কি না দীনেশ বাবু দেখেন নাই। কাশীখণ্ডের যে অংশ দীনেশ বাবু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাতেই অনুবাদকারীদিগের বিবরণ প্রকাশিত আছে। সম্ভবতঃ দীনেশ বাবু তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই ও তাঁহাদের পরিচয় জানেন না। দীনেশ বাবু যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, পূর্ণিমার পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সে অংশটী আমরা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর।
কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর॥
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
সতরশ চৌদ্দ শাক পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে॥
সুদ্রমণিকুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়।
বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥

পচত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা।
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা॥
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ।
এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥
পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত রহিলা।
শ্রী-উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥
যদ্যপি নয়ন দুটি দৈবযোগে অন্ধ।
তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥
ইষ্টনিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম।
পরানিষ্ঠ পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী-মর্ম্ম॥
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর।
গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর॥
শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান।
শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ।
ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহারে করেন রায় তর্জ্জামা খসড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
এই মতে চল্লিশ লাচাড়ী হৈল যবে।
বিদ্যাবাগীশের কাশীপ্রাপ্তি হৈল তবে॥
ভাদ্রমাসে মুখুর্য্যা গেলেন নিজ বাটী।
বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী॥
তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥
নিজে তাঁর সহিত করিয়া পর্য্যটন।
ছয় মাসে বহু গ্রন্থ করি সংকলন॥
ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত।
পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥
তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম।
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান॥

পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার॥

ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ।
এইখানে সমাপ্ত করিলা বিরচন॥

তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া।
রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া॥

সেই বহি দৃষ্টি কবি নকলনবিসী।
কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী"॥

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "তারিখের অংশটীতে লিপিকরের একটু প্রমাদ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া বিবরণটী অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।" তারিখের অংশ এইটা

সতরশ চোদ্দ শাক পৌষমাস যবে
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণিকুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥

প্রেমদাসের মুক্তার ন্যায় হস্তাক্ষর শোভিত কাশীখণ্ডের পুঁথিখানি আমরা দেখি নাই। সুতরাং প্রেমদাস কি প্রমাদ ঘটাইয়াছিলেন এবং দীনেশ বাবু কি সংশোধন করিয়াছেন জানি না। অনুমান হয় প্রেমদাস "মিত্রশ" লিখিয়াছিলেন, দীনেশ বাবু "সতর শ" করিয়াছেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে দীনেশ বাবু জয়নারায়ণ ঘোষালকেই অনুবাদকারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কাশীবাসকালে কাশীখণ্ডের তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, এই অনুবাদ সঙ্কলন করিতে অনেক গুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন।" সাহিত্যের প্রবন্ধে জয়নারায়ণকে অনুবাদ সঙ্কলনকারী বলিয়া গ্রন্থে জয়নারায়ণকে অনুবাদকারী এবং পণ্ডিতদিগকে অনুবাদ সঙ্কলনকারী বলিয়া দীনেশ বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইমত পরিবর্ত্তনের কারণ দীনেশ বাবু উল্লেখ করেন নাই। অনুবাদ শব্দ স্থলে তিনি "তর্জ্জমা" শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দীনেশ বাবু নৃসিংহদেবকে একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনে করিয়া অনুবাদ সঙ্কলনকারীদলে তাঁহাকে ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত অংশে লেখা আছে—

মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া
তাহারে করেন রায় তর্জ্জামা থসড়া
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া।

বস্তুতঃ কাশীখণ্ডের অনুবাদ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর বিরোধী মতের সমন্বয় করিতে আমার সামর্থ্য নাই। আশা করি দীনেশ বাবু আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। তাঁহার উদ্ধৃত অংশের অর্থ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি।

কাশীবাস করিবার সময় ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশীখণ্ড ভাষা করিয়া লিখিবার সাধ হয়। সহায় অভাবে অনেক দিন এ সাধ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, সতরশ চৌদ্দশকে পৌষমাসে পাটুলি নিবাসী শূদ্রমণি শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায় জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইলে, ফাল্গুনমাসে গ্রন্থ আরম্ভ হয়—পঁচাত্তর অধ্যায় পর্য্যন্ত নৃসিংহদেবের বাঙ্গালী-টোলার বাড়ীতে নৃসিংহ ও জগন্নাথ রচনা করেন, ছিয়াত্তর ও সাতাত্তর অধ্যায় পঞ্চানন রচনা করেন, তাহার পর এক বৎসর রচনা বন্ধ থাকে। তাহার পর কাশীপুরের উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে তৎপর হন। শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কাশী-খণ্ডের অর্থ বুঝাইয়া বলিতেন, জগন্নাথ তাহা শুনিয়া কবিতার পাতড়া করিতেন, নৃসিংহদেব তাহা হইতে খসড়া তর্জ্জমা করিয়া, পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে "চল্লিশ লাচাড়ী" পর্য্যন্ত লেখা সমাপ্ত হইলে রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু হয় ও জগন্নাথ দেশে ফিরিয়া যান। আবার এক বৎসর গ্রন্থ রচনা বন্ধ থাকে। তাহার পর উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কারের পিতা ও তাঁহার বন্ধু বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত কবিতার পাতড়া করিয়া দেন, নৃসিংহদেব রায় সর্ব্বগ্রন্থের প্রচার করেন—ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ এইথানে গ্রন্থ বিরচন সমাপ্ত করেন।

উদ্ধৃত অংশ দেখিলে বুঝা যায় কাশীখণ্ডের অনুবাদের উদ্যোগকর্ত্তা জয়নারায়ণ, কবিতার পাতড়া জগন্নাথ ও বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তের, তর্জ্জমাকারী, সংশোধনকারী ও প্রচারক রাজা নৃসিংহদেব রায়, তাঁহাকেই কাণ্ডারী বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। জয়নারায়ণ অপেক্ষা নৃসিংহদেবের সাহায্য কোন প্রকারে সামান্য নহে। সুতরাং জয়নারায়ণকে অনুবাদক ও রাজকবি

আখ্যান দিয়া সমস্ত সুখ্যাতি তাঁহাকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে কি না পুনরায় বিচার করিবার জন্য আমরা দীনেশ বাবুকে অনুরোধ করি।

রাজা নৃসিংহদেবের জীবন-চরিত, পাটুলীবংশের পরিচয় ও কাশীখণ্ড সম্বন্ধে অন্যান্য কথা ভিন্ন প্রবন্ধে সংগ্রহ করিব।

এই অংশটুকু লিখিবার পরে বাঁশবেড়িয়ার রাজকুমারদিগের কাছে কাশীখণ্ডের একখানি হাতের লেখা পুঁথি পাই। দীনেশ বাবুর উদ্ধৃত অংশের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম দীনেশ বাবুর পুঁথিতে কোথায় পর্য্যায় ভঙ্গ হইয়াছে এবং দুটী বিশেষ প্রয়োজনীয় পংক্তি কোন প্রকারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কাশীখণ্ডের অনুবাদে রাজা জয়নারায়ণের সাহায্য কতটুকু এই দুই পংক্তিতে রাজা নিজে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক আবার গ্রন্থ পরিচয় অংশটুকু আমাদিগকে উদ্ধৃত করিতে হইল।

ইতঃপর লিখিব গ্রন্থের বিবরণ
যেরূপে আরম্ভ হৈয়া হৈল সমাপন।
কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর
কাশীগুণগানহেতু ভাবিত অন্তর।
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি।
মিত্র শত চৌদ্দ শকে পৌষমাস যবে
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে।
শূদ্রমণি কূলে জন্ম পাটুলি নিবাসী
শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বায়াগত কাশী।
তারসহ জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা।
শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ
কাশীখণ্ড ভাঙ্গিয়া কহেন অনুক্ষণ।
তাহার করেন রায় তর্জমা খসড়া
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
রায় পুনর্বার সেই পাতড়া লইয়া
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া।

এই মত চল্লিশ অধ্যায় হৈল যবে
বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হইল তবে।
ভাদ্রমাসে মুখুর্য্যা গেলেন নিজ বাটী
বৎসর স্থকিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী।
পরন্তু বাঙ্গালীটোলা যবে গেলা রায়
বলরাম বাচষ্পতি মিলিলা তথায়।
পচত্তরি অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা।
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ
এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন।
পরে সম্বৎসরাবধি স্থকিত রহিলা
শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা।
যদ্যপি নয়ন দুটী দৈবযোগে অন্ধ
তথাপি তাহার গুণে লোকে লাগে ধন্ধ।
ইষ্টনিষ্ঠ বাক্যনিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম
পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞ মর্ম্মীমর্ম্ম।
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর
গ্রন্থের সমাপ্ত হেতু হৈলা তৎপর।
শ্রীযুদ্রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান
ভট্টাচার্য্য তার পিতা সুধীর বিদ্বান।
নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন
ছয় মাস বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন।
ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত
পদ্ধতি আনিলা সংস্কৃত অভিমত।
তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণধাম।
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার।
নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তথা যথার্থ বর্ণন
দশার্ণে ললিত যতি করিয়া রচন

দ্বাদশার্ণে ভারত ছন্দের প্রকরণ।

চতুর্দ্দশে ত্রিবিধ ছন্দের আলোচন
প্রথমে পয়ার ছন্দ জানে সর্ব্বজন।

দ্বিতীয়ে ত্রিপদী ক্ষুদ্র ছন্দের প্রকাশ
তৃতীয়ে চরণ চারি মিত্রাক্ষরাভাষ।

ষোড়শার্ণে করুণ ছন্দের অবগতি
অষ্টাদশাক্ষরে দুই প্রকার সঙ্গতি।

আদি সম যতিছন্দ দ্বিতীয় বিক্রম
বিংশতি অক্ষরে দ্রুম্ম ত্রিপদীর ক্রম।

দ্বাবিংশত্যক্ষরে হয় সমঞ্জয় ছন্দ
চব্বিশার্ণে অহীবন্ধ চন্দ অম্বুবন্ধ।

ছাব্বিশ অক্ষরে দীর্ঘ ত্রিপদী বিখ্যাত
অষ্টবিংশ অক্ষরে সন্ধর্ব্ব শুদ্ধজ্ঞাত।

ত্রিংশত অক্ষরে দীর্ঘ সুদীর্ঘ ত্রিপদী
এই চতুর্দ্দশে হয় গ্রন্থে ছন্দ বিধি।

এই পুস্তকে যত গীত তানমান যুত
তাহা অবধান কর হৈয়া মনঃপুত।

শাস্ত্রমত ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
তার মধ্যে তানসেন সম্মত বাখানি।

শ্রীভৈরব মালকোশ হিন্দোল মল্লার
বসন্ত আহঙ্গ এই ষড়্রাগ প্রচার
ধনাশ্রী মানসী কাফী হাম্বির কল্যাণী
শ্রীভাস পলাসী সুর মল্লার সোহিনী
পরজ খমাচ সিন্ধু কেদার সাবরী
কলিঙ্গড়া শঙ্করাভরণ দেবগিরি।

রায়সুথ আড়ানা কানড়া বাগেশ্বরী
বিহাগ সুরট জয়জয়ন্তী ভোটারী।
ঝিঝোটী ছেপর্দা দেবগান্ধার গান্ধার
ললিত ভৈরবী রামকেলীর প্রচার।

যোগিয়া শোয়ারী সানা টোড়ী জৌনপুরী
খটনট বৃন্দাবনী সারঙ্গ সঞ্চারী।
আলাহিয়া মুলতানী কামোদ মায়ুরী
ছায়ানট শ্রীগৌড় সারঙ্গ দেশবারী

শ্রীরাগ পুরবী গৌরী বহুসঙ্কীরণ
রাগিনী রাগিনী যোগে বিহিত মিলন।
এই রাগ রাগিণী বিশিষ্ট যত গান
ইথে যত তাল তাহা কর অবধান।
তেওট চৌতাল আড়া ধমার চপক
খয়রা বাদি ফরোদস্ত শোয়ারি রূপক।
পুস্তো মধ্যমান সুরফাক্তাই এরঙ্গিলা
পবেছটা চৌতাল কহঁবা তাল কলা।
এই পঞ্চদশ তালে সঙ্গীত রচন
সাতাতুরি গানে শেষ গ্রন্থ বিবরণ।
প্রথম গায়ক গানে শ্রীদোলগোবিন্দ
গ্রন্থগায় শ্রীগুরুপ্রসাদ গানানন্দ।
পালা প্রতি চূড়া ভেদ চৌত্রিশ রকম
তাহার সঙ্গতি যাহা শুন বিবরণ।
শ্রীযুদ্রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বিদ্বান
ভট্টাচার্য্য দিগসুইবাসী জ্ঞানবান
মনোযোগ করি চূড়া সমস্ত শুধিলা
অতএব পরিপাটী সমস্ত হইলা। শ্রীরামঃ॥
তদন্তে লিখিব অনুক্রম বিবরণ
প্রথমে বান্দিব গুরুদেবের চরণ।
পরে শতাধ্যায়ে কাশীখণ্ড প্রকরণ
কাশী পঞ্চক্রোশী যাত্রা নগর ভ্রমণ।
ঋতু মাস তিথি বার যাত্রার বিধান
তার মধ্যে তিলভাণ্ডেশ্বর উপাখ্যান।
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ততথা শ্রীশিবরহস্য
কাশীর রহস্য কাশীপদ্ধতি প্রকাশ্য।
পরন্তু যোগিনীতন্ত্র আদি গ্রন্থ যত
নিতান্ত তদন্ত তন্ত্র পুরাণ সম্মত।
বর্ত্তমান দেবতাগণের নামাবলি
নগর বর্ণন গ্রন্থ পূর্ণ কুতুহলি

এ অষ্ট অধ্যায়ে এই সর্ব্ব বিবরণ
নবোত্তর শতাধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপন।
ইতঃপর লিখি গ্রন্থে গ্রন্থিবদ্ধ যত
রামপক্ষ গ্রন্থি গুরুবন্দনাতে গত।
ভূরস ঋতু খ চন্দ্র গ্রন্থিকাশীখণ্ডে
গুণ বেদ রবি গ্রন্থি শেষ সপ্তকাণ্ডে।
বাজি পক্ষ গ্রন্থ রুদ্রে গ্রন্থি প্রকরণ
কাশীগুণ গানামৃত করিল রচন।
সপ্তদশশত অষ্টাদশ পরিমিত
সোমবার সংক্রান্তি পূর্ণিমা পূর্ণকৃত।
তথি হস্তানক্ষত্র ব্যাঘাত যোগযুত
চৈত্রমাসে পূর্ণদিনে গ্রন্থ পূর্ণভূত।
বারশত ত্রিশন বাঙ্গালা পূর্ণক্রম
সম্বত চোয়ান অষ্টাদশশত সন।
কাশিকা মোকামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল
বিশ্বেশ্বর প্রীতে নর হরি হরি বল।
বিশ্বেশ ভবানীপদ ভাবি অনুক্ষণ
ছন্দবন্দে ভণে দ্বিজ জয়নারায়ণ॥ ১·৮।৭৫।১০৯।৩৫।৭৭।০।

গ্রন্থ বিবরণটী দীর্ঘ, বিবিধ সম্বাদে পূর্ণ এবং অষ্টাদশ বন্ধনে আবদ্ধ। রাজা জয়নারায়ণ পুণ্য করিতে কাশীবাস করিয়াছিলেন, পুণ্যহেতু কাশীখণ্ড অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কাশীখণ্ড অনুবাদে যাহার যতটুকু যশ প্রাপ্য অকাতরে তাহা তাহাকে দিয়াছেন। কাশীখণ্ডের অনুবাদ সংস্কৃতের কত অনুযায়ী তাহা সময়ান্তরে দেখা যাইবে। কবিত্বের চাতুরিও আজ বিচার করিব না। জয়নারায়ণ নিজে কবি, শূদ্রমণি রাজা নৃসিংহদেব মহাশয় কবি, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় কবি। তিনজন কবি মিলিয়া ছন্দোবন্ধে গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। জয়নারায়ণ ও নৃসিংহদেব উভয়েই সংস্কৃত জানিতেন। তথাপি সংস্কৃতের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ চল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া দেন, বলরাম বাচস্পতি ৪১ হইতে ৭৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন, ৭৬।৭৭ বক্রেশ্বর পঞ্চাননের ব্যাখ্যা, বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা করেন।

নবোত্তর শতাধ্যায়ে সমাপ্ত গ্রন্থের নগরভ্রমণ নামক দুই অধ্যায় রাজা জয়নারায়ণের নিজের রচনা।

"নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তথা যথার্থ বর্ণন।"

তথাপি দীনেশ বাবু রাজা জয়নারায়ণকেই কাশীখণ্ডের অনুবাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সমস্ত সুখ্যাতিটা তাঁহার পাতেই ঢালিয়া দিয়াছেন। অথচ জগন্নাথ চল্লিশ অধ্যায় এবং নৃসিংহ দেব অবশিষ্ট প্রায় সমুদয় গ্রন্থ নিজে ছন্দাকারে পরিবর্ত্তন করেন। এবং জয়নারায়ণ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে "রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার।"

দীনেশ বাবু "মিত্র শত চৌদ্দশকে" সংশোধন করিয়া সত্র বা সতর লিখিয়াছেন। তাঁহার বোধ হইয়াছে যে মিত্র অর্থে সতর হয় না। এটী ভ্রম। অনুরাধা নক্ষত্র সপ্তদশ স্থানীয়। অনুরাধার অধিপতি মিত্র, সুতরাং সপ্তদশ স্থানীয়। এজন্য "মিত্রশত" অর্থে সতরশ। রাজা নৃসিংহদেবের জীবন বৃত্তান্ত বারান্তরে লিপিবদ্ধ করিব। নৃসিংহের কবিত্বশক্তি কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ইয়াদদাস্ত পুঁথি হইতে এখানে সংগ্রহ করিলাম। তাঁহার রচিত অন্যান্য সঙ্গীত গুলিও যথা সময়ে পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইবে।

মাঝ রাগিণী মধ্যমান তাল।

কেও সুন্দরী নারী হর উরে পরা বিহরে।
জনমন মোহন করে। ধু॥
ইন্দ্রনীল মণি জিনি, শ্যামা নব কাদম্বিনী
চঞ্চলা চঞ্চলা নুপুরে॥
অতনু সতনু করে, সতনুর তনু হরে
হেরে যারে নয়ন ভরে।
চরণে শরণাগত, দীনমণি দীন মত
কত সুধাকর নখরে।
চাঁচর চিকুরাবলি, লম্বিতে চুম্বিত অলি
পরিমলে গুণ্ গুণ করে।
ভবদাস মানে মনে, গুণময়ী নিজ গুণে
গুণহীনে গুণ বিতরে॥

ঝিঝোটী রাগিণী আড়া মধ্যমান তাল।

করুণাময়ি আর কবে করুণা করিবে। ধু
নহি মম সম পাপীতাপী
তোমা বিনে দীনে কে তারিবে।
তরু মরু গত ভীত, চকিত চাতক চিত
ঘনে ঘন বারিধি বারিবে ॥
তবদাস ভবলীলে, পারো তারো নিজগুণে
সুদিনে কি নয়নে হেরিবে।

এতদূর লেখা হইবার পর আর একখানি কাশীখণ্ডের অনুবাদ হস্তগত হয়। লেখা দেখিয়া বুঝা যায় যে সেখানি রাজা নৃসিংহদেবের স্বহস্ত লিখিত। যে দুটী পংক্তি দীনেশ বাবু ছাড়িয়া দিয়াছেন সে দুটী ইহাতে নাই। জয়-নারায়ণের গৌরব বাড়াইবার জন্য কি রাজা এরূপ করিয়া ছিলেন? এই পুঁথির গ্রন্থ বিবরণে আর কয়েকটী নূতন পংক্তি আছে, তাহাতেও এই ভাবের একটু আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চবেদ শূন্য বসু গ্রন্থি সমাপন
কাশীগুণ-গানামৃত ললিত রচন।
সপ্তদশ শত দ্বাবিংশতি শাকভুত
বুধবার কৃষ্ণাষ্টমী বৈশাখ সংযুত।
মাসের পঞ্চম দিনে বংশবাটী গ্রামে
গানের পুস্তক এই পূর্ণ অনুপামে।
ছন্দবন্ধে জয়নারায়ণ বিরচিল
শ্রীনৃসিংহদেব দত্ত পুস্তক লিখিল।

প্রথম পুঁথিখানিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে সতরশ আঠার শকে চৈত্র সংক্রান্তি পূর্ণিমার দিন সোমবার, বাঙ্গালা ১২০৩ সাল, সম্বত ১৮৫৪ সনে গ্রন্থ সমাপন হয়। এখানে ১৭২২ শাকের উল্লেখ আছে। আমি বুঝিলাম যে দ্বিতীয় পুথিখানি রাজা নৃসিংহ বাঁশবেড়িয়ার বাড়ীতে বসিয়া ১৭২২ শকে লিখিয়াছিলেন।

* এই পুঁথিখানিতে "মিত্রশত" স্থানে 'সতরশ' লেখা আছে।

দুইখানি পুঁথির সমুদয় অংশ তুলনা না করিলে আর কোথায় কি পরি-বর্ত্তন আছে এখন বলিতে পারিতেছি না।

কাশীখণ্ডের গানগুলির সহিত রাজা নৃসিংহের ইয়াদদাস্তের গান তুলনা করিলে বোধ হয় কাশীখণ্ডের গানগুলি রাজা নৃসিংহের রচিত নতুবা বলিতে হইত যে অন্যের রচিত গান রাজা ইয়াদদাস্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াদদাস্তের কোন কোন গানে রাজার ভণিতা আছে। এজন্য দ্বিতীয় অনুমানে আমাদের অধিকার নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মাসিক সাহিত্য।

(সমালোচনা।)

সাবিত্রী। ভাদ্র। সাবিত্রীর সবিস্তর পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। সাবিত্রী ভালই হইতেছে। তবে ভূমিকম্প প্রবন্ধটি সাবিত্রীতে না দিলেও চলিত।

বীণাপাণি। আষাঢ়। ক্ষুদ্র অথচ অনেক ভাল।

অনুসন্ধান। সাপ্তাহিক মাসিক চলিতেছে। সাপ্তাহিক সংস্করণের ২৭শে শ্রাবণের সংখ্যায় পলাশির যুদ্ধের শব্দ সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বড় অতিরিক্ত খুঁটীনাটী হইতেছে। এরূপ খুঁটীনাটী সমালোচনা বাচ্য নহে। বিশেষ 'বিষণ্ণ' বানান না হইয়া, বিষণন বানান হইবে বলা, কেবল ব্যাকরণের জ্যাঠামি মাত্র। জ্যৈষ্ঠের মাসিক অনুসন্ধানে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্রের লিখিত গৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে দুইটী সমীচীন প্রবন্ধ আছে।

সজ্জনতোষিণী। ভাদ্র। পূর্ব্বমত।

সনাতনধর্ম্ম-কণা। শ্রাবণ, ভাদ্রের দুই সংখ্যায়—হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার উপসংহার ভাগ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত জন্য এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

ভক্তাবতার নিজ জীবনে ভক্তরূপে যে দুর্ভাগ্য ও যে অভাব জন্য পরিতাপ ভোগ করিয়াছেন, আদর্শ ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করিতে গিয়া যেরূপে নামসাধন করিয়াছেন, তাহা সাধকভক্তগণের অনুকরণ, অনুষ্ঠান ও আলোচনার বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে প্রেমের আস্বাদ যেরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাহাই অষ্ট শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। কলির জীবের পক্ষে তাঁহার প্রদর্শিত ও অনুষ্ঠিত মার্গ অবলম্বনে সাধন ভজন সুখকর, রুচিকর ও সহজ। তিনি এ তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন, সেইজন্য হরিনামরূপপূর্ণসুধাকরের বিমলজ্যোৎস্নায় সমস্ত দেশ আলোকিত করিয়া অপূর্ব্ব প্রেমের জোয়ার আনিয়াছিলেন। অন্য যুগে লোকে অন্যবিধি সাধন ভজন করিতে পারিত, কিন্তু কলিকালের নিমিত্ত কেবল হরিনামসার জানিয়া তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকটী সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

তিন যুগের জন্য অন্য উপায় ছিল এবং তাহাতে নামও চলিত ছিল, কিন্তু কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই বলিয়া তিনবার গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই, উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব আসুন সকলে মিলিয়া জাতি ধর্ম্মের অভিমান ভুলিয়া বিষয় মদের গরিমা ত্যাগ করিয়া সংসারের মায়া-মোহ ক্ষণেকের জন্য দূরে রাখিয়া এবং শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষের মতামত অনুষ্ঠান বা খুঁটীনাটি ত্যাগ করিয়া, আসুন সকলে এক-মনে একপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রদর্শিত পথে দাঁড়াইয়া তাঁহারই শ্রীচরণ অনুসরণে আমরা অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকিয়া লই :—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥

গীত।

মন রে। কলুষে কেন হতেছ মলিন।
ত্যজ কাম ভজ নাম রবে না কুদিন॥
নামের মহিমা কে বলিবে বল,
সর্ব্বাশ্রয় নাম মহা মোক্ষফল,
ত্যজি এক মনে অন্য কোলাহল,
(হরি) নামসিন্ধু মাঝে হওরে বিলীন॥
সংসারের ধূলা খেলা যাওরে ভুলিয়ে,
সদা হরি হরি বল প্রাণ ভরিয়ে,
মধুর হরিনামে সদা ভাস প্রেমে,
হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রদিন॥

হরি হরি বল।

শব্দমণি রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ।	অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সাল।	৮ম সংখ্যা।

উদ্ধব আগমনে শ্রীমতীর উক্তি।

বলহে উদ্ধব শুনি সখাব কি সমাচার,—
মথুরায় রাজা হ'য়ে, কুবুজারে বামে ল'য়ে,
শ্যামত আছেন ভাল রাজা হ'য়ে মথুরার ?

শ্যাম কি গেছেন ভুলে এ গোকুল বৃন্দাবন,
মা যশোদা তাঁর তরে, ক্ষীরসর ল'য়ে করে
আকুল হইয়া ডাকে আয় বাপ যাদুধন।

যে অবধি গেছে শ্যাম ছাড়ি এই বৃন্দাবন,
সে অবধি বসি শাখে, কলকণ্ঠ নাহি ডাকে
পাপীয়া তুলে না তান মোহিয়া এ ত্রিভুবন।

সে অবধি বৃন্দাবনে ফুটেনাক ফুলদল,
পরিয়া কনক ভূষা, মধুরে হাসে না উষা
প্রকৃতি স্তবধপারা ঢালে নিতি আঁখিজল।

সে অবধি বৃন্দাবনে উঠে না চন্দ্রিমা আর,
ধরিয়া জলদ গলা দেখিনা বিজলী বালা
ফুটে না চামেলী বেলী সবি হেথা অন্ধকার।

মরমে মরিয়া আছে শ্যামহারা সখাগণ,
গোঠে নাহি যায় আর, সদা করে হাহাকার,
ধেনুদল তৃণ ছাড়ি আকুল পরাণ মন।

বৃন্দাবনে সেই শোভা নাহি সথে এবে আর,
সবাই মরমে ম'রে, প'ড়ে আছে ধরা'পরে,
ব্রজ ভরা আছে শুধু আর্ত্তনাদ হাহাকার।

গোপীদল নিতি নিতি শ্যাম আশাপথ চায়,
সাজাইয়া কুঞ্জবন, করে নিশি জাগরণ
সুখের স্বপন অহো চকিতে ভাঙিয়া যায়!
(হেথা কোথা শ্যামচাঁদ শ্যাম রাজা মথুরায়)

প্রথম দর্শন যবে হ'য়ে ছিল তাঁর সনে,
হেরি সরলতা তাঁর, মুগ্ধ হৃদি গোপিকার,
এমন হইবে পরে তখন বুঝিনি মনে।

তাহ'লে কি পড়িতাম সেরূপ বাগুরা মাঝ,
তাহ'লে কি তার পায়, বিকাতেম আপনায়,
তেয়াগিয়া যমুনায় কুলশীল ভয় লাজ!

জানি না সে কালরূপে কি যে সুধা ছিল হায়,
যতই পিয়িনু সুধা, ততই বাড়ল ক্ষুধা,
যত পিয়ি তত প্রাণ আরো যে পিয়িতে চায়!

বেদনা পাইত গোপী পথে যেতে শ্যামরায়
বাসনা করিত তারা, হইয়া আপনাহারা
তাদের হৃদয় খানি পেতে দিবে এ ধরায়!
(বঁধুয়া চলিবে তাহে মরি মরি রাঙাপায়)

পড়ে আছে শূন্য প্রাণে শ্যামহারা গোপীদল,
আর কি মাধব আসি বাজায়ে মধুর বাঁশী
গোপীহৃদি মরুভূমে ঢালিবে অমৃত জল?

বল হে বঁধুয়া সখা কেমনে সে শ্যামরায়,
ভুলে গেল বংশীবট, ভুলিল যমুনা তট,
ভুলে গেল গোপাঙ্গনা ভুলে গেল বাপমায়?

অথবা সে ভুলে নাই সদা জাগে হিয়া মাঝে,
নিতে বুঝি সমাচার, অবকাশ নাহি তার,
মথুরায় ব্যস্ত বঁধু কুব্জার দাসত্ব সাজে।

বল হে উদ্ধব বল বঁধুয়ার সমাচার!
লয়ে তারি স্মৃতিটুক আমরা বেঁধেছি বুক
শ্যামত আছেন ভাল রাজা হয়ে মথুরার?

শ্রীমতী——মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী।

মৃত্যুর পর।

(১২)

পাঠক মহাশয়কে অদ্য ভৃগুপুত্র শুক্রের উপাখ্যান উপহার দিব। কি কি বিষয় বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্ত অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণ করিতেছি সুবুদ্ধি পাঠক মহাশয়কে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। যুধিষ্ঠির স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। যোগীগণ যোগ বলে দেহ ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন এবং যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া এমন কি স্বর্গে বিচরণ করিয়াও আবার জীব-দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। পূর্ব্বকার পরকায়া প্রবেশের কথা। বশিষ্ঠের কথা তিনিই বলিবেন।

বশিষ্ঠ বক্তা। রামচন্দ্র শ্রোতা। যোগবাশিষ্ঠে* এই উপাখ্যান আছে। আরম্ভ হইয়াছে—

বশিষ্ঠ উবাচ। অকর্ত্তৃকমরঙ্গঞ্চ গগনে চিত্রমুত্থিতং।
অদ্রষ্টৃকং সানুভবমনিদ্রং স্বপ্ন দর্শনং। ১
সাক্ষীভূতে সমে স্বস্থে নির্বিকল্পে চিদাত্মনি।
নিরর্থং প্রতিবিম্বতি জগন্তি মুকুরে যথা। ২
এতত্তে রাম বক্ষ্যামি কার্য্যকারণতাং বিনা।
স্থিতা ব্রহ্মণি বিশ্বশ্রীঃ প্রতিভামাত্ররূপিনী। ৩
একং ব্রহ্ম চিদাকাশং সর্ব্বাত্মকমখণ্ডিতং।
ইতি ভাবয় যত্নেন চেতশ্চাঞ্চল্যশান্তয়ে। ৪
রেখোপরেখা বলিতা যথৈকা পীবরা শিলা।
তথা ত্রৈলোক্য বলিতং ব্রহ্মৈকমিতি দৃশ্যতাং। ৫
দ্বিতীয় কারণাভাবাদনুৎপন্নমিদং জগৎ।
তিষ্ঠতি ব্রহ্মনিস্ফারে প্রতিভামাত্র রূপধৃক্। ৬
অত ভার্গববৃত্তান্তং কথয়ামি তবানঘ।
অনুৎপন্নমিদং বিশ্বং যেন চেতসি পশ্যসি। ৭

---

*ভূকৈলাস রাজবাটীর সংস্করণ। বিনীতভাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি চাহিতেছি। ভাষা রক্ষা করাই প্রশস্ত বিবেচনা করিলাম। সাহিত্য ও জ্ঞানের অনুরোধে ক্ষমা করিবেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন—যেরূপ সামান্য গগণে ইন্দ্রজালের আবির্ভাব, সেইরূপ চিদাকাশে এই বিচিত্র জগৎ শোভা পাইয়া থাকে। (সকলই চিন্ময় অন্য আর কিছুই নাই) সুতরাং কর্ত্তা ও দ্রষ্টা নাই, জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্ন দর্শনে স্বকীয় অনুভবের ন্যায় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। ১। যেরূপ দর্পণে মুখাদির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ, সমান, স্বভাবস্থ নির্বিকল্প চিদাত্মাতে বৃথা মায়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২। হে রামচন্দ্র, যেরূপ কার্য্য কারণ ব্যতিরেকে, প্রতিবিম্বরূপিনী বিশ্ব-শ্রী ব্রহ্ম স্থিতি করিয়া থাকে, আমি তোমার নিকট তাহা বলিতেছি। ৩। তুমি মনের চাঞ্চল্য শান্তির জন্য যত্ন পূর্ব্বক চিদাকাশরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, সর্ব্বময় ব্রহ্মকে ভাবনা কর। ৪। যেরূপ স্থূল শিলাখণ্ডের উপরিভাগে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রেখার (সম্পাতে শোভা) হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ত্রৈলোক্য সম্বলিত এক দৃশ্য—ব্রহ্মপদার্থ দর্শন কর। ৫। (ব্রহ্ম জগদ্রূপ রেখাবিশিষ্ট শিলার ন্যায় অদ্বিতীয় পদার্থ); দ্বিতীয় কারণের অভাব প্রযুক্ত এই জগৎ অনুৎপন্ন হইয়া কেবল প্রতিভামাত্র ধারণ পূর্ব্বক, স্ফুরণ বিশিষ্ট ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকে। হে অনঘ!! আমি এ সম্বন্ধে (তোমার নিকটে) ভৃগুপুত্র শুক্রের বৃত্তান্ত বলিতেছি; ইহা শ্রবণ করিলে বিশ্ব যেরূপে উৎপত্তি শূন্য হইয়া অবস্থিতি করে, অন্তঃকরণে তাহা দেখিতে পাইবে। ৭।

আর শেষ হইয়াছে—

> ততস্তৌ কাননে তস্মিন্ পাবনে ভৃগু ভার্গবৌ।
> সংস্থিতৌ মননোদ্যুক্তৌ নিস্তরঙ্গাবিব হ্রদৌ।
> এবং তে ভার্গবাখ্যানং বর্ণিতং রঘুপুঙ্গব। ৯৫

পরে সেই পবিত্র কাননে ভৃগু ও ভার্গব দুই জনে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তরঙ্গহীন হ্রদের ন্যায় স্থির হইয়া, স্থিতি করিতে লাগিলেন। ৯৫

বলা বাহুল্য পাঠক মহাশয় মূলগ্রন্থে সমগ্র উপাখ্যান সবিস্তারে পাইবেন। আমি কেবল সার সঙ্কলন করিব।

পুরাকালে ভৃগুমুণি মন্দরপর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। পুত্র শুক্রও তপস্যা করিতেন। পিতা নির্বিকল্প সমাধির আশ্রয় করিলে পুত্র সেই নির্জ্জন প্রদেশে একদা মন্দারমাল্য শোভিতা এক অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া উল্লাসে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং নিমীলিত নেত্রে তাহাকে মনে

মনে ধ্যান করিয়া তৎসহবাস কল্পনায় মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। (পুরুষ যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়) তাহার ন্যায় আমি সেই ললনাকে লইয়া আকাশে সহস্রনয়নালয়ে সুরদিগের সুখকর স্বর্গধামে উপনীত হইলাম। দেখিলাম বনলতা যেরূপ বনের সেবা করিয়া থাকে তাহার ন্যায় মদোন্মত্ত মাতঙ্গীর ন্যায় সুরনারীগণ কামবিহ্বল হইয়া দেবেন্দ্রকে আলিঙ্গন আদি দ্বারা সেবা করিতেছে। আমি সেখানে গিয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় সিংহাসনোপবিষ্ট শক্রকে অভিবাদন করিলাম। শুক্র চিন্তা দ্বারা আকাশে গিয়া সেখানে দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্র সাদরে শুক্রকে অভিবাদন করিলেন। স্বর্গবাসী লোক কর্ত্তৃক প্রমোদিত হইয়া শুক্র স্বর্গ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন, শুক্র সেই মৃগশাবাক্ষী অপ্সরাকে তথা দেখিতে পাইলেন তিনিও তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কামাসক্ত হইলেন। শুক্র অভীপ্সিত বিষয় পাইয়া তমঃ অর্থাৎ রত্যাদি কর্ম্ম কল্পনা করিলেন।

পরে চিন্তা দ্বারা স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া মনঃশরীর দ্বারা বাসবপুরে হরিণলোচনা সেই অপ্সরীর সহিত সহবাস করিয়া ভার্গবের সুখে দ্বাত্রিংশৎ যুগ অতিবাহিত হইল। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হেতু শুক্র পৃথিবীতে পতিত হইলেন এবং পতিত হইয়া আপনার বপু বিস্মৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ভৃগুনন্দনের জীব চন্দ্রজ্যোতি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শুক্রের জীব চন্দ্রতেজের সহিত মিলিত হইয়া হিম ও ধান্যরূপে শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই ধান্য পক্ক হইলে দশার্ণ দেশের একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। তাহাতে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া শুক্র উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। পরে ব্রাহ্মণ সন্তান সৎসংসর্গে সুমেরু পর্ব্বতে এক মন্বন্তর তপস্যা করিলেন। সেখানে দৈবযোগে একদিন অপ্সরা দর্শন করাতে শুক্রের বীর্য্য স্খলন হইল। একটা মৃগী তাহা ভক্ষণ করে। মৃগীর নরাকার এক পুত্র হইল। শুক্র এই পুত্রের স্নেহে একান্ত মোহিত হয়েন। কিসে পুত্রের অর্থলাভ গুণপ্রকাশ আয়ুবৃদ্ধি হইবে সর্ব্বদা এই চিন্তা করায় শুক্রের ব্রহ্মধ্যান ভঙ্গ হইল আর ধর্ম্মচিন্তা নষ্ট হওয়াতে সর্পের বায়ু ভোজনের ন্যায় মৃত্যু, ক্ষীণায়ু সেই ভৃগুপুত্রকে গ্রাস করিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ চিন্তা করায় শুক্র মদ্রদেশে রাজপুত্র হইয়া জন্মেন ও রাজত্ব করেন। রাজদেহ পরিত্যাগের পর নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ হয়, পরে, সঙ্গমা নদীতীরে এক তপস্বীর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

ওদিকে ভৃগুবীর্য্যজাত শুক্রের শরীর পবন ও আতপতাপে জর্জরিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। পশুপক্ষীরা শুক্রের শরীর ভোজন করিল না। সেই সময় দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসব পর ভৃগুর সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না কেবল কঙ্কালময় শরীর দর্শন করিলেন, আরও দেখিলেন শুক্রশরীবের চর্ম্মছিদ্রে তিত্তিরিপক্ষী বাসা করিয়াছে, উদরের গহ্বরে ভেক সকল বিশ্রাম করিতেছে। তখন ভৃগু সহসা যমের উপর রাগ কবিয়া তাঁহাকে শাপ দিবাব জন্য উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কাল মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ভৃগুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ছয় মুখ ও ছয় বাহু; হস্তে খড়্গ ও পাশ; কুন্তল ও কবচ পরিধান, সঙ্গে অনেক অনুচর। কাল কহিলেন—"আপনি তপস্বী, আমি নিয়তির আজ্ঞাবহ, এই জন্য আপনাকে পূজা করি। আপনি তপস্যা ক্ষয় করিবেন না, কল্প কালাগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না আপনি তাহাকে অভিশাপে দগ্ধ করিবেন? আপনি নির্ব্বুদ্ধি, আমি সংসার সমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্রকে বিনষ্ট করিয়াছি—বিষ্ণুসমূহকে ভোজন করিয়াছি, আমি কাহাকে না নষ্ট করিতে পারি? এই জগতে যে কেহ কর্ত্তা নাই কেহ দ্রষ্টা নাই জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল এক মাত্র ব্রহ্মকারণ। বৃক্ষের পুষ্প, জগতে জীবের আবির্ভাব এবং প্রলয়ে তিরোধান সকলই বিধির হেতুতা মাত্র। মনই কার্য্যের কর্ত্তা এবিষয়ে শরীরের কোন সামর্থ্য নাই। এই একমন জীবন বিনষ্ট হইলে জীব, কর্ত্তব্যাধারণ করিতে পারিলে বুদ্ধি, শরীরাদিতে অভিমান প্রকাশ করিলে অহঙ্কার ইত্যাদি নানা প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয়। আপনি সমাধি আশ্রয় করিলে, আপনার পুত্র শুক্র শরীর পরিহাব করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল, সেখানে বিশ্বাচী নাম্নী দেবসুন্দরীর সহিত তাহার আসক্তি জন্মে। পরে দশার্ন দেশে বিপ্র, কৌশল দেশে নৃপতি মহাটবীতে ধীরবোধ নামে ব্রাহ্মণ, ভাগীরথীতীবে হংস হইয়া যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পৌণ্ড্রদেশে সূর্য্যবংশজাত নৃমণি, শাল্বদেশে সূর্য্যমন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, এক কল্প পর্য্যন্ত শ্রীমান্ বিদ্যাধর এবং পরে মুনিপুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কিরাতমণ্ডলে বংশ গুল্ম, চীন অরণ্যে হরিণ, তালতলে সরীসৃপ (বৃশ্চিক) এবং তমালবনে বনকুক্কুটদেহ ধারণ করেন। আপনার পুত্র বিবিধ বাসনা বশতঃ বিষম বিচিত্র অনন্তজাতি প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়া

ছিলেন। এক্ষণে বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ তনয় হইয়া সঙ্গমা নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন। সেখানে উৎকট তপে অষ্টশত বৎসর অতীত হইয়াছে। হে মুনে, আপনি যদি স্বপ্নসদৃশ মনভ্রান্তি দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তবে স্বীয় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করুন।"

জগতের অধীশ্বর সমদর্শী কাল এই কথা বলিলে ভৃগু জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে সন্তানের কার্য্যাদি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিভা বশত মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মজের যাবতীয় ব্যাপার বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি সঙ্গমাতট হইতে প্রতিগমন করিয়া মন্দর শিখরাশ্রয়ী কালের সম্মুখোপস্থিত আত্মশরীরে প্রবেশ করিলেন। ভৃগু তখন কালের স্তব করিলেন এবং কাল হাস্য করিয়া ভৃগুর হস্ত ধারণ করিলেন। তখন দুইজনে মন্দর পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সঙ্গমাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন শুক্র সমাধিস্থ রহিয়াছেন। তখন কাল "সমাধি ত্যাগে প্রবোধিত হোন" এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র ভৃগুনন্দন চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তিনি কদম্বলতিকা পীঠ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করত কহিলেন "কি শাস্ত্র চর্চ্চা, কি তপস্যা, কি জ্ঞানানুশীলন, কি বিদ্যালোচনা কিছুতেই যে মনের মোহ নষ্ট হইতে পারে নাই, আপনাদের দর্শনে আমার সে মনের মোহ ক্ষয় পাইয়াছে মহৎলোক দর্শনে অন্তঃকরণ যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, নির্ম্মল অমৃতধারা বর্ষণে সেরূপ সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। আপনাদিগের পদার্পণে এই স্থান সবিশেষ পবিত্র হইয়াছে।" ভৃগু তখন অন্য জন্ম প্রাপ্ত উক্তিকারী পুত্রকে আপনাকে স্মরণ করিতে বলিলেন ও তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করিলেন। ভার্গব ধ্যানস্থ হইয়া জন্মান্তরীণ দশা স্মরণ করিলেন ও সন্তোষচিত্ত ও বিস্ময়বিকশিত মুখ হইয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য, অন্তঃকরণে কি ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ভ্রমের অধীন হইয়াই নানা ভোগ বিশিষ্ট এই জগৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য তাহা জানিলাম, যাহা অক্ষয় দ্রষ্টব্য তাহাও দেখিলাম। এই সংসারে চিৎ ভিন্ন অন্য বস্তু কিছুই নাই; এতকাল ভ্রান্ত ছিলাম বলিয়া জানিতে পারি নাই। যাহা হোক এক্ষণে চিৎ-ব্রহ্মে বিশ্রাম করিলাম। আমি আমার মন্দরস্থ তনু দর্শন করিবার জন্য অতিশয় কৌতুকী হইয়াছি। এ জগতে আমার ঈপ্সিত, অনীপ্সিত কোন বস্তুই নাই।"

তখন ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ সেই তিন জন ক্ষণকাল মধ্যে মন্দর গিরিকন্দরে উপনীত হইলেন। ভার্গব কহিলেন "জীবের সর্ব্বপ্রকার আশাজ্বর ও মোহ বিনাশকারী শরৎ কাল তুল্য চিত্তের নাশ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে শ্রেয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শান্ত ও মহাবুদ্ধি সম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি মনো-রহিত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই সুখ সম্ভোগের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" অনন্তর কাল কহিলেন "নৃপতি যেমন নগরে প্রবেশ করে সেই রূপ তুমি এই শরীরে প্রবেশ কর, তুমি এই শরীর গ্রহণ করিয়া অসুরদিগের গুরুপদে নিযুক্ত হও তোমাদের মঙ্গল হোক, আমি এক্ষণে অভিষ্ট দেশে গমন করি।" মহাকাল এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের সাক্ষাতে অন্ত-র্হিত হইলেন।

মহাকালের প্রস্থানের পর শুক্র আমি সঙ্গমা নদীতীরবাসী ব্রাহ্মণ এই-রূপ ভাবনা ত্যাগ করিয়া, নিয়তির বশপ্রযুক্ত পূর্ব্বতনু ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ শরীরাশ্রয় করিলেন। মহামুনি ভৃগু, সেই শরীরে জীব প্রবিষ্ট হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কমণ্ডলু সলিল দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তখন ক্ষীণ নাড়ী সকল পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। শুক্র প্রাণবায়ু ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং পুরস্থিত পবনাকৃতি পিতাকে অভিবাদন করিলেন। পরে সেই পবিত্র কাননে ভৃগু ও ভার্গব দুইজনে বাসনা ত্যাগ করিয়া তরঙ্গ-হীন হ্রদের ন্যায় স্থির হইয়া, স্থিতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

পাপের পরিণাম।

(গল্প)

প্রণাম, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক। দেবতার নিবাস?—

নিবাস ভট্টপল্লী। হরিহর দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য।

তামাক দেরে, পা ধোবার জল এনে দে।

১২—সালের ফাল্গুণ মাসের প্রথমে একদিন বেলা প্রহরেক অতীত হইলে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশস্থিত কোন পল্লীগ্রামে রামসুন্দর সামন্তের বাড়ীতে ভাটপাড়ার হরিহর ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা করেন। রামসুন্দর জাতিতে কৈবর্ত্ত। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হরিহর তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক কিন্তু উভয়ের আকৃতি দেখিলে রামসুন্দরকে বয়োজ্যেষ্ঠ বোধ হইবে। রামসুন্দরের আদেশে ভৃত্য তামাক এবং পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ তামাক খাইতে খাইতে পুনরায় গৃহস্বামীর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন

আপনার সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। এ বাড়ীতে আমি অনেকবার আসিয়াছি। আপনি কর্ম্মস্থলেই থাকিতেন।

রা। আজ্ঞা হাঁ আমি কর্ম্মস্থলেই থাকিতাম। দাদার মৃত্যুর পর চাকরি ছাড়িয়া দেশে আসিয়াছি। এখন আর বাড়ীতে না থাকিলে চলে না।

হ। ঈশ্বরেচ্ছায় যা আপনাদের আছে, চাকরি করাই নিষ্প্রয়োজন।

রা। দাদা থাক্‌তে ত আর সংসারের কিছুই আমাকে দেখ্‌তে হয় নাই কাজেই বাইরে থাক্‌লে চল্‌ত। তাতেই চাকরি।

হ। আপনি ত নারায়নপুরের কাছারির নায়েব ছিলেন।

রা। আজ্ঞা হাঁ।—তেল এনেদেরে।

হ। ব্রহ্মত্তরের কিছু খাজানা পেয়ে থাকি।

রা। আজ্ঞা আচ্ছা। আহারাদি করুন, তারপর নিলেই হবে, এ মাসের কদিন না এলে আমিই পাঠিয়ে দিতুম। দাদা সব টুকে রেখে গেছেন—এক কপর্দ্দক কারও গোল হ'বার যো নাই।

হ। তিনি বড়ই হিসেবি লোক ছিলেন।

রা। যান স্নান আহ্নিক সমাপন করুন।

ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া আসিয়া দেখেন সিদার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী। রামসুন্দরের অগ্রজ বর্ত্তমান থাকিতে যেরূপ আয়োজন হইত রামসুন্দর তদপেক্ষা অনেক অধিক আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তি-শ্রদ্ধাও যেন অনেক বেশী। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ পাক করিলেন রামসুন্দর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামসুন্দরের পরিধান একখানি পট্টবস্ত্র হস্তে একটী তুলসীর মালা। রামসুন্দর জপের চিহ্ন মুখ নাড়িতেছেন সঙ্গে সঙ্গে মালা টপটপ করিতেছেন। হরিহর ভট্টাচার্য্যের রন্ধন শেষ হইয়াছে, তিনি ভোজনে বসিবেন এমন সময়ে অন্দর হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া রামসুন্দরকে কহিল—যায়গা হয়েছে আসুন।

রামসুন্দর অত্যন্ত রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—যা ব্যাটা নচ্ছার, দেবতার সেবা হয় নাই—আমি যাব খেতে।

ভৃত্য। আজত জলও খান নাই, বেলা প্রায় শেষ হয়।

হরিহর কহিলেন যান আপনি খেতে যান আমার ত হয়েছে।

রা। এমন আদেশ করিবেন না। ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাক্‌তে আমি খাব। ও ব্যাটা বেল্লিক—কাণ্ডজ্ঞানহীন।

হ। ব্রাহ্মণে ভক্তি আপনাদের বংশানুযায়ী।

রা। আজ্ঞে অ্যা অ্যাঁ—অ্যা, রামসুন্দর দেখাইলেন যেন তিনি অতি-শয় লজ্জিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের আহার হইল রামসুন্দরও আহার করিলেন, উভয়ে ক্ষণকাল বিশ্রামও করিয়াছেন।

অপরাহ্নে হরিহর কহিলেন তাহলে—খাজানাটা দিয়ে দিলে আমি উঠ্‌তে পারি।

রা। আজ আর কোথায় যাবেন।

হ। না যেতে হবে। শীঘ্র বাড়ী ফিরবার দরকার। আজ এখান থেকে বিদায় হলে রাজপুর পর্য্যন্ত যেতে পারি। কাল এগোব দক্ষিণ মুখে।

রা। আপনাদের ব্রহ্মত্র না আছে কোথায়?

হ। সেই বাপদাদারা যা করে রেখে গেছেন—এখন আর হবে না।

রা। এখন দেবার লোক কোথায়? আর কি সেকালের রাজারাজড়া আছেন?

হ। তাত বটেই।—

কথা বাড়িয়া যায় দেখিয়া হরিহর এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই পুনরায় কহিলেন তাহলে খাজনাটা দিয়ে দিলে—

রা। হাঁ এই কাগজটা দেখেই দিচ্ছি। এক বৎসরের খাজনা পাওনা ত?

হ। হাঁ, দেখুন লেখা আছে ১৭৷৵০ সতের টাকা সাত আনা,

রামসুন্দর (কাগজ বাহির করিয়া) মহিষাদল ৩১৩৲ পাথরঘাটা ৫১৪৷৵০ ইত্যাদি অনেকগুলি বাজে আওড়াইয়া শেষে কহিলেন এই যে আপনাদের নাম আপনার নামও আছে মারফত লেখা। কি পোক্ত কাজ, রামযাদব ভট্টাচার্য্য কার নাম?

হ। তিনি আমার প্রপিতামহ, ব্রহ্মত্বর তাঁরই নামে।

রা। কত বলছিলেন খাজানা—

হ। ১৭৷৵০ সতের টাকা সাত আনা।

রা। বলেন কি এত মেলে না, দেখ্‌তে পাচ্ছি ৪৷⁄১৫। দেখি আর কোন জমা আছে কি না।

হ। সে কি, একই জমা আমাদের—আর জমা নাই।

রা। (কাগজ দেখিয়া) না দেখ্‌তে পাই না ত।

হ। ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। আমিই খাজানা নিয়ে যাচ্ছি আজ ২০ বিশ বছর হবে।

রা। আজ্ঞে দাদাত আমার কাঁচা লোক ছিলেন না।

হ। তা ত জানি তাঁর সঙ্গে কোনদিন দুকথা হয় নাই, এমন ভুলটা কেন করে গেলেন? তাঁর লেখা ঠিক ত।

রা। লেখা তাঁর হাতের নয় বটে, কিন্তু তিনি নিজ মুখে বলে যান, আর ঐ গোপাল আমাদের মহরের সেই লিখে নেয়। কই কারও ত এমন গোল হয় নাই।

হ। কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।—দাখিলা আছেত ঘরে, দেখুনত দুচারি বছরের দাখিলা—তা হলে টের পাবেন।

রা। আমার বোধ হয় আপনারই ভুল হচ্ছে। অনেক গ্রামে ব্রহ্মত্র আপনাদের, আর কার জমা ১৭৷৵০ তাই আমাদের সঙ্গে গোল করেছেন।

হ। না তা কি হতে পারে, বলিয়া হরিহর তাঁহার বুচ্‌কি হইতে এক কাগজ বাহির করিলেন এবং দেখাইলেন লেখা রহিয়াছে শ্যামসুন্দর সামন্ত বামসুন্দর সামন্ত দীঃ ১৭৷৵০।

রা। তাইত এত ভারি গোলের কথা।

হ। গোল কি আপনি দাখিলা দু চারিখানা আনুন না।

রা। দাখিলার বাক্সের চাবি দাদার স্ত্রীর কাছে, তিনি কাল গেছেন বাপের বাড়ীতে।

হ। তা হলে আর কি হবে?

রা। এই খাজানাটাই নিয়ে যান বরং। আর আপনার প্রণামী কিঞ্চিৎ।

হ। প্রণামীতে কি হবে? আপনার কথা শুনেই আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে খাজানার কড়ি একদিন দুদিনের নয় চিরকালের।

রা। তাত বটেই।

হ। আপনাদের জমি কতটা জানেন ৫০/ বিঘার কম নয়।

রা। আজ্ঞে ব্রহ্মত্র জমির খাজানা কমই হয়ে থাকে। অনেক ব্রাহ্মণ আবার আদৌ পানই না।

হ। হাঁ তেমনও আছে।—তাহলে আর কি হবে উঠি আমি।

রা। খাজানা নেবেন না?

হ। নি কেমন করে, এর একটা নিষ্পত্তি না হলে, আপনি বাক্সের চাবিটে আনিয়ে দাখিলা দুচারিখানা বের করে দেখ্‌বেন, আমি কাঁথি অঞ্চল থেকে ফেরবার সময় আর একবার আস্‌ব।

রা। আজ্ঞে আচ্ছা।—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র তার এক পয়সা খাজানা কম দেব এমন ইচ্ছা রাখি না। তবে দাদার কাগজে ৩ কার ভুল লেখা নাই।

হ। কি জানি কিছুই বুঝ্‌তে পার্লেম না।

হরিহর উঠিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি কেবল এই এক কথাই ভাবিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দরদাস কেন এমন ভুল করিলেন ইহার কোনই সন্তোষজনক মীমাংসা তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রামসুন্দরের যেরূপ ভক্তি দেখিয়াছেন তাহাতে তাহার কোনরূপ প্রতারণা আছে ইহা তাঁহার মনেই আসিল না।

২য় অধ্যায়।

রামসুন্দরের পরিচয়ের নিমিত্ত অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের নিমিত্ত যাহা জানা আবশ্যক তাহা প্রায় পূর্ব্বাধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। সোণাদিয়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামসুন্দর বাড়ীতে থাকিতেন। রামসুন্দর নারায়ণপুরে জমিদারের কাছারির নায়েব ছিলেন। ইহারা মধ্যশ্রেণীর কৈবর্ত্ত। মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্ত্তজাতির সম্মান কম নহে। উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা অনেকেই প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত অথবা ঐরূপ বংশের সহিত সম্পর্কিত। কালের পরিবর্ত্তনে এখন ইহারা অনেকেই নিঃস্ব সুতরাং গণনীয় নহেন। কিন্তু

ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বর্ত্তমান বহু সম্ভ্রান্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাশালী এবং সম্মানিত ছিলেন। মধ্যশ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা বিশেষ সম্মানিত না হইলেও সাধারণতঃ চাকরি, ব্যবসা এবং হলচালন ইত্যাদি কর্ম্ম করেন না। রামসুন্দরদিগের জমি জমাও বেশ ছিল।

হরিহর চলিয়া গেলেই রামসুন্দর মুহুরি গোপালকে ডাকাইলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে কহিলেন "শুনেছ কিছু?"

গো। আজ্ঞে না।

রা। বামুণের জমা টাকায় সিকি রেখেছি। ১৭।৶০ আনার যায়গায় একবারে ৪।৴১৫ এখন চাই কতকগুলো দাখিলা। ওরা বছরে একবার করেই খাজানা নেয়। তুমি আগাগোড়া দাখিলাগুলি ঠিক করবে। কাগজ আমার কাছে যথেষ্ট আছে।

গো। তা দেখেছি।

রা। যেগুলো বেশী পুরোণ সেই গুলোয় গোড়ার দাখিলাগুলি আর ক্রমে শক্ত কাগজগুলিতে হালের দাখিলাগুলি লিখ্‌বে। আমি সব দেখিয়ে দেব। হাত আছে বেশ তোমার।

গো। তা পারিব।

রা। একখানা পাট্টার চেষ্টা করা যা'ক। সেই রামযাদব ভট্টাচার্য্যের নামে এই জমা দিয়ে পাট্টা একখানা কর্ত্তে পারিলে খুবকাজই হয়।

গো। তা পারা যাবে না কেন?

রা। দেখ সেটা হয় ভালই না হয় দাখিলা দিয়েই কাজ সারিব। নালিস এইবারই কর্‌বে। এত কম খাজানা কিছুতেই নেবে না। আদালতে বিশবছরের দাখিলা এক রকম দেখাতে পাল্লেই বস্। কিন্তু দাখিলাগুলো কর্ত্তে হবে, বামুণ ফিরে আস্‌তে আস্‌তে ১০।১৫ দিনের কম ফিরে আস্‌তে পাচ্ছে না। তুমি কালথেকেই লেগে যাও।

গো। আজ্ঞে, আচ্ছা।

রা। নামটাম দাখিলার পাঠ অন্য যত কিছু সব ঠিক রাখ্‌বে কেবল টাকার অঙ্কটা বদলাতে হবে আর "মবলক"টা তা বুঝেছি। কাল সকালেই আরম্ভ করিব

রা। হাঁ—? আসুন আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

গ্রাম্যপুরোহিত বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত, রামসুন্দর তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই অভ্যর্থনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ নিকটস্থ হইলে

পদধূলি গ্রহণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন। মালা টপটপ কিছু শীঘ্র শীঘ্র চলিতে লাগিল।

বরদাকান্ত বলিলেন গেছলুম মণ্ডলদের বাড়ী, মনে কল্লুম ঘর যাবার সময়ে একবার আপনার সঙ্গে দেখাটা করে যাই।

রা। আস্‌বেনইত। রোজই একবার করে পায়ের ধূলাটা দেবেন।

ব। কাজের ঝঞ্ঝাট অনেক। মধু বাবুর ওখানে আর আপনার এখানে একবার করে আসাত আমার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে।

রা। কেমন দেখ্‌লেন মধু বাবুকে?

ব। উনিত চির রোগীর মধ্যে গেছেন। হজম একবারেই হয় না।

রা। ছেলে বাড়ীতে না?

ব। হাঁ এসেছে কাল। ছেলেটা বিগ্‌ড়েছে। হিন্দুধর্ম্মে আস্থা নাই। কোথাকার এক বিধবার বিবাহ দিবার যোগাড় কচ্ছে।

রা। হা ভগবান্ কালে কালে কতই দেখ্‌তে হল। ভাগ্যে দাদার মেয়েটী বে হতে হতেই মরে গেছিল তা নইলে জামাইয়ের এই আচরণ দেখলে তিনি আপনার গলায় আপনি ফাঁসী দিতেন।

ব। তা ঠিক। তাঁর মতন হিন্দু আজকাল দেখা যায় না। দেবতা ব্রাহ্মণে অমন ভক্তি। আর সাক্ষাতে বলা নয় আপনি তাঁকেও ছাড়িয়ে উঠেছেন।

রা। (সলজ্জভাবে হাতযোড় করিয়া) আজ্ঞে—আপনাদের আশীর্ব্বাদ আর পায়ের ধূলোর জোরে, তাই যা বলেন। আজকাল যে দিন পড়েছে, তাতে হিন্দুর ছেলে হিন্দুর আচরণ বজায় রাখলে সেও বাহাদুরী।

ব। তা'ত বটেই। কটা লোক এখন খাঁটীহিন্দু মেলে? মধু মণ্ডলের ব্যাটা সেই কিনা বলে যে, অল্প বয়সে বিধবা হ'লে তার বে দিতে দোষ নাই। চিরকাল ওদের বাড়ীতে বিগ্রহ। বারমাসে তের পার্ব্বন। নিত্য অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ ভোজন। আজ কালই না হয় পড়ে গেছে।

রা। ইংরাজী শিখ্‌লেই যেন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া আসে। আমার ইনিও ত কলিকাতায় কি হয়ে আসেন ভগবান জানেন।

ব। না, আপনার ছেলের হবে না। আপনার শাসন আছে। মধু বাবুর স্ত্রী মরে যাওয়াতেই ছেলেটা বিগ্‌ড়েছে। একমাত্র সন্তান ভালবাসা ছিল অতি বেশী কখনও উঁচু কথাটী কননি।

রা। তার ফল এখন ভুগ্‌ছেন আর কি।

ব। তাত বটেই—আপনার ছেলে অমন হওয়া অসম্ভব।

রা। হলে কি আমি সে ছেলের মুখ দেখ্‌ব?—মধু বাবু গ্রামের মাথা প্রাচীন, আমাদের ওঁকে উপদেশ দেওয়া সাজে না। ছেলেকে একটু কড়কে দিলে ছেলে ত ছেলে—ছেলের চৌদ্দপুরুষ বসে পড়বে না?

ব। আজকালকার ছেলেরা তা নয়। তবে মধু বাবু শাসন কোন দিনই করেন নাই। যে ভালবাসা। ছেলেরও পিতৃভক্তি আছে আর লেখাপড়ায় বেশ, এই বয়সে বি এ পাশ দিয়েছে।

রা। জোর সেই টুক্‌খানি। মোদ্দা মধু বাবু নাই দিয়েই মাটী করেছেন। দেবতা ব্রাহ্মণে যার ভক্তি নাই তেমন ছেলে আস্ত পুঁতেফেলে দেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলছিল যে আবার আমার মেয়েটাকে ঐ ছেলের সঙ্গে বে দিতে—যে তা হলে সম্পর্কটা বজায় থাকৃত। অমন সম্পর্ক উঠে গেছে সেই ভাল।

ব। যাই সন্ধ্যার সময় হল—

রা। হাঁ তা হ'লইত—প্রণাম।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন।

৩য় অধ্যায়।

বরদাকান্ত উঠিয়া যাইতেই, রামসুন্দরের পেয়াদা আবদুল শেখ ভজহরি দাস নামে এক আসামীকে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ভজহরি এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ কৈবর্ত্ত। রামসুন্দরের বাড়ী হইতে তাহার বাড়ী অর্দ্ধ মাইল দূরে। সে রামসুন্দরের প্রজা এবং খাতক। পাচ বৎসর পূর্ব্বে সে রামসুন্দরের অগ্রজের নিকট হইতে চারি মণ ধান কর্জ্জ করিয়া খাইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ১২/ মণ ধান দিয়াছে। কিন্তু রামসুন্দরের হিসাবে এখনও পাওনা ১৮।৫ আঠার মণ পনর সের। তাহাই আদায়ের জন্য ভজহরির তলব। ভজহরির অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহার একমাত্র পুত্র কলিকাতায় কাজ করিত, ছয়মাস হইল সে তথায় বিসূচিকারোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভজহরি এবং তাহার বৃদ্ধাস্ত্রীর অতিকষ্টে দিন যাইতেছে। ভজহরি সম্মুখে আসিবামাত্র রামসুন্দর কহিলেন কি ভজহরি ধানের কি?

ভ। আজ্ঞে আর আমার দেবার সঙ্গতি নাই। যা দিয়েছি তাইতেই আমাকে রেহাই দেন্।

রা। রেহাই টেহাই হচ্ছে না। সহজে দেবে কি না বল।

ভ। দেবার শক্তি থাক্‌লে দিতাম। ব্যাটা না মলে যা চাইতেন দিতাম।

রা। যা চাইতেন কি? ভিক্ষে চাইচি তোমার কাছে? চারি দেড়ে ছয়, ছ' দেড়ে নয়, ন' দেড়ে সাড়েতের। সারেতের দেড়ে সওয়াকুড়ি। সওয়াকুড়ি মণের দেড়ে হ'ল ত্রিশমণ পনের সের। এর মধ্যে উসুল কেবল ১২৲ মণ, ১৮।৫ আঠার মণ পনর সেরই বাকি। পনের সেরই না হয় ছেড়ে দিলাম। আঠার মণের কি?

ভ। আজ্ঞে আঠার মণ ছেড়ে আঠার সেরও আমার দেবার সাধ্য নাই।

রা। শালা, ষ্ঠাক্‌রা পেয়েছ না কি? আবদুল ধান আদায় কর্‌। ধান আদায় কর্‌।

শেষের কয়েকটী শব্দ রামসুন্দরের মুখ হইতে ব্যাঘ্রগর্জ্জনে বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু সুর নরম করিয়া মুখবিকৃতির সহিত কহিলেন "ব্যাটা মরেছে তবেই আর কি শালার সব দেনা শোধ হয়ে গ্যাছে—ব্যাটা'ত কারু মরে না! অল্পকাল মধ্যেই আবদুল প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে অগ্রসর হইল। বঙ্গের পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন আদায় করিতে বলার অর্থ কি।

অতিশয় নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক না হইলে অত্যাচারী ভূস্বামী বা মহাজনের পেয়াদা কিম্বা নগ্‌দীর কার্য্য করিতে পারে না। ভালমানুষ হইলে সে এইরূপ আদেশের অর্থ না বুঝিয়া অনেক সময়ে স্বয়ং প্রভুর হাতে প্রহার খাইয়া থাকে। আবদুল সে শ্রেণীর নহে। জমিদারী কাছারিতে রামসুন্দরের অধীনে সে নগ্‌দী ছিল। কাজের লোক বলিয়াই রামসুন্দর তাহাকে বাড়ীতে আনিয়াছেন। প্রভুর গর্জ্জন শুনিয়াই সে বৃদ্ধকে মারিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভজহরি শীর্ণকায়। তাহার শ্বাস রোগ ছিল। আবদুলের হাতের প্রহার সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? দু'এক ঘা খাইয়াই বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

রামসুন্দর হুকুম দিলেন শালাকে সামনে থেকে সরা। লে যা পুকুরে এখনই ধান আদায় হবে।

আবদুল তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া গেল এবং পুকুরে নাবাইয়া গলা অবধি ডুবাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ফাল্গুণ মাসের প্রথমভাগ সুতরাং শীত ছিল। বৃদ্ধ ভজহরি থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আর ডাকিতে লাগিল চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া কেবল সেই দরিদ্র দুঃখহারী পরমেশ্বরকে।

দুএকবার আবদুলকে অনুনয় করিয়া কহিল আমার ঘরে একটা খবর দাওনা। আবদুল তাহাতে কাণ না দিয়া কহিল শালা ধানের পথ কর্। বল্ এখনি বাড়ী যেয়ে গরুটকু বেচে দিবি তা হলে কর্ত্তাকে বলি।

ভ। তা আছে একটা গাই তাই বেচেই দেব। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

এই সময়ে ভজহরির স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। আবদুল ভজহরিকে বেলা থাকিতেই আনিয়াছিল। বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া সে সময়ে হাজির করে নাই। সন্ধ্যার পরেও স্বামী ফিরিল না দেখিয়া বৃদ্ধা রামসুন্দরের বাড়ী মুখে আসিতেছিল পথে খবর পাইয়াছে যে রামসুন্দরের আদেশে ভজহরি প্রহার খাইয়া পুকুরের জলে নাবিয়াছে। রমণী অমনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে। রামসুন্দর বাহিরের ঘরে বসিয়া মালাই টিপিতেছেন। ভজহরির স্ত্রী প্রথমেই পুকুরধারে আসিল এবং আবদুলকে কহিল বাপ আমার বুড়োকে ছেড়ে দাও। আমি কর্ত্তাকে যেয়ে বল্‌ছি।

আবদুল তাহা শুনিবে কেন? বৃদ্ধা একবার স্বামীকে তুলিতে গেলে আবদুল অতি কর্কশ ভাষায় জানাইয়া দিল যে এরূপ চেষ্টা করিলে তাহাকেও অবমানিত হইতে হইবে।

রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া রামসুন্দরের কাছে দৌড়াইল এবং তাহার চরণপ্রান্তে ঠুস্ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল এই কি বিচার কর্ত্তা? বুড়ো হাঁপানিতে মরো মরো। যা ছিল ব্যাটার শোকেই সেরে দিয়েছে। সেই লোককে দিয়েছেন পুকুরে নাবিয়ে?

রা। সর্। সর্। ছুঁড়ি?

ভ, স্ত্রী। বুড়োরে খালাস দাও।

রা। ধানগুলি দিলেই খালাস দি।

ভ, স্ত্রী। দেবার শক্তি কি আছে আমাদের?

রমণী এইবার রামসুন্দরের পায়ে ধরিতে গেল। রামসুন্দর সরিয়া বসিয়া চেঁচাইলেন "মর, মাগী, হারামজাদী।"

ভজহরির স্ত্রী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল "ছার বুড়োরে, এ শীতে বাঁচবে না।"

রা। ধান দে এনে।

ভ, স্ত্রী। কোথায় পাব? বাবা রামতনু একবার উঠে আয় বাবা, বৃদ্ধা মৃত পুত্রের উদ্দেশে কাঁদিতে লাগিল।

রা। শালী আবার কান্না সুরু করে দিল। ইচ্ছে হয় গরুটরু বেচে ধানের দামটা দিয়ে বুড়োকে খালাস করে নিয়ে যা।

ভ, স্ত্রী। থাক্‌বার মধ্যে একটা গাইই আছে তাই নিলে আপনি খুসী হন্ নিন্।

রা। খুসী কি শালি? আমি কি মাগ্‌তে যাচ্ছি তোমার কাছে?

ভ, স্ত্রী। কর্ত্তা আনিয়ে নাও সে গরু, দাও বুড়োকে ছেড়ে।

এতক্ষণে আবদুলের প্রতি হুকুম হইল, ভজহরিকে জল হইতে তুলিতে। বৃদ্ধা স্বামীর কাছে দৌড়াইল এবং ভজহরি উঠিলে আপনার অঞ্চল দিয়া তাহার সমস্ত গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিল। ভজহরির গাত্রবস্ত্র সহিতই আবদুল তাহাকে জলে ডুবাইয়াছিল। বৃদ্ধ আর্দ্রবস্ত্রে থাকিলে দারুণ ক্লেশ পাইবে দেখিয়া রমণী একটু দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইয়া আপনার অঞ্চলাংশ পরিধান করিল এবং কথঞ্চিৎ নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া শুষ্কভাগের অনেকটা ছিঁড়িয়া লইল। ভজহরির কাপড় ছাড়াইয়া সেইটুকু পরাইলেও তাহার শীত বারণ হইল না। বৃদ্ধা কতকগুলি শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিল এবং তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্বামীকে উত্তাপ দিতে লাগিল। ভজহরি বসিলে রমণী তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় মারিয়াছে?" ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহারের স্থান দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধা হস্ত দ্বারায় সেই সকল স্থান মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিল। স্বামীর সেবা করিতে করিতে রমণী তাহাদের একমাত্র সম্বল গাভীটীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সহসা রামসুন্দরের এক ভৃত্য আসিয়া বলিল "এই যে তোমার গরু এনেছি, ধানের দেনা মিটিয়ে যাও।"

বৃদ্ধ দম্পতির চেতনা হইল। গাভীটীকে তাহারা বড়ই ভালবাসিত। তাহারা যে গৃহে শুইত তাহারই একপার্শ্বে গাভীটী থাকিত। গাভীটীর ক্রোড়ে ছ'সাত মাসের একটী বৎস। তাহাই শুদ্ধ টানিয়া আনিয়াছে। ভজহরির স্ত্রী সন্ধ্যার সময়ে গাভীটীকে গৃহে তুলিয়া সেখানে ঘুঁটের ধূম করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। এখন যাইয়া গৃহের সেই অংশ শূন্য দেখিবে।

রমণী মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সমস্ত ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরেই কাঁদিয়া ফল নাই ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া রামসুন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

গাভীটী চারি সের করিয়া দুদ্ দেয়। তাহার মূল্য ১৮/ মণ ধানের দাম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু অতি সহজেই নিষ্পত্তি হইল যে ঐ ১৮/ মণ ধানের জন্য গাভীটী যাইবে। ভজহরি কিম্বা তাহার স্ত্রী কোন আপত্তিই করিল না। ভজহরি স্ত্রীকে কহিল আর দেরী কর কেন? চল ঘর যাই। ভজহরির স্ত্রী উঠিল এবং শিশিরসিক্ত একগুচ্ছ দুর্ব্বা আনিয়া গাভীটীর মুখে দিল। কিছুকাল তাহার কাল মুখ খুর প্রভৃতিতে হাত বুলাইল এবং বাছুর-টীরও গাত্র স্পর্শ করিল। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "মা ভগবতী, এতদিন আমার ঘরে ছিলে আজ বিদায় দিলাম মা। ব্যাটা মরবার পর থেকে তুমিই আমাদের মানুষ করেছ মা। তোমার দুদ্ বেচে চা'ল কিনেছি মা। তোমার গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানিয়ে ভাত রেন্ধে খেয়েছি মা। কত অযত্ন করেছি—মেরেছি তোমায় মা—অপরাধ নিওনা মা। জন্মের শোধ ঘাস খাইয়ে গেলুম মা।—

ইহার পরে কাঁদিতে কাঁদিতেই স্বামীর হাত ধরিয়া কহিল চল বাড়ী যাই। পুত্রশোকদগ্ধ দরিদ্র দম্পতি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। রজনীর অস্পষ্ট আলোকে যতদূর তাহাদিগকে দেখা গেল গাভীটী কাতর নয়নে পালকপালিকার পানে চাহিয়া রহিল।

পশু! তোমারও প্রাণ আছে! কিন্তু মানুষ কেমন করিয়া এমন পাষাণ হয় ইহাই আমরা বুঝিতে পারি না।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

শূদ্রমণি রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়।

১১৪৭ সালের পৌষমাসে ইংরাজী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেবের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের তিনমাস পূর্ব্বে আশ্বিন মাসে তাঁহার পিতা রাজা গোবিন্দদেব রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহার পিতামহ রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়কে নবাব মুরসিদকুলীখাঁ শূদ্রমণি উপাধি দিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ে মুরসিদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে।* কিন্তু মুরসিদের গুণগ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ জমিদার যথা সময়ে রাজস্ব উসুল করিতে না পারায় নবাবের আদেশে সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ কুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রাজা রঘুদেব এ কথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাহার সমুদয় দেনা শোধ করিয়া তাহাকে নরকমুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার নাম শূদ্রমণি রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় হয়।

---

*Moorshood Cooly Khan continued to make the Collections through his Aumils, by displacing the Zemindars, with a few exceptions where he found the latter worthy of trust and confidence

* * * *

The Nawab, however, never placed confidence in any man; he himself examined the accounts of the exchequer every day; and if he discovered any of the Zemindars or others remiss in their payment, he placed either the principal or his agent in arrest with a guard over him, to prevent his either eating or drinking till the business was settled.

* * * *

A principal instrument of the Nawab's severity was Nazir Ahmed, to whom, when a district was in arrears, he used to deliver over the captive Zemindar, to be tormented by every species of cruelty; as hanging up by the feet; bastenadoing, setting them in the sun in summer; and by stripping them naked, and sprinkling them frequently with cold water, in winter.

But all these acts of severity were but trifles, compared with the wanton and cruel conduct of Syed Reza Khan * * In order to enforce the payment of the revenues, he ordered a pond to be dug, which was filled with every thing disgusting, and the stench of which was so offensive, as nearly to suffocate whoever approached it: to this shocking place, in contempt of the Hindoos, he gave the name of Bickoont, which in their language means Paradise, and after the Zemindars had undergone the usual punishments, if their rent was not forthcoming, he caused them to be drawn, by a rope tied under the arms, through this infernal pond. He is also stated to have compelled them to put on loose trowsers, into which were introduced live cats. By such cruel and horrid methods he extorted from the unhappy Zemindars every thing they possessed and made them weary of their lives.

* * * *

Moorsheed Cooly devoted two days in the week to the administration of justice in person in court, and so impartial was he in his decisions and so rigid in the execution of the sentence of law, that he put his own son to death for an infraction of its regulations.

* * * *

In the affairs of Government, he showed favour to no one; and always rewarded merit wherever he found it.

Stewart's History of Bengal.

রাজা নৃসিংহদেবের পূর্ব্বপুরুষ ও পরপুরুষগণের বংশাবলী এইরূপ

নাম	সে সময়ে যে শাসনকর্ত্তা
দেবাদিত্য দত্ত	বল্লাল সেন
বিনায়ক দত্ত	লক্ষ্মণ সেন
তপন দত্ত　কাপ দত্ত	মাধব ও কেশব
মণ্ডল দত্ত	লাক্ষ্মণ্য
বুড়ন দত্ত	লাক্ষ্মণ্য ওকুতুব উদ্দীন
মধুসূদন দত্ত	ইলৎমশ ও নাসিরউদ্দীন
যাদব দত্ত	মহমুদ ও বুলবন
মহেশ্বর দত্ত	বুলবন ও জলাল উদ্দীন
উবারু দত্ত	অলা উদ্দীন ও গয়েস উদ্দীন
কুলপতি দত্ত	মহম্মদ শা
কবি দত্ত	
ঈশ্বর দত্ত	
কেশব দত্ত	
দ্বারকানাথ দত্ত	বহলোল লোদী
শ্রীমুখ দত্ত	সিকন্দর লোদী
সহস্রাক্ষ দত্ত (জমীদার)	ইব্রাহিম বাবর, হুমায়ূঁ ও অকবর
উদয় দত্ত (সভাপতি রায়)	অকবর
জয়ানন্দ রায় (মজুমদার)	জঁহাগীর ও শাহজঁহা
রাঘব রায় (চৌধুরী মজুমদার)	শাহজঁহা
রামেশ্বর রায় (রাজা মহাশয়)	অওরঙ্গজেব
রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় (শূদ্রমণি)	ঐ
রাজা গোবিন্দদেব রায় মহাশয় শূদ্রমণি	বহাদুর, মহম্মদশা
রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয় শূদ্রমণি	ক্লাইব, হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস
রাজা কৈলাশদেব রায় মহাশয় শূদ্রমণি	
রাজা দেবেন্দ্রদেব রায় মহাশয় শূদ্রমণি	
রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয় শূদ্রমণি	

রাজা সতীন্দ্রদেব　　ক্ষিতীন্দ্রদেব　　মুনীন্দ্রদেব　　রমেন্দ্রদেব

রাজা নৃসিংহদেবের প্রপিতামহ রামেশ্বর রায় ১০ই সফর ১০৯০ হিজরি অব্দে বাদসাহ অওরঙ্গজেবের নিকট এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রমে রাজা মহাশয় উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। এই সনন্দের সঙ্গে বাদসাহ তাঁহাকে পঞ্চপার্চা (পঞ্চ পোষাক) খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজপদবী সম্মানের সহিত রক্ষা করিবার জন্য বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জায়গীর দিয়াছিলেন। সনন্দ দুইখানির অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল। আগামীবারে মূল সনন্দ প্রকাশ করা যাইবে।

রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়

বরাবরেষু—

মোকাম বাঁশবেড়িয়া, পরগণে আর্শা, সরকার সাতগাঁ

পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যেহেতু তুমি রাজ্য শাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যখন যে কার্য্য তোমাকে ভার দেওয়া গিয়াছে যেহেতু তুমি যথেষ্ট যত্নের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছ, এজন্য তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চপার্চা খিলাত ও রাজা মহাশয় উপাধি তোমাকে দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহ'তে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ সফর ১০৯০ হিজরী।

এই শুভসময়ে সর্ব্বজন শিরোধার্য্য মহাপ্রতাপান্বিত এই আদেশ প্রচার হইল যে, যেহেতু সপ্তগ্রাম সরকার ও কোট এক্তিয়ারপুর পরগণার কানুনগো ও চৌধুরী এবং বক্সবন্দরপুর পরগণার, রায়পুর কোতোয়ালি পরগণার, উপরিউক্ত সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য পরগণার ও সলিমাবাদ সরকারের চৌধুরী রামেশ্বর হিতকারী ও রাজ্যোন্নতি প্রার্থী;—অতএব তাহাকে সং সপ্তগ্রাম, পং আর্শা, মৌং বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি, বসতবাটী ও জীবিকার জন্য নিষ্কর পারিতোষিক স্বরূপ দেওয়া হইল। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রধান কর্ম্মচারিগণ যেন উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত জমির চিরন্তন লাখেরাজদার জানিয়া উক্ত জমি উহার দখলে ছাড়িয়া দেয়, মাল বা অন্য কোন কারণে আপত্তি না করে ও প্রতিবৎসর নূতন সনন্দ তলব না করে। ইহা নিশ্চয় জানিয়া ইহার কদাচ অন্যথা না করে।

ইতি সন ১০৯০ হিজরি, ২২শে জলুস।

পুনরায় স্পষ্ট করিয়া লেখা হইতেছে যে, সপ্তগ্রাম সরকার কোট এক্তিয়ারপুর পরগণার কানুনগো ও চৌধুরী—বক্সবন্দরপুর পরগণার উপরি উক্ত সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য পরগণার কোতয়ালি রায়পুর পরগণার ও সরকার সলিমাবাদের চৌধুরী রামেশ্বরকে সং সপ্তগ্রাম, পং আর্শা, মৌং বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জীবিকা ও বসতবাটীর জন্য ৪০১ বিঘা পতিত খারিজ জমা জমির সনন্দ মহামান্য মহামহিম হুজুরের তরফ হইতে প্রদত্ত হইল। আর এইরূপ হুকুম হইল যে, উপরি উক্ত জমি উক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হয়। বিশেষতঃ সরকারের হাকিম ও আমলাগণ যেন মালের জন্য বা অপর কোন কারণে কস্মিন্‌কালেও উক্ত জমিতে হস্তক্ষেপ না করে।"

রাজা রামেশ্বরের পূর্ব্ব কয়েক পুরুষ পাটুলীতে বাস করিতেন। রামেশ্বর পাটুলী হইতে বাঁশবেড়িয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। তথাপিও মাঝে মাঝে পাটুলীতে অবস্থান করিতেন। রাজ্যের সুশাসনের জন্য তাঁহার পিতা রাঘব রায় চৌধুরী বাঁশবেড়িয়ায় একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার জীবিতকালে এটী কাছারীবাড়ীর মত ব্যবহার হইত। দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্ম রাঘব পাটুলীর বাড়ীতে সম্পন্ন করিতেন। রামেশ্বরের সময় হইতে ঐ সব উৎসব বাঁশবেড়িয়ার বাটীতে সম্পন্ন হইত। নদীগর্ভে পাটুলী-প্রাসাদ অন্তর্দ্ধান হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে মহাশয়বংশ পাটুলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাদশাহ শাহজঁহা ১২ রুবি ১০৬৬ হিজরী শকে (১৬৪৯ খৃঃ) রাঘবকে চৌধুরী ও পর বৎসর তাঁহাকে মজুমদার উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধির সঙ্গে রাঘব ২১টী পরগণার জমিদারী ও বিস্তর নিষ্করভূমি উপহার পাইয়াছিলেন। রাঘবের পিতা জয়ানন্দকেও শাহজঁহা মজুমদার উপাধি একটি পরগণার জায়গীর ও কানুনগুই চাকরি দিয়াছিলেন।

জয়ানন্দের পিতা উদয় দত্তকে বাদশাহ অকবর বংশানুক্রমে সভাপতি রায় উপাধি দিয়াছিলেন। উদয়ের পিতা সহস্রাক্ষ ৯৮০ শালে (১৫৭৩ খৃঃ) মোগল বাদশাহ অকবরের এক ফর্ম্মান প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে জমীদার উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

মুরসিদাবাদ জেলায় কান্দির সন্নিকটে দত্তবাটী গ্রাম। দত্তবংশীয় জমিদারদের বাস বলিয়া গ্রামটীর ঐরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। বকতিয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করিলে মুসলমানের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি

পাইবার জন্য বুড়ন দত্ত নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া দত্তবাটীতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। সহস্রাক্ষের পিতামহ দ্বারকানাথ দত্ত দত্তবাটী পরিত্যাগ করিয়া পাটুলীতে রাজধানী স্থাপন করেন—পাটুলী হইতে বাঁশবেড়িয়া। বাঁশবেড়িয়া নামের অর্থ কি বলা যায় না। দত্তবাটীর ন্যায় কেহ কেহ অনুমান করেন, রাজবংশেরবাটী হইতে বংশবাটী নাম হইয়া থাকিবে। আমার বোধ হয় বর্গীদিগের অত্যাচার ভয়ে রাজা রামেশ্বর যখন রাজ প্রাসাদ পরীখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন, তখন পরীখার পার্শ্বে বাঁশঝাড়ের সার বসাইয়া বেড়ার মত করিয়া লইয়াছিলেন। কণ্টকময় বেড়বাঁশের বেড়ার ভিতর দিয়া প্রবেশ করা শ্বাপদগণেরও দুঃসাধ্য। হয়ত এইরূপ বেড়া হইতে বাঁশবেড়িয়া নাম হইয়া থাকিবে। অথবা রাজবাটী স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ঐ গ্রামে বাঁশের প্রচুরতা হেতু ঐরূপ নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এ নাম কতদিনের না জানিলে অনুমান অন্ধীভূত হয়।

রামেশ্বরের গড় হইতে রাজবাটীকে গড়বাটীও বলা হয়। এই পরীখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধনুর্ব্বাণ, ঢাল তরবারী ও বন্দুক লইয়া পদাতিগণ এই গড়ের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। মাঝে মাঝে কয়েকটী কামানও রাখা হইয়াছিল। বর্গীরা ত্রিবেণী লুট করিতে আসিলে লোকেরা এই গড়ের ভিতর আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিত। একবার বর্গীরা গড়বাটী অবরোধ করিয়াছিল। রাজা রঘুদেব নৈশযুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া দেন। রঘুদেব পূর্ব্ব পরীখার সংস্কার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে আর একটী নূতন পরিখা খনন করাইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ কি রাজকার্য্যে, কি সমরকৌশলে, কি দানধর্ম্মে, কি নীতি-নিপুণতায় পাটুলীর মহাশয়বংশ বাঙ্গালার গৌরবস্থান। বিচক্ষণ অকবর, ক্রূরনীতি অওরঙ্গজেব, রাসকলাপটু জঁহাগীর ও সমৃদ্ধি শোভমান শাহজহাঁ পাটুলী বংশকে গরীয়ান করিতে সকলেই মুক্তহস্ত। মুরসিদকুলী ও মুয়াজম্, ইসলামধর্ম্মে অবিশ্বাসী, বিশ্বাসী ও অতিবিশ্বাসী, হিন্দুর হিন্দু তান্ত্রিক বংশকে সকলেই কুসুমদাম উপহার দিয়াছেন। মহাশয় বংশের নীতি-নিপুণতার ইহা চূড়ান্ত প্রমাণ।

মহাশয়বংশ বাঁশবেড়িয়ায় আসবার পূর্ব্বে উহা একটী নগণ্য গ্রাম ছিল। মহাশয়বংশ নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য ও কায়স্থ এবং

বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে আনাইয়া বংশবাটীতে বাস করাইয়াছিলেন। এক এক পল্লীতে এক এক জাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কাশী হইতে পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে আনাইয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রাম মধ্যে বার চোদ্দটী টোল স্থাপন করিয়া কাশী ও মিথিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়া ছাত্রদিগের স্মৃতি শ্রুতি বেদ বেদান্ত ন্যায় সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার হইতে দেওয়া হইত। তখনও ভাটপাড়ায় পণ্ডিতবংশের বাস হয় নাই। ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর আলীবর্দ্দীর সমসাময়িক। বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবমন্দির রাজা রামেশ্বরের স্থাপিত। ১৬০১ শকাব্দে (১৬৭৯ খৃঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে মন্দিরের গাত্রে একটি শ্লোক অদ্যাপি খোদিত রহিয়াছে

মহীব্যোমাঙ্গ শীতাংশু গণিতে শকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং॥

পাঠক! একটী কথার উপর লক্ষ্য করিবেন। অন্যান্য খোদিত লিপিতে প্রতিষ্ঠাতার আত্মগৌরব জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবেন। "পরম ভট্টারক" "অঙ্গ বঙ্গ ত্রিকলিঙ্গপতি" দেবমন্দির প্রতিষ্ঠাতার, সুদ্ধবুদ্ধ বিনীত ভক্তের কাহিনী। বাসুদেবমন্দির প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর সভাপতি রায় চৌধুরী মজুমদার রাজা মহাশয় কেবল রামেশ্বর দত্তে অবনত। ভক্ত ও গর্ব্বিতের বিভিন্নতা এইখানে।

কুলজী পঞ্জিকায় পাটুলী বংশের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কি হিন্দু কি মুসলমান, ইতিহাস লেখক মাত্রে পাটুলী বংশের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

পাটুলী বংশের সহিত বড়িশার সাবর্ণ বংশের একটী ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সাবর্ণ বংশের পরিচয়ে কুলপঞ্জিকায় পাটুলীবংশের পরিচয় জড়িত রহিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে এ দুটী বংশই প্রসিদ্ধ। কালীক্ষেত্র, কালীঘাট ও কলিকাতার ইতিহাসে সাবর্ণ নাম খোদিত। কালীঘাট সাবর্ণের আবিষ্কৃত। দেবল অপবাদ ভয়ে সাবর্ণেরা কালীপূজার ভার হালদার দিগকে দিয়াছিলেন—কালীমন্দির সাবর্ণের প্রতিষ্ঠিত। কৌলীন্যের সহিত সাবর্ণের নাম জড়িত। সুতরাং এই সঙ্গে সাবর্ণবংশের কিছু পরিচয় জানা থাকিলে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা জানা হইবে।

শিব সহোদর জীয়ো (জীব) রাখি শিশুপুত্র
সংসার সাগর হতে উঠায় বহিত্র।

প্রসব হইয়া পুত্র প্রসূতির কাল
হইল দ্বিজের ঘটে বিষম জঞ্জাল।

লুকাইয়া চলি যায় বারাণসীপুর
পরিব্রাজ ধর্ম্ম তথা করিল প্রচুর।

দিনে দিনে বাড়ে শিশু প্রতিপদ চাঁদ
পশ্চাৎ দেখিবে এটী কুলভাঙ্গা ফাঁদ।

ক্রমশঃ দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল
অম্বুদেশ হেতু পিতা বিষম ঘটিল।

উপনয়কাল তাঁর ছাড়াইয়া যায়
হেন কালে সমাচার শুন মহাশয়।

মানসিংহ মহারাজা কাশীতে আসিল
জীয়োর নিকটে তিঁহো উপদিষ্ট হল।
রাজারে কহিল দ্বিজ শুন বাপধন
করিতেছ শুনি তুমি বঙ্গেতে গমন।
মম পুত্রে গিয়া তুমি ঠিকানা করিবা
সেই কার্য্য করি বাপ মোরে বাঁচাইবা।
বঙ্গেতে আসিয়া রাজা যে কার্য্য করিল
প্রথমতঃ ঐ কার্য্য পশ্চাৎ সকল।
পাটুলীতে হয় শূদ্রমণি জমিদার
তাহাকে ডাকায়ে রাজা কহে সমাচার।
রাজাজ্ঞা মতেতে সেই ঠিকানা করিল
গুরুবাক্য ঐক্য করি ঠিকানা হইল।
তারপর রাজা গুরুপুত্র দরশন
করিয়া হইল অতি আনন্দিত মন।
শূদ্রমণি মহাশয় করজোড় করি
দেখেন রাজার মনে আনন্দলহরী।
রাজা বলে ওহে তুমি যে কার্য্য করিলা
তার পরিতোষ তুমি লহ এই বেলা।
মহাশয় কহিলেন আপন কৃপায়
অভাব নাহিক কিছু এই বাঞ্ছা হয়।
ঈশ্বরীর তীরে মম তরণী ভিড়ান
নিজ নিজ স্থানে হয় এই দেহ স্থান।

মধ্যে মধ্যে আছে মম গমনাগমন
দুই চারি দিন করি নীরে যে ভ্রমণ।
তথাস্তু কহিয়া রাজা তাহাই করিল
স্থান পরিবর্ত্ত করি ঐ স্থান দিল।
অদ্যাপিহ ঐ স্থান স্থানে স্থানে হয়
বেন্দাফোঁড়া জমীদার ওই মহাশয়।
তারপর রাজা কহে বালকের জন্য
দেখ এক জমিদারী প্রায় কর শূন্য।

* * *

রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গালা দেশে আসেন তখন জীবের পুত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্বাদশ বৎসরের বালক। যিনি লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত রাজা মানসিংহের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি? উদয় ও তাঁহার পিতা সহস্রাক্ষ উভয়কেই অকবর খেলাত ও উপাধি দিয়াছিলেন, সহস্রাক্ষ তাঁহার নিকট জমীদার উপাধি ও ফয়জুল্লাপুরের জমীদারী লাভ করেন (১৫৭৩)। তাঁহার পুত্র উদয় দত্ত অকবরের নিকট বংশানুক্রমে সভাপতিরায় উপাধি পান। মানসিংহ অনেকবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে তিনি আসিয়াছিলেন ইতিহাসে এমন উল্লেখ নাই। এজন্য বোধ হয় উদয় দত্ত লক্ষ্মীনারায়ণের অনুসন্ধানে মানসিংহকে সাহায্য করিয়া সভাপতিরায় উপাধি ও ভাগিরথীর পার্শ্বস্থ পরগণা সকলের জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন।

কোথায় বারাণসী কোথায় পাটুলী? এত পথ কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া—একেবারে পাটুলীতে আসিয়া উদয় দত্তকে লক্ষ্মীনারায়ণের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি? পথে ভাগিরথীর উভয় পার্শ্বে অনেক বাঙ্গালী জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা হইল না কেন? পাঠকের কৌতুহল জন্মিতে পারে।

জীবের নিবাস আমাট্যা। সাবর্ণ চৌধুরীরা আপনাদিগকে আমাট্যার গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচয় দেন। এই আমাট্যা পাটুলীর অতি সন্নিকট। পাটুলী কাটোয়ার ৫।৬ ক্রোশ দক্ষিণে, কাটোয়া গঙ্গা ও অজয়ের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। আমাট্যাও সেইখানে। বস্তুতঃ কাটোয়া আমাট্যার অংশ মাত্র। জীব মানসিংহকে পূর্ব্বনিবাস বোধ হয় বলিয়া দিয়াছিলেন, তাই মানসিংহ পাটুলীর জমিদারের নিকট লক্ষ্মীনারায়ণের অনুসন্ধান করেন।

গাঙ্গবংশে কুলপতি কুলপতি সম
আমাট্যা বসতি দানে জ্ঞানে নিরূপম।

*　　　　*　　　　*

শম্বক গোঁসাঞী ভাগবতে পরিচিত
গাঙ্গুলীর আমাট্যা বিশেষ সুবিখ্যাত।
আমাট্যা যতদূর ততদূর বীরভূঞি
অজয় গঙ্গা সন্ধি তীর্থাবাস নিমাঞি।
আমাট্যা প্রদেশ কণ্টক তার অংশ
নবদ্বীপের তৃতীয় আবাস গাঙ্গবংশ।
শিশুসুত পঞ্চ আয়ুবিনা অনপত্য
তাই সে চারি পুত্র বৃথা জন্ম অসত্য।
আয়ুসুত হলধর গদাধর পৌত্র
পরমায়ু আয়ু নামে জান সে প্রপৌত্র।
পরমজ হলায়ুধ শ্রেষ্ঠ পুত্র পঞ্চ
শ্রীকণ্ঠ কুল মুরারী বিদ্যার প্রপঞ্চ।
হলসুত চিরায়ু আর পাঁচ সহোদর
তাদের সমাজ মধ্যে মহা সমাদর।
চিরায়ুজগণ বটু বল বিনায়ক
বল নিহ্নো নামে খ্যাত শিব তার দত্তক।
বিনায়জ শিব আর সহোদর অষ্ট
জীয়ো জ্যেষ্ঠ শিব মধ্য তাহে আমাট্যা নষ্ট।
অবরজ নাম শুন শূলী শম্ভু ব্যাস
কেশব মাধব পদ্ম ছোট পরিহাস।
শিব সন্ততির সংখ্যা রুদ্র পরিমিত
পুরাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিরিঞ্চী বিনিন্দিত।
পুরাই সুতমধ্যে ভৈরব যে সুশীল
নিতুগোরী বায়ু ভিন্ন সবাই দুঃশীল।
তাই তাদের বংশ না করে যে বর্ণন
আমাট্যার নামে যে মিত্রামিত্রে তর্পণ।

*　　　　*　　　　*

জীয়ো প্রভৃতি সপ্তক না পেয়ে মর্য্যাদা
দেশত্যাগী সঙ্গহীন চিন্তাকুল সদা।
নির্ব্বেদে জীয়ো হল চির কাশীবাসী
বিদ্যা ব্রহ্মণ্য যে দেখে দণ্ডী অন্তেবাসী।

জীয়ো শিষ্য প্রশিষ্য যতেক নারায়ণ
তা দেখি মানসিংহের ভক্তি অগণন।
তাই মানসিংহ তাঁর অতিশয় ভক্ত
তাঁর শিক্ষা দীক্ষায় ত্রিতাপে অনাশক্ত।
গুরুর আশীষে শিষ্য মানবের সিংহ
ভারতজয়ী হোলো সে রাজা মানসিংহ।
কি কাজে গুরুর তোষ ইঙ্গীতে শুনি
তব ভ্রাতু অন্বেষণ কর যাদুমণি।
মানসিংহ গুরুপুত্রে করে অন্বেষণ
কালীঘাটে দেখা নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।
শিষ্ট শান্ত সুবুদ্ধি তেজিয়ান অতি
বালক হোলেও বিজ্ঞ আছিল সুনীতি
রাজা জিজ্ঞাসিল ভাই মাতৃচরণ কৈ
চরণামৃত দাও গুরুঋণ মুক্ত হৈ।
লক্ষ্মীনারায়ণ কহে মাতৃআজ্ঞা শুন
মর্য্যাদাহীন জীবনে নাহি কাজ পুনঃ।
নৃপ বলেন প্রতিজ্ঞা মম জান স্থির
গুরুর আদেশ রক্ষায় আছে এ শরীর।
আজি হতে তব ইচ্ছা যত লও ভূমি
কুলীনে ধরুক ছাতা অন্নদাতা তুমি।
পিত্রাদেশ আছে এই কুল কর চূর্ণ
তাঁহার মানস তাহে হবে পরিপূর্ণ।
ভবানন্দ সহচর কানুনগুর ভার
ইচ্ছামত তব রাজ্য হবে যে বিস্তার।

উত্তররাঢী কায়স্থ দ্বিজভক্ত এক
লক্ষ্মীর সন্ধানে ক্লেশ সে পায় কতেক।
ক্ষুদ্র ভূমীপ বটে দেবদ্বিজে মতী
মানসিংহের আজ্ঞায় রাজস্বে নিষ্কৃতি।
গঙ্গাবাসে স্থান নাহি চাহি সে নিষ্কর
পিতৃ যজ্ঞে ভূস্বামীর পূজা শ্রেষ্ঠতর।
তথাস্তু বলি তারে মহাশয় কয়
তদবধি নারায়ণ সন্ততি মহাশয়।
লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত রায় চৌধুরী খ্যাতি
কন্যাদানে কুল নাশে কুলের দুর্গতি।

কুসুমাটী মত কুলীন উঠিয়া মাথায়
পদতলে দলিত মানহীন ধরায়।
ভাগীনেয় উপানদ্বহ এই স্পর্দ্ধায়
শ্রেষ্ঠ কুল চূর্ণ করয়ে অবলীলায়।
কুলীনের মাতামহ হয় কুলপতি
কুল ভেঙ্গেও তবু গোষ্ঠীপতির খ্যাতি।
লক্ষ্মীর আরাধ্যা কালী যাহে স্থির৷ মতী
অদূরে বড়িশা তথা করিলা বসতি।
যদবধি কালীঘাটে কালীকার স্থিতি
তদবধি কুলভঙ্গে সাবর্ণের মতী।
কালীঘাট কালীদেবী চৌধুরী সম্পত্তি
হালদার পূজক এইত তার বৃত্তি।

*　　　　*　　　　*

দুর্গার চরণ স্মরি কহে কৃষ্ণ হরি
দ্বিজ শক্তিপুরে পায়ে গুরুপদে তরি।
শাকে সিন্ধু রস রস চন্দ্রক গণিতা
পাটুলীর চাটুতির আদেশে ভণিতা।

সারাবলীর অন্তর্গত মেলমালা

সাবর্ণ চৌধুরীরা আমাট্যার গাঙ্গুলী শিবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। অথচ দেখা গেল তাঁহারা শিবের ভাই জীবের সন্তান। এ কোন রহস্য?

আমাট্যার অন্তর্গত পর্গণা ইন্দ্রানী
শিবের আট হাট, বার শিব সর্ব্বাণী।
শিবের প্রতাপে দানে জ্ঞাতি অতি শুদ্ধ
আত্মজ্ঞানে জ্ঞানীতার আছিল প্রালব্ধ।
ভ্রাতৃগণ স্থান ভ্রষ্ট নব পরিচয়
আমাট্যা কাশীতুল্য শিব সম্পত্তি কয়।
জ্ঞাতির পরিচয় গাঙ্গুলীর আম্যাটে
শিবের দোহাই বিনা আমাট্যা না খাটে।

বেগের গাঙ্গুলী বিনা সবাই আম্যাটে
জীবাপত্য-শিবনামে পরিচয় আঁটে।

এইরূপে বংশজ যত দেয় পরিচয়
প্রখ্যাত নাম যা পূর্ব্বপুরুষের হয়।

মুখকুলে দিবাকর সন্ততি যতেক
কহে রামনৃসিংহ পূর্ব্বপুরুষ বটেক।

তথা বন্দ্যো দাশু, চট্টে রমাই, শ্রীকর
ঘোষালে পশো পরিচয়ে তৎপর।
বাক্যে যথাযথ ফুলে কাটাখণে বলে
আমাট্যা কলিকাতা বন্দ্যেরো আখণ্ডলে।
পঞ্চানন নুলো বলে এত নূতন নহে
বার্হস্পত্য ভারদ্বাজকে ঔতথ্য কহে।
চারিমেলে কন্সাদ গোষ্ঠীপ চতুর্ধূরী
রায় সৌভাগ্য লক্ষ্মীরৈ শব্দ মাধুরী।

পুত্র প্রসব করিয়া প্রসূতীর মৃত্যু হয়। ধর্ম্মপরায়ণ জীব স্ত্রী বিয়োগে এবং শিশুসন্তানের ভাবনায় কাতর হইয়া পড়েন। সম্মুখে অকূল পাথার, কতই ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একটী টিকটিকীর ডিম্ব সম্মুখে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, একটি শিশু তাহা হইতে বাহির হইয়াই সম্মুখে একটী পিপীলিকা দেখিয়া ধরিয়া ভক্ষণ করিল। জীব একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হিতোপদেশের সেই ভুবনমোহন শ্লোকটী এক খণ্ড ভূর্জপত্রে লিখিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলেন

কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতো যেন হংসশ্চ ধবলী কৃতঃ
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি।

এবং দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

পিতৃমাতৃহীন সেই শিশু লক্ষ্মীনারায়ণ আজ পাটুলীর মহাশয়ের যত্নে ও মানসিংহের অনুগ্রহে বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকারী, গোষ্ঠীপতি এবং সমাজে ও রাজদ্বারে মাননীয় এবং ভবানন্দের সহকারী কানুনগু।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সমালোচনা।

স্বয়ং অসুস্থ, সন্তানগণ অসুস্থ, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ একেবারেই সমালোচনা করিতে পারি নাই—নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধেই আজি—দুই চারি কথা বলিতে হইতেছে।

এডুকেশনগেজেট চিরকালই ধীর, স্থির ও গম্ভীর। এমন সময় সময় হয়, যে আন্দোলন আলোড়নে, দুর্ব্বল বাঙ্গালা, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সাময়িক ও সংবাদ পত্র, যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, এডুকেশন গেজেট তখনও কিন্তু টলে না, নড়ে না, সেই গম্ভীর ভাবে আপনার কথা বলিয়া যায়। মহাত্মা ভূদেব বাবুর চরিত্রই এইরূপ ছিল, তাঁহার সেই চরিত্র শক্তির অংশ মাত্র গেজেটে

পরিলক্ষিত হইত। সেই শক্তি তিনি গেজেটের বর্ত্তমান পরিচালকগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এখনও সেইরূপ ধীর স্থির গম্ভীর-ভাবে গেজেট পরিচালিত করিতেছেন। এই গাম্ভীর্য্যের একটু ব্যভিচার দেখিলেই দুই এক কথা বলিতে হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ২য় সংখ্যায় 'বঙ্গীয় সংবাদ পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে, লেখক শ্রীযুক্ত রাজবিহারী দাস এডুকেশন গেজেট সম্বন্ধে, অন্যান্য কথার মধ্যে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেনঃ—"—লেফটেনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের অনুরোধে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর হইতে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তদবধি রাজ-নৈতিক বিষয়ে এই পত্রের কোন স্বাধীনতা নাই।" এই মন্তব্য শ্রাবণ মাসের শেষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতেই এডুকেশন গেজেটে শব্দ সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পরিচয় পূর্ণিমার পাঠককে আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রাবণের পূর্ণিমায় আমরা বলিয়াছিলাম—"যেরূপ জ্ঞান, গবেষণা, চিন্তাশক্তি থাকিলে, বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি সমালোচনায় কথঞ্চিৎ অধিকার হইতে পারে, তাহার কিছুরই পরিচয় পত্র প্রেরক-দ্বয়ের পত্রে পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ আমরা ইঙ্গিত করিয়া ছিলাম, ঐরূপ পত্র প্রকাশে এডুকেশনের চির প্রসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য যেন কিছু নষ্টই হইতেছে। আমাদের ঐ কথাগুলি, ১২ই ভাদ্রের গেজেটে উদ্ধৃত করা হয়—কিন্তু ইঙ্গিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বরং 'হাড়' প্রভৃতি শব্দ যে ইংরাজি Hard প্রভৃতি শব্দ হইতে উৎপন্ন, এমন অসার কথাও পত্রস্থ হইতেছে এবং পরে প্রতিবাদিতও হইতেছে। ভঙ্গি দেখিলে, এমনটাই মনে হয়, যেন এডুকেশন গেজেট পুরাণ ভাণ্ডে একটু নূতন মদ সঞ্চয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র।

এরূপ মনে করিবার আরও কারণ আছে। ঐ ১২ই ভাদ্রের এডুকেশন লিখিতেছেন "এডুকেশন গেজেটকে প্রধানতঃ সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা করিতে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। বিলাতে একাডেমী বা এথিনিয়ম পত্রিকায় সাহিত্যানুরাগী সুজনমাত্র আপনাদের অভাব ইচ্ছা কল্পনা, জল্পনা প্রকাশিত করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, আমাদের এডুকেশন গেজেটকে সাহিত্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করিতে সকলেই সাহায্য করিবেন।" ভাল কথা—তথাস্তু, তাই হোক, সেই ১২ই ভাদ্র হইতেই 'সাহিত্য সংবাদ' আরম্ভ হইল।

৯ই আশ্বিনের গেজেটের "সাহিত্য সংবাদে", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত, সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অভাবের—প্রতিবাদ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার, ভাবভঙ্গিতে পত্রিকা সম্পাদকের এবং প্রধান প্রধান লেখকদের সুদীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে সুতীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইল। গেজেটের এরূপ ভাঙ্গির আমরা যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।

সাহিত্য পরিষদের সহিত এতকাল আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না; এই বর্ত্তমান বর্ষের জন্য আমাকে একজন সহকারী সভাপতি করা হইয়াছে। কিন্তু আমি কোন কার্য্য করি নাই বা একদিনও সাহিত্য পরিষদে যাই নাই। কাগজে কালিতে যে সম্বন্ধ মাত্র। আমি পরিষদ হইতে রাশি রাশি পত্র পাইয়াছি, পাইতেছি. দুই একখানির উত্তর দিয়াছি মাত্র। কিন্তু কেবল সাহিত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে, আমি পত্রিকার পক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য।

গেজেটের ঐ ৯ই আশ্বিনের সাহিত্য সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে— "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ত্রৈমাসিক, তবুও দু একখানি এক সঙ্গে বাহির হইয়াছে। পরিষদের ধনের বা লেখকের অভাব নাই, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু পারদর্শী সম্পাদক তবুও পত্রিকার এত দুর্দশা!"

বর্ত্তমান সম্পাদকের অপরাধ স্খলন—পত্রিকা পূর্ব্বে নিয়মিতরূপে বাহির হয় নাই, নগেন্দ্র বাবু এই বৎসর সম্পাদকের ভার পাইয়াছেন, পাইয়া তিনি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ এক সংখ্যা, ১০ই শ্রাবণ এক সংখ্যা, ২৮শে শ্রাবণ আর এক সংখ্যা এবং ১লা কার্ত্তিক এক সংখ্যা বাহির করিয়াছেন। বাহির করিয়াছেন যে আলাত পালাত পূর্ণ করিয়া তাহা নহে, বিশেষ গবেষণা পূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ এই এক বৎসরের পত্রিকায় আছে। অথচ গেজেটের ঐ সাহিত্য সংবাদে তাহার সকলগুলিতেই ঠোকর মারিবার চেষ্টা আছে। ইহাকেই বলিতেছিলাম—পুরাতন ভাণ্ডে নূতন মদ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা।

বিশেষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কৃত্তিবাসের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কৃত্তিবাস, যে বাঙ্গালার আদিকবি এবং প্রায় পাঁচশত বৎসরের সময়ের লোক, তাহা একরূপ সংস্থাপনই করিয়াছেন—তাঁহার দোষ আছে বটে, তিনি চিরকালই লিখিতে লিখিতে বাঙ্গালার লেখকগণকে গালি দিয়া বসেন, কিন্তু তা বলিয়া, তাঁহার এবারকার মহতী চেষ্টার কি প্রশংসা করিতে হইবে না? না, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে না? যে কেঁড়ে ভরা দুধ দেয়, সে নহে একদিন একটা চাট্ মারিলই, তা বলিয়া কি তাকে গো-বাড়ান্ ঠেঙ্গাইতে হইবে? গেজেটের এ ভঙ্গি ভাল নহে। ইহাতে কেবল গেজেটের চির অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইতেছে, আর ভাণ্ড ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | পৌষ, ১৩০৪ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

দুইটী গীত।

এখন যেমন একদিকে হালিসহর, কোণা, অন্যদিকে বংশবাটী, সাহাগঞ্জ হুগলি রাখিয়া মধ্যভূভাগ অধিকার করিয়া দেবী সুরধনী প্রবাহিত হইতেছেন, তখনও তেমনিছিল—দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপে দেবী সাগর দর্শন উদ্দেশে যাত্রা করিতেন। এখনও যেমন দেবী সমীরণের বিকার তুচ্ছ করিয়া আকাশরূপী অনন্তের সাকাররূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপরাহ্নে সমাধিস্থ হয়েন, তখনও তেমনি হইতেন। এখনও যেমন দলে দলে ভাবুকের দল তটে প্রকট হইয়া আকাশপাতাল ভাবিয়া থাকেন, তখনও তেমনি ছিল। এখনও যেমন পুণ্যসলিলার তটপ্রান্তে শ্মশানের চিতায় অধিষ্ঠান হইয়া দেব বৈশ্বানর মৃতদেহ ভস্মীভূত করিয়া পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া থাকেন, তখনও তেমনি করিতেন। এখনকার ন্যায় তখনও বিয়োগবিধুরার সকরুণ কণ্ঠ-ধ্বনির বিলাপ কাহিনী জনসাধারণ লোকের অন্তস্থল আলোড়িত করিয়া চক্ষে জল আনিত। তখনও গায়কের স্বরলহরী জল ছাড়িয়া স্থল ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে উঠিয়া আকাশ ভাসাইত। সেই সবই আছে।

না! কবির কথা। সবই কি আছে? ঠিক্ কই? তখন যে প্রসন্ন-সলিলা ফৈরাঙ্গের* ধর্ম্মমন্দিরের পুরোভাগস্থ ঘাট—সোপান বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেন? এখন যেখানে বংশ প্রমান গভীর জলরাশি, তখন যে সেখানে হাবুলি সহরের তটে কত শিবমন্দির ছিল এবং পশ্চিম সীমান্তের

*পর্তুগিজদিগের ব্যাণ্ডেল চর্চ্চ।

ভাগীরথীর তট বিদ্যমান ছিল? এখনকার ন্যায় তখন কি লৌহপথে বাষ্পীয় শকট তুরঙ্গম বিকট চীৎকার করিতে করিতে ধাবমান হইত? তখন কি সওদাগরের পণ্য, কি রাজার সৈন্য, তখন কি পথশ্রান্ত পথিক আর কি প্রবাসী বণিক সকলেরই একমাত্র আশাভরসার স্থল ছিল দেবী সুরধনী ও কৈবর্ত্তের তরণী। তখন দেবীর সমাধি যে সহসা অযথারূপে ভঙ্গ হইত? ভাবুকের দল তখন আকাশপাতাল ভাবিত না—আকাশপাতাল যাঁর লীলা সাগরের তরঙ্গমাত্র তাঁহাকে ভাবিত। তখন শ্মশানের শ্মশানত্ব ছিল, এখন তা কই? সে শকুনি গৃধিনী কই, সে শৃগাল কুক্কুরের ভীষণ সংগ্রাম কই, সে অর্দ্ধ দগ্ধ বংশখণ্ড, সে বিচ্ছিন্ন শব শরীর খণ্ড, ভগ্নাভগ্ন মৃৎকলসী, রজ্জু, যবসরাশি, বেদী, বস্ত্র, কন্থা, শয্যা কই, মুদ্দারফরাশের মাদুরের ঘর কই, সে ভৈরবাকার সাধকদল কই?—এখন যে শ্মশানের বুকে রবিশস্যের ক্ষেত্র দেখিতেছি? বিয়োগবিধুরার ক্রন্দন ধ্বনিতে নাস্তিকতার নিরাশা কোথা হইতে আসিল? সাধকের স্বরলহরী জল ছাড়িয়া, স্থল ছাড়িয়া এখনও আকাশে উঠিতেছে বটে কিন্তু সেরূপ দশদিক প্লাবিত করিয়া স্বরলহরী ছুটে কই? হৃদয়ের আবেগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া ভাবে ভোর হইয়া আকাশ ছাপাইয়া অনন্তের চরণোপান্তে পঁহুছিতে আর পারে কই? গ্রামে গ্রামে পদবী প্রাপ্ত হইয়া উদারায় উঠিয়া মুদারা ছাপাইয়া—তারায় মিশিয়া, গুরুগভীর অভ্রভেদী তারা তারা তারা রবে বৃক্ষ লতা গুল্ম, জল, স্থল, বায়ু, আকাশ, মন, প্রাণ, ভাব, দর্শন, শ্রবণ, সমগ্র নিসর্গ অন্তর বাহির বাহ্য অভ্যন্তর, সব তারাময় কই করিয়া তুলে? শব দেহ আছে প্রাণ নাই, সে আব্ হাওয়া নাই—সে সব, সেই সব—তেমনি নাই!

আজি অপরাহ্ণ। ভাগীরথী তটে, সম্মুখে সমাধিমগ্না ভাগীরথী লইয়া আর অবসন্ন সূর্য্য লইয়া, ঐ কে দুই মহা পুরুষ একেবারে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন?—হাঁ দেখিয়াছি একজন দেব রামপ্রসাদ, অন্য জন তাঁহার হৃদয়প্রতিম বন্ধু রাজা রামকৃষ্ণ*। নির্বাত নিষ্কম্প ভাগীরথীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া সহসা স্বরলহরী প্রতিধ্বনিকে ধরিতে ছুটিল। রামপ্রসাদ গান ধরিয়াছেন, রামপ্রসাদ গানের তান ধরিয়াছেন। এমন তারা তারা মা মা শ্যামা মা, শ্যামা মা, কখন কেহ শুনিয়াছ কি?

*রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেব রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন।

(রাগিণী গাড়া-ভৈরবী, তাল আড়া।)

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥
আবির রুধির তায়, কিশোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥

ঐ দেখ কুলবধূর সলিলপূর্ণ ঘট জলেই রহিয়া গেল—আর কক্ষে উঠিল না। ঐ দেখ পুত্রবিয়োগ বিধুরা জননী ক্রন্দন ভুলিয়া জ্বালাময়ী চিতা হইতে দৃষ্টি সংহার করিয়া উন্মনা হইয়া প্রসাদের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ দেখ ধীবরের হাতের জাল হাতে রহিয়া গেল—মৎস্য পলাইতেছে তাহার অনুসন্ধান নাই। ঐ দেখ গাভীগণ শস্প ছিন্ন করিতে করিতে মুখ তুলিয়া কি দেখিতেছে। ঐ শুন পাপিয়ার স্বরলহরী স্থির হইয়া গেল। ঐ শুন নিসর্গ সুন্দরী যেন তানে তান মিশাইতেছেন। ঐ দেখুন ভগবান মরিচীমালী অস্তাচল চূড়ার দিকে আর ঢলিয়া পড়িতেছেন না। আবার ও কি ও?—ঐ দেখুন অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিতা, পতাকা পরিশোভিতা বহু ক্ষেপণী যন্ত্রিতা বিস্ময় বিকাশিনী অদ্ভুত তরণী বংশবাটীর ক্রোড় হইতে তীরবেগে ধাবিতা হইতে হইতে সহসা কি মনে করিয়া, কি ভাবিয়া, কি দেখিয়া, কি শুনিয়া গতিশক্তি রহিতা ও স্থানুবৎ নিশ্চেষ্টা হইয়া গেল! বুঝিয়াছি, মহাশক্তি কি গূঢ় লীলা বিকাশের উদ্দেশে আজ শক্তি হরণ করিয়াছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাধ্য কি যে আর এক ক্ষেপণী মাত্রও অগ্রসর হয়েন? সিরাজের মর্ম্মস্থল আজ নিপীড়িত হইয়াছে; কি যেন তাহাকে দংশন করিয়াছে, মর্ম্মগ্রন্থী যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে; সিরাজের কর্ণকুহর পথে আজ প্রসাদের স্বরে মহাশক্তির শক্তিশেল সিরাজের অন্তকরণকে আঘাত করিয়াছে। যে সিরাজ স্মিত বদনে জীবন্ত লোকের চক্ষু উৎপাটন ক্রিয়া ও ওষ্ঠচ্ছেদন ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিত; গর্ভাচ্ছাদিত চর্ম্মখণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া যে গর্ভবতী রমণীর গর্ভস্থ ভ্রূণের শয়ন-কৌশল পর্য্যা-

বেক্ষণ করিত; আরোহী-তরণী জলে মগ্ন করিয়া যে স্নিগ্ধ হৃদয়ে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শ্রবন করিত—সেই নরপিশাচ সেই মরু-হৃদয়, সেই পাষাণ প্রতিম সেই দগ্ধ-মর্ম্মস্থল সিরাজের মর্ম্মেও আজ কি অদ্ভুত অভূত পূর্ব্ব রসের সঞ্চার হইতেছে? অর্ফিউস্ গান গাহিলে য়ুরোপের ভূমে মহীরুহ ও মহী-ধরের গতিশক্তি হইত—নন্দনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরের বংশীরবে যমুনা উজান বহিত; তানসেন দীপক রাগের আলাপে দগ্ধ হইয়াছিলেন; মীরাবাইয়ের একটি মাত্র সঙ্গীতে মুসলমান আক্‌বর বাদসাহ বৈষ্ণবধর্ম্ম কি বুঝিয়াছিলেন; ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ নিমাই একটি মাত্র সঙ্গীতের সাহায্যে বাদসাহের প্রতি-নিধিকে সদবে পরাজয়ে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন; কমলাকান্তের একটি সঙ্গীতে হত্যাকারী-পথ-দস্যুগণ হত্যা ভুলিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বাটী রাখিয়া গিয়াছিল। সেই সঙ্গীতের বিদ্যার নাম উপবেদ, আর ভরত মুনি সেই সঙ্গীতকে "গানাৎ পরতরো নহি" "জ্ঞানাৎ পরতরো নহি" বলিয়া—জ্ঞানের আসনে বসাইয়াছেন। আর আজ স্বয়ং সেই দেব রামপ্রসাদ সেই সঙ্গীতের আলাপ করিতেছেন যে সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য স্বয়ং জগন্মাতা কৈলাসেশ্বরী কৈলাস ও কৈলাসেশ্বর ছাড়িয়া হাবলীসহরে প্রসাদের বার্ত্তাকুবাগিচার বেড়া বাঁধিয়াছিলেন! হরি, হরি,! লীলাময়ি মা তোমার যে অনন্তলীলা!!

বজ্‌রায় তয়ফা থামিয়া গেল। সুরা-পাত্র-করে বিবসনা সুন্দরীর নাচ থামিয়া গেল। নাচ আর চলিল না, চরণ আর টলিল না, কামের ধ্বজাও আর উড়িল না। সকলে স্তব্ধ অথচ কৌতূহলী।

নিমেষ মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল, নিমেষ মধ্যে বজ্‌রা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র নৌকা তীরবেগে তীরমুখে প্রসাদ অভিমুখে ছুটিল। নিমেষ মধ্যে দেব রাম-প্রসাদ "মা আনন্দময়ীর জয় হোক" বলিয়া কম্পিত কলেবরে রামকৃষ্ণের হাত ধরিয়া নৌকায় উঠিলেন, আবার নৌকা বজ্‌রারদিকে ছুটিল। প্রসাদ অতিশয় ভীত হইয়া মনে মনে দুর্গতি হারিণী দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রসাদের পরিচয় পাইয়া নবাব সাহেব প্রসাদকে গান গাহিতে বলিলেন। প্রসাদ ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে কাতর হইয়াছিলেন, তাই ভাব গোপনের জন্য একদৃষ্টে নবাবের অতি বড় আলবোলা দর্শন করিতে ছিলেন। নবাবের আজ্ঞা মাত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিয়া হিন্দি টপ্পা ধরিলেন। গান শেষ হইল। নবাব কাতর হইয়া বসিয়া ছিলেন।

নবাব আদব কায়দা বেশ জানিতেন। গান শেষ হইলে প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার হিন্দী টপ্পা শুনিবার অভাব নাই। বাঙ্গালা ভাষায় মা মা করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ গান হইতেছিল সেইরূপ গান শুনিতে তিনি অভিলাষী আর তাহাই শুনিবার জন্য প্রসাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

প্রসাদ তখন মহা বিপদে পড়িলেন। এদিকে ম্লেচ্ছ বজ্‌রায় তয়কার আসর ওদিকে সাত্বিকতা ও ইষ্টদেবী, এদিকে নবাব সিরাজউদ্দোলা ওদিকে নিজের ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা; একদিকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রদত্ত নবাবের হুকুম, অন্যদিকে ম্লেচ্ছমন্দিরে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে অসময়ে অস্থানে ইষ্টদেবীর আবাহনে ধ্যান ধারণার অযৌক্তিকতা ও অস্বাভাবিকতা ও ন্যায়-বিরুদ্ধতা। "হুকুম নিশ্চয় মান্য হইবে" এই ভাবে, অথচ, নবাব প্রসাদের মুখে নিশ্চলা দৃষ্টি স্থাপন করিয়া স্বরোদ্গম প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিন্দু দেখা দিল। ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল, পলকে যুগ বহিয়া যাইতেছে, পলকে প্রলয় হইতেছে।

তখন সন্তানের দুর্গতি দেখিয়া দুর্গতিহারিণী আর থাকিতে পারিলেন না, প্রসাদের উষ্ণশ্বাস তখন শতধা বিভক্ত হইয়া সহস্র ভাবে যে মায়ের সিংহাসন টলাইয়াছে—মা যে জানিতেন ধ্যান ধারণায় মূর্ত্তিমতী হইয়া আবির্ভূতা না হইলে তাঁর প্রসাদ আদৌ গাহিতে পারেন না। যে বুড়ী জননী শাল্ববানের মশানে নরপিশাচ নরঘাতীর দলে ত্বরিৎ পদে গমন করিয়া বিশ্বাসবীর বালক শ্রীমন্তকে কোলে করিয়াছিলেন সেই চিন্ময়ী জগজ্জননীই আজ বাৎসল্যে পরিপ্লুতা ও পরিচালিতা হইয়া নবাব সিরাজউদ্দোলার বজ্‌রার বাতায়ন পথে অথচ গঙ্গাবক্ষে সাধক প্রধান রামপ্রসাদের মনের বিকলতা শান্তিকল্পনায় পূর্ণ বিভূতি বিকাশে প্রসাদের নর-নয়নে প্রকট হইলেন, বলিলেন, মাভৈ মাভৈ! নিমেষ—নিমেষ, নিমেষ মধ্যে প্রসাদের বদনে রক্তরাগ ভাসিয়া উঠিল, দিব্য দ্যুতি খেলিতে লাগিল। প্রসাদ শান্তি-ময় হাস্যে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া, দুই করতলে প্রেমাশ্রু মুছিয়া গান ধরিলেন। সঙ্গীত জগতে আর একটি সত্যলোক সৃষ্টি হইল।

[রাগিণী কালেংড়া তাল ঠুংরি]

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব নীল জলধর কায় হায় হায়,
কেরে, হর হৃদি হ্রদ পদে দিগবাসে॥

কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ॥
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে হিল্লোলে ভাসে ॥
কেরে, নিন্দিত রাম কদলীতরু,
হেরি উরু দরদর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষ বলে,
ভুজঙ্গমদলে, নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে,
দংশিল এসে।
কেরে, উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকশিত সিতাম্বুজ বনরুহায়
কিবা ওষ্ঠশোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনলোভা
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে ॥—
(মাভৈ মাভৈ) ॥
কেরে কুন্তল জাল আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁতি মুহু দোলে,
কি চকোর খেলে, যেন অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুন্ধবা ডুন্ধবী নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হি হি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায়।
অমনি রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষে ॥

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর ইতিহাস।

"বাঙ্গালার" ইতিহাস নহে, বাঙ্গালাদেশনিবাসী "বিভিন্ন জাতির"ও ইতিহাস নহে—বাঙ্গালার "খাঁটি বাঙ্গালীর" ইতিহাস। "খাঁটিবাঙ্গালী" কাহারা, এ কূট ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়; যদি এ নামে কাহারও আপত্তি হয় তাহা হইলে ইহার পরিবর্ত্তে "বর্ত্তমান হিন্দু বাঙ্গালী" আখ্যা ব্যবহার করিতে পারেন। ফলতঃ, এই যে আমরা আধুনিক বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্যাদি হিন্দুগণ, আমাদের ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ইতিহাসের বড়ই অসদ্ভাব ও আবশ্যক হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে যে সব ইতিহাস পঠিত হয় সে গুলি নানা কারণে অসন্তোষ-কর। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এখনকার ইতিহাসে বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস কতকটা ভালরূপ জানা যায় বটে, কিন্তু এই প্রাচীন ও বৃহৎ জাতির প্রকৃত ও পূর্ণ ইতিহাস অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই, সুতরাং পঠিত হওয়া ত দূরের কথা। এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে আছেন যাঁহারা স্বজাতিকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য হইলেও কথাটি প্রকৃত। আমি "সাহেব" বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না; আমি যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, যথার্থই স্বদেশের হিতকামী, স্বয়ং তাঁহারা দেশীয়ভাবে থাকেন,—অথচ তাঁহারা স্বজাতিকে ঘৃণা করেন! সহসা এ শ্রেণীর লোককে দোষ দিবেন না। ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বজাতিদ্রোহী নহেন, নীচাশয় স্বার্থপর নহেন; ইহাদের যেমন শিক্ষা, তেমনি ধারণা। ইতিহাসের আদ্যোপান্ত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ইহারা বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের পরিচয় কোথাও পান নাই, সুতরাঃ স্বজাতি হইলেও বাঙ্গালীকে বীরোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি করিয়া? ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় ইহারা বাঙ্গালীয় কার্য্যকুশলতার নিদর্শন পান নাই, সুতরাং বাঙ্গালী কার্য্যকুশল জাতি এ ধারণা হইবে কোথা হইতে? এমন এক সময় ছিল যখন আমরাও মনে করিতাম "বাঙ্গালী আবার জাতি, তাহাদের আবার ইতিহাস!" কিন্তু এখন সে ভ্রম ক্রমেই ঘুচিতেছে; এখন মনে হয় আমরাও এক সময় মান্য জাতি ছিলাম, অন্ততঃ নিতান্তই হেয় ছিলাম না। কিন্তু কেবল মাত্র এই ধারণায় জাতীয় অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না।

"অতীতের অতীত কথায় লাভ কি?" আছে বৈকি। ক্ষতিও আছে স্বীকার করি; কিন্তু লাভই বেশী। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া যখন আমরা বর্ত্তমানের অধঃপতন বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করি তখন অতীতে অনিষ্ট ব্যতীত আর কি বলিব? "আমাদের এক সময় এইরূপ ছিল" ইহা অধঃপতিত, উদ্যম বিহীন, নিরাশ হৃদয়ের সান্ত্বনাবাক্য; ইহা উদ্যোগী পুরুষসিংহের কথা নয়। সুতরাং দেশের জন্য কাতর প্রাণ মহানুভবদের মধ্যে যথার্থই এমন লোক আছেন যাঁহারা সরলান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে অতীতটা একবারে বিস্মৃত হইলেই দেশের মঙ্গল হয়। কিন্তু যে সমুদ্রে গরল তাহাই ত আবার অমৃতের আধার। বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই, যেখানে একজন অতীতের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান অধঃপতনে নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতেছে, সেখানে দশজন পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করিয়া কাতরপ্রাণে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। ইচ্ছাই যদি কার্য্যের সোপান হয়, তাহা হইলে কাতর হৃদয়ের এই ঐকান্তিকী ইচ্ছার কি কার্য্য-কারিকা শক্তি নাই? অবশ্যই আছে। শুদ্ধ "আছে" কেন, এই শক্তি বড়ই তেজস্বিনী। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন দেখিবেন কত মহাপরাক্রান্ত অরি ইহার ভয়ে বিজিত, পদদলিত জাতির যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতির বিষয়গুলি সমূলে নষ্ট করিয়াছে, এমনকি তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে!

যে পূর্ব্বস্মৃতির এত শক্তি বাঙ্গালীর সেই স্মৃতিময় ইতিহাসের বড়ই অভাব। কিন্তু ইতিহাসের কেবল অস্তিত্বাভাব হইলেও তত ক্ষতি ছিল না; আমাদের অদৃষ্টদোষে বিকৃত ইতিহাস এই অধঃপতিত জাতির স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম সমস্তই নষ্ট করিতেছে! অতীতের তমোময়ী সেই কল্পিতা মূর্ত্তি দুর্ব্বল হৃদয়ের বল হরণ করিতেছে; ক্ষীণ আশাকে নিরাশাসাগরে ডুবাইয়া দিতেছে; স্বাবলম্বন, আত্মসম্মানের মূলোচ্ছেদ করিতেছে। যে চিত্রে বাঙ্গালী-জীবন বিদেশীর হস্তে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে কি হৃদয়ে আত্মনির্ভরতা সঞ্চারিত হইতে পারে? "চিরপদদলিত, দুর্ব্বল, মিথ্যাবাদী বাঙ্গালী"—ইহাই কি হৃদয়োন্মাদিনী চিন্তা? অতীতের এই স্মৃতিই কি নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবে? নিরুদ্যমকে উদ্যমশীল করিবে?

যদি বুঝিতাম যে ইহাই অবিকল চিত্র তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তাহা ত নয়। কথিত আছে ক্রম্‌ওয়েল্ একবার নিজের জনৈক চিত্রকরকে বলিয়াছিলেন "Paint me as I *am*" (আমি যেরূপ আমার চিত্রও ঠিক সেইরূপ হউক)। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংলণ্ডেশ্বরের কুৎসিত মুখের ছবি যথাযথ চিত্রিত করিতে ভয়বিহ্বল চিত্রকর সাহসী হয় নাই, কিন্তু কি ভয়ে স্বাধীনচেতা বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এই নিরাশ্রয় জাতির সুন্দর ছবিকে বিকৃত করিলেন? যে দোষে একটী বিশাল জাতির উন্নতিপথ সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে সে দোষের স্খালন কিসে হইবে?

কিন্তু দোষী কি শুধু বিদেশী? স্বদেশবাসীও যে এ পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাপের গতি রুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন না। অনেকেই বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে সক্ষম; ইঁহাদের লিখিবার প্রবৃত্তি আছে, লেখনীর শক্তি আছে; ইঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আছে, উদ্যম আছে; ইঁহারা যদি দেশের কাজ ফেলিয়া বিদেশের কাজে ব্যস্ত হন তাহা হইলে কি বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন দেখি? দেশ মান্য দত্তজ মহাশয় ইতিহাসক্ষেত্রে যে যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বয়ং যশস্বী হইয়া স্বদেশবাসীকেও যশস্বী করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতের ভাবনা ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের ভাবনাটি ভাবিলে কি, তাঁহার না হউক্ তাঁহার হতভাগ্য দেশবাসীর অনেক অধিক উপকার হইত না? স্বয়ং দত্তজ মহাশয়ই কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহার ইতিহাসে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকটিত হইয়াছে তদপেক্ষা তাহাদের বিষয়ে অধিক কিছু জানিবার বা জানাইবার নাই? "ছত্রপতি শিবজী"র সুলেখক সকলেরই সম্মানের পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার "প্রতাপাদিত্য" আমাদের যেমন আদরের সামগ্রী "শিবজী"ও কি সেইরূপ?

পাঠক, সঙ্কীর্ণচিত্ততার বিভীষিকা দেখিবেন না। অপরের সামগ্রীকে মন্দ বলিতেছি না, তাহাকে তুচ্ছও করিতেছি না; কিন্তু সংসারীর পক্ষে পরার্থে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগটা যেন কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। নীতিক্ষেত্রে "স্ব" শব্দের সীমা কোথায় জানি না, তবে ইহা বেশ জানি যে স্বদেশের অভাব আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পরের দেশের জন্য ভাবনা ভাল দেখায় না।

আজ আমরা ভাগ্য দোষে এই হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছি, কিন্তু স্বজাতির যোগ্যতায় আমার অটল বিশ্বাস আছে। যতদূর পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী কোথায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে? কোন্ বিষয়ে এই "হেয় ঘৃণিত" জাতি পশ্চাৎপদ? সমাজের কোন্ কক্ষ এই বাঙ্গালী উজ্জ্বলিত করে নাই? রাজনীতি বলুন, সমাজনীতি বলুন, ধর্ম্মনীতি বলুন, সাহিত্য বলুন, বিজ্ঞান বলুন,—এ সংসারে এমন কি আছে যাহা বাঙ্গালীর আয়ত্তাধীন নহে? শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এমন কে আছেন যিনি উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ একটী আধুনিক বাঙ্গালীরও সংশ্রবের বিষয় অবগত নহেন? অবশ্য এ কথা বলি না যে প্রত্যেক বিষয়ে বাঙ্গালী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন, বা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন; আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে বাঙ্গালীর প্রত্যেক বিষয়ে যোগ্যতা আছে কি না। যদি থাকে তাহা হইলে উহাতে মনোনিবেশ করিলে ঐ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে বাঙ্গালী না পারিবে কেন?

এই যোগ্যতা বাঙ্গালীর আধুনিক উপার্জ্জিত শক্তি, কি ইহা পৈত্রিক সম্পত্তি? ঐতিহাসিক, এই প্রশ্নের মীমাংসক আপনি, এবং এই বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন হেতুই আপনাকে দোষ দিতেছি। একবার, পুরাতত্ত্বজ্ঞ, আপনি দেশবিদেশের চিন্তা ছাড়িয়া স্বদেশের চিন্তায় মগ্ন হউন, নানা জাতির ভাবনা না ভাবিয়া দিন কতক কেবল স্বজাতির ভাবনাই ভাবুন। আপনার স্বদেশ ও স্বজাতি বড়ই দুর্দ্দশাপন্ন, আপনার অন্যমনস্ক হইবার অবসর কোথায়? শিবজীর লোক-বিমোহিনী কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া আপনার যে সময় ও উদ্যম ব্যয়িত হইয়াছে তাহাতে স্বজাতির কত প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় দিয়া স্বদেশবাসীর হৃদয়ে বিপুল আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিতেন! সিপাহীযুদ্ধের অশেষ কথা কহিতে গিয়া যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালীর কত আবশ্যকীয় কথাই কহিতে পারিতেন, বাঙ্গালী-জীবনের কত রহস্যই উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেন। বাঙ্গালীর উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া নিজের কি কীর্ত্তিই রাখিয়া যাইতে পারিতেন!

এখনও সময় আছে। বিলম্বে কার্য্যহানি হইয়াছে বটে, কিন্তু আদৌ কোন কার্য্য না হওয়া অপেক্ষা উহা বিলম্বে কথঞ্চিৎ হওয়াও ভাল। স্বদেশের

কৃতীলেখকগণ, আপনারা একবার প্রকৃত কার্য্যে মনোযোগী হউন। বাঙ্গালীর প্রাচীন ও প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া দেখান যে এই অধঃপতিত জাতির চিরকালই এই অবস্থা ছিল না; দেখান যে এক সময় ইহাদের মধ্যেও বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহারাও এক সময় স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া উহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইত, ইহাদেরও এক সময় স্বদেশ-ভক্তি ছিল, ইহাদেরও এক সময় হৃদয়ে সাহস ও বাহুতে বল ছিল; দেখান যে ইহারাও এক সময় ব্যবসায় বাণিজ্য বুঝিত, ইহারাই এক সময় চাকুরীকে "শ্ব-বৃত্তি" বলিত,—দেখাইয়া অন্তরে আশার সঞ্চার করুন, আত্ম-সম্মানের বীজ ছড়াইয়া দিউন, স্বাবলম্বনের বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত করুন, জাতীয় উন্নতির ফললাভের ব্যবস্থা করুন। এখন আমরা যেদিকে নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই ঘোর অন্ধকার, সেই দিকেই অন্ধকারের মধ্য হইতে ব্যঙ্গশ্লেষের অট্টহাসি উচ্চরোলে হৃদয়কে স্তম্ভিত ও দমিত করে; কোন দিকেই আশার ক্ষীণালোকও দৃষ্টিগোচর হয় না! নিরাশায় চিত্ত বিকল হয়, হৃদয় স্ফূর্ত্তি ও বলবিহীন হইয়া পড়ে! ভগবন্, রক্ষা কর!

শ্রীকালীপদ সরকার।

মৃত্যুর পর।

(১৩)

ঘোরতর তপস্যা করিয়া তপস্যার ফলে ভার্গব কিরূপে দেবের দেব মহাদেবের—মহাকালের প্রসাদে অসুরদিগের গুরুপদে অভিষিক্ত তথা শুক্রলোক প্রাপ্ত হয়েন তাহা প্রসঙ্গত উল্লেখ হইয়াছে। এ তপস্যা—সাময়িক একটি প্রসঙ্গ যোগবাশিষ্ট রামায়ণ হইতে অবতারণও করিয়াছি। তাহাতে অনেক কথা খুলিয়া গিয়াছে এবং পরকায়া প্রবেশের জটিলতাও অনেকটা সুখবোধ্য ও সুগম হইয়াছে বলিয়া বোধ করি। স্বর্গ ভোগের বিবরণ থাকায় স্বর্গ বর্ণণের পরই তাহা উপস্থাপিত করিয়াছি এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মালোচনাকারী বৈদেশিকের মনে কি হয় তাহা দেখাইতেছি।

বিদুষী বীবী বিশান্তা (Aunie-Besant) বিলাত-বাসিনী, ফৈরাঙ্গ-অঙ্গনা। সাধের নাস্তিকতা ছাড়িয়া "থিওজফী" অবলম্বন করিয়াছেন, সাহিত্য-সেবায় সংস্কৃত আসন পাইয়াছে, পাশ্চাত্য সামাজিকতা ছাড়িয়া

প্রাচ্য সাধন স্বাতন্ত্র্য সেবা করিতেছেন এবং জ্ঞানলিপ্সা লালসায় পরিণত হওয়ায় সদ্‌গুরু সাহায্যে সাধন পথে শনৈ শনৈ অগ্রসর হইতেছেন। তিনি এখন ব্রহ্মচারিণী, তিনি এখন যোগিনী সম্ভবত তিনি এক্ষণে খেচরী সিদ্ধা*। তিনি পাশ্চাত্য জড়দেশের জড়বিদ্‌গণকে, তমো ও রজোগুণান্বিত ব্যক্তি-গণকে সাত্বিকতা ও স্বর্গ নরক কি বুঝাইবার জন্য ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাসের "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী" নামক মাসিক পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব। উদ্দেশ্য, দেখাইব—বৈদেশিকের মনে কি হয়। বিদেশীর মুখে না শুনিলে ত আমাদের শাস্ত্রের গৌরব বুঝা যায় না? দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাই আজ বিশান্তার প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠক মহাশয়ের যদি না ভাল লাগে তবে নবেল মনে করিয়াও পাঠ করিবেন। আমি ভাবে বিশান্তার প্রবন্ধ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিব তবে নিজের দুকথা বলিবার সুযোগ পাইলে তাও ছাড়িব না।

বিশান্তা, যাঁহারা পরকালগত জীবন বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১ম যাঁহারা দলিলের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বিশ্বাস করেন। এই সমস্ত বহু পুরাতন দলিল বা গ্রন্থে যাঁহারা স্বয়ং পরলোক দেখিয়াছেন বা তাহার বিষয় নিজ জ্ঞানে জানেন তাঁহাদের ও তাঁহাদের শিষ্যগণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। যে কোন ধর্ম্মের লোক হোন না কেন, যিনি সাধু, সন্ন্যাসী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কথার উপর নির্ভর করিয়া পরকালে বিশ্বাস করেন তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

২য় যাঁহারা পরলোকবাসীর কথা বিশ্বাস করিয়া এই কথা বিশ্বাস করেন। "স্পিরিচুয়ালিষ্ট" এই শ্রেণীতে। যাঁহারা ঈশ্বরবাক্য, দেবদূতের বা শুদ্ধাত্মার বা প্রেতাত্মার কথা মানেন।

৩য় যাঁহারা স্বয়ং পরলোক দেখিয়াছেন। না মরিয়াও পরলোকে গমন করিয়াছেন। যোগীরা। যাঁহারা ঐরূপ ব্যক্তি বা যোগীদের কথায় বিশ্বাস করেন ও নিজেও অনেকটা প্রমান পাইয়াছেন (স্থূলত যোগী ও তস্য শিষ্য)।

*"মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনং, বায়ুঃ স্থিরো যত্র বিনাবরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যত্র বিনাবলোকনং, সা এব মুদ্রা কথিতা তু খেচরী॥"

এই গেল ৩ শ্রেণী। বিশান্তার প্রবন্ধ কিন্তু কেবল তৃতীয়শ্রেণী লইয়া। কথা বলিবার অগ্রে ২য় ও ৩য় শ্রেণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল গোটাকত কথা ভূমিকাভাবে বলিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—

সকল ধর্ম্মেই মৃত্যুর পর মনুষ্যের জীবন মানেন। তর্ক এখানে নয়। মৃত্যুর পর কি কি অবস্থায় আত্মা পতিত হইবে এবং কত দিন ধরিয়া ঐ অবস্থা থাকিবে তাহা লইয়াই তর্ক ও ভেদ। মৃত্যুর পর একটা অবস্থান্তর প্রায় সকলেই মানেন এবং স্থূলত এটাও মানেন যে কতকটা দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সেই যন্ত্রণাভোগ অবসানে আত্মা সংস্কৃত ও পবিত্র হয়। অধিকাংশ লোক বলেন, পরের এই সুখের অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হইলেও চিরস্থায়ী নহে এবং ঐ অবস্থার শেষে আত্মাকে আবার পৃথিবীতে জন্ম লইতে হয়। আত্মার ক্রমোন্নতির জন্য পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হয় ও আত্মা ক্রমেই উন্নতির পথে ধাবিত হয়। অল্পাংশ আর এক দল লোক বলেন যে মানুষ একবার মাত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তারপর পৃথিবীতে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন তদনুসারে মৃত্যুর পর হয় চির সুখ না হয় চির দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন। এই দুইটী প্রধান দলের স্থূলত এই কথা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন পরলোকে আত্মার কেবল ক্রমোন্নতি হয় আবার কেহ বলেন পরলোকে দেবসদৃশ ভাব পাইয়া আত্মা স্থির তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনই করিয়া থাকেন।

মৃত্যুর পরের প্রকৃত অবস্থা লইয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়গণের মধ্যে যতই কেন বিবাদ থাকুক না, সুবিচারক ব্যক্তি ইহা স্পষ্টই বুঝিতেছেন "মানুষের যে সব মরে না" তাহাতে সকলেরই এক মত। দেখা যাইতেছে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাদের হেতু কেবল "নিজের সম্প্রদায়টি ভাল অপরটি কিছু নহে, আমাদের স্বর্গ ভাল—উহাদের স্বর্গ কিছু নহে" এইরূপ আত্ম- সম্প্রদায়ের উপর টান। কলহকারীগণের জানা উচিৎ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ভগবানের কৃপা আছে সকল জাতিরই মধ্যে স্বর্গবিহারী লোক আছে। কিন্তু "মৃত্যুর পর মানুষের কিছু থাকিবে" এই মত বাদীগণের ঐক্যমতের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। তাহার কারণ, এই যে হৃদয় বিহারী আত্মা স্বয়ং সকলের হৃদয়ে থাকিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিতেছেন যে 'শরীরের স্থিতিকাল মানুষের জীবন নহে এবং আত্মার মহানুভবতার ও সদ্‌গুণের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই।' এ মত বাদীরা

আরো বিশ্বাস করেন যে পুরাকালে মানুষ পরলোক রহস্য জ্ঞাত ছিলেন ও পরলোক দেখিয়া আসিয়া পরে তদ্‌বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২য় শ্রেণীর লোকেরা বা স্পিরিচুয়ালিষ্টরা মৃত্যুর পর জীবন মানেন বটে কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তাহাদেরও বিস্তর মতভেদ আছে। "আত্মারা" পরলোকের যে সকল বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর সহিত বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। পৃথিবীর প্রতিরূপ চিত্র এখানে আছে। পৃথিবীর জড়ত্ব সেখানে আছে—সেখানে আবার আছে সূক্ষ্মত্ব; বায়ুর ন্যায় ইচ্ছা-গমনকারী ইথরের ন্যায় সূক্ষ্ম ধর্ম্মাবলম্বী আত্মারা আছেন। আর পৃথিবীর যখন ৫টা জিনিষ পাঁচ রকমের তখন স্বর্গেও সেইরূপ হওয়াই ত যুক্তিসিদ্ধ। স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ পরলোকের যেরূপ বিবরণ দেন তাহা অবিশ্বাস্য বা প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা কখন কাহারও প্রকাশ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা নানা কারণে হইয়াছে, সে সমস্ত বাদ দিলেও কতকটা শেষে এমন অবস্থা থাকে যে সে টুকু আর এড়াইবার উপায় নাই। যত সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক হৌন না কেন সে টুকুকে স্বীকার করিতেই হইবে।

এখন আমরা তৃতীয় শ্রেণীর কথা বলিব। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মেস্‌মেরিজম্‌ ও হিপনটিস্‌ম্‌ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া এই বুঝিয়াছেন যে সচরাচর মনুষ্যের যে চৈতন্য-শক্তি দেখা যায় তাহা অপেক্ষা মনুষ্যের আর একটি গুরুগভীর চৈতন্য-শক্তি আছে। গভীর হিপনটিক নিদ্রায় তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের মস্তিষ্কের যেরূপ সচরাচর ধারণা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে তাহার আধার-স্থান হয় না। গুহ্য আত্মবিদ্যা বিশারদ ব্যক্তিরা এবং যোগীরা চিরকালই কিন্তু এই "চৈতন্য-শক্তি"র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ও ইহার উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। যোগীরা এই চৈতন্য-শক্তিকেই প্রকৃত মনুষ্য বলেন। আরো বলেন সকল মনুষ্যের মধ্যেই এই শক্তি আছে এবং ক্রম-বিকাশ ক্রমে গুহ্য বা বিকাশ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও বা এই শক্তি জড়ত্বে আচ্ছন্ন কাহারও বা জড়ত্বের অল্পই আছে, কাহারও বা সূক্ষ্মত্বে পরিণত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যের আত্মা-শক্তি বা আত্মা। ধার্ম্মিক বা স্পিরিচুয়ালিষ্ট বা যোগী সকলেই স্বীকার করেন যে মৃত্যুকালে মানুষের আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। স্পিরিচুয়ালিষ্ট বলেন যে সেইরূপ মিডিয়মের (যাহার দেহে

মেস্‌মেরিজম্‌ বা হিপনিটিজিমের কার্য্য বা আবেশ হয়) আত্মা কিয়ৎ কালের জন্য দেহ ছাড়িয়া থাকে ও দেহ-আকাশে অপর একটী আত্মা তাহার দেহে শাসন বা কার্য্য করে। যোগীরা বলেন যে মানুষের আত্মা যোগ বলে ইচ্ছা-ক্রমে দেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে এবং ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই দেহে প্রবেশ করিতে পারে। দেহ ছাড়িয়া বিচরণ কালে আত্মা যাহা দেখে ও শুনে দেহ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাহা ভুলিয়া যায় না।

মানুষের আত্মার আবার শরীর আছে এত সূক্ষ্ম যে জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না, সে দেহ "সেণ্টপলের"* সূক্ষ্ম দেহের মত। এইরূপ আত্মার আবার আরও দুইটী স্থূলতর (তথাচ সূক্ষ্ম) আবরণ আছে। জড় দেহ ত্যাগ করিয়া এই আবরণ দেহের বা কোষের সাহায্যে আত্মা সকল কার্য্যই করিতে পারে—জড় দেহ থাকিতে যাহা করিতে পারিত না, এই দেহে তাহাও করিতে পারে। আত্মার সকল গুণ ও শক্তি বিদ্যমান থাকে। দেহ ছাড়িয়া যখন আত্মা বাহির হয় তখন জড়দেহ নিদ্রাবস্থার ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং আত্মা তখন, মৃত্যুর দ্বার দিয়া যে রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয় সেই রাজ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে এবং মস্তিষ্কের সকল কার্য্যই করিতে পারে। অবশ্য অভ্যাসে সকল কার্য্যই ভাল ও পরিষ্কার হয়। দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া অত্যন্ত আয়াস সাধ্য হইলেও ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে ও অভিজ্ঞতায় সহজ হইয়া আসে। কোন্‌ শাস্ত্রে রাতারাতি বিদ্বান হওয়া যায়? কি জড়বিদ্যা কি সূক্ষ্মবিদ্যা, কোন বিদ্যারই দেশে যাইতে রাজপথ নাই।

পরলোকের দর্শক হইল তবে কে?—না, মনুষ্য শরীরের এই আত্মাই। কি সাহায্যে দর্শন করিতে সক্ষম?—জড়দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ সাহায্যে পরলোক দর্শন করিতে সক্ষম। তবে কি দেহ ত্যাগ না করিয়া পরলোক দর্শন করিবার আর কোন উপায় নাই?—আছে।—যখন দেহ ছাড়িয়া গিয়া দর্শন করা একান্ত অভ্যস্ত হইয়া যাইবে তখন এই পৃথিবীতে এই জড়দেহ লইয়া বসিয়া থাকিয়াই, জাগ্রত থাকিয়াই পরলোকের কার্য্যকলাপ দর্শন করা যাইতে পারে। দুই তিন কৃতীব্যক্তি এইরূপে একত্রে বসিয়া আপনাদের দৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে মত প্রকাশে কথোপকথন ও তুলনায় সমালোচনা করিতে পারেন।

*খৃষ্টিয়ানদিগের একজন ঋষি।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে এই সমস্ত কার্য্য পুরাকালের সাধুসজ্জনগণ, মুনিঋষিগণ, ভবিষ্যদ্বক্তাগণ করিতে পারিতেন। এখনকার কোনও মানুষ এরূপ করিতে পারে ইহা তাঁহারা কোন ক্রমে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কোনও কালে যদি কোন মানুষ কখনও এই কার্য্য করিয়া থাকে তবে এখনকার মানুষের পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব কিরূপে বলা যাইতে পারে? মানুষে যাহা করিয়াছে মানুষে তাহা করিবে। তবে এক্ষণে কোন মানুষ এরূপ করিতে পারে কি না—করিতেছে কি না, তাহা ত প্রমানের কথা। সে প্রমান পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা ত সকলেরই আছে। এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কেহ স্বয়ং সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার দর্শনের ফল অপর ব্যক্তির ঐরূপ দর্শনের ফলের সহিত তুলনায় সমালোচন করিতে পারেন কি না? তাহা হইলে ত মৃত্যুর পর জীবন আছে কি না তাহার বৃত্তান্ত লোকে অপরের সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই জানিতে পারিবেন। অপর যে কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনকারীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তর যাহা হইবে, এ কথার—এ বিজ্ঞানের উত্তর ঠিক তাহাই। অর্থাৎ উত্তর এই, "হাঁ, স্বয়ংই বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, তবে যথেষ্ট সময় চাই, যথেষ্ট অধ্যবসায় চাই, যথেষ্ট শক্তি চাই, ধারণা চাই।"

অপর একটি বিজ্ঞানানুশীলনে বিশেষত্ব লাভ করিতে যাহা যাহা চাই, আত্মার গুহ্য বিজ্ঞান জানিতে সেই সেই বিষয় তাহা অপেক্ষা গুরুতররূপে চাই ও তাহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক আয়াস-সাধ্য। যেমন উত্তর মেরুতে নৌ-যাত্রা করিবার সকলেরই ঔপপত্তিকী অধিকার আছে কিন্তু কার্য্যত বড় কঠিন, সেইরূপ আত্মার তত্ত্ব অবগত হইয়া দেহ ছাড়িয়া পরলোকে বিচরণ করিবার অধিকার সকলেরই আছে বটে কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিতে গেলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা নিতান্ত আয়াস-সাধ্য ও অতি অল্পমাত্র লোকের পক্ষে সম্ভব। যখন বিবর্ত্তন বিকাসে ক্রমোন্নতি সহকারে মানবের অন্তর্নিহিত গুহ্য বৃত্তি নিচয়ের সুন্দর ও যথেষ্টরূপে স্বাভাবিক প্রকাশ হইবে তখন—সেই দিনে—সকলের পক্ষেই এই কার্য্য সুগম হইবে কিন্তু সে দিনের দিন—বহুদূর—বহুদূর।

সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচার ছাড়িয়া দিয়া এখন কি করিলে মানুষ দেহ ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন, স্বীয় দেহ হইতে স্বকীয় আত্মাকে বিচ্ছিন্ন

করিয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ হইতে পারেন তাহার স্থূল গোটাকত কথা এই-খানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না বোধ হয়।

যিনি এই কার্য্য কবিতে অগ্রসর তাঁহাকে সকল বিষয়েই অতিশয় শান্ত ভাব ও সামঞ্জস্য অবলম্বন করিতে হইবে, বাড়াবাড়ির দিকে কিছুতেই যাই-বার যো নাই। অধিকও আহার নয় অল্পও আহার নয় সামঞ্জস্য ও সমান ভাবে আহার বিহারাদি করিতে হইবে। মনের অবস্থা হইবে সহিষ্ণু ও শান্ত ও দুশ্চিন্তাশূন্য। তাঁহার জীবন সততায় লোকের আদর্শ স্থানীয় হইবে তাহার চিন্তা সুচিন্তা ও পবিত্র হইবে তাহাতে কিছুমাত্র নোংরামি থাকিবে না। তাঁহার শরীব হইবে আত্মার কঠিন শাসনের অধীন তাঁহার মন হইবে উচ্চ, পবিত্র ও সদাশয়। তিনি নিজেব কষ্ট কি নিজের সুখ তুচ্ছ করিবেন কিন্তু তিনি হইবেন দয়ালু, দাতা ও হৃদয়বান্ ও অপরের জন্য মমতায় তাঁহার হৃদয় কাঁদিবে, অপরের চক্ষের জলে তাঁহাব অশ্রুপাত হইবে। তাঁহার সাহস চাই, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, মনঃসংযোগ ও ভক্তি চাই। এক কথায়, লোকে অপরকে, ধার্ম্মিক সাধু করিবার জন্য যেগুলি কেবল মুখে উপদেশ দিয়া থাকেন নিজে কখনও করিতে পারেন না, সেইগুলি কার্য্যত করিয়া সাধু বনিতে হইবে। মনঃসংযোগ শিক্ষা করিয়া, মনঃসংযোগে উপাসনা ধ্যান ধারণা শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রতিদিন একাগ্রতা সহকারে অনন্য মনে কোন উচ্চ নীতি-তত্ত্বের কি ভক্তি-তত্ত্বের কথা ধ্যান করিতে হইবে, দেখিও মন যেন দোলে না, যেন হাটবাজার করে না, আপিসের সাহেবের মুখ যেন মনে না পড়ে, চুরি করিয়া মন রাম ভাবিতে যেন শ্যাম ভাবে না। এই সময়ে কোন ইন্দ্রিয়ের বা মনের তোমার উপর যেন কিছুমাত্র জোর বা শাসন থাকে না। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীবে তুমি বাহ্য জগতের জ্ঞান বুদ্ধি হারাইবে কেবল তোমার চৈতন্য জাগরিত থাকিবে এবং ক্রমে সেই চৈতন্য উচ্চতম পদে উন্নীত হইবে। তখন শান্তভাবে অথচ দৃঢ়রূপে কেবলমাত্র দুর্জ্জয় ইচ্ছার বলে উচ্চতম চৈতন্য হইতে আরও উচুঁতে উঠিতে প্রয়াসী হইলে দেখিবে যে এই দেখিতে দেখিতে তুমি দেহ-যুক্ত মানব মস্তিষ্কের অধিকার ছাড়াইয়া উঠিতেছ—এই উঠিলে ত—কোথায় আসিলে? এই, এইবার, এইবার তুমি তোমার দেহ-চৈতন্য, মস্তিষ্ক-চৈতন্য ছাড়াইয়া তুমি এক অপূর্ব্ব

চৈতন্য-শক্তিতে মিলিয়া যাইতেছে, তুমি এখন সেই মহান্ জগচ্চৈতন্যে লীন হইয়াছ! আর? আর তোমার আত্মা তোমার দেহ ছাড়িয়া বিশ্বরাজের এক অপূর্ব্ব প্রেমময়রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হরি হরি! পাঠক পাঠিকা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না? পাঠিকার আবার যে অতি শীঘ্র হয়, উনি যে মহাশক্তির শক্তি। যাক্।

ভাবিয়া দেখ এ তোমার স্বপ্ন নহে, এ তোমার নিদ্রা নহে, তোমার শরীরের ভার আর কিছুমাত্র নাই, তোমার ভারী জড় দেহ জড় হইয়া পড়িয়া আছে, তুমি এখন হাওয়া—হাওয়ার জীব, তুমি এখন আলো, তুমি এখন আলোর জীব। তুমি হাওয়ারও বট, আলোরও বট, তোমার বাষ্পীয় ইথরীয় সূক্ষ্মদেহ তোমার কথা শুনিবে। কথা কহিতে হইবে না কেবল মনে মাত্র, যেমন মনে করিবে অমনি তোমার সূক্ষ্ম দেহ হুকুম তামিল করিবে যা বলিবে তাই শুনিবে, যা বলিবে তাই করিবে। বিঘ্ন নাই বাধা নাই, রোধ নাই অবরোধ নাই। কি মজা, তোমার মৃত্যু হইয়াছে! একবার বল না হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে। বল না তারা ব্রহ্মময়ী। শুধু ব্রহ্ম বলিবে তাই বল। ক্ষতি নাই।

দেহ ছাড়িয়া বাহির হইবার আরও উপায় আছে। ভক্তি আতিশয্যে বা গুরুদীক্ষিত ও শিক্ষিত বিশিষ্ট প্রথাবলম্বনে। পথ ও উপায় নানা থাকুক্, উদ্দেশ্য একই। পরলোকে বিচরণ করা ও তথ্য অবগত হওয়া। ইচ্ছা মাত্রেই আবার আত্মা তোমার দেহে প্রবেশ করিবে এখন – ভয় কি? যাহা দেখিলে শুনিলে (যাহা আমি স্বর্গ নরক অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছি)—তাহা মনে থাকিবে এখন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অধিক অভ্যাসের পর দেহ না ছাড়িয়াই আত্মা স্বীয় মন্দিরে বসিয়াই পরলোক দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন।

যখন আত্মা শরীর ছাড়িয়া বাহির হন, তখন তাঁহার রং বায়লেট্ ও ধূসর বর্ণের মিশ্র। ইহা অতি সূক্ষ্ম। রণ্টজেন সাহেব যে "জ্যোতি" বাহির করিয়াছেন তাহার আবাসস্থল এই দেশে। তাপ আলো, তড়িৎ ইহারা এইখানকার সূক্ষ্মে আধার করিয়া বিচরণ করেন। দেহ ছাড়িবার পরই আত্মা এই আধারে আসিয়া পড়েন, এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান আসে নাই, এখনও যেন স্বপ্ন স্বপ্ন ঠেকিতেছে। কিন্তু উঠিতেছে – এই ঘুম ঘুম মহানিদ্রার নিদ্রা ছাড়িয়া গেল এই স্বপ্ন ছাড়িয়া গেল, এই আত্মা আর এক প্রদেশে প্রবেশ

করিতেছে। এইখানে সব নরক আছে। রোমান কাথলিকের পরগেটরী এখানে আছে, তাহা স্পিরিচুয়ালিষ্টের সমারল্যাণ্ড, তাহা হিন্দু বৌদ্ধের "মধ্যাবস্থা" ও থিওজফিষ্টের তাহা "কামলোক"। এই প্রদেশের অবস্থা নানা প্রকার, বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের, (গভীরতা হিসাবে) বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং একস্থানের আত্মা আর এক স্থানের আত্মার কথা কিছু জানিতে পারে না ও সেথানে স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারে না। গভীর সাগরের অন্ত-স্থলেও বায়ু আছে আর অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমাচল শৃঙ্গেও বায়ু আছে। কিন্তু সাগরের মাছ কিছু পর্ব্বতশৃঙ্গের বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসে টানিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এক বায়ু একজনের জীবন রক্ষক কিন্তু অপরের জীবন সংহারক। কিন্তু অভ্যাসী যোগীর পক্ষে এসব বাধা বাধাই নহে তিনি উপায় অবলম্বনে এক দেশ হইতে আর দেশে, এক স্তর হইতে অন্য স্তরে বিনা বাধায় শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারেন। কিন্তু যাহারা যোগ অভ্যাস করে নাই, আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে নাই তাহাদের যে দেশে গমন সেই স্তরেই সেই দেশেই স্থিতি। ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন আর নড়িবার যো নাই। প্রধানত এই স্থানে নরকদেশে ৭টী শ্রেণী-প্রদেশ বা স্তর আছে। এক স্তরের লোক অন্য স্তরে যাইতে পারে না কিন্তু তাহার নিজের স্তরে যত আত্মা আছে তাহাদের সহিত তাহার দেখা শুনা কথাবার্ত্তা হইতে পারে ও হয়। মৃত্যুর পরেই আত্মা যে প্রদেশে যায় থিওজফীষ্ট তাহাকে Astral plane (ভুবলোক) বলেন ও আত্মা যে দেহ প্রাপ্ত হয় তাহাকে Astral-body (লিঙ্গশরীর) বলেন। এস্‌ট্রাল অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহে বা লিঙ্গ-শরীরে পূর্ব্বোক্ত ৭টী স্তরেরই পদার্থ বিদ্যমান থাকে। যেমন ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম লইয়া এই পৃথিবী আবার মানব দেহেও এই ক্ষিতি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ আছে। সেইরূপ ৭টী স্তরে যে যে পদার্থ আছে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সূক্ষ্ম দেহে সেই সমস্ত পদার্থ আছে। পৃথিবীতে বাস কালে আত্মার উপর জড়দেহের আবার সূক্ষ্ম দেহের উভয়েরই আধিপত্য ছিল এবং এই উভয়ের সংমিশ্রণে আত্মার একরূপ গঠন হইয়াছিল। যে পাশব আচারের বশবর্ত্তী হইয়া মদ্য মৎস্য মাংস নিকৃষ্ট বাসনা ও কাম লইয়া যে পৃথিবীতে কাটাইয়াছে তাহার আত্মা প্রায় জড় দেহের ন্যায় জড় হইয়া পড়িয়াছে আর যিনি সাধু সঙ্গ সদাচারে সততায় হবিষ্যভোজী হইয়া পরদুঃখ মোচনে জীবনযাপন করিয়াছেন তাঁহার আত্মায়

পৃথিবীতে বাসকালেই অতি উপাদেয় উন্নত সূক্ষ্মধাতু সকল আশ্রয় করিয়াছে। পৃথিবীতে দেখিতে পান না, যে মদ্য মাংস ভোজীর চেহারা ও স্বভাব একরূপ আর হবিষ্যভোগী একাহারী সাধু ব্যক্তির দেহ ও স্বভাব ও জ্যোতি অন্যরূপ? জড় দেহেই যদি পার্থক্য এতটা অনুভূত হয় তবে সূক্ষ্মদেহে ত অধিক পরিমাণে হইবেই। সুতরাং এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাপন দর্শন করিয়াই মৃত্যুর পর তাহার গতি কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আর সেই জন্যই যোগীরা তোমার আমার দেহ দেখিবামাত্র একে বারেই দৌড় কতদূর বুঝিতে পারেন। যিনি সাধু হইয়া পৃথিবীতে জীবনযাপন করিয়াছেন ও পার্থিব বস্তুতে যাঁহার কিছুমাত্র টান নাই তাঁহাকে এই ৭টী স্তর দেখিতে হয় না। সুখময় সুন্দর সুস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে এই ৭টী স্তর পার হইয়া তিনি অপর এক সুখময় স্থানে উপনীত হন এবং যেমন ৭টী স্তর পার হয়েন, অমনি তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের আবার একটা সূক্ষ্ম আবরণ (অপেক্ষাকৃত স্থূল) পড়িয়া যায় ও সেই আত্মা-দেহ আরও সূক্ষ্মতর হয়। কিন্তু যাহারা পৃথিবীতে সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে পারে নাই তাহাদিগকে এই ৭টী স্তরে কিছু দিন বাস করিতে হয় এবং ক্রমশ আত্মার উন্নতি সহকারে তাহারা স্তর হইতে স্তরের উপর উঠিতে থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

পাপের পরিণাম।

(গল্প)

৪র্থ অধ্যায়।

রামসুন্দরের ভ্রাতৃবধূ পিত্রালয়ে। তাঁহার একটীমাত্র কন্যা ছিল। কন্যাটীর মৃত্যুর পরে আর তাঁহার সংসারে আসক্তি নাই। রামসুন্দরের বাড়ীতে এখন রামসুন্দরের স্ত্রী, এক পুত্র এবং একটী কন্যা। পুত্রটী বড়। কন্যাটী ছোট। বৃদ্ধ ভজহরির প্রতি যে পীড়ন হইয়াছিল রামসুন্দরের স্ত্রী সে সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি রামসুন্দরের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন না। স্বভাবতঃ হিন্দু ললনা যাহা হইয়া থাকে তাহাই ছিলেন। আধুনিক শিক্ষা তাঁহার ছিল না কিন্তু মোটামোটী বঙ্গগৃহের গৃহিণীর কর্ত্তব্য তিনি জানিতেন।

পুত্রবতী রমণীর হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতা ছিল। তাই ভজহরির প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। রামসুন্দর বাড়ীর ভিতরে আসিয়া আহার শেষ করিলে তিনি আস্তে আস্তে আরম্ভ করিলেন

হ্যাঁগা ঐ পাড়ার এক কেশো বুড়োকে ধরিয়ে এনে নাকি মেরেছ?

রামসুন্দর। তোমার কাছে এসব খবর এনে দেয় কে?

গৃহিণী। যেই দিক সত্যি তাকে কি আবদুল্ মেরেছে?

রা। সে কথায় তোমার কাজ কি? যাও খেয়ে এস।

গৃ। না বল্লে আমি খাব না।

রা। মেরেছে ত মেরেছে। ধান পাওনা ছিল তাই দেয়নি বলে একটু কড়্কে নিয়েছিল।

গৃ। কড়্কে কি? বুড়োকে এই শীতের রাত্রে জলে ডুবিয়েছে!

রা। না ডুবুলে ধান আদায় হয় না।

গৃ। কাজ কি অমন ধান আদায় করে।

রা। সে পরামর্শ যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করি তখন দিও। এখন খেয়ে এসে শোও।

গৃ। আমার খাওয়ার জন্যে আস্ছে যাচ্ছে কি? তুমি অমন করে লোক মার্ত্তে পার্বে না। নারায়ণপুরের কাছারিতে বুঝি অমনি করে মানুষকে মার্ত্তে।

রা। মার্ত্তাম্ ত মার্ত্তাম্।

গৃ। যদি মেরে থাক, আর মেরো না। গরীবদুঃখী হাড়ে কেটে গাল দেয়। আর ওতে পরমেশ্বরও নারাজ হন্।

রা। রেখে দাও তোমার পণ্ডিতত্ব। মেয়েমানুষের মুখে শাস্ত্র জ্ঞান ভাল লাগে না।

গৃ। আমি শাস্ত্রের কথা বল্ছি না। আমার মনের কথা বল্ছি। নিজের ছেলে মেয়ে হয়েছে। পরের প্রাণে ব্যথা দিও না। ওদের অমঙ্গল হবে। আর মান্ষের অমন গাল কুড়ুলে জপতপ পূজার্চ্চনা সবই মিথ্যা।

রা। মিথ্যে হ'ক সত্যি হ'ক সে আমি বুঝি। মেয়েমান্ষের অত জ্যাঠামোয় কাজ কি? মেয়েমানুষ খাবেদাবে থাক্‌বে বস্।

রামসুন্দর চটিয়াছেন। গৃহিণী পূর্ব্বাপেক্ষা সুর নরম করিয়া আরম্ভ করিলেন। আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে জ্যাঠামো করেছি? তবে সে

বুড়োবুড়ীর কিছু নাই, থাক্‌বার মধ্যে একটী গরু আর তার বাছুর তাই তুমি এনেছ!

রা। না আন্‌লে যে ধান আদায় হয় না?

গৃ। অমন লোককে না হয় ধান ছেড়েই দিতে।

রা। তোমার যখন এত দয়া তুমি তাদের হয়ে ধানগুলি দিয়ে দাও না কেন? তাদের গরু তা'রা নিয়ে যা'ক।

গৃ। তা দিলে ছেড়ে দাও? আমি তোমার ধানের দাম এখনই দিচ্ছি।

রা। কোথাথেকে টাকা দেবে? যা দেবে সে টাকা কি আমার নয়? —করে এনেছ বুঝি?

রামসুন্দর একটী জঘন্য অকথ্য কথার প্রয়োগ করিলেন—
স্বামীর শেষ কথায় সরলা রমণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর উত্তর দিবার ক্ষমতা রহিল না। মনে মনে তিনি ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন আর কহিতে লাগিলেন "জগদীশ্বর আমার স্বামীকে সুমতি দাও। যা'তে লোকের অন্যায় না করেন তা করে দাও।" ক্ষণকাল পরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে যেন অন্যমনস্কভাবে কহিয়া উঠিলেন "ও গরুর দুধ্ আমি আমার ছেলে মেয়েকে খাওয়াচ্ছি না।"
রামসুন্দর অবসর বুঝিয়া উত্তর দিলেন "তা নাই খাওয়ালে। ও দুধ্ আমি ঠাকুর ঘরে আর অতিথ্ ঘরে দেবো।"

গৃহিনী সে রাত্রিতে আহার করিলেন না। সধবার পক্ষে রাত্রিতে নিরম্বু উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ জলপান করিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে তিনি ভজহরির স্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং বৃদ্ধা আসিলে নানা উপায়ে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভজহরির স্ত্রীর বস্ত্রের অভাব জানিতে পারিয়া তিনি তাহাকে একখানি ব্যবহারোপযোগী পুরাতন বস্ত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি তণ্ডুল ও কিছু তরকারী দিয়া কহিলেন "মা তুমি আমার মা'র বয়েসী। যতকিছু অপরাধ আমার হয়েছে। তুমি আমার ছেলেপিলেকে গাল দিওনা। যখন তোমার কষ্ট হয় আমার কাছে এসো। আমি যা পারি দেবো। গোপাল আর আবদুলই ওঁয়ার মতিচ্ছন্ন ঘটায়েছে। ওদুটোকে সঙ্গে করে এনে কি অন্যায়ই করেছেন।"

"ওমা আবতুলের নাম করো না মা" বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল। এবং আপনার অঙ্গের ছিন্ন-বস্ত্র দেখাইয়া পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিল। রামসুন্দরের স্ত্রী তাহাকে থামাইয়া নানা কথা কহিয়া বিদায় দিলেন।

৫ম অধ্যায়।

এ দিকে রামসুন্দর, গ্রাম্য-পুরোহিত বরদাকান্তকে ডাকাইলেন এবং পুনরায় সৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। এই সময়ে গ্রামে দু একটী লোকের বসন্তরোগ হইতেছিল। রামসুন্দর কহিলেন "আমার বিবেচনায় মাশীতলা দেবীর অর্চ্চনা করা আবশ্যক। গ্রামের সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পূজার উদ্যোগ করা যা'ক। আপনাকেই সব ভার নিতে হবে। পূজাটী যা'তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সেইটী দেখ্বেন। টাকার জন্য তত ভাবনা নাই। গ্রামের লোকে যা দেয় দেবে বাকি আমি দেব।"

বরদাকান্ত বলিলেন অতি উত্তম প্রস্তাব করেছেন।

রা। হিন্দুর কাজইত দেবদেবীর অর্চ্চনা, আর দেখুন আমার বিশ্বাস যে এই সব অমঙ্গল ব্যারামস্বারাম কেবল দেবতার কোপেই হয়। তাঁদের কোপের শান্তি না হলে যা'ই করুন কিছুতেই যাবার নয়।

ব। ঠিক কথা বলেছেন। আজকালকার দিনে বড় একটা এ রকম কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় না।

রা। আপনাদের আশীর্ব্বাদে বয়সটাই ত বিদেশে বিদেশে কাট্‌লো। এখন দেশে এসেছি দু একটু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর্‌লে জীবনই বৃথা। পাপ-মুখে আগে বলাটা ভাল দেখায় না মনে করেছি এইবার বৈশাখ মাসে (হস্তস্থিত মালাটী কপালে ছোঁওয়াইয়া) কথা দেব। যে সময় পড়েছে কথাটথা দেওয়াও দেশ থেকে উঠে গেল। ভগবানের নাম শুন্‌তেই মানুষের আলস্য।

বরদাকান্ত। বড়ই সাধু সঙ্কল্প। বৈশাখ মাসে কথা দেওয়া আর ব্রাহ্মণ ভোজন।

রা। আজ্ঞে হাঁ তাও মনে করেছি, দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন দিব মাসের কয়েক দিন ধরেই। কি জানেন সংসারে কেবল নিজের উদরের চিন্তা ত পশুরাও করে।

ব। উত্তম উত্তম। পুণ্যমাসে নিত্য ব্রাহ্মণভোজন আর ভগবৎ গুণ-কীর্ত্তন। এর উপর আর কথা কি?

রা। সবই আপনাকে করেকর্ম্মে নিতে হবে।

ব। তা পারিব। আর একলা আমিই কেন গ্রামের সব লোকই দেখবে শুন্‌বে।

রা। তা ত বটেই। পাড়াগাঁয়ের গুণই ঐটী। একজন একটী কাজ আরম্ভ কর্‌লে দশজনে এসে খাটে ঠিক যেন আপনার বাড়ীর কাজ, বড় যায়গায় এমনটী হবার যো নাই। সেখানে পরের বাড়ীতে যেয়ে কাজকর্ম্ম দেখা অপমানের বিষয় মনে করে।

ব। তা ঠিক। ক্রমে কিন্তু পাড়াগাঁয়েও সেই ভাবটা হয়ে আস্‌ছে।

রামসুন্দর এবং বরদাকান্তে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে গ্রামের ত্রিলোচন দাস নামে এক বৃদ্ধ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিলোচনকে গ্রামের আপামর সাধারণ সকলেই ভালবাসিত। ত্রিলোচনে মনুষ্যত্ব অতি উচ্চমাত্রায় ছিল। ত্রিলোচন প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। ত্রিলোচনের প্রচলিত নাম হরিবলা। তাহার কথার মাত্রা ছিল হরি বলে। তিন কথা কহিতে পেলেই তিনি একটী হরি বলে লাগাইতেন।

ত্রিলোচন আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন হরিবলে কি কথা হচ্ছে?

বরদাকান্ত উত্তর করিলেন রামসুন্দর বাবু কথা দেবেন আর ব্রাহ্মণ খাওয়াবেন বৈশাখমাসে তাই বলছিলেন—

ত্রিলোচন রামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া কহিলেন বাবু হরিবলে কথাই দেন আর ব্রাহ্মণই খাওয়ান হরিবলে জীবের প্রতি দয়া না রাখ্‌লে সবই মিথ্যা হরিবলে।

রা। এ কথার অর্থ কি? (মালা টিপিতে টিপিতে) হরি বোল, হরি বোল।

ত্রি। হরি বলে কাল রাত্রে এই কেশোরোগী ভজহরিকে হরিবলে জলে ডুবিয়েছেন শুন্‌লাম হরিবলে তার প্রাণটায় তখন কি বলেছে।

রা। তা বলে কি পাওনাগণ্ডা সবই ছেড়ে দিতে হবে?

ত্রি। হরিবলে তা বলছিনে তবে যার যেমন শক্তি হরিবলে সেটাও দেখ্‌তে হয়। নিরর্থক হরিবলে মানুষকে কষ্ট দিলে তাতে পাপ আছে। হরিবলে বুড়োবুড়ী যে কান্না শুরু করেছে।

রা। পাওনাটী ছেড়ে দিলে আর কাঁদত না।

রামসুন্দর অপ্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া অপদার্থ বরদাকান্ত তাঁহার সমর্থনার্থ দুএক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"তা ও লোকের ধরণই ঐ। নেবার বেলায় খুব সুড়্ বুড়্। দেবার বেলায় যত কান্নাকাটী। উপুড় হস্ত করিতে গেলেই লোকের কেমন লাগে। আর একটু কড়কে আদায় করলেই, তা নিয়ে কত কথা হয়।"

ত্রি। ঠাকুর থামো না হরিবলে। খোষামুদে কথা ভাল নয়। হরিবলে সে ভজহরি তোমারই বা কে আর আমারই বা কে। বাবুর সঙ্গেই হরিবলে কার শক্রতা। তবে কি না হরিবলে ৪ মণ ধান খেয়ে বার মণ দিয়েছে হরিবলে আর পুত্রশোকে জরজর হরিবলে। একটা গাই ছিল হরিবলে তারই দুদটুকু বেচে চল্‌ত বুড়োবুড়ীর। কাল বাবু সেটাও নিয়ে এয়েছেন হরিবলে। এখন হরিবলে তাদের এমনি দশা হয়েছে যে দেখ্‌লে পথের লোকে কাঁদে।

বলা বাহুল্য রামসুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে বরদাকান্ত উভয়েই ত্রিলোচনের কথায় বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ত্রিলোচনের প্রতি গ্রামের লোকের ভক্তি অসীম। ত্রিলোচন মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন ইহা সকলেই জানে। বরদাকান্ত বা রামসুন্দরের তাহার বাক্য খণ্ডন করিবার মুখ রহিল না। তাঁহারা উভয়েই চটিয়া গেলেন। ত্রিলোচন আর সেখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া উঠিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

সমালোচনা।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন (একত্র) কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা। নব্যভারত উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র, প্রতি মাসে নানাবিধ সুপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে থাকে। তবে কোন বিশেষ সূত্রে সেগুলি গাঁথিবার চেষ্টা নব্যভারতে নাই। প্রবন্ধগুলি রুচি-বিরুদ্ধ বা নীতি-বিরুদ্ধ না হইলেই সম্পাদক পত্রে স্থান দান করেন। তিনি স্বয়ং লিপিকুশল, কিন্তু তাঁহার রচনা—বৈচিত্র, আজিকালি নব্যভারতে প্রায়ই দেখা যাইতেছে না। বড়ই উৎসাহে, সাহসে,—আশায় আকাঙ্ক্ষায়, উদ্যমে উদ্যোগে—দেবীপ্রসন্ন সংসার-ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, কিন্তু নানাদিকে তিনি বিড়ম্বিত হইয়াছেন। হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি হিন্দু সন্তান, ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি সাধু সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, এইরূপ একটা ধারণা,

এক সময়ে অনেক ভদ্র সন্তানের মনে উদয় হইয়াছিল। এই ধারণা একটি বিষম বিড়ম্বনা। অনেকের সঙ্গে যুবা বয়সেই দেবীপ্রসন্ন এই বিষম বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত। স্বয়ং সরল ও সত্যপ্রিয়, তাঁহার সাধের সমাজে চারিদিকে কপটতা, মিথ্যাচার, অনাচার, ভ্রষ্টাচার দেখিয়া দেখিয়া, দেবীপ্রসন্ন সংসার বিষময় বোধ করিতেছেন। সেই বিষ স্বয়ং সেবন করিতেছেন এবং নব্য-ভারতে সেই বিষ উদ্গীরণ করিতেছেন।

শ্রাবণের পূর্ণিমায় আমরা শ্রাবণের নব্যভারতে প্রকাশিত 'খোসামোদী' প্রবন্ধের পরিচয় দিয়াছি। তাহার পর ভাদ্র আশ্বিনের সংখ্যায় 'কি লিখিব' প্রবন্ধে, রাজনৈতিক বিভ্রাটের পরিচয় এবং ক্রোড় পত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কীর্ত্তিকলাপের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ; কার্ত্তিকের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর পঠিত 'ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধের ভূমিকায়, সেই কীর্ত্তির আবার পুনরুক্তি, আর অগ্রহায়ণের সংখ্যায়, "দেশের উপরকার দশজনের" উপর আক্রোশ। এই সমস্ত প্রবন্ধই উদ্গীরিত বিষ – বিষ – হলাহল। দেবীপ্রসন্ন সংসারে দেখিতেছেন বিষ, সংসার হইতে লইতেছেন বিষ—আর সাহিত্য পত্রে বিস্তার করিতেছেন – সেই বিষ। দেবীপ্রসন্নের মত সরল সত্যনিষ্ঠ লোকের এরূপ পরিণাম অতি শোচনীয়। সংসার বিষময় নয় রে ভাই! বিষময় নয়! সংসারে বিষ আছে বৈকি? কিন্তু সে ঔষধের জন্য। সমস্ত বিষেই কি ঔষধ হয়? তা হয় না জানি। কিন্তু করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। আর সেই চেষ্টাই চেষ্টা। 'উপরকার দশজন' লইয়া সমাজ হয় না। 'উপরকার দশজনে' কোন সমাজেরই কিছু করিতে পারেন না। স্পষ্ট করিয়া বুঝ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা এইরূপ দশজনে হিন্দু-সমাজের কিছু করিতে পারেন কি? কিছুই পারেন না। যাঁহারা সেলূনে চড়েন, তাঁহাদের লইয়া হিন্দুসমাজ নহে, যাঁহারা ফষ্ট সেকেন ক্লাসে চড়েন—তাঁহাদের দ্বারাও হিন্দু-সমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। ওরে ভাই! এই ইণ্টর্মিডিয়েট আর থর্ড ক্লাস লইয়াই সমাজ। ইহারই মধ্যে দেখিবে সদাচারী, স্বধর্ম্ম-রত, মিতব্যয়ী, সংযমী মহাপুরুষ সকল নীরবে বিরাজ করিতেছেন। হিন্দুর হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। সনাতন ধর্ম্মীগণ চিরদিনই থাকিবে। সনাতনে বিশ্বাস করিয়া হিন্দু, রাজার ভ্রূকুটি, কৃতবিদ্যের চীৎকার, দশের অনাচার – সকলই সহ্য করিবে। যে যত সহ্য

করিতে পারে, সে তত মনুষ্য-নামের যোগ্য। হিন্দু সকল জাতি অপেক্ষা সহিষ্ণু—এই জন্য হিন্দু মহাপুরুষ, তুমি মহাবংশজাত হইয়া দুদিনের জ্বালায় ছটফট্ করিবে কেন?

ভাদ্র আশ্বিনের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ বি এল্ 'রাজতরঙ্গিনী' প্রবন্ধে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় স্থির করিবার উদ্দেশে পুরাণাদি হইতে মত সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন মতের কোন সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। যেরূপ বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান গবেষণা থাকিলে, এই সকল বিষয়ে কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারা যায়, তাহা আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। আমাদের কেবল কতকগুলা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গণ্ডগোল করাই সার হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চোধুরী লিখিত "এক শৃঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে জানিবার ও ভাবিবার কথা অনেক আছে। শ্রীযুক্ত রমাকান্ত গুপ্ত একটি প্রবন্ধে কবি ও সাধক "লালা রামগতি" রায়ের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা শ্রাবণের পূর্ণিমায় জ্যৈষ্ঠের ভারতী হইতে এই রামগতি রায়ের ও তাঁহার কন্যা আনন্দময়ীর পরিচয় দিয়াছি। রমাকান্ত বাবুর এই প্রবন্ধ, নব্যভারতে না হইয়া ভারতীতেই প্রকাশিত হইলে ভাল হইত। কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চোধুরী বৌদ্ধ-দর্শন এবং শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বৈষ্ণব দর্শন লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখা এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িবার জিনিশ। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, নাম দিয়া কয়েক সংখ্যায় "খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। শুনিলাম, গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী নামটা নাকি জাল করা। প্রবন্ধও বন্ধ করিলে চলে না কি? পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দ দাসের কড়চার সমালোচনের আড়াই বৎসর পরে, গোস্বামীজির পুত্র কর্তৃক তাহার অসার প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চোধুরী কর্তৃক সেই প্রতিবাদের উত্তর, অগ্রহায়ণের নব্য-ভারতে ছাপান ভাল হয় নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা সেই কড়চার রহস্য স্পষ্ট কথায় বহু পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আর কেন?

ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন। ভারতী সাহিত্য-প্রধান পত্র। উপন্যাস, বর্ণনা, কবিতা অধিক পরিমাণে থাকে। তবে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সূর্য্যাদি জ্যোতিষীগণের বিবরণ

ভারতীতে ক্রমান্বয়ে লিখিতেছেন। আর বাঙ্গালার পাটের চাষের কথা শ্রাবণে এবং মীরকাশিমের ইতিহাস, ভাদ্র আশ্বিনে আছে।

বামাবোধিনী ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ। সাবিত্রী আশ্বিন হইতে পৌষ। প্রাচীনা বামাবোধিনী ও নবীনা সাবিত্রী উভয়েই বালিকা ও যুবতীর উপ-যোগিনী বটে। বামাবোধিনীতে বৈচিত্র বেশী ও 'ব্রাহ্ম' ছায়া আছে, সাবিত্রী সর্ব্বতোভাবে হিন্দু ছাঁচে ঢালা—তবে কার্ত্তিক মাসেই বলিয়াছি, ভূমিকম্প প্রবন্ধ না দিলেই ভাল হইত।

সাহিত্য-সেবক, শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ। সাহিত্য সেবক আসামের সিলং হইতে প্রকাশিত হয়। ভূমিকম্পে আসামে যে কি মহা বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এই বিভ্রাটে অবশ্য সাহিত্য-সেবকও বিপন্ন হইয়াছিলেন, ভগবানের কৃপায় সাহিত্য-সেবক নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। কার্য্যাধ্যক্ষ এই বিপদের উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ভাদ্র আশ্বিনের পূর্ণিমায় আমরা সাহিত্য-সেবকের ভাষাগত ও ভাবগত দোষ দেখাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ করি, মহা বিপদের সময়ে আমাদের সেই ক্ষোভের কথাও সাহিত্য-সেবকদের ভাল লাগে নাই, না লাগিবারই কথা। সাহিত্য-সেবকগণ ব্যথা পাইয়াছেন, দেখিয়া আমরাও ব্যথিত হইলাম। কিন্তু অতঃপর সাহিত্য-সেবকের ভাষা এবং ভাব সম্বন্ধে লেখকগণকে অধিকতর মনোযোগী হইতে না দেখিলে আমরা আরও ব্যথিত হইব।

পন্থা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এখানি ধর্ম্ম-প্রধান মাসিক পত্র। অবতরণিকার উপসংহারে অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার লিখিয়াছেন "আমরা সাধ্যানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্যগুলি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। * * * এবং যাহাতে লোকের মন হইতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণভাব তিরোহিত হইয়া সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের উদারভাব উদয় হয় সাধ্যানুসারে তাহার যত্ন করিব।"

পন্থার মলাটের উপর প্রতিমাসেই পঞ্চকোণী যন্ত্রচিহ্ন থাকে। আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে—উহা কি সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নহে? বাস্তবিক মানুষ মনে করিলেই সাম্প্রদায়িকতার হাত এড়াইতে পারে না। সকল সম্প্রদায় এক করিবার বা সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিবার চেষ্টা সনাতন ধর্ম্মে

নাই, কখন ছিল না, কখন হইবে না। তবে অন্য সম্প্রদায় সকল কিছু নহে, তাহাদের দ্বারা কোন কাজ হয় না, এরূপ বিশ্বাস সনাতন ধর্ম্মীরা করেন না, কাজেই অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করেন না। সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই থাকে না। যেমন তোমাতে আমাতে বিভেদ স্বাভাবিক, তেমনই এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিভেদ স্বাভাবিক। যে কোন শক্তিমান্ পুরুষ সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিতে গিয়াছেন, তিনিই একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্ম উদার বটে—সঙ্কীর্ণ নয় বটে—কিন্তু তবু ইহার বিশেষত্ব আছে বৈকি? সেই বিশেষত্বই ইহার সাম্প্রদায়িকত্ব। তাহা এড়াইবার উপায় নাই। এড়াইবার চেষ্টাও করিতে নাই।

পন্থার প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছেঃ—
এই যে ধারাবাহিকরূপে "মৃত্যু-রহস্য" প্রকাশিত হইতেছে—উহা কি বাস্তবিকী ঘটনা? না ইংরাজি হইতে ভাব সংগ্রহ? সকল প্রবন্ধেই নাম দেওয়া আছে, এইগুলিতে কেবল 'শ্রীভঃ' বলিয়া সঙ্কেত আছে। আর লেখক নিজেই বলিয়াছেন, তিনি পাত্র পাত্রীদের নাম ধাম পরীবর্ত্তন করিয়া লিখিতেছেন, আবার জিজ্ঞাসা করি ঘটনাগুলি কি প্রকৃত? মনুষ্যের সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইলে, মনুষ্য-চিন্তা সকল কি অবয়বীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়? 'শ্রীভঃ' নাকি সেইরূপ দেখিয়াছেন, তাহাতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আর একটি কথা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধারাবাহিকরূপে 'অলৌকিক ঘটনাবলী' লিখিতেছেন। অলৌকিক ঘটনায় আমাদের দেশের সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর লোকের অতিরিক্ত বিশ্বাস আছে—এত আছে, যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝান দায়। যিনি ন্যায় শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়—কারণের কারণত্বের সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা বিচার করিতে পারেন, তিনিও অলৌকিক ঘটনায় অতিরিক্ত বিশ্বাসী। অবতরণিকায় লেখা হইয়াছে "অন্ধ বিশ্বাস ধর্ম্মের অবনতির কারণ।" তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, অলৌকিক ঘটনাবলির কথা ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সেই অন্ধ বিশ্বাস কি আরও বাড়িবে না? আমরা বলি যাহাতে দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়, এমন সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে ভাল হয়—সিন্দুরেপটীর প্রেতিনীর কথা আর কেন?

পন্থা—ভাল। যাহাতে আরও ভাল হয় সেই জন্য আমরা যথাসাধ্য সৎ পরামর্শ প্রদানের চেষ্টা করিতেছি

উৎসাহ। এখানিও একখানি এই বর্ষের নূতন 'মাসিকপত্র ও সমালোচন', বৈশাখ হইতেই প্রকাশিত হইতেছে, আমরা আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ (একত্র) সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ইহাতেও অনেকগুলি লেখক একত্র হইয়াছেন; উৎসাহ উৎসাহেই চলিতেছে। প্রতি সংখ্যার প্রথমেই 'অজ্ঞেয়বাদ' নামক বিজাতীয় দার্শনিক মত বিবৃত হইতেছে। কিন্তু কেন, কি উদ্দেশে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ফল কথা উৎসাহের বাদী-স্বর জান্ সুর—যে কি তাহা ধরিতে পারিলাম না। কি সুরে যন্ত্র বাঁধিয়াছেন, তাহা ধরিতে না পারিলে প্রকৃত সমালোচনা চলে না। গুটি দুই ছোট কথা বলিতেছি। ভাদ্রের উৎসাহে গাছপালার পচানি সারকে, ইংরাজির নামকরণানুসারে 'সবুজসার' নাম দিয়া সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে; তাহাতে ইংরাজি হইতে অনেক কথা, কাণপুর, নাগপুর, ডুম্‌রাও প্রভৃতি স্থলের সরকারি কৃষিক্ষেত্রের কথা আছে, অথচ আমাদের দেশে যে ধঞ্চে ছিটাইয়া দিয়া চারাগুলা একটু বড় হইলে, গোড়া কাটিয়া দিয়া পচানি সার করা হয়; তাহার ভাল মন্দ বিচার দূরে থাকুক, উল্লেখই নাই। ধঞ্চে লেগুমেন জাতীয় বটে এবং চাষারা উহাতে অঙ্গারজান কি পরিমাণে আছে, না আছে, তাহার কিছুই জানে না, কিন্তু পচানি সারের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

উৎসাহের কয়জন লেখকের পদ্য লিখিবার ক্ষমতা বেশ আছে, এখন যদি পদ্যের প্রাচীন রীতিনীতি, বেশ মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের *শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচারে শক্তির হ্রাস হয়—* এই কথাটি মনে রাখিতে পারিলেই ভাল।

বিশ্ব-জীবন। এক বৎসর পূর্ণ হইল। ৮ম সংখ্যা পৃথক এবং ৯ম হইতে ১২শ একত্র পাওয়া গিয়াছে। ৮ম সংখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জীবনী আছে। ৯মে কবীর, ১০মে রাজা রাধাকান্ত দেব, ১১শে গার্গী; ১২শে মহারাণী স্বর্ণময়ী। 'রাজা রাধাকান্ত দেবের ধর্ম্মমত' এইরূপে ব্যখ্যাত হইয়াছে—

"রেভারেণ্ড ডল্ সাহেবের নাম অনেকের নিকট পরিচিত। ডল্ মহোদয় একদা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তদীয় দেবমন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া উক্ত পাদ্রিসাহেব রাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয় কি পুতুল পূজা করেন?" তিনি বলিলেন, না, মানুষ

কথন পুতুল পূজা করিতে পারে না। আমার বালকগণের জন্য মন্দিরে পুতুল রাখিয়াছি।" তৎপরে রাজা বাহাদুর ঈষৎ হাস্য করিয়া ডল্ সাহেবকে বলিলেন, "আপনারা কি আপনাদিগের বালকগণকে পুতুল দেন না?" ডল্ বলিলেন, "খেলিতে দি, পূজা করিতে নয়।" তৎপরে রাজা বলিলেন, আমাদের বালকেরা পুতুলের সহায়তা ব্যতীত যত দিন না প্রকৃত পূজায় সমর্থ হয়, ততদিন আমরা তাহাদিগকে পূজা করিবার জন্য পুতুল দিয়া থাকি।" তখন ডল্ সাহেব বলিলেন, "তবে দেখিতেছি আপনি পৌত্তলিক নহেন; যদি আপনি পুতুল পূজা না করেন, তবে, কাহার পূজা করেন?" রাজা বাহাদুর বলিলেন, "আমি আমার ধর্ম্মের পূজা করিয়া থাকি। আমার ধর্ম্ম সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। ঈশ্বরের সহিত এক স্থানে বাস করা, ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া, ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা যুক্ত থাকা এবং পরিশেষে দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় ক্রমশঃ ঈশ্বরে বিলীন হওয়া।" প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা রাজা বাহাদুরের ধর্ম্মমত পরিস্ফুট হইতেছে।

রাজা বাহাদুরের সহিত রেবরেণ্ড ডল্ সাহেবের কথোপকথন কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্মরণার্থ ১৮৬৭ সালের মে মাসে কলিকাতায় যে মহতী সভা হয়, সেই সভায় স্বয়ং ডল্ সাহেব ঐরূপ কথোপকথনের উল্লেখ করেন; আমরা সেই বৎসর বিএ পাশ করিয়াছি, সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। ডল্ সাহেবের কথাগুলি বেশ স্মরণ আছে, আর তাঁহার আবেশের মত ভাবভঙ্গি ভুলিবার নহে। ডল্সাহেবকে রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন—"Don't you give dolls to your children?" ডল্ সাহেব উত্তর করেন, "yes, Raja, to play with, not to worship" তাহার পর রাজা বাহাদুর যে কোন প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, এমন কথা ডল্ সাহেব বলেন নাই। কথোপকথন যেন ঐখানেই শেষ হইল। তাহার পর ডল্ নিজের মত বলিলেন, Raja's religion was—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য and নির্ব্বাণ। এটি ডল্ সাহেবের নিজ মত, রাজা বাহাদুরের নিজ উক্তি নহে। ধাতুময় বা শিলাময় অথবা অন্য কোন রূপ বিগ্রহ – যে কেবল পুত্তলিকা মাত্র এবং কেবল বালকের উপযোগী, রাজা বাহাদুরের এমন ধর্ম্মমত ছিল না। তিনি বিগ্রহোপসানায় বিশ্বাসী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় চৌরাশী

ক্রোশ ব্রজমণ্ডল মধ্যে কোন গোরা বা আফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তি সামান্য পাখীটি পর্য্যন্ত মারিতে পারে না। তাঁহার জীবনী মধ্যে তাঁহার এই কীর্ত্তিরও উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত।

বীণাপাণি। ৪র্থ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে দশম সংখ্যা পর্য্যন্ত। বীণাপাণি পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকটা ভাল দেখিয়াছিলাম, এখন যেন কেমন কেমন দেখিতেছি। শ্রাবণ হইতে চারি মাস 'ঈশ্বরোপাসনা' বলিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার প্রথম প্রবন্ধে প্রথম তিন পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সকৃৎ শ্রবণ মাত্রেই অন্বয়ী প্রমাণে (directly) যাহাদের স্বাত্মানুভূতী হয়, অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত অধ্যাসের জ্বলন্ত প্রদীপ তাহাদের চকিতেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়;" এক বর্ণ বুঝা গেল না। যদি বুঝাই না যায়, তবে লিখিবার প্রয়োজন কি। এই 'ঈশ্বরোপাসনা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে—কত বেদ বেদান্ত, দর্শন মীমাংসার কথা আছে, কিন্তু ভাষা প্রাঞ্জল হইল কি না, বিশদ হইল কি না, সে দিকে লেখকের দৃষ্টিই নাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ নব্যলেখকেরা ভাষা বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হয়েন। তাঁহাদের অবহেলায় সর্ব্বনাশ হইতেছে। একদিকে 'প্রাকৃত' বলিয়া পণ্ডিতের অবহেলা, অন্য দিকে ইংরাজি নবীশের উপহাস, এই উভয় সঙ্কট মধ্যে অতি অপ্রশস্ত পথে, ক্ষীণ অবয়বে, বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে চলিয়াছেন, অতি সন্তর্পণে মাতৃসেবা করিতে হয়; তোমরা পাঁচ জন সুসন্তান, মায়ের ধাতু না বুঝিয়া, অবস্থা না দেখিয়া, দুষ্পচ পথ্য প্রদান করিয়া, বিষম বিষময় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, যদি সেই সেই শীর্ণদেহে ক্ষীণ প্রাণে বিকার ঘটাও, তবে আর কে রক্ষা করিবে? তাহাতেই বলিতেছি, তোমাদের প্রকরণ পদ্ধতিতে সর্ব্বনাশ হইবে।

একদিকে ঐরূপ দর্শনের নামে ভাষার উপর উৎপাত, অন্যদিকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া মাতৃভাষার উপর বিষম উৎপাত হয়, এই উভয়বিধ অত্যাচার হইতে লেখকগণ সাবধান না হইলে, ভাষার দুরবস্থাই হইবে। বিজ্ঞানের উৎপাতের একটু নমুনা দিতেছি:—

সাহিত্য ৮ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা। সাহিত্য পূর্ণিমা কার্য্যালয়ে বোধ করি আসে না—আসিলে অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এখানি পূর্ণিমা কার্য্যালয় হইতে ক্রীত 'সাহিত্য'। যে প্রবন্ধ হইতে আমরা নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,

তাহাতে নাম না থাকিলেও নিশ্চয়ই উহা প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা সংস্কারক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। এ মাসের লেখকগণের নামের মধ্যে তাঁহার নাম আছে। তিনি নব্য লেখক নহেন, বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান, আমাদের সুপরিচিত, কোনরূপ অপবুদ্ধিতে তাঁহার ভাষার সমালোচনা কবিতেছি—তিনি কথনই মনে করিবেন না। 'ধূমকেতু' সম্বন্ধে তিনি 'সাহিত্যে' লিখিতেছেনঃ—

"এই কোষগুলি পার্থিব বাষ্পবৎ পদার্থ নহে; কারণ, উহা বাষ্পবৎ পদার্থ হইলে, তদ্দ্বারা আলোকেব বিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত। বোধ হয়, এগুলি কোন প্রতিঘাত। বলবিশেষ দ্বারা গর্ভ হইতে সূর্য্যাভিমুখে বিক্রত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক-অবস্থাপন্ন কোনও পরিচালক হইতে বৈদ্যুতিক প্রতিঘাত কর্তৃক লঘিষ্ঠ কণা সকল অপাকৃত হয়। আর প্রতিঘাতীবলের সাময়িক বিরাম বা হ্রাস প্রযুক্ত উপর্য্যুপবি কোষ ব্যবহিত শ্যামপত্তিকার উৎপত্তি ঘটে।"

সাধারণ পাঠকে বিচার করুন, আমরা সমালোচনা করিব না।

সখা ও সাথী। ১৪শ বর্ষ, ৫ম হইতে ৭ম সংখ্যা। প্রধানত বালকোপযোগী বটে কিন্তু প্রবীণের যে দেখিবার কিছু না থাকে এমন নহে। ছবিগুলি বেশ ভাল, তবে ইহার পূর্ব্বে যেন আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হইতেছে। এই যে সব শীকারের গল্প, খবরেব বোতলের গল্প, এগুলাত ইংরাজী হইতে লওয়া? তা যদি হয, তবে সেই ভাবে লিখিলে ক্ষতি কি? আমাদের বোধ হয়, লেখাই ভাল।

বানরে কি কাঁকড়া খায়? খায় না; তবে ছবিখানা বদ্‌লিয়া শৃগালের বুদ্ধির পরিচয়ে কবিতা লিখিলেই ভাল ছিল। বালককাল হইতে একটা ভুল শিক্ষাও ভাল নয়।

মুকুলও আর একখানি বালকোপযোগী পত্র। মুকুলেব ছবিগুলি যেন আরও ভাল। ভালুকের লেজ কাটার গল্প এবং শিয়ালের খেয়াল—অত্যন্ত ছোট ছেলেদের জন্য লেখা। ওরূপ লেখা বোধ করি না দেওয়াই ভাল। ন্যান্‌সেনের মেরু-যাত্রা—ছেলে বুড়া সকলেরই জন্য লেখা, এরূপ প্রবন্ধ যত বেশী থাকে তত ভাল। বৈজ্ঞানিক আমোদ প্রমোদ দেওয়া ভাল। প্রথমটির পরীক্ষা করিতে গিয়া, আমার ছেলেরা বিড়ম্বিত হইয়াছে, তাহাদেরই অনুরোধে, এ কথা পত্রস্থ করিলাম। মনোগত সংখ্যা বলিয়া দিবার নূতন কৌশলে তাহারা খুব আমোদ পাইয়াছে। ফলত মুকুলের বহুল প্রচার হইলেই ভাল।

সমাজ ও সাহিত্য। আশ্বিন, কার্ত্তিক (একত্র) এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা। সমাজ ও সাহিত্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ ও সাহিত্যের, সেবা করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে। লেখকগণ বিশেষ কৃতি বা গুণী না হইলেও তাঁহাদের চেষ্টার প্রশংসা না করিলে প্রত্যবায় আছে। 'দুখের বিদায়, সুখের আহ্বান' কবিতাটি বেশ।

চিকিৎসক ও সমালোচক। জুলাই, আগষ্টের দুই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এগুলির সমালোচনা চলে না।

সজ্জনতোষিণী পৌষ পর্য্যন্ত, সনাতন ধর্ম্মকণা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এই দুই খানি বৈষ্ণব পত্রিকা পূর্ব্বমতই চলিতেছে।

প্রভা। ২য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যা। এখানি মন্দ নয়—কিন্তু নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে কি?

বীণাবাদিনী, ৩য় সংখ্যা। স্বরলিপিতেই পূর্ণ, তবে যে দুই চারিটি ব্যাখ্যা আছে—(যেমন তালের) সমীচীন বটে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ বসু যে গল্পটি নাম বাদ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নাম দিলেই চলিত। কেন না আইন ব্যবসায়ী বিজ্ঞ ব্যক্তির নাম বোধ হইতেছে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ৺কাশীবাসী, আমাদের সকলেরই পূজনীয়—হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল অন্নদা বাবুই গায়ককে রাজসভা মধ্যে কোন ফরমায়েস না করিয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন।

নদীয়াবাসী ভাদ্র মাসের পাওয়া গিয়াছে, আর কি প্রকাশিত হয় নাই? মাসিক বিজ্ঞাপনী ডিসেম্বরের পাওয়া গিয়াছে।

আমরা গত মাসে এডুকেশন গেজেট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, গেজেট তাহার 'সন্তোষজনক' কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। গেজেটের উপর নদীয়াবাসী 'অপ্রিয় কথা' লিখিয়াছেন কেন?

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহের আফিষের পার্শ্বে বারিকে কাছারি আসিল, অথচ বার্ত্তাবহ—

'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'

নীতি অবলম্বন করিলেন!!! দুর্ভাগ্য!!!

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ।	মাঘ, ১৩০৪ সাল।	১০ম সংখ্যা।

পাপের পরিণাম।

(গল্প)

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ক্রমে রামসুন্দরের অত্যাচার গ্রামে অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। দুর্ব্বলের শোণিত শোষণ করিয়া তিনি আপনার অর্থ বাড়াইতে লাগিলেন। ভজহরির ন্যায় অনেক দরিদ্র তাঁহার পেষণে সর্ব্বস্বান্ত হইল। কে তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিবে? রামসুন্দর দুর্ব্বল দেখিয়াই পীড়ন করিতেন। সংসারে দুর্ব্বলের জন্য অতি অল্প লোকেই কাঁদিয়া থাকে। বিশেষতঃ রামসুন্দর গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিতে জানিতেন। গ্রামের অনেকেই তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকাণ্ডে আসিয়া যোগ দিত এবং উদর পুরিয়া আহার পাইত সুতরাং ভজহরির ন্যায় দরিদ্রের কথা মনে আসিলেও কেহ উত্থাপন করিত না। পুলিস থানা—গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। আদালত ফৌজদারি কাছারি একদিনের পথ ব্যবধান। ইহাতে রামসুন্দরের অত্যাচার করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। পুলিস কিছু কিছু পার্ব্বনী পাইত। কাজেই রামসুন্দরের বিরুদ্ধে একটী কথাও কহিত না।

রামসুন্দরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গ্রামে কেবল দুইটী লোক ছিলেন এক ত্রিলোচন দাস আর মধু মণ্ডল। ত্রিলোচনের পরিচয় পাঠক পূর্ব্বাধ্যায়েই কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন। ত্রিলোচনকে গ্রামের লোকে বড়ই ভক্তি করিত। ত্রিলোচনের সম্পত্তির মধ্যে বিঘা পঞ্চাশেক জমির এক জোত।

ইহা দ্বারাই তিনি অনেক বিপন্নের সাহায্য করিতেন। অতিথি আসিলে ত্রিলোচনের বাড়ী হইতে কখনই ফিরিত না। গ্রামের অন্য লোকে পথিক প্রভৃতি আশ্রয় প্রার্থীকে ত্রিলোচনেব বাড়ী দেখাইয়া দিত। ত্রিলোচনের সংসারে কেহই নাই, তাঁহার স্ত্রীর কাল হইয়াছে। সন্তানসন্ততি হয় নাই। কিন্তু সংসারের সকলেই যেন তাঁহার কুটুম্ব। ত্রিলোচন একটী বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বাড়ীতে রাখিয়া অধিকাংশ সময় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং কেহ কষ্টে পড়িয়াছে দেখিলেই প্রাণপণে তাহার কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণেই ভজহরির বৃত্তান্ত এত শীঘ্র তাঁহার কাণে গিয়াছিল। ভজহরি এখন সস্ত্রীক ত্রিলোচনের বাড়ীতেই রহিয়াছে।

নিকটস্থ আট দশখানি গ্রামের লোকে ত্রিলোচনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ত্রিলোচন সাধারণতঃ হরিবলা নামেই পরিচিত। এমনকি বালক এবং অধিকাংশ যুবকেরাও তাহার হরিবলা ভিন্ন অন্য নাম আছে ইহা জানিত না। বৃদ্ধেরা তাহাদের পুত্রগণকে শিখাইত হরিবলাকে সম্ভ্রম করিতে। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই তাঁহার আদর। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত তাঁহাকে শিশুরা। ত্রিলোচনে শিশুর সারল্য ছিল। ত্রিলোচন কোন বাড়ীতে গেলেই অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত কেহ কোলে উঠিত, কেহ বা কান্ধে চড়িত। প্রতিবেশীদিগের পুত্রকন্যাগণ অনেক সময়ে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া অত্যাচার করিত। ত্রিলোচনের বাড়ীর গাছের ফলে শিশুদিগের একচেটিয়া অধিকার।

এক কথায় ত্রিলোচনের শত্রু ছিল না। নিকটস্থ দু চারি গ্রামে কোন বিবাদ বাধিলে উভয় পক্ষ বলিত হরিবলা যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন তাহাতেই আমরা সম্মত। কোন বিষয় তাহার জানা থাকিলে দুই পক্ষই তাঁহাকে সাক্ষী মানিত। ত্রিলোচন কিন্তু সাক্ষ্য দিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা হইলে প্রায়ই পলাইয়া ফিরিতেন। এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কাছারিতে আনিতে পারে নাই।

ত্রিলোচনের জমিতে যে ধান হইত তদ্দ্বারা তিনি অনেক দরিদ্রের সাহায্য করিতেন। যে বৎসর তাঁহার ধান কিছু অধিক হইত তিনি প্রায়ই একটী মহোৎসব দিতেন। ত্রিলোচনের মহোৎসবের অর্থ দুঃখী এবং কাঙ্গালী ভোজন। দুঃসময়ে কেহ তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইলে প্রায়ই বিফল মনোরথ

হইতে হইত না। এ হেন সাধুস্বভাব ত্রিলোচনও রামসুন্দরের শত্রু বলিয়া গণ্য হইলেন। আর হইলেন মধু মণ্ডল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধু বনিয়াদি ঘরের সন্তান। এখন অবস্থা খারাপ হইয়া থাকিলেও রামসুন্দর অপেক্ষা গ্রামে তাঁহার সম্মান অধিক। মধু প্রায়ই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হন না কেন না তাঁহার শরীর সুস্থ নহে। তথাপি গ্রামের অনেক লোকই তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। যে দিন সন্ধ্যার সময় ভজহরির প্রতি অত্যাচার হয় তাহার পরদিনই একথা মধুবাবুর কাণে গিয়াছিল। ইহার পর বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তীর সহিত দেখা হইলেই মধু ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন এবং কহিলেন রামসুন্দর বাবুকে বলিবেন গরীবের প্রতি এমন উৎপীড়ন না করিতে। অমন লোকের শাপ হাড়ে হাড়ে লাগে। বরদাকান্ত এই কথাই রামসুন্দরকে একটু বক্রভাবে মানাইয়া বলিয়াছিলেন। রামসুন্দর, মধু এবং ত্রিলোচন উভয়ের উপরই চটিয়া গেলেন। ভাবিলেন ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে সুবিধা নাই। সেই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। রামসুন্দরের সহায় গোপাল। রামসুন্দর এবং গোপালের পরামর্শের যে ফল হইয়াছিল পাঠক পরবর্ত্তী কয়েকটী অধ্যায়ে তাহা জানিতে পারিবেন।

৭ম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত্রিলোচন সাক্ষী দিতে বড়ই নারাজ। আদালতের নামেই তাহার ভয় ছিল। ত্রিলোচন কখনও আদালতে যান নাই। যে দিন তিনি ভজহরি এবং তাহার স্ত্রীকে আশ্রয় দেন তাহার তিন মাস পরেই কিন্তু ত্রিলোচনকে আদালতে যাইতে হইল। সে যাওয়া সাক্ষী স্বরূপে নহে কিন্তু এক মোকর্দ্দামার প্রতিবাদী হইয়া। ত্রিলোচনের বাস-গ্রামের চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানের এক ব্যক্তি তাহার নামে ৯০০ টাকার দাবিতে এক মোকর্দ্দামা উপস্থিত করিয়াছে। কাঁথির মুনসেফিতে এই মোকর্দ্দামা। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট নয়শত টাকা পাওনা বলিয়া নালিস করিয়াছে, ত্রিলোচন বলেন তাহার সহিত কোন দিন তাঁহার পরিচয়ই নাই। আর তিনি কখনও কাহার নিকট কোন টাকাও ঋণ করেন নাই। মোকর্দ্দামার সমন পাইয়াই ত্রিলোচন স্তম্ভিত হইলেন তাহার মুখে সংবাদ পাইয়া গ্রামের অনেক লোকও

স্তম্ভিত হইল। অনেকে অনুমান করিল ভুলিয়া সমন জারি করিয়াছে। ত্রিলোচনের ন্যায় লোকের নামে কেহ মিথ্যা মোকর্দ্দামা করিবে এ কল্পনাতেও অনেকে বিস্মিত।

নিরূপিত দিনে ত্রিলোচনকে কাঁথির আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। ত্রিলোচনের মনের ধারণা তিনি যাহা কহিবেন বিচারক তাহাই বিশ্বাস করিবেন। ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে মোকর্দ্দামাই তাঁহার নামে নহে। কিন্তু এ বিশ্বাস এবং ধারণা অধিক কাল টিকিল না। ত্রিলোচন টাকা লওয়া বা বাদীর সহিত পরিচয় থাকা অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করিলেও মোকর্দ্দামার তাহাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণ করিবার জন্য দিনান্তর ধার্য্য হইল। ত্রিলোচনের উকীল তাঁহাকে প্রমাণ আনিতে কহিলে ত্রিলোচন কহিলেন এর আবার প্রমাণ কি আনিব। ওরাই যেন প্রমাণ করে যায়।

বিচারের দিনে প্রথমতঃ বাদী এবং তাহার সাক্ষীর প্রমাণ আরম্ভ হইল। ত্রিলোচন দেখিলেন তাহারা অনায়াসে মিথ্যা কথা কহিয়া সাব্যস্ত করিল যে তিনি বাদীর নিকট হইতে ৭৫০ টাকা ধার লইয়াছেন ঐ টাকা শুদে আসলে ৯০০ শত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ত্রিলোচন একবার তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাহারা কহিল ঐ তীর্থ দর্শন উপলক্ষে তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হয়। ত্রিলোচন সমস্ত শুনিয়া অবাক। তিনি তীর্থে গিয়াছিলেন কিন্তু তজ্জন্য কাহারও নিকট ঋণ করেন নাই। বাদীর পক্ষ হইতে এক খাতা বাহির হইল, তাহাতে ত্রিলোচনের নাম লেখা। ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্মৃত হইলেন যে ঐ লেখা ঠিক তাঁহার হস্তাক্ষরের ন্যায়। অথচ তিনি নিজে কথনও এমন কাগজে স্বাক্ষর করেন নাই। সমস্ত ভাবিয়া ত্রিলোচনের পা হইতে মাথা অবধি জ্বলিয়া গেল। যথন তাঁহার নিজের প্রমাণ দিবার সময় আসিল ত্রিলোচন তথন প্রায় জ্ঞানহারা। মানুষ এমন মিথ্যা সাজাইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল না।

হলপ পড়াইবার পর যথন ত্রিলোচনের প্রতি প্রশ্ন আরম্ভ হইল, ত্রিলোচন তথন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন—হরিবলে আমার নাম ত্রিলোচন দাস, হরিবলে বাপের নাম ধনঞ্জয় দাস ইত্যাদি। জবানবন্দীতেও তাঁহার জবাব হইতে লাগিল—হরিবলে আমি বাদীকে চিনিই না, হরিবলে কারও কাছেথেকেও আমি টাকা ধার করি নাই হরিবলে—

বিচারক দুই কারণে ত্রিলোচনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এক তাহার কম্প দেখিয়া আর তাহার মুখে "হরিবলে" শুনিয়া। প্রথমতঃ দু'একবার কহিলেন "ভালভাবে বল। হরিবলেটা ছেড়ে দিয়ে বল। কাঁপ কেন?" ত্রিলোচন ইহাতেও কিন্তু সংশোধিত হইবার নহেন। হরিবলে তাহার কথার মাত্রা। এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে "হরিবলে" বাদ দিয়া কথা বলা তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। ত্রিলোচনের মুখ দিয়া "হরিবলে" বাহির হইতেই লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি কহিলেন "ফের হরিবলে হরিবলে করবে তা হলে তোমার ভাল হবে না। সোজাভাবে কথা বলতে পার না? ত্রিলোচন উত্তর করিলেন কি কর্‌ব হুজুর হরিবলে হরিবলে আমার মুখের কথার মাত্রা হরিবলে।

হাকিম এবার চটিলেন কহিলেন আবার হরিবলে বল্লেই মোকর্দ্দামা ডিক্রি দেব বলছি। ত্রিলোচনের এইবার কেমন অসহ্য হইল, তিনি কহিলেন —হরিবলে তাই যদি হুজুরের বিবেচনায় হরিবলে—তা হলে হরিবলে দেন ডিক্রি। হরিবলে এত মিথ্যাই যখন করেছে, হরিবলে তখন হরিবলে হুজুরও যে ডিক্রি দেবেন তার বিচিত্র কি হরিবলে?

ত্রিলোচনের জবানবন্দির পর তিনি আর সাক্ষী দিতে দিলেন না। মোকর্দ্দামা তাহার প্রতিকূলে ডিক্রি হইল ইহা বলাই বাহুল্য। মিথ্যা প্রমাণের সহিত হাকিমের ক্রোধও কিঞ্চিৎ যোগ দিয়াছিল সন্দেহ নাই।

৮ম অধ্যায়।

কেহ কেহ ত্রিলোচনকে পরামর্শ দিয়াছিল আপিল করিতে। তিনি তাহা করিলেন না। ত্রিলোচন সংসারে তেমন আসক্ত ছিলেন না। তাঁহার সংসার অন্যের জন্য। এই ঘটনায় তিনি সংসারের প্রতি বিশেষ বিতৃষ্ণ হইলেন। ডিক্রির টাকা শোধ করিবার জন্য নগদ কিছুই তাঁহার হাতে ছিল না। ত্রিলোচন বুঝিলেন ইহারই নিমিত্ত তাঁহার জমিটুকু যাইবে। সংসার হইতে বিচ্যুত হইবার এই এক অবসর উপস্থিত হইল ভাবিয়া তিনি মনে মনে সেইরূপ সংকল্পই করিলেন। গ্রামের লোকে তাঁহার এই সংকল্পে অতিশয় দুঃখিত হইল। কাহা কর্ত্তৃক এ ঘটনা হইয়াছে তাহা এখন আর গ্রামে কাহারও জানিতে বাকি নাই। ত্রিলোচনের সহিত যাহারা কাঁথিতে

গিয়াছিল তাহাদের একজন তথায় গোপালকে দেখিতে পাইয়াছিল। গোপাল রামসুন্দরের দক্ষিণ হস্ত। রামসুন্দরের ষড়যন্ত্রেই যে এই মোকর্দ্দামা হইয়াছে ইহা গ্রামের সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। ত্রিলোচনের প্রতি তাহাদের ভালবাসাও অত্যন্ত অধিক। ত্রিলোচনকে বাঁচাইবার জন্য তাহাদের সকলেরই চেষ্টা। তাহাদের অনেকে যাইয়া এ সম্বন্ধে মধুমণ্ডলকে অনুরোধ করিল। ত্রিলোচন নিজে কিন্তু উদাসীনের ন্যায় রহিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

দুমাস বাদেই ডিক্রিজারি হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিলোচনের জমি বাড়ী ক্রোক হইল। ক্রমে তাহা নীলামে উঠিল। মধু মণ্ডলের পয়সা থাকলে তিনি ইহা রক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহার তেমন অর্থ নাই। গ্রামের অন্যলোক ত সকলেই প্রায় নিঃস্ব। তথাপি মধু মণ্ডলের পুত্র নীলাম ডাকিতে গিয়াছিল। রামসুন্দর উচ্চ ডাক ডাকিয়া ত্রিলোচনের জোত জমি ক্রয় করিলেন।

নীলামে যে মুল্য হইল তাহাতে ডিক্রীর দেনা শোধ হইয়া ত্রিলোচনের কিছু পাওনা হইল। ত্রিলোচন এই টাকার অধিকাংশই ভজহরি এবং তাহার স্ত্রীকে দিলেন এবং অল্পমাত্র নিজে লইয়া চিরদিনের জন্য দেশত্যাগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাকে দেশে থাকিতে অনুরোধ করিল। ত্রিলোচন কিছুতেই থাকিলেন না। তিনি কহিলেন "আর যখন দুটী লোক এলে হরিবলে আমি তাদের আদর অভ্যর্থনা করিতে পারিব না, তখন হরিবলে আমার ঘরে থাকার আর দরকার কি? হরিবলে যাই এক দিকে চলে।"

ত্রিলোচন দাসের দেশত্যাগের দিন তাহার বাড়ীতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। অন্য গ্রাম হইতেও দুচারিজন লোক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। ত্রিলোচনের বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। কোন প্রিয়জনকে বিদায় দিতে বাড়ীর লোকের মধ্যে যেরূপ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে, সমাগত স্ত্রী পুরুষদিগের মধ্যে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। ত্রিলোচনের সকলেই আত্মীয়, সকলেই যেন আপনার লোক। অবশ্য রামসুন্দর এ সকলের মধ্যে নহেন।

সংসারে পুরুষ অপেক্ষা রমনীর প্রাণ কোমল অধিক। হরিবলা চির-দিনের জন্য দেশত্যাগী হইবেন শুনিয়া বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা অনেকে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সকলেরই চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছিল। জননীদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্রোড়স্থ শিশুগণও কাঁদিতেছিল। প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারা কেবল ত্রিলোচনের গুণকীর্ত্তণ করিতেছিলেন। কেহ বলিতেছেন আমার ছেলেপিলেকে বড়ই ভালবাসিতেন। কেহ কহিতেছিলেন আমাদের বাড়ীতে রোজ একবার যাওয়া ছিল। কেহ অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিতেছিলেন, আপনার ব্যাটাবেটী নাই পরের প্রতিই যত মায়া মমতা। গাছের আম-কাঁঠাল পাকিলে গ্রামের ছেলে জড় করে এনে খাওয়াতেন। যারা এমন লোককে দেশছাড়া কল্লে তারা কি ভাল থাকবে?
দুর্ব্বলের একবল রোদন আর এক অভিসম্পাত।

ক্রমে ত্রিলোচনের গৃহত্যাগের সময় উপস্থিত। তিনি উপস্থিত শিশুদিগকে চুম্বন দিয়া বালকবালিকাগণকে আদর দেখাইয়া যুবক, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন। এই সময়ে অনেকেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াই "ওমা, হরিবলা কোথায় যায়?" বলিয়া জননীর অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল। ত্রিলোচন অনেককে সান্ত্বনা করিলেন।

বৃদ্ধেরা কেহ কেহ কাঁদিল "আর কি আমরা গ্রামে থাকতে পারব?" ত্রিলোচন বুঝাইলেন "ভগবান ভরসা, হরিবলে কেবল তাঁকেই ডেকো। পাপের বৃদ্ধি ক'দিন থাকে হরিবলে।"

ত্রিলোচন যাত্রা করিলেন। কেহ কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু দূরপর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল। গ্রামের পক্ষে ত্রিলোচনের এই মৃত্যুদিন।

ত্রিলোচন তুমি ভাগ্যবান পুরুষ সন্দেহ নাই। সংসারে তোমার মত লোকেরই জন্ম সার্থক।

তুলসীদাস কহিয়াছেন—হে মানব, যখন তুমি সংসারে আসিলে, তখন সকলে হাসিল কিন্তু তুমি কাঁদিলে, সংসারে এমন কাজ করিও যে তুমি যখন যাও তখন যেন সকলে কাঁদে, আর তুমি হাসিতে পার।

রামসুন্দর তোমার অদৃষ্টে ইহা ঘটিবে কি? তুমি যে হরিবলাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেশ ছাড়া করিলে, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তুমি সংসার ছাড়িবার দিন হাসিতে পারিবে কি? তুমি জীবিত থাকিতেও অনেক দুর্ব্বল এবং দরিদ্র মনে মনে তোমার মৃত্যু কামনা করে না কি?

৯ম অধ্যায়।

মেদিনীপুরের গল্প বলিতে বলিতে আমাদিগকে ময়মনসিংহে আসিতে হইল। ময়মনসিংহ এবং মেদিনীপুর বাঙ্গালার দুই প্রধান জেলা। ইহার একটী দেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে, অপরটী দক্ষিণ পশ্চিমাংশে। ময়মনসিংহে অনেক বড় বড় জমিদারের বাস। পবিত্র ও পুণ্যতীর্থ ব্রহ্মপুত্রনদ এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ১২—সালের কার্ত্তিক মাসের ২৯এ তারিখে প্রভাত সময়ে যদি কেহ জামালপুরের নীচে ব্রহ্মপুত্র পার হইতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে ভিন্ন দেশীয় দুইটী লোক ডুলিতে চড়িয়া খেয়া নৌকায় যাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অন্যটী যুবক।

ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ডুলি সেরপুরাভিমুখে চলিল। সেরপুর জামালপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বেলা নয়টার সময় ডুলি দুইটী সেরী নদী তীরে উপস্থিত হইল। সেরিনদী পার হইলেই সেরপুর। সেরপুর ময়মনসিংহ জেলার একটী প্রধান স্থান। এই স্থানে পুলিসথানা, দেওয়ানী আদালত, বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। মিউনিপালিটী রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সহর সেরপুর। সেরপুর প্রাচীন স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ সেরখাঁ কর্ত্তৃক ইহা সংস্থাপিত। সেরপুরের নিম্নবাহিনী নদীও তাঁহারই নামানুসারে সেরিনদী বলিরা পরিচিত। সেরপুর যে পরগণার অন্তর্গত তাহার নামও সেরপুর। ফলতঃ সহর সেরপুরকে সেরপুর পরগণার রাজধানী বলা যাইতে পারে। সেরপুর পরগণা অতি বিস্তীর্ণ। সুন্দরবনে না যাইয়া এখানে আসিলে অনেকে আবাদের জমি পাইতে পারেন। ইহার অনেক ভূমি এখনও জঙ্গলাকীর্ণ বা অনাবাদ অবস্থায় রহিয়াছে। গারো পাহাড় ইহার সন্নিহিত। সেরপুর হইতে উত্তরদিকে কিঞ্চিদ্দূর গেলেই স্বাভাবিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

সেরপুর পরগণার জমিদার বৈদ্যবংশীয় বিখ্যাত ভূম্যাধিকারীদিগের বাস সহর সেরপুরে। ইহাদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট। বাড়ীতেই তিনি কাছারি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ডুলী দুইটী তাঁহারই ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল।

ডুলি হইতে নামিয়া বৃদ্ধ এবং যুবক এক পুষ্করিণীতে অবগাহন করিল এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কখন কাছারি বসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে

লাগিল। বেলা দুইটার পর জমিদার প্রভু তাঁহার অবৈতনিক বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। দুএকখানি দরখাস্ত লইবার পরই মোকর্দ্দামার ডাক আরম্ভ হইল। দুএকটী ক্ষুদ্র মোকর্দ্দামার ডাক হইবার পরেই ডাক পড়িল "নিত্যানন্দ দাস বাদী হাজীর? কেহ উত্তর দিল না। আসামীর নাম ডাক পড়িতেই সেই ভূমিস্থিত বৃদ্ধ কহিল হাজির। হাকিম গরম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাদীর মোক্তার কে?" মোক্তার রাধামোহন দাস উত্তর করিল "হুজুর আমি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "বাদী কোথায়?" মোক্তার বলিল আজ্ঞে আমি জানি না। বিদেশী মক্কেল দরখাস্ত লিখে দি'ছিলাম আর খবর নাই। মেদিনীপুরে তার বাড়ী। আসামী উত্তর করিল "আজ্ঞে আমারও বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়।" আমার চৌদ্দপুরুষে আমি কখনও এ দেশে আসি নাই। আদালতের ওয়ারেণ্ট দেখিয়াই আমি অজ্ঞান। বাদী হাজির হইবে না তা ত আমি জানিতাম। যে বাদী তাও বুঝিতে পারিতেছি। যে দুর্ভোগ ভুগিয়েছে তা ত আর শোধ হবার নয়। বাড়ীথেকে দু'পা বাড়াতে পারি না।" হাকিম দেখিলেন লোকটীর চেহারা অত্যন্ত রোগা। পুনরায় রাধামোহন মোক্তারকে কহিলেন "বাদী হাজির কর্ত্তে পারবে?" "কেমন করে পার্‌ব হুজুর?" বলিয়া মোক্তার উত্তর করিল। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন "তা হ'লে আসামী খালাস হ'ক।" মোক্তার বলিল "তাহাতে আপত্তি নাই।" এই সময়ে আসামী কহিল "হুজুর খালাস ত দিলেন কিন্তু সে বাদীর কিছুই হল না। যে ভাবের মোকর্দ্দামা হুজুর শুন্‌লে বুঝতে পার্‌বেন। গ্রামের একটী লোক রামসুন্দর তাঁহার সহিত আমার বিবাদ। বিবাদ এই যে তিনি লোকের প্রতি অযথা অত্যাচার করেন, আমি তাহা সহ্য কর্‌তে পারি না। সেই জন্য পরোক্ষে দুএক কথা বলিয়াছিলাম। গোপাল নামে তার একটী সর্ব্বকর্ম্মা চাকর আছে। সে ব্যাটা লোকের সর্ব্বনাশ করিতে মজবুত। আমাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে সেই এসে হুজুর আদালতে এই দরখাস্ত দিয়েছে। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার যা আছে তাতে গোপালের মতন লোক দুচারিজন আমিই চাকর রাখ্‌তে পারি।" হাকিম এই কথা শুনিয়া রাধামোহনের নিকট বাদীর চেহারা কিরূপ ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধামোহন যাহা বলিল তাহাতে মধুমণ্ডল পরিষ্কার বুঝিল যে সে গোপাল ভিন্ন অন্য কেহই নহে। এখন আর পাঠককে বলিতে বাধা নাই যে হাজিরা আসামী বৃদ্ধ

মধুমণ্ডল আর দ্বিতীয় বুনিতে তাঁহারই পুত্র ব্রজগোপাল। গোপাল সেরপুরে আসিয়া যে নালিস করিয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে মধুমণ্ডল নামে এক ভৃত্য তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। গোপাল বা নিত্যানন্দ শীতলপাটীর কারবার করিতে আসিয়াছিল। মধুর কাছেই তাহার টাকাকড়ি যা কিছু ছিল। মধু তাহা লইয়া চম্পট দিয়াছে। এমন ঘটনা কল্পিত হইলেও সহজেই তাহা সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মে। হাকিম মধুর নামে ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলেন। তাই-মধুকে মেদিনীপুর হইতে ময়মনসিংহের সেরপুরে আসিতে হইয়াছে। এখন মোকর্দ্দামার ফরিয়াদি ফেরার। হাকিম বলিলেন "আসামীকে খালাস দিলাম। বাদীর অনুসন্ধান করিয়া ফল নাই। মিথ্যা নালিস করিয়াছে বলিয়া তার নামে মোকর্দ্দামা চলিতে পারে বটে কিন্তু প্রমাণ বড়ই দুর্ব্বল হইবে। অপরিচিত লোক এখানে একদিন দু'দিন মাত্র রহিয়াছে। যে মোক্তার দরখাস্ত নিয়েছেন তিনিই হয়ত বলিবেন আমি তাকে ভাল করে চিন্‌তে পারিব না।" রাধামোহন অমনই আম্‌তা আম্‌তা আরম্ভ করিলেন "আজ্ঞে তা'ত বটেই একদিন মাত্র দেখা, তা'তে কি চেহারা ঠিক করে রাখা যায়?" মধুমণ্ডল দেখিলেন গোপালের নামে নালিস করিয়া ফল লাভ করা কঠিন। সে বিষয়ে তিনি পীড়াপীড়ি করিলেন না। মনে মনে একবার সেই ব্রহ্মাণ্ডের বিচারপতির নিকট গোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া পুত্রকে কহিলেন "চল ঘর যাই।" পুনরায় সেই দুই ডুলিতে উঠিয়া তাঁহারা জগন্নাথগঞ্জে আসিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে এই ৭টী স্তরের বা প্রদেশের একটু বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সপ্তম বা সর্ব্ব নিম্নস্তর। এখানেই সর্ব্বজাতির সর্ব্বধর্ম্মের নরক প্রদেশ। ইহা অন্ধকারময়, মরুময়, বায়ু এমনি ভারী যে বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। আটাময় চট্‌চটে পাঁকে বেড়ান যেমন কঠিন এখানে বেড়ান তেমনি কঠিন, বেড়াইলে গাত্রে চট্‌চটে পাঁকের ন্যায় বায়ু গাত্রে লাগে। ইহা ত অল্প কথা, আত্মারা তাহা ছাড়া আপনার নরক আপনারা সৃষ্টি করিতেছে।

এখানে আছে—খুনী, অপব্যয়ী, মদ্যপ, অতি ঘৃণিত অপরাধকারীগণ, এবং আত্মঘাতী। সেই দুর্জয় প্রতিহিংসা, সেই দুর্জয় ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, সেই পাপ কার্য্যের লালসা সকলই হৃদয়ে জ্বলিতেছে—নাই কেবল দেহ, সুতরাং আশা চরিতার্থ বা "ভোগ" করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে তাহারা যেমন করিয়া বেড়াইত এখানে তাই করিতেছে, মদ্যপের আত্মা মদের দোকানে, বেশ্যাসক্তের আত্মা বেশ্যার বাড়ী বাড়ী, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আরও পৃথিবীর লোকের হৃদয়ে আপনার মনোমত পাপ করাইবার জন্য প্রবৃত্তি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আঁস্তাকুড়ে, ছাঁচতলায়, পাইখানায় কত নরপিশাচের আত্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা পৃথিবীর দেহ-সম্বন্ধ ছাড়িয়াছে বটে কিন্তু আত্মা সেই পৃথিবীতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ছাড়িতে পারে নাই। রিপু থাকিতে নড়িতে পারিবে না। রিপু ছাড়িলে উপরে উঠিবে।

ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ স্তর। এই তিনটি স্তরের কথা একত্রে বলা যাইতে পারে। ইহাদের এখনও পৃথিবীর সহিত সংস্রব আছে কিন্তু যত উচ্চে উঠা যাইতেছে ততই সূক্ষ্ম হইতেছে। ষষ্ঠ স্তরে আত্মার সংখ্যা বড় বেশী। অতি তুচ্ছ বিষয়ে মায়া ও পার্থিব বন্ধনে যাহারা জড়িত তাহারা, যাহাদের হৃদয়ের আশা হৃদয়ে আছে পুরে নাই তাহারা এবং যাহারা ভোগবিলাসী ছিল তাহারা, এইখানে ক্রমোন্নতির আশায় বসিয়া সময় যাপন করিতেছে। এখানকার আত্মারা অসন্তুষ্ট, অস্থির, চঞ্চল আর আপন আপন মনাগুণে পুড়িতেছে। যাহাদের বাসনা শীঘ্র ক্ষয় না হয় তাহাদিগকে এখানে অনেক দিন যাপন করিতে হয়। এখানকার আত্মাদের দোষ এই যে তাহারা পৃথিবীর সংস্রব খুঁজিয়া বেড়ায়, পার্থিব বিষয়ে মিশে। মিডিয়ম সাহায্যে বা মানবদেহ আধারে আবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর লোককে মনের কথা বলে এবং ঐ আধারের দেহ সাহায্যে কতকটা ভোগও করে। প্রায়ই এই প্রদেশের আত্মারা মূর্খ আর তাহাদের আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

তৃতীয় স্তর। এখানেও মূর্খের দল কিন্তু জীবন সাধু ছিল, কতকটা ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা নিজের উন্নতি করিয়াছে তাহারাও এখানে। স্বার্থপর দেশ-হিতৈষী, পর-হিতৈষীরা এখানে। এখানে আসিয়াও তাহারা বিদ্যালয় স্থাপন করে, ধর্ম্ম প্রচার করে, উন্নতি-কল্পে সভা-সমিতি করে, ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করে। মিডিয়মের সাহায্যে

পৃথিবীর লোক পাইলে মহা আনন্দে আপনাদের ভাব ব্যক্ত করে ও পার্থিব বিষয়েও মিশিতে চেষ্টা করে ও মিশিতে পাইলে ছাড়ে না। ইহারা সকলে আপনা লইয়া ব্যস্ত। এক এক ধর্ম্মাবলম্বী বহুলোক এখানে একত্রে দেখা যায়। পৃথিবীতে একই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একটু একটু প্রভেদ লইয়া যেমন স্বতন্ত্র দল ছিল এখানে সেরূপ নাই।

দ্বিতীয় স্তর। অনেকটা তৃতীয় স্তরের মত। কিন্তু এখানে মূর্খ নাই সব অর্দ্ধশিক্ষিতের বা শিক্ষিতের দল। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সেবা করিয়াছেন কিন্তু স্বার্থপরতার খাতিরে—তাঁহারা এখানে। অপেক্ষাকৃত উচ্চভাবের ধার্ম্মিকও এখানে। মানব আধার পাইলে, কখন কখন বাগ্মীতা সহকারে, আপনাদের মনোভাব সানন্দে ব্যক্ত করেন।

প্রথম স্তর। এ স্থান নিতান্ত মন্দ নয়। বড় বড় পণ্ডিত লোক বটেন কিন্তু পার্থিব ভাবে ভোর, তাঁহারা এখানে। বড় বড় গণিতবেত্তা এখানে থাকিয়া পার্থিব নূতন তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া ভাবিতেছেন। মস্তিষ্করাজ্য লইয়া ব্যাকুল, হৃদয়-রাজ্যের সাহায্যে সুখময় স্থানে যাইবেন যে তাহাতে লক্ষ্য নাই।

সকল আত্মাই একদিন, যতদিন পরেই হোক না কেন, সুখময় স্থানে যাইবে—কিন্তু যাহারা পৃথিবীতে একদিনের জন্যও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে নাই একদিনের জন্যও মস্তিষ্ক কি হৃদয়-রাজ্যের ভাবে ভোর হয় নাই, একদিনের জন্যও “আপনা” ছাড়া আর কিছু আছে মনে করে নাই—তাহাদের আত্মা যাইতে পারিবে না। যাঁহারা সুখময় স্থানে যাইবেন তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীর আবার শব-দেহের ন্যায় সূক্ষ্ম আবরণ (অপেক্ষাকৃত স্থুল) ত্যাগ করিবে। মহানিদ্রায় জড়দেহ ত্যাগ যেরূপে হইয়াছিল, সূক্ষ্মদেহে একবার সেই অভিনয় বা সূক্ষ্ম-মৃত্যু হইবে। সূক্ষ্ম আবরণ ছাড়িয়া একটু অচৈতন্য থাকিয়া অনির্বচনীয় সুখে চৈতন্য আসিবে। এই হইতেছে স্বর্গস্থান। প্রথমে আত্মা কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগই অনুভব করে পরে জ্ঞানচৈতন্য আসিলে দেখিতে পায় যে সেখানে আরও আত্মা আছে। ভালবাসার পাত্রের মুখচ্ছবি নয়নে পড়ে। তখন জীবন্ত জ্যোতির মধ্যে তখন জীবন্ত সুরের, সুরব্রহ্মের, মোহকর সঙ্গীতধ্বনিতে ভাসমান হইয়া আত্মা দেখিতে পায়, যে ভবে যাহাদিগকে প্রাণভোরে ভালবাসিয়াছিল তাহারাই তাহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। আত্মা এই বর্ণনাতীত সুখভোগ করিতে থাকুক আসুন পাঠক মহাশয় আমরা একবার স্বর্গস্থান দেখিয়া লই।

এই স্থান খৃষ্টীয়ানদের 'হেভেন' (Heaven), মুসলমানের স্বর্গ (জান্নৎ), হিন্দুদের দেবলোক, বৌদ্ধের সুখাবতী এবং থিওজফিষ্টগণের দেব-চান। এই স্থান সুবিশাল মনোরাজ্যের একাংশ এবং সুরক্ষিত—পাপ তাপ দুঃখ প্রবেশ করিবার উপায় নাই। মনুষ্য-জগতের বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার যাঁহাদের উপর আছে সেই সব আধ্যাত্মিক জগতের মহাত্মারা এই স্থান রক্ষা করিতেছেন। সমগ্র স্বর্গে ক্রমোন্নতি বিকাশের যে প্রধান প্রধান স্তর বা লোক আছে, সেই তুলনায় এই স্থান তৃতীয় স্তর বা লোক অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া জড়জগৎ (ভূ) ও প্রথম সূক্ষ্ম জগৎ (ভুবর্লোক) এই দুইটি স্তর বা লোকের পর এই স্বর্গস্থান (স্বর্লোক)। এই স্থান মানবের পশু প্রকৃতির নহে, এই স্থান মানবের দেব প্রকৃতির জন্য। যে সূক্ষ্মদেহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহারই "স্বদেশ" বটে। যখন আত্মার কিছু উন্নতি হয় নাই তখন প্রথম আগমনে আত্মাকে মেঘের ন্যায় দেখিবে, পরে উন্নতি সহকারে জ্যোতির্বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন বিশিষ্ট দেব-মূর্ত্তির ন্যায় দেখিবে। এখানে আত্মার যে দেহ-আবরণ তাহাই নিত্য, চির-কাল স্থায়ী, অমর আত্মা-দেহের শেষ আবরন, সেই আবরণই আত্মার যথার্থ ও উপযুক্ত কোষ-দেহ আর তাহাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, আরও তাহাই (বাইবেল কথিত) সেণ্টপলের Spiritual body বা দেব-শরীর। এই স্বর্গস্থান আবার পূর্ব্বোক্ত নরক-দেশের (ভুবর্লোক) ন্যায় ৭টি প্রদেশে বা স্তরে বিভক্ত। স্থূলত নিম্নকার ৪টী এক ভাগে ও উপরের ৩টী আর একটি ভাগে পড়িবে। নিম্নের ৪টী স্তরের সূক্ষ্ম-সামগ্রী হইতে "আত্মার" দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। উপাদান হইতেছে—তর্ক, যুক্তি বিচারশক্তি। আর শেষোক্ত ৩টি স্তর হইতে "অমর-আত্মার" দেহের পুষ্টি হয়, উপাদান হইতেছে আত্মজ্ঞান বা আত্মদৃষ্টি, হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি। প্রথমোক্ত ৪টী স্তরে যে সকল আত্মারা বাস করেন তাঁহারা মনোরাজ্য লইয়াই আছেন এবং তাঁহাদের যাবতীয় মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু তাঁহাদের উদ্ভাবনী বা সৃষ্টি-শক্তি এত প্রখরা যে পৃথিবীর লোক চিন্তা করিয়া তাহা অনুমান করিতে পারে না। পৃথিবীতে চিত্রবিদ্যাবিৎ বা ভাস্কর বা সঙ্গীতবেত্তা চিন্তা করিয়া মানসে কল্পনায় যাহা সৃষ্টি করেন জড়জগতের উপাদানে তাহা তাঁহারা আদৌ বিকাশ করিতে পারেন না। পাথর ত আর নরম নয়, রংএর মসলা ত

আর তত সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু স্বর্গের এই প্রদেশের আত্মারা চিন্তা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ চিন্তা আকার পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। তাহার কারণ? "মন ই"—"চিন্তাই" এখানকার গঠনের মালমশলা বা উপাদান কি না? সুতরাং যেমন যেমন চিন্তা অমনি তদনুরূপ আকার সৃষ্টি হইতে থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে যাহার চিন্তা যেমন তদনুরূপ আকারে তাহার স্বর্গ প্রদেশ পূর্ণ হইবে। তবেই আত্মা আপনার স্বর্গ আপনিই সৃষ্টি করিতেছেন, অতি সুন্দর সুন্দর চিন্তা দ্বারা অতি রম্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতে পারেন। যেমন মনের শক্তি বাড়িতেছে অমনি স্বর্গ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, রম্য হইতে রম্যতর, সুখময় হইতে অতি সুখময় হইতেছে। অনুদার চিন্তায় স্বর্গ ছোট ও অনুদার হইবে। বড় উদার চিন্তায় স্বর্গ বিশাল ও উদারতাময় হইবে। স্বার্থপরতার কণা যদি থাকে তবে স্বর্গ সেই পরিমাণে অসুখময় হইবে। যিনি পরের জন্য প্রাণটা ভাসাইয়া দিয়াছেন তিনি স্বর্গ-সুখের সাগরে সাঁতার দিতেছেন। বাইবেলের কথা এইখানে প্রতিপন্ন—যেমন কার্য্য তেমনি ফল, যেমন বীজ রোপন করিবে তদনুসারে ফল পাইবে। পৃথিবীতে উচ্চভাবের যে কার্য্য, যে প্রয়াস, যে স্ফূর্ত্তি হইয়াছে ও হয় এখানে সেই সব, আত্মার নিজস্ব হইয়া দাঁড়ায় ও একেবারে আত্মার স্বাভাবিক গুণে ও শক্তিতে পরিণত হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে যে যত অধিক ভাল কাজ করিয়া আসিবে এখানে সেই পরিমাণে আত্মায় তত অধিক শক্তি পাইবে। পৃথিবীতে ১০৲ বেতনের কেরাণী হইয়া যদি প্রতিদিন শত লোককে অন্নদান কিসে করিব, এই চিন্তা করিতে করিতে, সম্পন্ন না করিয়া—মরিয়া থাক তবে, ঐ চিন্তার বলে এখানে আসিয়া তোমার এমন শক্তি জন্মিবে যে যখন তুমি পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে তখন সেই শক্তির বলে তুমি প্রতিদিন শত লোককে অনায়াসে অকাতরে অন্ন দিতে সক্ষম হইবে, কোন বিঘ্নবাধা, বিপদ, অসুযোগ হইবে না। চিন্তা-শক্তির এই বলে ও ফলে আজিকার ছাত্র একদিন এই পৃথিবীতে মহান্ প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, আজিকার পূজক সন্ধ্যা-আহ্নিককারী ব্রাহ্মণ একদিন পরমহংস হইয়া, ঋষি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। আর এক কথার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি, যে যাহাকে ভালবাসে এই প্রদেশের আত্মার মধ্যে সে তাহাকে জীবন্তভাবে সেইখানে পায়। যদি তুমি ভূমণ্ডলে দশ জনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া

তাহাদের নানা প্রকারে উপকার করিয়া থাক তবে মৃত্যুর পর যদি এই প্রদেশে কখনও আসিতে পার তবে সেই দশজন অনুক্ষণ হাসিয়া হাসিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমায় ভালবাসিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। কিন্তু একটা কথা আছে। তোমার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী যদি পাপী হয়, যদি এখানে আসিবার ক্ষমতা সে আত্মার না হইয়া থাকে? তাহা হইলেও তাহাকে মূর্ত্তিতে পাইবে, ছায়ার ন্যায়, ছবির ন্যায় পাইবে। কিন্তু তার যদি আবার—সেই ভালবাসার পাত্রের, সেই বন্ধুর, আবার তোমার মত আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তাহাকে প্রাণেতেও পাইবে। অর্থাৎ সেই ছায়াতে ও সেই ছবিতে প্রাণ সঞ্চার দেখিবে। ভব-কারাগারে মহামায়ার যে মায়া-কুয়াশা বিকশিত আছে তাহার একটু, অতি অল্প হইলেও—এখানে প্রকাশ আছে। মনুষ্য-আত্মা যে ক্রমোন্নতির স্তব-সোপান। আসুন তবে একবার স্বর্গের স্তরগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া লই।

সপ্তম স্তর বা সর্ব্বনিম্ন স্তর—যাঁহারা কেবল আপনার পরিবারবর্গকে বা বন্ধুবর্গকে ভালবাসিয়াছেন—ভালবাসার মতন ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহারা এখানে। ইঁহাদের ভালবাসা বা প্রেম একদেশদর্শী সুতরাং সঙ্কীর্ণ হইলেও অকপট বটে। ধর্ম্মের উচ্চভাব বা মনুষ্য-জীবনের উচ্চভাব ইঁহাদের নাই। ইঁহাদের উন্নতি ও সুখ সুতরাং কম হইলেও যে টুকু নিজ কৃতকার্য্যের ফল, তাহাই ভোগ করেন।

ষষ্ঠ স্তর। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের ধার্ম্মিকগণ, এই স্থানে। ধর্ম্মের উত্তেজনায়, ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন ও যিনি যে ভাবে ভবে ঈশ্বরকে পূজা করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে ভগবান-কে এইখানে দেখিতে পাইতেছেন। খৃষ্টীয়ান যীশুকে দেখেন, হিন্দু এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন। ভক্তির পন্থা বিবিধ হইলেও গম্যস্থান যে এক। জীবন্ত ঈশ্বরের সম্মুখে এক একটি ধার্ম্মিক পরিবার সকলে একত্রে রহিয়াছেন দেখিতে অতি সুন্দর। ভগবানকে এই স্থানে বালখৃষ্ট বা বালকৃষ্ণ ভাবে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম স্তর। এখানকার আত্মারা কেবল ভগবানকে ভালবাসিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না—অনেক কার্য্য করিয়াছেন, দীনহীন মানবের জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা অপর মানবকে, ভগবানকে কি করিয়া

ভালবাসিতে হয় তাহা শিখাইয়াছেন। ইঁহারা সেই শক্তির এখানে ক্রমাগত পুষ্টিসাধন করিতেছেন এবং স্বভাবদত্ত যৌতুকধন লইয়া পৃথিবীতে যখন জন্মিবেন, তখন বড় বড় ধর্ম্ম-সংস্কারক বা লোকপালক হইয়া আসিবেন।

চতুর্থ স্তর। এই স্থান বাসী আত্মাদের বিবিধ প্রকার আছে। যাঁহারা গুরু হইয়া শত শত আত্মার জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন তাঁহারা এখানে—এখানেও তাঁহারা শত শত আত্মাকে সুশিক্ষা দিতেছেন। যে সকল আত্মারা ছাত্রভাবে ইঁহাদের উপদেশ শুনিতে পান তাঁহাদের উন্নতির গতি বড়ই প্রখরা। এই সকল মহানুভব আত্মা আবার গুরুবেশে পৃথিবীতে যাইবেন, আবার সহস্র সহস্র জীবকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে আনিবেন। এই প্রদেশে আরও দেখিতে পাওয়া যায়—সূক্ষ্ম-শিল্প ও সাহিত্য-জগতের গুরুগণকে। আবার ইঁহারা শিল্পবীর সাহিত্যবীর হইয়া ভবে আসিবেন। আরও দেখা যায় এখানে বড় বড় বৈজ্ঞানিক। যখন আবার ভবে আসিবেন তখন বড় বড় প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্ভাবনকর্ত্তা ও আবিষ্কর্ত্তা হইবেন। এই স্থানের কথা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। মানুষে এখানকার জীবন্ত জ্যোতির ও মোহিনী সুর-শক্তির বর্ণনা করিতে অক্ষম। সে বর্ণনার সময়ও নাই।

তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম স্তর। এই তিনটি স্তরের কথা একেবারে বলা যাউক। এখানে আত্মা স্বীয় স্বরূপে, একেবারে মায়াপারে—সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য সবই লাভ করিয়াছে। মানবের আত্মা এখানে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একবার মৃত্যু হইলে মানুষ এতদূর না উঠিয়া এই স্থান না স্পর্শ করিয়া পুনরায় ভবে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। নিম্ন-দেশের যে সকল আত্মা, সেই সেই দেশ উপযোগী তাহারাও তৃতীয় স্তরের নিম্ন সীমা অন্তত স্পর্শ করিয়া পুনরায় জন্ম লইবে, একবার বুড়ী ছুঁইয়া যাইতে হইবে। বলা বাহুল্য অধিকাংশ আত্মার ভাগ্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু নিম্ন আত্মারা অতদূর উঠিবার সময় জ্ঞানে, জাগ্রত অবস্থায় থাকিতে পারে না—ঘুমাইয়া পড়ে, যেমন মাতৃগর্ভে জরায়ু মধ্যে শিশু থাকে সেই অবস্থায় আসিয়া, ঘুমে বা স্বপনে আসিয়া, স্থান স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। শিশু কানাড়ার আলাপ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে না? কিন্তু এই আত্মা আসিতে আসিতে ভুব স্ব সকল স্থান হইতে স্বীয় আবরণ সাহায্যে একটু

একটু উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়—মন্দও লয়, আর যাহা ভাল ও পবিত্র তাহাত লইবেই। এই স্তর আরোহণকালে যাহা সংগ্রহ হয় তাহাতেই আত্মার পুষ্টি বৃদ্ধি, উন্নতি পক্কতা হয়। স্বর্গের তৃতীয় স্তরে এইরূপে আমরা অযুত অযুত আত্মাকে দেখিয়া এই কথা শিক্ষা করিতে পারি—কতকগুলি আত্মা স্থূলকোষ বা আবরণ সহ বিদ্যমান কিন্তু অধিকাংশ আত্মাকেই এই কোষ-বিবর্জিত অবস্থা বা "আবরণ ঝরিয়া পড়া অবস্থা"তে দেখিতে পাই। সকল প্রকার উন্নতির অবস্থার আত্মাকে এই স্থানে দেখা যায়—এই কাহারও উন্নতির সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে, আবার কাহারও অপেক্ষাকৃত উন্নতির পক্কাবস্থা। যাহাদের পক্কাবস্থা তাহারা আর ঘুমন্ত নহে, তাহারা ব্যাপারটা কি দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে ও আত্মার স্বরূপ কি তাহাও জানিতে পারে। মায়া তখন আর বড় বিড়ম্বনা করে না। কানাড়া কি, এখন সে জানে ও আলাপও বুঝে।

স্বর্গের যতদূর উচ্চ স্তবের কথা বলা হইয়াছে তাহার পরের বা উপরের দেশের (মহর্লোক) কথা এখন শ্রবন করুন। এখানকার আত্মারা মানসিক শক্তি বা নৈতিক উন্নতির উচ্চতম স্থানে, শীঘ্রই মানব-জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে। এখানে তাহারা ভূত-জীবনের ব্যাপার স্মরণ করিতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ কিরূপ হইতেছে, কোন পথে যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সমশ্রেণীর আত্মার সহিত মনোভাব বিনিময় করেন ও পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য কবেন। ইঁহারা পৃথিবীতে জন্ম লইয়া অধিক দিন থাকেন না। পৃথিবীতে অবস্থানকালে শরীর ইঁহাদের একেবারে দৃঢ় শাসনে থাকে ও ইঁহাদের চরিত্র অতি উন্নত, অতি সদাশয়, অতি উদার ও অতি দৃঢ় হইয়া থাকে। চৈতন্যের যে পরিমাণে প্রসন্নতা হইয়াছে, আত্ম-দৃষ্টি যতটুকু হইয়াছে, তাহা আর যাইবার নহে—তাহা যায় না এবং তখন তাঁহারা জগচ্চৈতন্যে একেবারে মিশিয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত। এই জগচ্চৈতন্যে যখন তাঁহারা সংমিলিত হন, তখন তাঁহারা মানবদেহে মানব মস্তিষ্ক লইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম কথা স্মরণ করিতে পারেন, এবং বহু জন্মের কথা বলিয়া দিতে পারেন।

যতদূর বলিয়াছি তাহার উপরেও লোক আছে (জনলোক ও তপলোক) এখানে মহাগুরুগণের, পরমগুরুগণের, পরাপর গুরুগণের ও পরমেষ্টি গুরু-

গণের আবাস স্থান। সে দেশের কথা বলিতে গেলে কাজ ভাল হইবে না, মনে হইতেছে কুলাইবেও না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান ভাব বৃক্ষের মূল এই স্থানে—আর এই স্থান হইতেই চিন্তাজ্যোতি, শক্তিজ্যোতি ও ভাবজ্যোতি পৃথিবীতে ধারা বহিয়া প্রবাহিতহইতেছে। এই খানেই প্রতিভার শক্তির ভাবের ভাণ্ডার। সেই ধন্য যার উপর এই জ্যোতি বিকীর্ণ হয়।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা প্রকৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই—ইহা নিশ্চয়। কিন্তু থিওজফিষ্টগণের মধ্যে যাঁহারা দেহ ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন এবং তাঁহারা জনে জনে যাহার বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন তাহাই, মৃত্যুর পরের কতকটা অবস্থা অতি অকর্ম্মণ্য ও ক্ষীণভাবে বর্ণিত হইলেও হইয়াছে। ইহাতে অযথা কিছুই নাই, অসম্ভব কিছুই বলা হয় নাই, সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন এবং জাগ্রত অবস্থায় দেহে থাকিয়াও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই সকল দর্শকের পক্ষে এবং ইঁহাদের আনুসঙ্গিক দলের পক্ষে মৃত্যুটা ত কিছুই নয়। মৃত্যু, দেখা যাইতেছে, একটা বিশাল জীবনে প্রবেশ করিবার দ্বার মাত্র। আত্মার নির্ব্বাসন হইতে স্বকীয় দেশে, জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন মাত্র, কারাগার হইতে স্বাধীনতায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপায় মাত্র। চৈতন্যের এমন অবস্থা আছে যাহাকে কবি টেনিসন বলিয়াছেন "Death seems a ludicrous impossibility." (মৃত্যুটা একটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত অসম্ভব কথা)। যিনি একবার এই চৈতন্য আস্বাদ করিয়াছেন তাঁহার মনে, মৃত্যুর পর মানুষের যে কি অবস্থা হয় তদ্বিষয়ে, আর কোন অবিশ্বাস থাকিতে পারে না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে মানব-জীবনের শেষ নাই, সীমা নাই, তবে মধ্যে মধ্যে জীবন মৃত্যুকে গ্রাস করিয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

শূদ্রমণি রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়।

(২)

গতবারে ঘটক কারিকা হইতে আমি যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম সে সকলই সম্মাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধির নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় অমূল্য গ্রন্থ, বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের ফল এবং বাঙ্গালা হিন্দুসমাজের পারিবারিক তথ্য নির্ণয়ে আমাদের এক মাত্র সহায়। সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্টাংশ মুদ্রিত হইতেছে। সেই অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে অনুগ্রহ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বড়িশার সাবর্ণবংশ ও পাটুলীর শূদ্রমণিদিগের যে বিবরণ আমাকে দিয়াছিলেন, আমি তাহাই মুদ্রিত করিয়াছি। এ গবেষণার গৌরব তাঁহার প্রাপ্য। এবং ইহাতে যদি কোন ভুল থাকে তাহার জন্য তিনি দায়ী। ইতি মধ্যে বড়িশা হইতে সাবর্ণবংশের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সঙ্গে মেলমালার বংশ তালিকার অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে। সেওড়াপুলীর রাজবংশ আমাকে জানাইয়াছেন যে পাটুলীবংশের ইতিহাসে কোথায় কোথায়ও আমার ভ্রম হইয়াছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিবিউতে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহাতে লিখিত আছে যে নবাব মুরসিদকুলী খাঁ যাঁহাকে শূদ্রমণি উপাধি প্রদান করেন তাঁহার নাম মনোহর রায়। মনোহর রায়ের নাম আইন আকবরীতে পাওয়া যায়। তিনি আকবরের সমসাময়িক। মুরসিদকুলি খাঁর অনেক পূর্ব্বের লোক, তাঁহাকে মুরসিদকুলী শূদ্রমণি উপাধি দিবেন সম্ভব নহে। কলিকাতা রিবিউর প্রবন্ধ লেখকের ভুল হইয়াছিল। বংশ তালিকাতেও মনোহর রায় আকবরের সময় সাময়িক বলিয়া অনুমান করা যায়। তিনি সভাপতি রায় উদয় দত্তের ভ্রাতা ছিলেন। সেওড়াপুলীর রাজবংশ এ ইতিহাস লিখিতে আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং আমার ইতিহাসে যদি কোন অংশ ভ্রমযুক্ত বা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ভ্রম স্বীকার করিতে আমি কখন কুণ্ঠিত হই না। গতবারে পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যের উল্লেখ না করাতে পণ্ডিত মহাশয় দুঃখিত হইয়াছেন, হইবারই কথা, আমার ব্যবহার অকৃতজ্ঞের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু এইটী ভ্রম ক্রমে হইয়াছিল, অকৃতজ্ঞতাহেতু নহে, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাপ্য যশ অপহরণে আমার কখন বাসনা হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা গোবিন্দদেবের মৃত্যুর তিন মাস পরে নৃসিংহ-দেবের জন্ম হয়। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তখন বাঙ্গালা বিহারের মসনদে সমাসীন। বর্দ্ধমানের জমিদার একবার এক ষড়যন্ত্র হইতে আলিবর্দ্দী খাঁর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান রাজার পেস্কার মাণিকচন্দ্র আলিবর্দ্দী খাঁকে সংবাদ দেন যে বাঁশবেড়িয়ার রাজা গোবিন্দদেবের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। আলিবর্দ্দী খাঁ গোবিন্দদেবের সমুদয় জমিদারী বর্দ্ধমানের রাজাকে দান করিয়া উপকারীর ঋণ পরিশোধ করিলেন। পাঁচ মাসের শিশু নৃসিংহদেব শত্রুর কৌশলে নিমেষে বিপুল ধনে বঞ্চিত হইলেন। নৃসিংহ-দেব স্বহস্তে এ কথা লিখিয়া গিয়াছেনঃ—"সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয় সেকালে আমি গর্ভস্ত ছিলাম, বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে, খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত-পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মালিকের জমিদারি সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে খামাখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কীসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল, পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখল আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুক-দারের পর এমত বেইনসাপী ও বেদায়ত কখন হয় নাই।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সুখ্যাতি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পেস্কার মাণিকচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অসহায় নাবালকের সহায়তায় কে অধিক অগ্র-গণ্য, পুণ্যবান ও ধর্ম্মশীল, এই কীটদষ্ট পত্রখানি তাহার পরিচয় দিতেছে। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে কালসাগরের মহোচ্ছ্বাসে বাঙ্গালার মুসলমান সিংহাসন অকূলে ভাসিয়া যায়। ষোলবৎসরে সাতজন নবাব মুরসিদাবাদে নবাবীর অভিনয় করেন। নর্ত্তকী ও ক্রীতদাসেরা ক্রীড়াপুত্তলিকাদিগকে অঙ্গুলী সঞ্চালনে যথেচ্ছ সঞ্চালিত করে। হীনবীর্য্য অকর্ম্মণ্য নবাবেরা মাদক সেবনে, চাটুকারের সংসর্গে বা নর্ত্তকীর সংলাপে রাজকার্য্যের গুরুত্ব বিস্মৃত হইতেন।

পাঁচশত বৎসরের মুসলমান সাম্রাজ্য সময়ের ফুৎকারে উড়িয়া গেল। মুসলমানেরা আততায়ী শক্রর ন্যায় ভয়ঙ্কর না হইলেও প্রতিপালক রাজার ন্যায় কোন দিন প্রজার প্রণয়পাত্র হইতে পাবে নাই। বনে শিবিরে উপনিবেশের ন্যায় তাঁহারা বাঙ্গালায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থিতি শ্রীবৃদ্ধি বা অন্তর্দ্ধানে হিন্দুপ্রজার ইষ্টাপত্য কিছুই ছিল না। এত বড় বিশাল প্রাসাদ একদিনে ভূমীসাৎ হইল, রক্ষা করিবার জন্য এক জন একটী অঙ্গুলীও নাড়ে নাই।

যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, দূরদর্শিতা বা স্বদেশ হিতৈষণা তাঁহাদিগকে পরিচালিত করে নাই। স্বার্থে অন্ধ কয়েক জনে সিংহশিশুর পিঞ্জরে বৃদ্ধ গর্দ্দভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ক্লাইব যখন নবাবের সিংহাসনে লগুড়াঘাত করেন না তিনি জানিতেন যে কাগজের খেলানার ন্যায় এক আঘাতে তাহা চূর্ণ হইবে, না জানিতেন যে ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজ কোম্পানীর উপর এত প্রসন্ন হইয়াছেন যে সেই আঘাতে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া স্বর্ণের উৎস উৎসারিত হইবে।

ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অদৃষ্টের এ নূতন লীলার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। লক্ষ্মীর উচ্ছ্বাসে তাঁহারা আপন কোটা পূর্ণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। প্রজা কাহার, ধন কাহার, বঙ্গের সিংহাসন কাহার বুঝিবার জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করেন নাই। দুরন্ত শিশু ক্লাইব ভাঙ্গিতে যত আনন্দ পাইতেন গড়িতে তত বুদ্ধ খেলাইতে জানিতেন না। বঙ্গের প্রজা ভীত চকিত স্তম্ভিত। দুরন্ত লোকের প্রশ্রয় হইল। অনাথ ও বিধবা, দরিদ্র ভীত ও প্রপীড়িত, কাহার শরণাপন্ন হইবে জানে না। এই সময়ে বঙ্গের বর্ত্তমান বিখ্যাত বংশের অভ্যুদয়। এই সুযোগে বর্দ্ধমানের জমিদার ও নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র অনাথ নৃসিংহের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন।

হিন্দু সমাজের অবস্থা, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষা ভীষণতর। ধর্ম্মের যে উচ্ছ্বাসে চৈতন্যদেব বঙ্গসমাজের কলঙ্ক ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, সে উচ্ছ্বাস এখন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। ভাবের পবিত্রতা অপেক্ষা বাহিরের আড়ম্বর ধর্ম্ম-জীবনের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কবি তখন চাটুকার ধর্ম্মাচার্য্য ধনবানের স্তুতিগায়ক। অধর্ম্মে কেহ পতিত হইত না,

পাষণ্ড ও পামর ধনের আভরণে সমাজে গণণীয় হইত। অনাচার ও ব্যভিচার, দুর্ব্বল পীড়ন ও পরস্বাপহরণ চাটুকার ও হৃদয়হীন ধর্ম্মাচার্য্যের পাদোদকে ধৌত হইত। রাজনীতির ন্যায় সমাজনীতি তখন গলিত পুতিগন্ধময়।

কুমার নৃসিংহদেব পৈতৃক সম্পত্তি পুনরধিকারে কাহার শরণাপন্ন হইবেন? দেশে তখন রাজা নাই—মুসলমান রাজত্ব হারাইতে বসিয়াছে, অক্ষক্রীড়ায় যাহারা পণ মাত্রে রাজ্যেশ্বর হইয়াছে তাহারা ক্ষুদ্র প্রাণ বণিক্‌জীবী। অপহারকদের ঘৃণা করিয়া পদাঘাত করিবার বল সমাজের নাই, কৌলীন্যাভিমানী শ্লীপদ রামেশ্বর হইতে শ্লীলতাবিহীন কাব্যাচার্য্য ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহাদের চৌষট্টীকলার ব্যাখ্যা কবিতে উৰ্দ্ধমুখ। রাজা ধর্ম্ম ও সমাজ তখন ব্যভিচার ও অনাচারের আশ্রয়দাতা।

নৃসিংহদেব ন্যায় বিচারের অপেক্ষায় অষ্টত্রিংশত বৎসর অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তখন ইংরাজী পড়ার চলন ছিল না। নৃসিংহ বাল্যকালে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। বিলাসে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি শান্ত, সদ্বিবেচক ও ধর্ম্মাচরণ প্রিয় ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি অসাধাবণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিষাদের একটী ক্ষীণ ছায়া সর্ব্বদাই নৃসিংহের মুখজ্যোতি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। পিতার মৃত্যুর পরে সংসারের বিপুল ব্যয়ের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু সে আয়ের কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ফৌজদার পীরখাঁর অনুগ্রহে কুলীহাণ্ডা পরগণা রক্ষা হইয়াছিল, সেই কুলীহাণ্ডার আয়ে কোন প্রকারে সংসার খরচ চলিয়া যাইত। উচ্চাসন হইতে অবনত হওয়া, লক্ষ্মীর কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া দারিদ্র্যের ভীষণ ভ্রুকুটী সহ্য করিতে সহৃদয় লোকের প্রাণান্ত ঘটে। নৃসিংহের বিষণ্ণতা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

নৃসিংহের প্রৌঢ়াবস্থায় বাঙ্গালার অরাজকতার কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়। লোভ ও হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও অধার্ম্মিকতা, সহস্র নীচতায় কলঙ্কিত হইলেও হেষ্টিংস যে একজন ক্ষমতাবান শাসন কর্ত্তা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনিই বাঙ্গালায় ইংরাজ শাসন স্থাপনের প্রথম উদ্যোগী। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের চরিত্র নিতান্ত কলুষিত। হেষ্টিংসের অনুগ্রহে গঙ্গাগোবিন্দ দেওয়ান, গঙ্গাগোবিন্দের সহায়তায় হেষ্টিংসের প্রভুত বল। স্থাপনে

যেমন দক্ষ ধ্বংসে তেমনি নিপুণ—গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের নিত্য-সহচর। অত্যাচারী ও প্রপীড়িত সকলেরই তখন ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ। এই গঙ্গা-গোবিন্দ নৃসিংহের স্থায় উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ এবং নৃসিংহের দূর সম্পর্কিত। নৃসিংহ পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য গঙ্গাগোবিন্দের শরণ লইলেন। দেওয়ান যাহার ভরসা ভাবনা তাহার কি? গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যের ফল কি হইয়াছিল, রাজা নৃসিংহদেব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"সন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেস্তর হিষ্টীন সাহেব ও সাহেবান কৌষল হক ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীক করিয়া, আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারির মধ্যে যে সকল মহাল বৰ্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিষ পরগণার সামিল হইয়াছিল সেই মহালাতের জমিদারিতে ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌসল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সমালোচনা।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীবঙ্কুবেহারী বিশ্বাস প্রণীত। চুঁচুড়া "হীরা যন্ত্র" হইতে শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০৪ সাল। মূল্য ৷৷০ আনা।

প্রথম খণ্ডে এই কয়টি বিষয় আছে—গোমুখী প্রান্তর, সমাধির পূর্ব্বভাব, বাণী, কল্পনা-দেবী, সমাধি, ভক্তির পরিচয়, কুটীর-নিবেশ, চিন্তা। দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিষয়গুলি আছে—প্রকৃতি সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিভীষিকা, বিষমা-প্রকৃতি, ভক্তিরসনাথভাব, ভক্তির বিরহভাব, সংশয় দৈত্য, ভক্তির সংসারে পতন, ভক্তি সংসার কারায়, শ্রদ্ধাদেবী, শান্তিদেবীর আবির্ভাব, মিলন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত।

শিরোবচন পাঠ করিয়া পুস্তকের উপাখ্যান ভাগ বুঝিবার উপায় নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ভক্তিরসাশ্রিত কতকগুলি খণ্ড কবিতা গ্রন্থকার একত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত তাহা নহে, একটি ধারাবাহিক গল্প আছে। তবে এ কথা আমাদিগকে অবশ্য বলিতে হইবে, উপাখ্যানভাগে

নাটকের চটক (Dramatic Effect) লাগাইতে গিয়া কবি উপাখ্যানটিকে একটু অস্পষ্ট ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। হোক, তাহাতে ভাবুক পাঠকের একটু পরিশ্রম হয় এই মাত্র—তজ্জন্য রসভঙ্গ হইরাছে বলিয়া আমাদের ত বোধ হয় না। সাধারণ পাঠক কিন্তু বিরক্ত হইবেন।

অতি সংক্ষেপে গল্পটি এই। পথিক তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। একদিন প্রদোষে শ্রান্ত হইয়া গোমুখী প্রান্তরে উপস্থিত। নদীর উপকূলে শিলাখণ্ডে বসিলেন। নিসর্গ লইয়া এ কথা সে কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, অদূরে তাঁহার পরলোকগত অভীষ্টদেবের তপস্যার স্থান। তাহাতে চিন্তাসাগরে একবারে তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। ক্রমে ভাবুক সমাধিমগ্ন হইলেন।—এ সমাধি "সোঽহং"। সমাধি ভঙ্গে ভক্তির সহিত দেখা হইল। ভক্তির তখন যোগিনীবেশ। পথিক ভক্তির সহিত একটি কুটীরে গেলেন, অবশ্য অতিথিভাবে। সেখানে পথিক দেখিলেন, একজন পরমযোগী গুহায় ধ্যানমগ্ন, দ্বারদেশে দুইজন তপস্বী, একটি মৃগশিশু আর একজন স্থবিরা রমণী। স্থবিরা রমণীকে ভক্তিদেবী মা বলিয়া থাকেন। রীতিমত অতিথি সৎকার হইল। তারপর পথিক ভক্তিদেবীকে সম্বোধন করিয়া অনেক গভীর কথা বলিলেন—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা, প্রকৃতির বিভীষিকার কথা আর বিষমা প্রকৃতির কথা। পথিকের প্রাণের ব্যথার কথা শুনিয়া ভক্তিদেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন ভক্তি নিজের পরিচয় দিতে বসিলেন। বলিলেন "আমি নাথের সহিত এক প্রাণ এক আত্মা হইয়া বড় সুখেই ছিলাম কিন্তু সহসা ভেদজ্ঞান হওয়াতে নাথ আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথা অন্তর্হিত হইলেন। আমি খুঁজিয়া পাইলাম না অথচ এক দৈত্য হস্তে পতিত হইলাম। তার নাম সংশয়-দৈত্য। সংশয় আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করিল, অনেক প্রলোভন দেখাইল কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না। তখন দৈত্য রক্ত, মাংস, অস্থি, বিষ্ঠা ও কৃমি সমন্বিত কদর্য্য "দেহপিঞ্জর" কারাগারে আমাকে আবদ্ধ করিল। কারাগারে আমার আত্মবিস্মৃতি হইল। সহসা একদিন দুই দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের পরিচয়ে জানিলাম যে একজন আমার কনিষ্ঠা ভগিনী 'প্রেম' অপরটির নাম 'শ্রদ্ধা'। পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হইল। শ্রদ্ধা দেবীর নিকট আমি দীক্ষিত হইয়াছি, আর তাহারই উপদেশ অনুসারে এই আশ্রমে থাকিয়া অদ্যাবধি

তপস্যা করিতেছি। শ্রদ্ধাদেবী বলিয়াছেন তপস্যা সিদ্ধ হইলে আবার নাথের সহিত আমার মিলন হইবে। এই আশ্রমে আপনি যে পরম-পুরুষ যোগীকে দেখিতেছেন উঁহার নাম "জ্ঞানদেব"। দ্বারদেশে 'শম ও দম' দুই জন তাপস কুমার দেখুন, ঐ প্রস্রবণ উহাই 'প্রেম'। যে পর্ব্বতে এই আশ্রম ইহার নাম 'উদারতা' আর যে পদানত মৃগ শিশুটি দেখিতেছেন ইহার নাম 'মায়া'। এই 'স্থবিরা' শ্রদ্ধাদেবীই আমার মাতা, ইঁহারই উপদেশানুসারে আমি এই জ্ঞানের কুটীরে যে এতকাল তপস্যা করিতেছি তাহার আজ শেষ দিন, আজি ব্রত উদ্‌যাপনের দিন।"

ভক্তি এই সব কথা বলিতেছেন, এমন সময় সহসা সেইখানে শান্তিদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তি ভক্তির চিরসহচরী। শান্তি বুঝাইলেন

"অভেদাত্মা পতি তব ক্ষণকাল তরে
তোমার অন্তর হতে নহেক অন্তর।"

পতির স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া শান্তিদেবী যে কথা বলিলেন তাহাতে পথিকের প্রকৃতির বৈষম্য দেখিয়া মনে যে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গেল। শান্তিদেবী ভক্তিদেবীকে আরও বলিলেন যে বিরহের কাল গত হইয়াছে—তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে, আজি পতিসনে মিলন হইবে।

ওই দেখ তব কান্ত—অভেদ তোমাতে,
বলিতে বলিতে তথা দিব্যজ্ঞান জ্যোতি
হল প্রমুদিত, শত-শশী-প্রভা-নিভ
বিমল কিরণে—কিবা হেরি সুমোহন
অনুপম শোভারাশি—বিশ্বের প্রতিম
ভুবন মোহনে! বামে ভক্তিদেবী রাধা।

মিলন হইল। এ মিলন রাস-লীলা। পতি আর কেহই নহেন ভগবান শ্রীনন্দনন্দন শ্যামসুন্দর মদনমোহন। পথিক তখন সম্ভ্রমে দেখিলেন. ভক্তি-দেবী আর কেহ নহেন শ্রীমতী রাধারাণী রাসমঞ্জরী। তখন সেইখানে রাস-লীলা হইল—শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বেদব্যাস যেরূপে রাসলীলা বর্ণন করিয়া-ছেন, সেই ভাবে, সেই রূপেই হইল কেন না

"বিনোদ বাঁশরী স্মরিয়া নাগরী বাজে—
দয়া মায়া স্নেহ, শ্রদ্ধা প্রেম তপঃ আদি

জীবাত্মার যত রূপ শত শত সবে
ঘিরে চারিভিতে, নাচিতে নাচিতে এল,
কর্ম্মে অনুরতা, যত গোপসুতা এল ভুলি
পুত্র কন্যা পতি, করয়ে মিনতি পদে।"

মহাভাগ্যবান পথিক এই রাসলীলা চক্ষে দেখিলেন এবং গোপিকার সহিত নন্দনন্দনের রাস উপলক্ষে যে কথা হইল তাহাও শুনিলেন। বলিতেছেন—

"হেরিনু নয়নে। সিহরিল অঙ্গ মম
আতঙ্কে, মোরেও যেন গ্রাসিছে অনন্ত,—
বিশাল বিরাটাননে যেতেছি ভাসিয়া!"

পরে কবির এই "অপূর্ব্ব স্বপ্ন" ভাঙ্গিয়া গেল—

কোথা মাতঃ শ্রদ্ধাদেবী পরম কল্যানী
কোথা বা পথিক আমি জটা-চীর-ধারী।

কবির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে বটে কিন্তু পাঠকের যেন

"সংসারের সুখ দুঃখ—মায়ার কৌশল
দিব্যজ্ঞানে জীবন্মুক্ত করে মিথ্যা জ্ঞান;
যেমতি নিদ্রার মাঝে নিশার স্বপন।"

এই তমিস্রাময়ী ঘোর রজনীতে ভীষণ শ্বাপদকুলের বিকট আরাবে, এই নিশাচর উপদেবতার উদ্দণ্ড তাণ্ডবের সময় গ্রন্থকারের এই স্বপ্ন অতি উপাদেয় এবং "অপূর্ব্ব"। নিদাঘ সন্তাপেই ডাবের উপযোগিতা। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন, ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই আমাকে আসিতে হয়। সাময়িক না হইলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের 'অপূর্ব্ব' গ্রন্থ "রাসলীলা"র অল্পদিন পরেই আমরা এ স্বপ্ন দেখিব কেন? প্রাণের ব্যথায়—পথিকের প্রাণের ব্যথাতেই ইহার উৎপত্তি। বাঙ্গালির, ভারতবাসীর কি আজি প্রাণের ব্যথার সময় নয়? শতাব্দীর কৈশোর কালেই মিশনরী অভ্যুদয়। সেই সিরক্কোর প্রবাহে প্রবাহে যে বালুকারাশি বহিতেছিল, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা স্তূপে পরিণত করে, আর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের পর ইংরেজী শিক্ষা সত্য সত্যই তাহা বিস্তীর্ণ সাহারা মরুতে পরিণত করে। সেই মরুভূমে ভ্রমণকারী পথিক আজ তৃষ্ণায় আতুর হইয়াও মরীচীকা চিনিতে পারিয়াছে, তাই আজি সমগ্র ইংরেজী নবিশের মস্তিস্কে বিষের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

"এ মর জগতে মাতঃ কোথা হতে আসি
বিস্মৃতির জলে যেন ডুবিলাম সব
হেরিলাম চারিপাশে নানাজাতি প্রাণী
আমারই মত তারা হয়ে দিশে হারা
খেলিছে হাসিছে কেহ কাঁদিছে নিয়ত।
কেহ পুন মোহবশে আছে কর্ম্মে রত।
সুদালাম তা সবারে বলে দিতে পার
আমি কে তোমরা বা কে? কোথা হতে আসি
যাইব কোথায় পুন এসেছি কোথায়?
কেহ নাহি তত্ত্ব জানে সকলে অজ্ঞান
মোহ তম ঘেরিয়াছে এ ঘোর সংসার
কাতর অন্তরে আমি হয়ে শোকাকুল
দেখিনু সম্মুখে—কাল ভীষণ বদন
গ্রাসিছে সকল জীবে অট্ট অট্ট হাসি
ভয়েতে আকুল মম হইল পরাণ।"

আমি কে, কেন জন্মিলাম, মরিতে হইবে—মরিয়া কোথায় যাইব?—এ চিন্তা ভগবানের, জগদম্বার কৃপায় যাহার হৃদয়ে একবার ফুটিয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। চিন্তা রক্তদন্ত আমার মত শরীর ধারণ করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়, পরে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হয়। একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে জবাব পাওয়া যায়, তাহাতে মন উঠে না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসু বলেন "ঈশ্বর"? বটে? কিন্তু তাঁর রাজ্যে এত অবিচার কেন? কেন তুমি সুবর্ণ-চামচ ওষ্ঠাধরে ধরিয়া জন্মিতেছ—আর কেন আমি মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে অবমানিত হইতেছি? কেন তুমি সুস্থ শরীরে দশ গণ্ডা লুচি, আট গণ্ডা সন্দেশ, এক কাতারী ক্ষীর খাইয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতেছে, আর কেন আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া দিনান্তে একটু বার্লি খাইয়া বদ্ হজমের জ্বালায় পাঁচবার বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতেছি। ঈশ্বর মানিব কি? এই প্রকৃতি বিচিত্রতায় এই অভাবনীয় বৈষম্যে মন যে তোলপাড় করিয়া তুলে?

এ প্রশ্ন যে কেবল তোমার আমার মনে আঘাত করে তাহা নয়, কেবল যে ফরাশি রুষের হৃদয়ে, কেবল যে নিহিলিষ্ট, কমুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্টের মনে

আঘাত দেয় তাহাও নহে, সাধকের হৃদয়েও সময়ে সময়ে আঘাত করে তাই চুপীনিবাসী মৃত রঘুনাথ রায় দেওয়ান মহাশয়ও একদিন গাহিয়াছিলেন—

তব বিচিত্র মায়ার কি রস, বিষ কি পীযুষ
না হয় অনুভব দুর্গে।
যদি হয় মা সুখ, মিলিত তায় দুখ, হৈয়ে কৃপামুখ
নিস্তার এ উপসর্গে॥

এই আঘাতে জীব অধঃপাতে গিয়াছে। জগতের সর্ব্ব প্রধান অনিষ্ট-পাত যে ফরাশি বিপ্লব তাহা এ আঘাত-তরঙ্গের ফেন পুঞ্জ, এই আঘাতেই রক্তময়ী সিন্ নদী অজস্র শোণিতধারা সাগর বক্ষে ঢালিয়াছিল, এই আঘা-তেই রাজমুকুট ধরণীতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে আর এখনও এই আঘাতেই সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকা ভীত চকিত, নিস্তব্ধ ও দোলায়মান চিত্তে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে। তবে নাকি আধুনিক সভ্য জগৎ কেবল "অর্থ" ভাবিয়া থাকেন, তাই তাঁদের নিকট ইহার মীমাংসা নাই, আর হিন্দু নাকি ভাবিয়া থাকেন "পরমার্থ" তাই ধর্ম্মশীল হিন্দুর নিকট ইহার মীমাংসা আছে। সংশয় দৈত্য জীবকে চিরকালের মত দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কখনও তির্য্যক্ যোনী পর্য্যন্ত লইয়া যায় বটে কিন্তু কোন সুযোগে যদি এক-বার দৈত্যকে চিনিতে পারা যায় তাহা হইলে আর ভাবনা নাই। পিঞ্জর-মুক্তির উপায়, তখন যেন কে কর্ণে কর্ণে বলিয়া দেয়। তখন সেই যুক্তি অনু-সারে চলিতে পারিলে অসাধ্যসাধন ও সাধ্য হইয়া পড়ে ও কারামুক্তিরূপ সিদ্ধি তখন কেবল সময় যাপনের কথা। শেষে আপন স্বজনগণের সহিত মিলন ও পরিশেষে প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ জনিত অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ অবশ্যম্ভাবী। তখন সে সুখ কেবল আপনি ভোগ করিয়া মন উঠে না, তখন স্বার্থপরতা যে প্রেমের হিল্লোলে ডুবিয়া গিয়াছে—তখন তাই আর পাঁচ জনকে ডাকিয়া সুখের ভাগ দিতে ইচ্ছা করে। তখন স্বার্থপরতা দেখিতে পায় সতী আপনার পতি সেবায়, তখন স্বার্থপরতা দেখিতে পায় জননী ক্রোড়স্থ সদ্যোজাত শিশুকে স্তন্যদানে। তখন প্রেমের বন্যায় সব ভাসে, তখন কেহ আর কাহারও উপেক্ষা রাখে না, অপেক্ষা করে না, তখন মানুষ আপনি আর আপনার উপেক্ষা রাখে না, ডুবে তখন মহা সমাধিতে, একে-বারে জনে জনে এক হইয়া একেবারে ডুবিয়া যায় শ্রীরাসরসিকনাগর নটবর শ্যামসুন্দর মদনমোহনের মহারাসের মহাসাগরেরর মহা প্রেমবন্যায়।

"মরি যে প্রেমেতে নাহি চায় প্রতিদান
নাহিক কামের গন্ধ, নাহি কোন আশ
সেই নিরমল প্রেম—সুধার ভাণ্ডার,
সে সুধা পানেতে মন হয়ে মাতয়ারা
ভোলে জীবন যন্ত্রণা, অশান্তির স্রোতে।

তখন প্রেমে উজান বহে, তখন মিলনে বিরহে সুখ—

"মিলনে বিরহে তার বহে প্রেমোচ্ছাস
পূর্ণচন্দ্র হেরি যথা সাগর উদ্বেল—
আনন্দে ফুলিয়া উঠে হৃদয় তাহার
আবার অদৃশ্য যবে হয় প্রেমশশী
অমানিশা আগমনে—বিরহ তুফানে
প্রেমাবেশে পূর্ণ হয় হৃদয় তাহার।"

আর তখন কি হয়?—

"বিশ্ব হইল তন্ময়, বাঁশরী নিঃসৃত
প্রেমের সঙ্গীত মাত্র রহিল ধ্বনিতে
মধুর লহরী বেগে উথলি অনন্তে
অপূর্ব্ব রমণ! কিবা অপরূপ রাস
বিরাট মূরতি ক্রমে গ্রাসিল সকলে!"

সাধক ও কবিতে প্রভেদ চিরকাল আছে, থাকিবেও চিরকাল। তাই সাধক চার ছত্র সঙ্গীতে যে মীমাংসা করিয়াছেন, কবিকে একখানি পুস্তক লিখিয়া সেই মীমাংসা করিতে হইয়াছে। হোক, তথাপি আমাদের প্রাণে—"বাঁশরী নিঃসৃত প্রেমের সঙ্গীত মাত্র রহিল ধ্বনিতে"। প্রতিধ্বনির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।

কবির সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কাজীর কাছে তিনি হিন্দুর পরবের কথা তুলিয়াছেন। এ গ্রন্থ পড়িবে কে? বোধ হয় গ্রন্থখানি প্রথম প্রয়াস, সেই জন্য বাঁধুনির ছাঁচুনীর রঞ্জন অতিরঞ্জনের দোষ ধরিলাম না। শঙ্করাচার্য্য হেন মহাপুরুষকে কঠোর অদ্বৈতভাব শিবোঽহং হইতে নামিয়া মনিকর্ণিকার ঘাটে যখন মহাশক্তি-পদে গড়াগড়ি দিতে হইয়াছিল আর লম্বোদর-জননী স্তোত্র পাঠ করিতে হইয়াছিল তখন গ্রন্থকারের

শৃঙ্গার সঙ্গমে বুঝি—পূর্ণ সম্মিলন
(আদি রসে তাই কবি গাহিল সকলে)
তাই প্রাণ কাঁদে সদা ওই রসাভাবে

দুই দুঁই ও রসেতে হয় অবসান
দুই প্রাণ এক হয় ও রস মিলনে

তথা—

পুরুষ নারীতে যথা জনমে সন্তান
প্রকৃতি প্রেমেতে মোর জগত উপজে।

পাঠ করিয়া সন্তুষ্টই হইয়াছি। এই দুই স্থানে উদীয়মান যে মেঘ দেখিতেছি তাহাই যেন কবির হৃদয়—অন্তর অম্বর ঘন-ঘোর কৃষ্ণবর্ণে ছাইয়া ফেলে। অনুমান হয় কবির অজ্ঞাতসারে মেঘ উঠিতেছে। দেব রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "আমি চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারে ঠোরে।"

পদ্য উদ্ধার করিয়া কবিত্বের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, স্থানও নাই। কবিত্ব বেশ আছে। অরসিকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবেন না, আর রসিকে পড়িলে মজিবেন।

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে পুরান কুবুজার যেন নূতন গঠন হয়। তবে কবির কথা যে শাস্ত্র ছাড়া নহে তাহা দেখাইবার জন্য সেই কুবুজা-গঠনকারীর কথাই বলি—

জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥

জরা মরণ নাশ জন্য সদ্‌গুরুর উপদেশে যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া সাধনায় যত্নবান হন তাঁহারা সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম (আত্ম ও কর্ম্ম বিষয়ক রহস্য) জানেন।

আর কবির কথা, সাধক ছাড়াও নহে।—

মায়ের এ পরম কৌতুক।
মায়া বদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মন্‌রে ওরে মিছামিছি সার ভেবে সাহসে বাঁধিছবুক।
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মন্‌রে ওরে কে করে কাহার সেবা,
মিছে ভাব দুঃখ সুখ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মন্‌রে ওরে তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক্।
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপন মুখ॥

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩০৪ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

হাসি।

কি হাসি হাসিছ তুমি?
হাসিতে জগৎ আলো!
কুন্দ-দন্ত পরকাশি,
নয়নে লেগেছে ভাল।

স্বরগ সুষমা ভরা
ও হাসি যে সুধাহাসি!
প্রাণ-কাড়া, মনোহরা,
আমি বড় ভালবাসি।

কোথা' হ'তে পেলে বল,
ও হেন অমৃত-ধারা?
মম হৃদি-শতদল
করিয়াছে মাতোয়ারা।

ও যে গো প্রাণের প্রাণ
চকিতে চপলাখেলা,
মরমে মাবেরে তান,
বসন্তের মহামেলা!

স্বরগ-প্রসূনে গাঁথা
ও যে পারিজাত-মালা!
সুবাসে ছেয়েছে হেথা,
লুপ্ত জগতের জ্বালা!

নিদাঘে শীতল বাত,
জগতের তাপহারী;
বসন্তের সুপ্রভাত,
প্রাণ মন মত্তকারী!

প্রাবৃটের জলধর,
করহে জীবন দান,
শিশিরের রবিকর,
তুমি হে জগৎ প্রাণ!

শরতের পূর্ণ ইন্দু,
জগজন মনোলোভা!
হেমন্তের হিমবিন্দু
দুর্ব্বাদলে, কিবা শোভা!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

পাপের পরিণাম।

(গল্প)

১০ম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রজগোপালের পিতৃভক্তি ছিল। মাতৃহারা সন্তান পিতার প্রতি অনুরক্ত না হওয়াই অস্বাভাবিক। ব্রজগোপাল বাড়ী হইতে সেরপুর পর্য্যন্ত পিতাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় বৃদ্ধ পীড়িত হইলেন। জগন্নাথগঞ্জে আসিয়াই তাঁহার জ্বর হইল। পাঠক জানেন মধুর শরীর রুগ্নই ছিল। মেদিনীপুর হইতে ময়মনসিংহ যাতায়াতের ক্লেশ সে শরীরে সহিবে কেন? পিতার অসুখ দেখিয়া ব্রজগোপাল বড়ই ভাবিত হইলেন। কোন মতে তাঁহাকে ষ্টিমারে ও গাড়িতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিলেন। সেখানে আসিয়াই মধুর পীড়ার বৃদ্ধি হইল, তাঁহার চলৎশক্তি রহিত হইল। মধুকে বাড়ী লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

মধুর ইচ্ছানুসারে, ব্রজগোপাল তাঁহাকে কালীঘাটে লইয়া গেলেন, মধু কহিলেন বাবা আমাকে গঙ্গাতীরে রাখ। পত্র তাহাই করিলেন এবং

পিতাকে লইয়া গঙ্গাতীরের একটী বাড়ীতে রাখিলেন। মধুর জ্বর ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কাশী দেখা দিল। ব্রজগোপাল পিতার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটী মাত্র ভৃত্য ছিল। ব্রজগোপালের হাতে টাকা অধিক ছিল না। তিনি কলিকাতার কোন সহাধ্যায়ীর নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিলেন। মধুর রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া উঠিল। মধু পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। ব্রজগোপালের মনে প্রথমতঃ এমন ভাবনা আসে নাই। পিতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। চিকিৎসক কহিলেন রুগ্ন অবস্থায় অনেক পথ-শ্রম সহ্য করাতেই ইঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাড়াইয়াছে। ব্রজগোপাল শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। চিকিৎসক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন এখনও ইনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। আপনি এমন নিরাশ্বাস হইলে চলিবে না। কে ইঁহার শুশ্রূষা করিবে? ব্রজগোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন মহাশয়, আমি নিরাশ্বাস হইব না? সংসারে পিতা ভিন্ন আমার আপনার বলিতে কেহই নাই। শৈশবে মা হারা হইয়াছি। মাকে চিনিতে পারি নাই। পিতাই আমার পিতামাতা উভয়ের কাজ করিয়াছেন। জীবনে আমাকে উঁচু কথাটী কহেন নাই। এখনও আমার মাথার চুলটী বেগোছালো দেখ্‌লে বাবা কাছে ডেকে নিয়ে নিজের হাতে চুলগুলি সমান করিয়া দেন। মুখে একটু ঘাম দেখিলে নিজের কাপড় দিয়া তাহা মুছাইয়া দেন। বাবা নিজে কখনও ভাল কাপড় পরেন নাই, কিন্তু আমাকে খারাপ কাপড় পর্‌তে দেখ্‌লে তা' বাবার সহ্য হয় না। সেই বাপকে আমি এই ভাবে বিদেশে হারাতে বসেছি, আমি কাঁদব না ত কাঁদবে কে?

ব্রজগোপালের ক্রন্দন শুনিয়া চিকিৎসকের চক্ষে জল আসিল। তিনি অতি কষ্টে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ব্রজগোপাল পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ভগবান যারা এই রকম চক্রান্ত করে আমার বাবাকে সেরপুরে নিয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল তুমি তাদের বিচার করো।

চিকিৎসক সেরপুরে যাওয়ার কথাই শুনিয়াছিলেন। চক্রান্তের কথা শুনিয়া মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারা ওঁকে সেরপুরে নিয়ে যায়?

ব্রজগোপাল সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। শুনিয়া চিকিৎসক শিহরিয়া উঠিলেন।

রামসুন্দর, গোপালচন্দ্র—তোমাদের কার্য্যের কথা শুনিলে মনুষ্য মাত্রেই শিহরিয়া উঠিবে। পিতৃভক্ত পুত্রের মর্ম্মভেদী অভিসম্পাৎ কি তোমাদের হাড়ে হাড়ে বিন্ধিবে না?

ব্রজগোপাল এবং চিকিৎসক মধু হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছিলেন। তথাপি পুত্রের শেষ আর্ত্তনাদ পিতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মধু ব্রজগোপালকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। মধু তখনও কথা কহিতে পারেন। জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণরূপ ছিল। তিনি কহিলেন "বাবা কেঁদো না, বাপ কারও চিরদিন থাকে না। মা গঙ্গা যদি আমাকে টানেন, আর তোমার সমক্ষে আমি দেহ ত্যাগ কর্‌তে পারি তা হলেই আমার মঙ্গল। অন্তিম সময়ে আমার মুখে একটু গঙ্গাজল আর কাণে হরিনাম দিও। তুমি যে ভাবে আমার গঙ্গায় ফেলে যাবে, তাতেই আমার সদ্গতি হবে।" ব্রজগোপাল কাঁদিয়া উঠিলেন। মধু তাঁহাকে থামিতে বলিয়া কহিলেন "বাবা, এই বেলা আমাকে তীরস্থ কর"।

পাঠকের স্মরণ আছে, একদিন বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য আর রামসুন্দর আলোচনা করিয়াছিলেন যে ব্রজগোপাল হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান নহেন। ব্রজ-গোপালের অন্তঃকরণে মধুর ন্যায় বিশ্বাস না থাকিলেও তিনি এমনভাবে পিতার আদেশ প্রতিপালন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে লাগিলেন, যে সংসারে অল্প সংখ্যক সন্তানই তেমনভাবে পিতার সেবা করিতে পারেন। ব্রজগোপাল পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। জ্ঞানতঃ তিনি কখনও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। ইহাও ঠিক যে ব্রজগোপাল অধার্ম্মিক ছিলেন না। কতকগুলি অনুষ্ঠানে তাঁহার আস্থা ছিল না, আর ছিল না সঙ্কীর্ণতা। এই সূত্র ধরিয়াই রামসুন্দর তাঁহার নিন্দা করিতেন। মধু কখনও পুত্রকে এ সম্বন্ধে কথাটী কহেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অভিলষিত কার্য্যগুলি ভক্ত পুত্র অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিলেন। মধু কহিলেন বাবা গঙ্গায় যাবার পূর্ব্বে আমার একবার মাকে দর্শন কর্ত্তে ইচ্ছা হয়। ব্রজগোপাল এক পাল্কী আনাইয়া পিতাকে কালীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। উত্থান শক্তি রহিত বৃদ্ধ কপালে হস্ত তুলিয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া মধু কহিলেন বাবা আর আমি জল খেতে

চাইনে, আমাকে গরমজল দি'ও না। কেবল গঙ্গাজল দাও। ব্রজগোপাল পিতার মুখে গঙ্গাজলই দিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধুকে তীরস্থ করা হইল। ব্রজগোপাল ও তাঁহার স্বজাতীয় ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই নিকটে ছিল না। মধ্যে মধ্যে ভৃত্যকে এখানে ওখানে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে ব্রজগোপালকে একাকীই পিতার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধুর কথা জড়াইয়া আসিল। কহিলেন "বাবা, হরি বল।"

ব্রজগোপাল, বাবা কোথায় যা'ও বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে থামিতে বলিলেও ব্রজগোপাল থামিতে পারিলেন না। পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন বাবা, কত অপরাধ করেছি বাবা, ক্ষমা করো। না জেনে হয়ত তোমার মনে কত ব্যথা দিয়েছি সে সব ভুলে যাও বাবা। শৈশবে হয়ত তোমাকে কত মেরেছি বাবা, তুমি ত আমার মা-বাবা দু'য়ের কাজই করেছ বাবা—তোমার স্নেহের, তোমার বাৎসল্যের প্রতিদানে কিছুই কর্ত্তে পার্‌লাম না বাবা—আমি তোমার অধম সন্তান বাবা!

ব্রজগোপালের কান্না শুনিয়া তটলগ্ন নৌকার দু'একজন নাবিক নাবিয়া আসিয়াছিল এবং সেই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিল।

ভৃত্য ব্রজপোলকে বুঝাইল, কর্ত্তার সময় হয়েছে এখন উঁহার কাণে হরিনাম দিন্‌। ব্রজগোপালের পিতৃ-আদেশ মনে পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়াই তিনি আরম্ভ করিলেন "হরিবোল, হরিবোল"। গঙ্গাজল লইয়া এক একটু বৃদ্ধের মুখে দিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মধুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ব্রজগোপাল অশ্রুপ্লাবিত মুখে সেই রাত্রিতেই মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি বাড়ী যাইবার জন্য গেঁওখালির ষ্টীমারে উঠিলেন।

১১শ অধ্যায়।

মধুমণ্ডলের মৃত্যুতে রামসুন্দর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, কেন না তাঁহার কথার বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার লোক গ্রামে রহিল না। রামসুন্দর

এখন একচ্ছত্রী। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোক তাহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই বীতরাগ ছিল। মধুর মৃত্যুতে অনেকে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে কেহ কিছু না বলিতে পারিলেও মনে মনে সকলেই রামসুন্দর এবং গোপালকে পরমশত্রু মনে করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিয়া আর কেহ রামসুন্দরের বাড়ীতে যাইত না। বরদাকান্ত প্রাপ্তির খাতিরে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন, কেন না রামসুন্দরের বাড়ীতে দেবার্চ্চনা রীতিমত হইত। কিন্তু মধুর প্রতি ব্যবহারে বরদাকান্তের অন্তঃকরণেও দারুণ লাগিয়াছিল।

রামসুন্দর গ্রামের লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কিছু দিনের জন্য দূরে থাকা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। ভেলামারি নামে তাহার এক তালুক ছিল এবং প্রায় গঙ্গার তীরেই ঐ তালুকের কাছারি। রামসুন্দর তথায় চলিয়া গেলেন।

গ্রামে এমন লোকই ছিল না যে ব্রজগোপালের সহিত প্রাণের সহানুভূতি না দেখাইল। মধুকে সকলেই ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত। রামসুন্দরের আচরণে সেই শ্রদ্ধা ভালবাসা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মধুর শ্রাদ্ধে সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিল। ব্রজগোপাল দেশে রহিলেন না। তাঁহার পিতার পরিচিত কোন একজন বড়লোকের অনুরোধে সত্বরই রুবাল সবরেজেষ্টারি চাকরি পাইয়া তিনি ডেব্রায় চলিয়া গেলেন। যাইবার দিন গ্রামের অনেক লোক একত্র হইয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল।

আর রামসুন্দরকে? তাঁহাকে বিদায় দিতে কেহই আসে নাই কিন্তু মনে মনে অনেকেই প্রার্থনা করিতেছিল যেন তাঁহাকে আর গ্রামে ফিরিয়া আসিতে না হয়। ফলতঃ জনসাধারণের সহানুভূতি সর্ব্বদাই অত্যাচার গ্রস্তের প্রতি ধাবিত হয়। অত্যাচারী প্রবল হইলে মানুষ প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারে না বটে কিন্তু মনে মনে অভিসম্পাত করিয়া থাকে ইহা নিশ্চয়।

রামসুন্দর তালুকে যাইয়া প্রজাদিগের রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন, বাজে আদায়ে তহবিল পূর্ণ হইয়া উঠিল। রামসুন্দর কাছারিতে পঁহুছিলেই অনেক প্রজা আসিয়া তাহাকে নজর দিয়াছিল। তারপর রামসুন্দর তাহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী হাকিমের কাজ করিতে বসিলেন। বিচারে

প্রভেদ এই যে ইহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী সব মোকর্দ্দামাতেই শাস্তি। আর শাস্তি কেবল জরিমানা। কেহ তাহার ভ্রাতার সহিত বচসা করিয়াছে দশ টাকা জরিমানা। কাহারও বিধবা ভগ্নি বাহিব হইয়া গিয়াছে পঁচিশ টাকা। অমুকের ভ্রাতৃবধূ ভ্রূণ হত্যা করা সন্দেহ হয় পঞ্চাশ টাকা। এইরূপে নিরীহ কৃষককুলের শ্রম-সঞ্চিত অর্থ রামসুন্দরের সিন্দুকে উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রামসুন্দরের পাপের সিন্দুকও অবশ্যই বোঝাই হইতেছিল। সে দিকে রামসুন্দরের দৃষ্টি ছিল না।

অনেকের বিশ্বাস দস্যু তস্কর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কেহ মানুষের প্রতি বিনা কারণে অত্যাচার করিতে পারে না। রামসুন্দরের ন্যায় চরিত্র যাহারা দেখেন নাই, তাহাদের এ কথা বলা অন্যায় নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভেলা-মারি কাছারি প্রায় গঙ্গাতীরে। এখান হইতে গঙ্গা অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে হইবে। ভেলামারী ভাগীরথার পশ্চিম তীরে। এখান হইতে সাগর অধিক দূরে নহে। গঙ্গার বিস্তৃতি এখানে পাঁচ ক্রোশেরও উপর। ভেলামারি কাছারির নিকটে একটী খাল আছে, ঐ খাল পূর্ব্বমুখে আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। একদিন সন্ধ্যাকালে রামসুন্দর দু'একজন লোক সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই খালের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন সেখানে একখানি বড় নৌকা বান্ধা রহিয়াছে। নৌকায় অনেকগুলি লোক। রামসুন্দর একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা-কার নৌকা?" নৌকার লোক উত্তর করিল, আমরা হাতীশুঁড়োর দ্বীপ হইতে আসিয়াছি। সেখানে রক্ষাকালীব পূজা করিব বলিয়া জিনিষপত্র কিনিতে হাটে আসিয়াছিলাম। ফিরিয়া যাইবার সময়ে তুফান দেখিয়া যাইতে পারি নাই, আজ এখানে নৌকা বাঁধিয়া আছি। কাল সকালে যাইব এই ইচ্ছা। রামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে নৌকা বান্ধিয়াছ তাহার জন্য খাজানা দিয়াছ? নৌকার লোক উত্তর করিল, আজ্ঞে না। জোয়ার ভাঁটার খালে আবার খাজানা কি? আমরা পূর্ব্বেও এখানে অনেক বার নৌকা রাখিয়াছি। রামসুন্দর বলিলেন খাজানা দিতে হইবে। নৌকার লোক বলিল, আমাদের কর্ত্তাপক্ষীয় ব্যক্তি উপরে গিয়াছেন। পূজার জন্য একজন পুরোহিত নিয়াছিলাম। আজ যাওয়া হ'ল না বলে পুরোহিত ঠাকুর বাড়ীতে খেতে গেলেন, সেই সঙ্গে আমাদের দুএকজনও গেছেন তারা

না ফিরে এলে আমি কিছুই বলতে পারিব না। রামসুন্দর চটীলেন কহিলেন তারা যদি নাই ফেরে? আমার জমিতে নৌকা বেঁধেছ তার খাজানা পাঁচ টাকা ফেল। লোকটী বলিল আমাদের কাছে টাকাই নাই। এমন ত অরাজক খাজানার কথা শুনি নাই। রামসুন্দরের তখনই টাকা আদায় করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু দেখিলেন তাহার সঙ্গে লোক অধিক নাই। নৌকায় অনেক লোক আর নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। রামসুন্দর চটিয়াগেলেন এবং কহিলেন আচ্ছা তারা এলেই দেবে। খালের ধার দিয়া তিনি কাছারিতে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার পরে হাতীশুঁড়োর নৌকার লোক যাহারা উপরে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। নৌকায় যাহারা ছিল তাহারা রামসুন্দরের সহিত কথোপকথনের বা কলহের মর্ম্ম তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিল। পুরোহিত-ঠাকুর পরামর্শ দিলেন, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। রামসুন্দর না করিতে পারেন এমন কাজই নাই। খাজানা না পাইয়াই তিনি চটিয়াছেন। জোয়ার ভাঁটাব খাল এর আবার খাজানা। কিন্তু তিনি যখন চেয়েছেন, তখন না আদায় করে ছাড়বেন বোধ হয় না। হাতীশুঁড়োর লোকেরা কহিল এ রাত্রে গঙ্গায় যাওয়া অসম্ভব। আমরা চোরও নয়, ডাকা'তও নয়। কি করবে আমাদের?

রাত্রি প্রহরেক অতীত হইলে, নৌকার লোক অনেকেই নিদ্রিত হইল। ইহার কিছুকাল পরেই নৌকার মধ্যে একটী কোলাহল উঠিল। রামসুন্দরের লোকেরা নৌকার উপরে আসিয়া খাজানা চাহে। নৌকার লোকেরা একটু জোর করিয়া অস্বীকার করায়, উভয় পক্ষে বচসা হয়। রামসুন্দরের লোকেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতও বাদ পড়েন নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকার সমস্ত লোক ধৃত হইয়া রামসুন্দরের কাছারিতে চলিল। নৌকার দ্রব্য যত কিছু সমস্তই লুণ্ঠিত হইল। তাহার মধ্যে অধিকাংশই পূজার জিনিস। চিনি, বাতাসা, ঘৃত, পাঁঠা, নূতন বস্ত্র ইত্যাদি।

রামসুন্দর! তুমিও না বাড়ীতে পূজা করিয়া থাক?

লোকগুলি কাছারিতে পঁহুছিলে রামসুন্দর তাহাদের অপরাধ শুনিয়া তাহাদিগকে বাঁধিতে হুকুম দিলেন। প্রহার যথেষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সে বিষয়ে আর হুকুমের প্রয়োজন হইল না। রামসুন্দরের অনুচরেরা নৌকার লোকগুলিকে নির্ম্মমভাবে পশুর ন্যায় বন্ধন করিল।

অর্জ্জুনদাস নামে একজন প্রজার বাড়ী গঙ্গার অতি নিকটে, হাতী-শুঁড়োর লোকগুলির নৌকা যেখানে ছিল, সেখান হইতে কয়েক রসিমাত্র ব্যবধান। রামসুন্দর অর্জ্জুনকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া তাহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। শেষে অর্জ্জুন ঘরের বাহিরে আসিল এবং একজন লোক সঙ্গে করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

হাতিশুঁড়োর নৌকার লোকগুলি সেই বাঁধা অবস্থাতেই রহিল। সকলেই মনে করিতে লাগিল, পুরোহিত-ঠাকুরের পরামর্শ শুনিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেই ঠিক হইত। গঙ্গায় যাইয়া তুফানে ডুবিয়া মরিতাম সেও ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল।

মানুষের নিষ্ঠুরতার কাছে, অগ্নি জল প্রভৃতির নিষ্ঠুরতা কিছুই নহে। অগ্নি জল প্রভৃতির নিষ্ঠুরতা আছে কি না তাহাতেই সন্দেহ। তাহারা ডাকিয়া তোমাকে বিপদ্‌গ্রস্থ বা নির্যাতন করে না। কিন্তু মানুষের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া আগুনে ও জলে ঝাঁপ দিয়া থাকে।

রামসুন্দর নৌকার লোকগুলিকে পশুরস্থায় রাখিয়াছিলেন বলিলেও ঠিক হয় না। পশুকেও মানুষ নিরূপিত সময়ে আহার দিয়া থাকে। ইহারা তাহা পায় নাই। পরদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একজন পুলিস সবইনস্পেক্টর কয়েকজন কনষ্টেবল সহ ভেলামারির কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের পশ্চাতে অর্জ্জুনদাস। পুলিস আসিয়াই লোকগুলিকে দেখিয়া কহিল, শালারা নৌকা করে এসেছ ডাকাতি কর্ত্তে।

বলিয়া দিতে হইবে না যে অর্জ্জুনদাস তাহাদের নামে ডাকাতির অভিযোগ করিয়াছিল। লোকগুলি এই কথা শুনিয়াই অবাক। পাঠকও হয়ত অবাক হইয়া থাকিবেন।

১২শ অধ্যায়।

দারগাবাবু তদন্ত আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনদাসের বাড়ী দেখা হইল। রামসুন্দর, অর্জ্জুন থানায় যাইবার পরেই তাহার বাড়ীর কতকগুলি জিনিষ আনিয়া কাছারিতে ডাকাইতদিগের নিকটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সে সমস্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। দারগা একবার ডাকাইতদিগের নৌকা দেখিতে

চাহিলেন। সেখানে যাইয়া অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ভাঙ্গা চিনির হাড়ি, বাতাসার গুড়া, পাঁঠার নাদি ইত্যাদি। কয়েকজন ডাকাইত দারগা বাবুর সঙ্গেই ছিল, তাহাদের একজন দেখাইয়া দিল, "দেখুন এখনও আমাদের পূজার জিনিসের চিহ্ন রহিয়াছে। আমাদের ওখানে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে তাই মা রক্ষাকালীর পূজার নিমিত্ত আমরা ষাঁড়মারারহাটে আসিয়াছিলাম জিনিষপত্র কিনিতে। বাতাসের জন্য কাল বৈকালে ফিরিয়া যাইতে পারি নাই। ইহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বর্ণিত হইল। আসামীর উক্তি শুনিয়া, নৌকার অবস্থা দেখিয়া এবং বাদীর কথিত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দারগা বাবুর সহজেই প্রতীতি জন্মিল যে মোকর্দ্দামা মিথ্যা। রামসুন্দর অবৈধ উপায়ে দারগাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ব্যর্থ হইল। দারগা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। পরদিনই মহকুমায় দারগার রিপোর্ট গেল, মোকর্দ্দামা মিথ্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস। আসামীরা যে জবাব দিয়াছে তাহাই সত্য বোধ হয়।

মোকর্দ্দামার প্রথম এজাহার এবং এই রিপোর্ট একই সময়ে মহকুমায় পঁহুছিল। বড় দারগা তদন্তে আসিলেন। একদিন মাত্র থাকিয়া তিনিও দারগার সহিত একমত হইলেন। মহকুমার হাকিম অর্জ্জুনদাসের নামে মিথ্যা এজাহার দিবার জন্য মোকর্দ্দামা চালাইবার হুকুম দিলেন।

বলা কর্ত্তব্য যে রামসুন্দর অর্জ্জুনকে বাঁচাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা মনিবের জন্য সব করিতে প্রস্তুত। মিথ্যা এজাহার দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। ইহারা বিপদে পড়িলে মনিব সাহায্য করিয়া থাকে। রামসুন্দরের ন্যায় লোকও তাহাতে বিরত ছিলেন না। অর্জ্জুন ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইলে, রামসুন্দর তাহার জন্য কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার আনিলেন। বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের নামে নারায়ণকে তুলসী দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অর্জ্জুনের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। অর্জ্জুন যথাক্রমে মাজেষ্টারি হইতে দায়রায় সোপর্দ্দ হইল এবং দায়রার বিচারে অর্জ্জুনের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইল। রামসুন্দর সেই দিন হইতে অর্জ্জুনের স্ত্রী পুত্রের নিমিত্ত মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

রামসুন্দরের এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, যত কেন পাপ করি না, ভগবানকে ডাকিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। এবারে তাহার সেই বিশ্বাস শিথিল হইল। এমন লোকের যে ভগবানকে ডাকিবার অধিকারই নাই তাহা তাহার ধারণা ছিল না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিব, আর শেষে তাঁহাকে ডাকিব এমন ডাকে কোন ফল হয় না। এতদিন রামসুন্দরের এ কথা বুঝিবার অবসরই হয় নাই। জীবনে তিনি কত লোককে কত প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমুচিত ফলভোগ করেন নাই। তিনি ভাবিতেন আমি যে পূজার্চ্চনা করি তাহাতেই সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া যায়। ভগবানের বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড শাসন রহস্য কে বুঝিবে? অনেক সময়ে মানুষ পাপ করিবা মাত্রই তাহার দণ্ডভোগ করে না বলিয়াই বোধ হয়, রামসুন্দরের ন্যায় লোক প্রশ্রয় পায় এবং নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে না অথবা বুঝিয়াও বুঝে না।

রামসুন্দর অর্জ্জুনের জন্য সেসন আদালতের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিলেন, তাহাতেও কোন ফল হইল না। রামসুন্দর অর্জ্জুনকে বাঁচাইবার জন্য যে এত চেষ্টা করিলেন সে কেবল অর্জ্জুনের উপকারার্থ তাহা নহে। রামসুন্দরের ভয় ছিল যে অর্জ্জুনের মোকর্দ্দামা ফাঁসিলে তাহার নিজের উপরও কিছু বিপদ আসিতে পারে। সত্য সত্যই সেই বিপদ আসিল। অর্জ্জুন যে রামসুন্দরের পরামর্শ মত মিথ্যা এজাহার দিয়াছিল তাহাতে তাহাকে ধরা গেল না কিন্তু কতকগুলি লোককে অন্যায়রূপে অবরোধ ও প্রহার করা বলিয়া পুলিস তাহার নামে রিপোর্ট দিল। হাকিম তাহাকে তলব দিলেন। রামসুন্দর ইতিপূর্ব্বে কখনও ফৌজদারি মোকর্দ্দামার আসামী হন নাই। এবার হাকিম, পুলিস তাহার বিরুদ্ধ বলিয়াই এমন হইল। রামসুন্দরের বুকের রক্ত খানিকটা শুকাইয়া গেল। তাহার আশ্বাসের বিষয় দুইটী ছিল। একটী এই যে, যে দুই অপরাধের জন্য তাহার নামে অভিযোগ, সে দুই অপরাধের মোকর্দ্দামাই আপোষ যোগ্য। আর ভেলামারি যে মহকুমার অধীন তাহার বাড়ী সে মহকুমার অধীন নহে।

রামসুন্দর মোকর্দ্দামাটী মিটাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত লোককে তিনি কয়েদ রাখিয়াছিলেন এবং প্রহার করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই দরিদ্র। দেশে জমিজমা কিছু নাই বলিয়াই দ্বীপে

যাইয়া রহিয়াছে। কিছু কিছু অর্থ দিয়া রামসুন্দর তাহার সকলকেই বাধ্য করিলেন। তাহারা মোকর্দ্দামা ছাড়িয়া দিল। হাকিম রামসুন্দরকে খালাস দিবার সময়ে কহিয়া দিলেন সাবধান থাকিও। আর লোকের উপর এমন ভাবে অত্যাচার করিও না। রামসুন্দর নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। মনে মনে কহিলেন আর তুমি আমাকে ভেলামারিতে পাইবে না। রামসুন্দর কিছু মনমরা হইয়া ভেলামারি হইতে বাড়ী আসিলেন।

১৩শ অধ্যায়।

ধনঞ্জয়দাস নামে এক দরিদ্র কৈবর্ত্ত রামসুন্দরের বাড়ীর নিকটে বাস করিত। ধনঞ্জয় নিরীহ কৃষক। ধনঞ্জয়ের স্ত্রী ও দুই পুত্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সামান্য যে জমি ছিল, ধনঞ্জয় বড়ই পরিশ্রম করিয়া তাহা আবাদ করিত। অন্যে সেই পরিমাণ জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করিতে পারিত, ধনঞ্জর তদপেক্ষা অনেক অধিক পাইত। যখন জমিতে হলকর্ষণ, শস্য বপন, তৃণোৎপাটন প্রভৃতি কাজ থাকিত না ধন ঞ্জয় তখন অন্যের কাজ করিত এবং তাহাতে তাহার পারিশ্রমিক মিলিত। ধনঞ্জয় কখনই নিরর্থক বসিয়া থাকিত না। গ্রামের সকল লোকেই তাহাকে ভালবাসিত এবং আদর্শ কৃষক বলিয়া আদর করিত। অবসর সময়ে ধনঞ্জয় রামসুন্দরের অনেক উপকার করিত বলিয়া রামসুন্দরেরও তাহার প্রতি সুদৃষ্টি ছিল।

ধনঞ্জয়ের ক্ষুদ্র সংসার শান্তিপূর্ণ ছিল। তাহার স্ত্রী অতিশয় পতি-পরায়ণা। ধনঞ্জয় মাঠে যতই খাটিয়া আসুক না কেন গৃহে আসিবামাত্র স্ত্রীর ব্যবহারে সে সমস্ত শ্রান্তিক্লান্তি ভুলিয়া যাইত। সন্তান দু'টীকে স্বামীর পার্শ্বে রাখিয়া রমণী এমনভাবে তাহার সেবা করিত যে তাহাতে দরিদ্র কৃষকের প্রাণ স্বর্গীয় সুখে ভরিয়া যাইত।

অভাগা রমণী অধিক দিন স্বামীর সেবা করিতে পারিল না। তাহাকে এবং শিশুসন্তান দুটীকে রাখিয়া সহসা ধনঞ্জয় পরলোকে প্রস্থান করিল। রামসুন্দর ভেলামারি হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আশ্বিন মাসে ধনঞ্জয়ের কাল হইল। অসহায়া রমণী পুত্র দুটীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। পিত্রালয়ে তাহার এক ভ্রাতা ছিল তাহার অবস্থা তত সচ্ছল নহে। ধনঞ্জয় পত্নী তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল এবং কোন মতে স্বামীর শ্রাদ্ধটী সমাধা

করিল। ভ্রাতা তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিলে সে কহিল দাদা এখানে তবু কিছু জমি আছে। এবার ত তাতে ধান ভালই আছে। ঘরে আন্‌তে পার্‌লে আমার বছর চলে যাবে। যতদিন এখানে থাকৃতে পারি তা থাকি। তার পরে কষ্ট হলে কাজেই তোমার কাছে যাব।

পাষণ্ড গোপাল বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ধনঞ্জয়ের পত্নীকে কুনয়নে দেখিত। ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর রূপ ছিল। যে দিন সে বিধবা হইল, গোপালের অন্তঃকরণে পাপবহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধনঞ্জয়ের শ্রাদ্ধের সময়ে গোপাল অযাচিতভাবে আত্মীয়তা দেখাইয়াছিল। সরলা রমণী ইহার কোন কদর্থই বুঝিতে পারে নাই। শ্রাদ্ধের পরেও গোপাল যখন ঘনিষ্টতা ক্রমশঃই বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন তাহার সন্দেহ হইল। ধনঞ্জয়-পত্নী গোপালের সমক্ষে বাহির হইত না কিন্তু গোপাল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া সংবাদ লইতেন এবং আত্মীয়তা দেখাইতেন।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল ধনঞ্জয়পত্নীকে একাকিনী পাইয়া তাহার কদর্য্য প্রস্তাব করিয়া বসিল। রমণী শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। গোপাল সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না। গোপাল চলিয়া গেল, ধনঞ্জয়পত্নী অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। শেষে ভগবানের নিকট আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা জানাইয়া নিকটস্থ এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেল। পাড়ার এক বুড়ী ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর পর হইতে রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে শুইত। ধনঞ্জয়ের স্ত্রী প্রতিবেশী-পত্নীকে অনুরোধ করিল যে আজি হইতে তোমার একটী ছেলে যাইয়া রাত্রিতে যদি আমাদের বাড়ীতে শুইয়া থাকে। প্রৌঢ়া প্রতিবেশী-পত্নী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালের ব্যাবহার বর্ণনা করিল। প্রতিবেশিনী শুনিয়া গোপালের উদ্দেশে নানারূপ গালি বর্ষণ করিয়া কহিলেন আমার নবীনকে কহিয়া দিব, সে যাইয়া রাত্রিতে তোমার বাড়ীতে শুইয়া থাকিবে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার এক নবীন অমন সাত গোপালকে ঠ্যাঙ্গাতে পারে। একখানা নাটী নিয়ে নবীন তোমার দাওয়ায় থাকৃবে। আর মা কথাটা একবার ওদের বাড়ীর গিন্নিকে বলে আসা ভাল। গিন্নিটী কর্ত্তার মত নয়।
ধনঞ্জয়ের স্ত্রী বলিল আজ রাত হয়েছে। কাল যাব।
প্রতিবেশিনী উত্তর করিলেন হাঁ কাল সকালেই বলে এস।

ইহার পরদিন প্রভাতে রমণী যাইয়া রামসুন্দরের স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং কহিল আমি একটা কথা বলতে এসেছি। রামসুন্দরের স্ত্রী একটু সরিয়া আসিলে বিধবা তাহার মনের কথা কহিতে লাগিল, মা, যে অবস্থায় আমি গ্রামে আছি তা'ত দেখ্‌তেই পাচ্ছেন কিন্তু আর যেন থাক্‌তে পারিনে।

রামসুন্দরের স্ত্রীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন হয় তাঁহার স্বামী না হয় আবদুল বা গোপাল অসহায়া বিধবার প্রতি কোন অন্যায় করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন কি হয়েছে যাদবের মা?

ধনঞ্জয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যাদব, কনিষ্ঠের নাম মাধব।

রমণী উত্তর করিল তোমাদের গোপাল আমার জাতমার্‌তে চায়। কপাল পুড়ে যাওয়ার পর থেকে আমি কত বলেকয়ে কেশবের পিশিকে এনে রাত্রে আমার কাছে শোওয়াই আর ছেলে দুটীকে নিয়ে পড়ে থাকি। গোপাল প্রায়ই আমার বাড়ীর উপর দিয়ে আনাগোনা করে। সময়ে সময়ে যাদব ও মাধবকে ডাকে। ডেকে দুচারিটা কথা কয়। কাল সন্ধ্যার সময়ে যেয়ে যা বল্‌লে—আর কি বল্‌বো, পরমেশ্বর করেন ওর ঐ মুখে যেন কুড়িকুষ্ঠ হয়, ঐ জিব্‌ যেন খসে পড়ে—শেষে নবীনের মার কাছে যেয়ে কেঁদে পড়লাম, তিনি নবীনকে শুতে বল্লেন আমাদের দাওয়ায়—রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবো না বলে কাল আর আসিনি। আপনি একটু দৃষ্টি না রাখ্‌লে আমি ভিটেয় থাক্‌তে পার্‌বো না।

রামসুন্দরের পত্নীর প্রাণে লাগিল। তিনি বিধবাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন যাও তুমি ঘর যাও। ও নচ্ছার গোপাল যাতে গ্রাম ছাড়া হয় তার চেষ্টা আমি করিব।

১৪শ অধ্যায়।

রামসুন্দরের স্ত্রী সেই দিনই স্বামীর কাছে গোপালের কথা উত্থাপন করিলেন এবং কহিলেন "ওকে তাড়াও"।

রামসুন্দর বলিলেন ও তোমার করেছে কি?

গৃহিণী। আমার কি কর্‌বে?—গ্রামের লোকের যা কচ্ছে তাতেই স্বর্গের সিঁড়ি বান্ধা হচ্ছে।

রা। কার কি করেছে?

গৃ। ও আবার কার কি করেছে তাও জিজ্ঞাসা কর। ত্রিলোচন দাসকে সর্ব্বস্বান্ত করলে কে? মণ্ডলবাড়ীর কর্ত্তাকে সেই সেরপুরে না কি পুরে নিয়ে মেরেফেল্লে কে?

রা। এ সব কথা তোমাকে বলে কে?

গৃ। যেই বলুক না। ও পাপ যে তোমাতেও অর্শাবে।

রা। পাপপুণ্যের পরামর্শ যখন তোমার সঙ্গে কর্ত্তে যাব তখন বলো।

গৃ। তা আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে কেন? পরামর্শের উপযুক্ত লোক তোমার আবদুল আর গোপাল।

রা। আবদুল আর গোপাল তোমার চক্ষুঃশূল হল কেন?

গৃ। অমন লোকও চক্ষুঃশূল হবে না? গ্রামের লোকে বোধ হয়, গোপালের পিত্তি না চটকে আর আবদুলের গোর না দিয়ে জলগ্রহণ করে না। সঙ্গে সঙ্গে কি তোমাকেই শাপে না? আবদুল ও গোপাল ত তোমার জোরেই মানুষকে মাড়িয়ে চলে।

রা। তুমি যে ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি।

গৃ। কুমীর ত বটেই। যাই হ'ক আমার একটা কথা রাখ। আবদুল ও গোপালকে তাড়াও।

রা। আজ এ কথা তোমার মনে উঠ্‌লো কেন? ত্রিলোচনদাসের মাম্‌লা, মধুমণ্ডলের মোকর্দ্দামা সে ত অনেক কাল হয়ে গেছে।

গৃ। ত্রিলোচন ও মধুমণ্ডলকে যে অমন কর্ত্তে পারে সে গরীবগুরবোকে কি কর্‌বে তা কি বুঝতে পারো না?

রা। কি কর্‌বে তা বুঝব কেমন করে? কিছু করে থাকে ত বলই না ছাই।

গৃ। করেছে বই কি?

রা। কি?

গৃ। ধনঞ্জয়দাস মরেছে সে ত দু'মাসও হয় নি। কাল সন্ধ্যার সময়ে যেয়ে গোপাল তার স্ত্রীকে—বলেছে। মনে করেছে গরীব হলেই ভ্রষ্টা হবে, জাত নাশা হারামজাদা—সে বেদোর মা আজ সকালে এসে কেঁদে পড়েছে। রামসুন্দরের ইন্দ্রিয়দোষ ছিল না। গোপালের এ দোষ ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি কহিলেন এই কথা বল্লেই হয়, আজই আমি গোপালকে শাসন করে দেবো। যা'তে ও ধনঞ্জয়ের বাড়ীর কাছ দিয়ে না যায়।

গৃ। শাসনটাসন নয় ওকে একবারে তাড়াও।

রা। এ যে তোমার ভয়ানক আবদার।

গৃ। একটা আবদার না হয় রাখ। আমি ত তোমার স্ত্রী।

রা। রাখবার মতন হলে রাখতাম্।

গৃ। গোপালকে তুমি ছাড়তে পার্‌বে না?

রা। না। আচ্ছা, মেয়েমানুষের অত জিদ্ কেন?

গৃ। জিদ্ করলেও ত তুমি রাখ্‌ছ না?

রা। আমি কি রকম লোক রাখি না রাখি তাতে তোমার এসে যায় কি?

গৃ। এসে যায় বলেই বল্‌ছি। সাধ করে পাপের বোঝা বাঁধ্‌ছ।

রা। সাধে মানুষে বলে না, যে বানর, কুকুর আর মেয়ে মানুষ নাই দিলেই কাঁধে চড়ে।

গৃ। এতে কাঁধে চড়া হ'ল।

রা। আর কাঁধে চড়্‌বার বাকি কি? দু বেলাই বক্তৃতা ঝাড়।

গৃ। আর কিছু বল্‌বো না। সাম্‌নে থেকে শুনা যায় না, আর দেখা যায় না তাতেই দু'এক কথা বলি।

রা। না শুন্‌তে পার, দেখ্‌তে পার চলে গেলেই হয়।

গৃ। তা তোমার তাই ইচ্ছা বটে। আমি গেলে ভাল থাক ত আমি চলে যাই।

রা। তা যাও, রোজ রোজ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগে না। ঘরের মাগ্ আবার উপদেশ দেবে এ সহ্য হয় না।

গৃ। দাও আমাকে একখানা নৌকা করে। কালই আমি বাপের বাড়ী যাবো। তুমি তোমার গোপালকে আর আবদুলকে নিয়ে থাক।

রা। তোমার মতন স্ত্রী সংসারে না থাকাই ভাল।

গৃ। জগদীশ্বর করুন যে আর আমাকে ফিরে না আস্‌তে হয়।

রামসুন্দর উঠিয়া গেলেন। গৃহিণীর চক্ষে জল আসিল।

রামসুন্দর সে দিন স্ত্রীর সহিত আর বাক্যব্যয় করিলেন না। ভেলামারির ব্যাপারে তাহার মন অসুস্থ ছিল। তিনি মনে করিলেন অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এমন মুখরা গৃহিণীকে দূরে রাখাই ভাল।

পরদিন প্রভাতে নৌকা আসিল। গৃহিণী কন্যাটীকে লইয়া পিত্রালয়ে গেলেন। রামসুন্দরের পুত্র কলিকাতায় পড়িতেছে। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া কয়েক মাস হইল কাশী চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামসুন্দর একাকী বাড়ীতে রহিলেন। গোপাল, আবদুল এবং দু'একজন ভৃত্য তাহার কাছে রহিল।

রামসুন্দর বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি ইচ্ছা করিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়াইলেন। বঙ্গে রামসুন্দরের ন্যায় অনেক পামর কেবল তাহাদের গৃহিণীর পুণ্যেই অন্ন পাইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

আমাদিগের অধঃপতন।

কালের প্রবলাবর্ত্তে ধীরে ধীরে সে দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যে দিন আর্য্যঋষিগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করত স্বদেশের উপকার ও আত্মীয়-স্বজনের হিতসাধনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সে দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; নবযুগ আসিয়া এক্ষণে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কালমাহাত্ম্যে আমরা সেই গতযুগের প্রাতঃস্মরনীয় আর্য্য-সন্তানগণের ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদের সে তেজস্বিতা, সে মহানুভবতা স্মৃতিপট হইতে একবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছি। নবভাবে, নবপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহাদের সেই সকল অত্যা-শ্চর্য্য ক্ষমতাকে ছায়াবাজি বলিয়া অবজ্ঞা করি, তুচ্ছ-নিরর্থক ভাবিয়া সে সকল উপেক্ষা করি। স্বল্প শিক্ষা দোষে প্রাচ্যশিক্ষার নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু হায়! কাহার দোষে আজ আমাদের এত অধঃপতন—এত শোচনীয় অবস্থা? কে ইহার উত্তর দিবে!

গভীর গবেষণা করিয়া দেখিতে গেলে প্রথমতঃ আমরাই তাহারই মূল, দ্বিতীয়তঃ আমাদের পূর্ব্বতন রাজন্যবর্গ। যে সময় হিন্দু রাজাগণ আমা-দিগের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, যে সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভেদাভেদ ছিল। সাহিত্য ও শাস্ত্রানুশীলন যে সময় সাধারণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং ঐ সকলে উৎসাহ দান রাজাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল, সে সময় এই ভারতভূমি "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ক্রমে কালস্রোতে ভাসমান হইয়া হিন্দুরাজত্বের সে গৌরব-রবি অস্তমিত হইল; ম্লেচ্ছ যবন কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকার হইল।

যে দিন মুসলমান প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করে, ক্রমে বিজাতীয় পরাক্রম যখন সমগ্র হিন্দুরাজত্ব বিধ্বস্ত করিয়া সহনশীল ও ক্ষমাগুণ সম্পন্ন হিন্দুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, সেই দিন হইতেই, আমাদের এই অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু অনভ্যস্ত এবং হিন্দুধর্ম্মানভিজ্ঞতাহেতু প্রথমে তাহারা একবারে সমস্ত বিলুপ্ত করিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণে আমাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল; একাধীশ্বর হইয়া সমগ্র রাজ্য সু-শাস-নাধীনে রাখা দুরূহ জানিয়া স্থানে স্থানে হিন্দুদিগের উপর শাসনের ভার

ন্যস্ত করিয়াছিল। ফলতঃ সাধ্যায়ত্ত, হিন্দুধর্ম্ম, সাহিত্য ও শাস্ত্রানুশীলনের অস্তিত্ব একবারে লোপ পায় নাই। ক্রমে দুৰ্দ্ধর্ষ যবনগণ যখন নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিল—ভোগ ও বিলাসিতা দ্বারা যখন সকলের মন আকৃষ্ট করিতে লাগিল, চতুঃবর্ণগণ যখন সেই সকলে মুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিল, সেই দিন হইতেই সে সকল একবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িল।

অনন্তর সেই অবিরাম স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে হিন্দুগণ তাহাদের পূর্ব্ব জাতি গৌরব, ধর্ম্মাধ্যয়নাদি ভুলিতে লাগিল। শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থাদি সঙ্গে সঙ্গে ক্রমলোপ পাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, যখন দিল্লীর সম্রাট আকবর-সাহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেই সময় আমাদিগের রীতি, নীতি, সাহিত্য শাস্ত্রানুশীলনাদি পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্রাট আকবরসাহ হিন্দুদিগের কার্য্যকলাপ, আচার, ব্যবহার, অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন; ফলতঃ তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দুদিগের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে মঙ্গলপ্রদ ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অধিকাংশ হিন্দুগণের মন বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল—বাহ্যভাব ও বিলাসিতায় মুগ্ধ হইয়া আত্মধর্ম্মকর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াছিল, সেই জন্য অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কয়েক জনের উৎসাহে ঐ সকলের পুনরুদ্ধার দুরূহ হইয়া উঠিল, উড়ুপ সহায়ে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার হওয়ার ন্যায় সকলি অব্যর্থ হইল; সুতরাং যেরূপ অন্ধকারে নিহিত হইয়াছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল। ক্রমে পূর্ণ মাত্রায় আমাদের অধঃপতন হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ভুলিতে লাগিলেন, যাহাদেব আদর্শ জানিয়া অপর তিন বর্ণ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেন, তাঁহারাও শ্রেষ্ঠ বর্ণের ঈদৃশাবস্থা দেখিয়া নির্দ্দোষজ্ঞানে সেই সেই কর্ম্মের অনুগামী হইলেন। ক্রমে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া দাঁড়াইলেন; কেহ কাহার অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হয়েন না। রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া, নিজের পদমর্য্যাদা বুঝিয়া, আমি সর্ব্বজ্ঞানী, সর্ব্বদর্শী, এই অহঙ্কারে নিজের মনকে অহঙ্কৃত করিতে লাগিলেন; ফলতঃ পরস্পরের মধ্যে রুচিগত বৈলক্ষণ্য ঘটিতে লাগিল। স্ব স্ব মতানুসারে কর্ম্ম করিতে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে হিন্দুগণ স্বার্থ ত্যাগ করিতে জানিতেন, সমাজের কল্যান কামনায়

নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেন; অধুনা ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বার্থ ত্যাগ, সে সমদর্শিতা অন্তঃর্হিত হইয়া গিয়াছে; ভোগ ও বিলাসিতা প্রবল হইয়া সে মনোবৃত্তিগুলি একবারে নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, প্রত্যুত একতা, সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য একবারে অতীতের অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

অনেকে হয়ত বলিবেন এই সকল বৈপরীত্য আমাদের আধুনিক শিক্ষার দোষে ঘটিয়াছে। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, ইহা আমাদের শিক্ষার দোষ নহে, পরন্তু স্বার্থসাধনই ইহার মূল; যেহেতু ইংরাজগণ যে ভাবে আমাদের শিক্ষিত করিতে চাহেন তদনুরূপ কার্য্যে আমরা আপনাদিগকে বিনিয়োজিত করিতে পারি না, অল্প পরিমাণে, যৎ-সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া, যথেষ্ট জ্ঞানে, ইংরাজী চাল-চলন, ভাবভঙ্গি ও বিলাসিতায় সমৎসুক হইয়া পড়ি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ পায় না, অল্প শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, স্ত্রী স্বাধীনতা, গৃহ-বিচ্ছেদ, অনৈক্য, জাতীয় অসম্মিলন ইত্যাদি নানা প্রকার কুফল লাভ করিয়া লোকের নিকট, উপহাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি এবং স্বোদরম্ভরিতায় তাহা-দের উপেক্ষা করিয়া থাকি! সুতরাং সুশিক্ষার বিনিময়ে কুশিক্ষা করিয়া আমরা আপনাদিগকে আরও অধঃপাতিত করিয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু এ সকলের কি প্রতিকারের কোন উপায় নাই? আছে! সকল বিষয়েরই একটি করিয়া সীমা আছে। যখন কোন বিষয়ের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অচীরে তাহার আবার প্রতিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য আশা করা যায় যে সত্বর আবার আমাদের উন্নতি হইবে; হিন্দুধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সাহিত্যানুশীলনাদি শীঘ্রই আবার জাগরুক হইয়া উঠিবে। কিন্তু যাবৎ না আমাদের মধ্যে একতা স্থাপন হয়, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা যাবৎ না ত্যাগ করিতে পারি, যাবৎ আমাদের অন্তরে আত্মম্ভরিতা থাকিবে—সামা-জিক বিশৃঙ্খলতা, কাপট্য ইত্যাদি যাবৎ না হৃদয় হইতে দূর হইবে, তাবৎ আর আমাদের উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। পূর্ব্বে হিন্দু রাজাগণ স্ব-দেশের উন্নতির জন্য, সাহিত্যাদি শাস্ত্রোন্নতির জন্য, স্থানে স্থানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। অধুনা আমাদের রাজাও শিক্ষানিপুন, দয়ালু প্রজারঞ্জক, এক্ষণে যদ্যপি আমরা তাঁহাদের সুশিক্ষার অনুসরণ করি—তাঁহা-

দের সাহায্যে প্রাচ্য শিক্ষার ও সাহিত্যাদির উন্নতিকল্পে যত্নবান হই—সকলে সমবেৎ হইয়া হৃদয়ে একাগ্রতা স্থাপন করি, তাহা হইলে অবশ্যই আবার আমাদের উন্নতি হইবে—ভারতে হিন্দুদিগের পূর্ব্বগৌরব বৃদ্ধি হইয়া আবার ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

মৃত্যুর পর।

(১৪)

স্বর্গ ও নরকাদির বর্ণনা পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়কে যাহা উপহার দিয়াছি তাহা প্রায়ই পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন যে আর্য্যদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র যে বেদ তাহাতে বুঝি এই সকল বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই, নহিলে তাহা হইতে কোন সংবাদ দেখিলাম না কেন? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ আবার স্বর্গ নরকের কথা একবার তুলিতে হইল। আমি বিশ্বকোষ অভিধান লিখিতেছি না সুতরাং বেদে যেখানে যেখানে স্বর্গ নরকের কথা আছে তাহা উদ্ধার করিতে বাধ্য নহি। বেদে যে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে ইহা দেখাইলেই আমার কার্য্য ফুরাইল। কোন বিশেষ কারণ বশত বেদের শ্লোক উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয় তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ ভিন্নভাবে সঙ্কলিত হইয়া সংহিতা হইয়াছে। এইরূপ ঋগ্বেদ সংহিতায় ৯ মণ্ডল, ১১৩ সূক্ত, ৭—১১ ঋকে বৈবস্বত অর্থাৎ যমলোকের বর্ণনা আছে। তাহার মর্ম্ম এই—"হে পবমান সোমদেব, যে লোকে অজস্র জ্যোতি ও সূর্য্যতেজ অবস্থিত আছে, সেই অমৃত অক্ষয় লোকে আমাকে স্থাপন কর। যে লোকে বৈবস্বত বা যমরাজা রাজত্ব করেন, যেখানে দ্যুলোকের অন্তরতম স্থান এবং বিস্তৃত সলিলপুঞ্জ অবস্থিত আছে, সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে লোকে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করা যায় এবং যেখানে জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল বিদ্যমান আছে, দ্যুলোকের সেই ত্রিনাভি বিশিষ্ট পবিত্রতম স্থানে আমাকে অমর কর। যেখানে যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ এবং সুধা ও তৃপ্তি আছে ও যেখানে

সূর্য্যলোক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থানে আমাকে অমর কর। যে স্থানে বহুল আনন্দ ও বহুতর আমোদ-প্রমোদ বিদ্যমান আছে এবং যেখানে কাম্য-বস্তু সমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাকে সেই স্থানে অমর কর।"

অথর্ব্ব বেদ সংহিতায় ৪।৩৪।২-৪ স্থলে এইরূপ বর্ণনা আছে।

"তাঁহারা অস্থিশূন্য, পবিত্র, বায়ু দ্বারা বিশুদ্ধিকৃত এবং উজ্জ্বল হইয়া জ্যোতির্ম্ময় লোকে গমন করেন। অগ্নি তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় দগ্ধ করেন না তাঁহাদের সেই স্বর্গলোকে যথেষ্ট রতিসুখ সম্ভোগ হয়। যাঁহারা বিষ্টারী নামক হবন দ্রব্য রন্ধন করেন, তাঁহাদের কখন অপ্রতুল হয় না, এরূপ ব্যক্তি যমের সহিত বাস করেন, দেবতাদিগের সন্নিধানে গমন করেন এবং সোম-পায়ী গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আনন্দে অবস্থান করেন। যাঁহারা বিষ্টারী নামক হবন দ্রব্য রন্ধন করেন, যম তাঁহাদের শিশ্নেন্দ্রিয় হরণ করেন না। এরূপ মনুষ্য রথস্বামী হইয়া তদুপরে বাহিত হন ও পক্ষ বিশিষ্ট হইয়া গগণ মণ্ডল অতিক্রম করিয়া যান।"

ঐ শ্লোকের একটু পরেই আছে (৪।৩৪।৬) "ধার্ম্মিক লোকের জন্য পর-লোকে ঘৃত, মধু, সুরা, দুগ্ধ এবং দধির পূর্ণ সরোবর আছে।" আর এক স্থানে (১২।৩।১৭) "তুমি আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাও। আমরা যেন সেখানে স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্রে অবস্থান করি।"

"যে স্ত্রীলোক পূর্ব্ব পতি সত্ত্বে অন্যপতি গ্রহণ করেন, অজ পঞ্চৌদন দান করিলে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না, দ্বিতীয় পতিও যদি দক্ষিণা দ্বারা দীপ্তিমান্ অজপঞ্চৌদন দান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাঁহার পুনরুদ্বাহিত পত্নী উভয়ে একলোকে গমন করেন।"——অথর্ব্ব বেদ সংহিতা ৯।৫।২৭-৮

পাঠক মহাশয় যদি বেদে নরক বর্ণনা দেখিতে চান তবে অনুগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার ৪ মণ্ডল, ৫ সূক্ত, ৫ ঋক্ ও ৯ মণ্ডল, ৭৩ সূক্ত, ৮ ঋক্। অথর্ব্ববেদ সংহিতার ৮।২।২৪, ১৮।৩৩ ও ১২।৪।৩৬ দৃষ্টি করিবেন।

উপনিষদেও আছে, যথা—

অসূর্য্যানাম তেলোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥

বাজসনেয়ি সংহিতোপনিষদ্।৩।

অর্থাৎ যাঁহারা আত্মস্বরূপকে হনন করেন, তাঁহারা মৃত হইয়া ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত অসূর্য্য লোকে গমন করিয়া থাকেন।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির জন্য শাস্ত্র। আগাগোড়া যে সকল শাস্ত্রবিধি উদ্ধার করিয়াছি সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে ভগবান্ কি বলিয়াছেন তাহা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দি।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥ ২৩, ১৬অ
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া কামাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে কখনও সিদ্ধি সুখ ও পরমগতি লাভ করিতে পারে না। ২৩

সেই হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; অতএব তুমি শাস্ত্র বিধান জানিয়া কার্য্য কর। ২৪

আর শাস্ত্র বাক্যে যাঁহারা সংশয়বিশিষ্ট হয়েন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও শ্রীভগবানের কথা আছে, তাহা এই

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪অ, ৪০

অজ্ঞ অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়ী ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই সন্দেহ-সঙ্কুল-চিত্ত ব্যক্তির ইহকাল, পরকাল এবং সুখও নাই।

প্রসঙ্গত শাস্ত্র-শাসনের কথা আনিয়াছি কিন্তু শাস্ত্র শব্দের অর্থই হইতেছে যদ্দ্বারা শাসন করা যায়। রাজভক্ত রাজার শাসন মানিয়া চলেন, আর ভগবানের ভক্ত ভগবানের শাসন অর্থাৎ শাস্ত্র মানিয়া চলেন। হিন্দুর পক্ষে আর্য্যের শাস্ত্রই শাস্ত্র। হিন্দুর জন্যই এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে।

কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে কি আর্য্যের শাস্ত্র, শাস্ত্র নহে? প্রসঙ্গত আর একটী কথা আসিয়া পড়িল সত্য বটে, কিন্তু দুই এক কথা না বলিয়াই বা কি করিয়া প্রসঙ্গ ত্যাগ করি? অহিন্দুর পক্ষে—আজি কালি যাহাই হোক, স্থূল দৃষ্টিতে যাহাই হোক, আজিকালি অনেক হিন্দুও ত হিন্দুশাস্ত্র মানেন না,—একদিন আর্য্যের শাস্ত্রই শাস্ত্র ছিল। আধুনিক সভ্যতাভিমানী শব্দরহস্যবিদ্ পণ্ডিতগণ এ কথা এক প্রকার প্রমান করিয়াছেন। আর সভ্য জগতের কোন পণ্ডিতই তদ্বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা আলোচনা করিয়া শব্দরহস্যবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, টিউটনিক প্রভৃতি কতক অহিন্দু জাতিরা পূর্ব্বে সকলেই আর্য্য ছিলেন ও তাঁহাদের এক ভাষা ছিল, সম্ভবত তাহা

সংস্কৃত। সে গুরুতর বিষয় সমালোচনের এ স্থানও নয়, সময়ও নয়। তবে আমার আবশ্যক মতে দুই একটা কথা আলোচনা করিব।

ভাষাতত্ত্ব গবেষণায় ইহা জানা গিয়াছে যে বৈদিক দেবতাগণ জল বায়ু ও উচ্চারণ বিকারে অন্য ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পূজার আসন পাইয়াছেন। পরলোকের ভাব ও স্বর্গ নরকের ভাব সকল জাতিরই আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেবতাদিগের কথা ও দুই একটি আনুসঙ্গিক বিষয়ের কথা।

অমর বাচক শব্দটি সংস্কৃতে অমর্ত্য, গ্রীক ভাষায় আম্ব্রাটস্ এবং লাটিনে ইমার্টালিস্ দেখাইলে অনেক দেখান হইল, কেননা ইংরেজী, ফরাশি প্রভৃতি আধুনিক জাতির ভাষা প্রধানত রোমীয় ভাষা বা লাটিন হইতে লওয়া। রোমানদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের ন্যায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রচলিত ছিল। চিতা-সজ্জা, সম্পর্কীয় লোক দ্বারা মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আত্মীয় ভোজন করান প্রচলিত ছিল। "আর্য্য" শব্দটিই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত আছে। সংস্কৃত দিব্ বা দ্যু ধাতু হইতে দেব শব্দ হইয়াছে। লাটিন ডিউস্, গ্রীক্ জিউস্ ও থেয়স্, প্রাচীন জার্ম্মান টুসিও, লিথুনিয় দাইবস্ শব্দগুলি সংস্কৃত দিব্ শব্দেরই এককপ বা অনুরূপ।

সংস্কৃতের "দ্যৌ" দেব, গ্রীকের জিউস; দ্যৌস্পিতৃ জুপিটর, বরুণস্-উবনস্ বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে। সংস্কৃত অরুষা, অহনা, সরণ্যু, অক্ষিবান্ হরিৎ, গন্ধর্ব্ব, বৃত, সরমা, পণি, গ্রীকদিগের ঈরস্, ডাক্‌নী, এরেন্নুস, ইক্‌সিওন্, খ্যারিট, কেণ্টোরস্, অর্থ্রস্, হেলেনা, পারিস্ প্রভৃতিরই অনুরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সংস্কৃত 'অসুর' পারসীকদিগের 'অহুর', সংস্কৃত ত্রিত ও ত্রৈতন, পারসীকদিগের থ্রিত ও থ্রএতওন। নাভানেদিষ্ট—নবান-জুদিস্ত। সরস্বতী—হুরথইতি। মিত্র—মিথ্রণ সংস্কৃত বায়ু, সোম, অরমতি, অর্য্যমন্ নরাশংস যথাক্রমে জেন্দবেস্তার বয়ু, হোম, অর্‌মইতি, অইর্য্যমন্, নইর্য্যোশঙ্হ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতা ও অথর্ব্ববেদে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে, জেন্দ-অবেস্তায় ও ৩৩ জন রতু, অহরমজ্‌দের (বরুণ) তত্ত্ব প্রচারে নিয়োজিত। বৈদিক অথর্ব্বন্ ও হোতা অবেস্তার আথ্রব ও জওত। সোম (সোমরসের) = হোম (উদ্ভিদ্ বিশেষ)। পারসীকদিগেরও যজ্ঞোপবীত ধারণ করার রীতি ছিল ও এখনও কোথাও কোথাও আছে।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ন্যায় অনেকগুলি ক্রিয়া ও যজ্ঞ অবেস্তায় উল্লিখিত আছে। অনেকে অনুমান করেন একটি বেদের সমগ্র অংশই জেন্দ-অবেস্তায় রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল দেবতার নামের সাদৃশ্য দেখান হইল তাঁহাদের কর্ম্মসাদৃশ্যও আছে অর্থাৎ বৈদিক দেবের যে কার্য্য উল্লিখিত দেবতারও সেই কার্য্য। সপ্তসিন্ধু ও যা হপ্তহেন্দুও তাই। আমাদের যম যাহা অবেস্তার যিম্ তাহা। আমাদের সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, পারসীকদিগেরও পৃথিবী সাত খণ্ডে বিভক্ত। আমাদের সুমেরুর ন্যায় উহাদের তাদৃশ পর্ব্বত আছে। সুমেরুর একাংশে ব্রহ্মার পুরী, পারসীকদিগেরও পর্ব্বতের শিখরে মিথ্রদেবের পুরী।

এখনকার সভ্য শব্দরহস্যবিদ্ পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহারই অস্পষ্ট ছায়া মাত্র অতি সংক্ষেপে পাঠক মহাশয়কে উপহার দিলাম। হিন্দুর শাস্ত্রে এ কথা আছে, যে হিন্দুই দোষ করিয়া ম্লেচ্ছ হয়েন। যযাতির পুত্র ম্লেচ্ছ হইবার উপাখ্যান প্রায় সকলেরই অবগতির মধ্যে। আজ নাকি গ্রহবৈগুণ্যে হিন্দুর সকলই মন্দ তাই উল্লিখিত বিবরণটী সংগ্রহ করিলাম।* অন্তত হিন্দুর মধ্যে হিন্দুয়ানীর মধ্যে কি আছে—জানিতে ইচ্ছা হইলেও শ্রম সফল হইবে। পাঠক মহাশয়কে আর কি বলিব, আমেরিকার পিরু দেশীয় 'ইঙ্কা' রাজারা সূর্য্যবংশীয়, আর বহুপ্রকার দেবদেবীর মন্দির, পিরু ও মেক্সিকো প্রদেশে বাহির হইয়াছে। যব দ্বীপেই হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে, শুধু নহে, আফ্রিকার অনেক স্থলে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ডের একস্থলে বৃষ ও ত্রিশূলধারী এক ব্যক্তির প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পরলোকগত আত্মা আবার ফিরিয়া আসিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবে বলিয়া "মমী" অর্থাৎ শবদেহ মিশরে রক্ষিত হইত, আর গগণ বিহারী আত্মাগণ আপনাদের দেহ দেখিতে আসিবে বলিয়াই অত উচ্চ করিয়া মিশরের পিরামিড গ্রথিত হইয়াছিল। মহম্মদের ধর্ম্ম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সকল দেশেই দেবদেবীর পূজা ছিল। পারসীক, গ্রীক্, য়িহুদীরা, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ভূলোক, স্বর্গলোক, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতির পূজা করিতেন। এখন ত একথাও শুনিতেছি, যে তিব্বৎ দেশে যীশুর যে জীবনী বাহির হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনের ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে আর য়ুরোপীয়েরা তাঁহার জীবনের যে অংশের কোন রহস্য বলিতে

*"ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়।"

পারেন না, জীবনীতে তাঁহারও বিবরণ আছে। সে সময়ে তিনি নাকি পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না কিন্তু একটি কথা চিন্তা করিবার বিষয় বটে। কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে মনুষ্যের যথার্থ জ্ঞান হয়। কুণ্ডলিনী সর্প বা সর্পাকৃতি। আধুনিক বাইবেলেও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার জন্য সর্প অনুরোধ করিয়াছিল। স্ত্রীজাতির অনুরোধে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ। তন্ত্রমতে স্ত্রী শক্তি ও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে গেলে স্ত্রীর সাহায্য আবশ্যক, কেননা স্ত্রী সহচারিণী ও সহধর্ম্মিণী।

বেদের কথা বলিয়া তন্ত্রের কথা না বলিলে কলিতে পাপ আছে। শব্দ উচ্চারণে তন্ত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। বেদ ত চারিখানি না হয়, মতান্তরে পাঁচখানি। তন্ত্র কত? তন্ত্র এক লক্ষেরও উপর এবং এখনও প্রতিদিন কৈলাস-শিখরে নূতন নূতন তন্ত্র সৃষ্টি হইতেছে—ইহাই শাস্ত্রের কথা। অবশ্য বিশ্বাস করা না করার জন্য পাঠক মহাশয় দায়ী, সে ভোগ আমাদিগকে ভুগিতে হইবে না। এখন এতগুলি তন্ত্র হইতে কি উদ্ধার করিব এবং তাহার আকারই বা কিরূপ হইবে? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমি বিশ্বকোষ অভিধান লিখিতেছি না। আভাস দিলেই যথেষ্ট।

তন্ত্রই বলিয়াছেন—

বেদাদ্যনেক শাস্ত্রানি স্বল্পায়ুর্বিঘ্নকোটয়ঃ।
তস্মাৎ সারংবিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাম্ভসি॥

অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অনেক, লোকের আয়ু অল্প অথচ কোটী কোটী বিঘ্নপূর্ণ, সেই জন্য হংস যেমন জল হইতে ক্ষীরমাত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ শাস্ত্রের সার যাহা তাহাই জানিবে।

কুলার্ণবতন্ত্রে দেবী ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপে জীবের "ভব-বন্ধন" মোচন হইতে পারে।

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবী, প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণ মাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
অস্তি দেবি পরংব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোদয়ঃ॥
অয়ং জ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্ব্বিকার পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দ স্তদংশা জীবসংজ্ঞকা॥

অসত্যাঽবিদ্যাপহিতা যথাগ্নৌবিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
স্বর্গাদ্যুপাধিভিন্নাস্তে কর্ম্মাদিভিঃ রনাদিভিঃ॥
সুখদুঃখপ্রদৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যপাপৈর্নিযন্ত্রিতাঃ।
তত্তজাতিযুক্তং দেহমায়ুর্ভোগঞ্চ কর্ম্মজং।
প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে তেষামন্তো ন বিদ্যতে॥

* * *

মহাদেব বলিলেন,—দেবি তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহার শ্রবণমাত্রে নর সংসার হইতে মুক্ত হয়। দেবি, পরব্রহ্মস্বরূপ নিষ্কল শিব নিত্য রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর এবং নির্ম্মলোদয়। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ, অনাদি অনন্ত, নির্ব্বিকার পরাৎপর নির্গুণ সচ্চিদানন্দ, তাঁহারই অংশ সকল অসতী অবিদ্যায় উপহিত হইয়া জীব নামে অভিহিত হয়। অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় শিব (ব্রহ্ম) হইতে, তদ্রূপ জীবনিঃসৃত হয়। এই সকল জীব সুখদুঃখপ্রদ স্বীয় স্বীয় পুণ্যপাপরূপ অনাদি কর্ম্ম দ্বারা নিযন্ত্রিত এবং স্বর্গনরকাদি উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম অনুরূপ জাতিবিশিষ্টদেহ, (পশু পক্ষী মানুষ) আয়ু ও ভোগ জন্মে জন্মে প্রাপ্ত হয়। জন্মে জন্মে কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্তদেহের ও শেষ নাই।

সূক্ষ্মং লিঙ্গশরীরং তদামোক্ষাদক্ষয়ং প্রিয়ে।
স্থাবরাঃ ক্রময়শ্চাব্জাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকা স্ত্রিদশা স্তদ্বৎ মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমং।
চতুর্ব্বিধ শরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতান্মানবো ভূত্বা জ্ঞানীচেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাং।
ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তুলভ্যতে।
অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি।
কদাচিৎ লভতে জন্তু র্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং।
য স্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ॥

স্থূল দেহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহা যতদিন মোক্ষ না হইবে ততদিন অক্ষয়ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। প্রথমে স্থাবর (পর্ব্বত, জল বৃক্ষ লতা) তারপর ক্রমিকীট (মশক আদি) তারপর অব্জ, (জলজীব মৎস্য কচ্ছপ আদি) তারপর পক্ষীসকল, তারপর পশুসকল, তারপর নরসমূহ। অনেকবার মনুষ্য

জন্ম গ্রহণের পর জ্ঞানবৃদ্ধি বশে মানুষ ধার্ম্মিক হয়। অনেকবার ধার্ম্মিক জন্মগ্রহণের পর মানব দেবযোনি (গন্ধর্ব্বসিদ্ধ বিদ্যাধর, যক্ষ, চারণ, কিন্নর, গুহ্যক, ভূত, রক্ষ, পিশাচ আদি) প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে উন্নত হইলে মানুষ পূর্ণ দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। এই দেবদেহে স্বর্গভোগের পর কর্ম্ম অনুসারে উচ্চধাম ব্রহ্মলোকাদিতে অথবা নিম্নধাম মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া তখন তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকার ও অভিলাষ জন্মে, ইহাই জীবের ক্রমসিদ্ধি বা ক্রমোন্নতি। (কাহারও সাধ্য নাই এ ক্রম অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে মোক্ষাধিকারী হইতে পারে।)* উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ শরীর সহস্র সহস্র জন্মে ধারণ করিয়া তবে জীব পুণ্যফলে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে। এই মানব-জন্মে যদি জীব তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, তবেই মোক্ষ লাভকরে। শরীরি বর্গের চতুরশীতিলক্ষ শরীর মধ্যে মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য কোন দেহেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। পার্ব্বতি, এই সহস্র সহস্র জন্ম মধ্যে বহুসহস্রদেহ অতিবাহিত করিয়া বহু পুণ্যের সঞ্চয় থাকিলে তবে কদাচিৎ একটি জীব মনুষ্যত্ব লাভ করে। মোক্ষের সোপান স্বরূপ এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে আত্মাকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ না করে তাহা অপেক্ষা পাপী আর ত্রিসংসারে কে আছে?

> ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্মলব্ধা চেন্দ্রিয় সৌষ্ঠবং।
> ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদ্ ব্রহ্মঘাতকঃ॥
> বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে।
> তস্মাদ্দেহধনং রক্ষ্যং পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
> রক্ষেৎ সর্ব্বাত্মনাত্মনং আত্মা সর্ব্বস্য ভাজনং।
> রক্ষণে যত্নমাতিষ্ঠেৎ যাবত্তত্ত্বং ন পশ্যতি॥
> পুনর্গ্রামাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিত্তং পুনর্গৃহং।
> পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃপুনঃ॥
> ইহৈব নরকব্যাধে শ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
> গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি॥

সেই মনুষ্যদেহে আবার উত্তমকুলে জন্ম, ইন্দ্রিয়বর্গের সৌষ্ঠব (সম্পূর্ণতা) লাভ করিয়াও যে আপনার হিত আপনি বুঝিতে পারে না, সেই যথার্থ ব্রহ্মঘাতক (ব্রহ্মরূপ আত্মার আঘাতকারী)। দেহ ব্যতিরেকে কাহারও কোন পুরুষার্থ

---

*"শৈবী"—হইতে। শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিনীতভাবে অনুমতি চাহিতেছি।

সিদ্ধ হয় না, সেইহেতু দেহরূপ ধনকে নিয়ত রক্ষা করিবে এবং সে দেহের দ্বারা (ভোগবিলাস না করিয়া) পুণ্য কর্ম্ম সকল সাধিত করিবে। সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মাকে (দেহকে) সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। আত্মাই (দেহই) সমস্ত পুণ্য ফলের ভোগ কর্ত্তা। অতএব তাহার রক্ষণে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, যতদিন পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ না হয়। (জন্মান্তরে) পুনর্ব্বার গ্রাম, পুনর্ব্বার ক্ষেত্র, পুনর্ব্বার বিত্ত, পুনর্ব্বার গৃহ, পুনর্ব্বার শুভাশুভ কর্ম্ম, এ সকলই পুনর্ব্বার হইতে পারে বা হইবে; কিন্তু যে শরীর একবার যাইবে, তাহা আর কখনও পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবে না। ইহলোকেই যে ব্যক্তি ভাবী নরকব্যাধির চিকিৎসা না করে ঔষধহীন দেশে (পরলোকে) গিয়া ব্যাধিস্থ হইয়া তখন আর সে কি প্রতিকার করিবে?

শতং জীবিতমিত্থঞ্চ নিদ্রা তস্যার্দ্ধ হারিণী।
বাল্যরোগ জরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলং॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যে ভয়স্থানং হা নরঃ কেন হন্যতে॥
তোয়ফেণ সমে দেহে জীবে শকুনিবৎ স্থিতে।
অনিত্যে প্রিয়সংসারে কথং তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ।
সন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
মৃত্যুরোগমহাগ্রাহে ন কিঞ্চিদপি বুধ্যতি।
পৃথিবীদহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে
শুষ্যতে সাগরজলং শরীরে দেবী কা কথা।
ইদংকৃতং মিদংকার্য্যং মিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্।
এব মীহাসমাযুক্তং মৃত্যুরত্তি জনং প্রিয়ে॥

উর্দ্ধ সংখ্যা জীবগণের শতবর্ষ পরমায়ু, নিদ্রা তাহার অর্দ্ধভাগ (পঞ্চাশ বৎসর) হরণ করে; আর যে অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকে, বাল্য, রোগ, জরা ও দুঃখ এই চারিজনে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ নিজ ভোগের বিষয় করিয়া লয়। তজ্জন্য সে অর্দ্ধেক থাকিয়াও জীবের পক্ষে নিষ্ফল; কারণ স্বাধীনরূপে তাহার নিজের ভোগ করিবার উপযুক্ত, পরমায়ুর কোন একটু ভাগও অবশিষ্ট থাকে না। যাহা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহাতেই উদ্যোগহীন হয়, যেখানে জাগিয়া থাকিতে হইবে সেইখানেই ঘোর নিদ্রিত হয়, আর যে স্থানে বিশ্বাস করিতে হইবে সেই স্থানেই ভয়ের সম্ভাবনা করে। হায়, কোন্ দুরদৃষ্টফলে নরগণ এইরূপ বিপরীত পথে গিয়া হত হয়? জলের উপরিভাগে

ফেণরাশি সমষ্টি গত হইলে তাহার উপরে গিয়া কোন পক্ষী বসিলে তাহার অবস্থা যেমন ক্ষণভঙ্গুর ভয়ঙ্কর ও বিপদের মূল, তদ্রূপ এই ক্ষণবিনশ্বর দেহে অবস্থিত হইয়া এই অনিত্য সংসারকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া, হায়! জীবকুল কোন প্রাণে নির্ভয় হইয়া রহিয়াছে। দেবি, মৃত্যু ও রোগরূপ মহাকুম্ভীর কুলে আবৃত গম্ভীর কালসাগরে এ জগৎ মগ্ন হইয়া যাইতেছে কিন্তু কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। দেবি, যাহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হয়, সুমেরু পর্ব্বত বিশীর্ণ হয়, সপ্তসমুদ্রের জল শুষ্ক হয়, সেই কালের প্রভাবে জীবের শরীর বিনষ্ট হইবে, ইহাতে আর কথা কি? প্রিয়ে, ইহা করিয়াছি, ইহা করিতে হইবে, ইহার কিয়দংশ কৃত হইয়াছে, কিয়দংশ অকৃত রহিয়াছে, নিয়ত এই-রূপ কর্ম্মচেষ্টায় ব্যাকুল মানবকে মৃত্যু আসিয়া সহসা গ্রাস করে।

জীবস্তৃণ জলৌকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ।
সংপ্রাপ্য পরমংশেন দেহং ত্যজতি পূর্ব্বজং॥
বাল্যযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা দেহান্তরাদিকম্।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্গৃহাদ্গৃহমিবাগতিঃ।
জনাঃ কৃত্বেহকর্ম্মাণি সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে।
পরত্র হানিতো দেবি! যান্ত্যায়ান্তি পুনঃপুনঃ॥
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপ ভুঞ্জতে।
সিক্তমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃশ্যতে॥

তৃণজলৌকার ন্যায় জীব মৃত্যুকালে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, অর্থাৎ তৃণ সঞ্চারী জলৌকা যেমন নিজ শরীরের একাংশ দ্বারা অন্য তৃণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করে, জীবও তদ্রূপ একাংশ দ্বারা আতিবাহিক দেহ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। দেহের পক্ষে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য যেমন অবস্থান্তর মাত্র, জীবের পক্ষে দেহান্তর প্রাপ্তিও তাহাই। দেহ যেমন গৃহ হইতে গৃহান্তরে গত হয়, জীবও তদ্রূপ দেহ হইতে দেহান্তরে গত হয়। জন সকল ইহলোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে তদনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে। পরলোকে ভোগাবসান হইলে আবার ইহলোকে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে। জীব ইহলোকে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, পর-লোকে তাহারই ফলভোগ করে। বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে ফল যেমন তাহার শাখাতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ইহলোকের কর্ম্মফলও পরলোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

ভুল।

আকাশ মাঝারে হাসিছে শশী
হাসিছে অনন্ত তারকাকুল,—
সরমে হাসিছে নলিনীধনী
কাননে হাসিছে কতই ফুল।

ফুলের আতর মাখিয়া গায়,
সমীর হাসিয়া পড়িছে ঢ'লে,—
আমারি থেমেছে হাসির খেলা
কালিমা ছেয়েচে মরম তলে।

আমারি বসন্তে অনল ঢালা
মলয়ে মাখান তপত ধূল,—
আমারি বীণা বেসুরে বাজে
আমারি পরাণে মাখান ভুল।

হৃদয় বিথারি প্রেমের মালা,
পরানু হাসিয়া যাদের গলে,—
তারাত চাহেনা নয়ন তুলি
হিয়াখানি পদে দিল যে দ'লে।

ফুটিল তাহাতে জ্ঞানের আঁখি,
ভাবিলাম চিতে জগতে আর,—
আপনা ভুলিয়া রবনা বাঁধা
ঢালিব না হেথা প্রেমের ধার।

হৃদয়ের প্রেমনিতি যতনে,
পরমেশ পদে করিব দান,—
তাঁর(ই) প্রেমে সদা মগন রয়ে
প্রাণ খুলে গাব তাঁহারি গান।

চকিতে সে জ্ঞান গেল গো উড়ি
পবনে যেমন পৃথির ধূল,—
আবার জগতে পড়িনু বাঁধা
আমারি পরাণে দারুণ ভুল।

কত ভাই বোন রয়েছ হেথা
আমারে দেখায়ে দিবে কি কুল,—
আপন বলিয়া যতন করি
দিবে কি আমার ভাঙ্গিয়া ভুল।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা——মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চম বর্ষ। | চৈত্র, ১৩০৪ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

পাপের পরিণাম।

(গল্প)

১৫শ অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভেলামারির ব্যাপারে রামসুন্দরের মন খারাপ হইয়াছিল। জীবনে কথনও এত অর্থ ক্ষতি তাঁহার হয় নাই। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া রামসুন্দর ভেলামারিতে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ অর্জ্জুনদাসের এবং তাঁহার নিজের মোকর্দ্দামায় ব্যয় হইল। রামসুন্দর ভাবিলেন লোকগুলিকে মারিয়া ছাড়িয়া দিলেই হইত। এজাহার দেওয়াতেই বিপদগ্রস্ত হইলাম। শালার দারগা ঘুস নেয় না, এ কেমন করে বুঝ্‌বো? যা'ক এমন করে আর ধরা দেবো না। গ্রামে বসিয়া এমন লোকের উপর অত্যাচার করিব, যার রাজদ্বারে যাইবার শক্তি-সামর্থ্য বা সম্ভাবনা নাই। সমকক্ষ বা প্রধান লোককে জব্দ করিতে হইলেই কৌশলের প্রয়োজন। দরিদ্রকে পীড়ন করা প্রকাশ্যেও চলে।

প্রথমতঃ ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নীর প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। গোপাল উস্কাইয়া দিল। ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর জন্যেই ত গৃহিণীকে তাড়াইতে হইয়াছে। রামসুন্দর দেখিলেন ধনঞ্জয়ের তিন চারি বিঘা জমিতে হৈমন্তিক ধান পাকিয়াছে। তাঁহার মনে হইল ধনঞ্জয়ের ধানগুলি কাটিয়া লইতে হইবে। ধনঞ্জয় তাঁহারই প্রজা ছিল। পাঠক জানেন ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নী আর তাহার দুই অপোগণ্ড সন্তান বই কেহ নাই। এমন লোকের প্রতি পীড়ন

করা বড়ই সহজ। রামসুন্দর তাঁহার মহাজনি খাতা বাহির করিলেন। দেখিলেন ধনঞ্জয় একবার পাঁচ টাকা ধার করিয়াছিল। সে তাহা শুদে আসলে শোধই করিয়াছিল। কিন্তু গোপাল একরূপ হিসাব করিয়া আড়াই টাকা তিন টাকা পাওনা করিয়া রাখিয়াছিল। রামসুন্দর মনে মনে স্থির করিলেন, লোকের কাছে ইহাই বলা যাইবে। ধানটা একবার কেটে নিলেই মাগী গ্রাম ছেড়ে পালাবে। ঐ জমিগুলি আর এক জনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়া যাইবে।

অনাথা ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নী এ সব কিছুই জানে না। ঐ জমিটুকুই তার সম্বল। তাহার স্বামীর অর্জ্জিত শস্য আর কেহ লইয়া যাইতে পারে এ ধারণা তাহার মনেই আসে নাই। ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর পরে অবস্থা দেখিয়া গ্রামের লোকে অনেকেই তাহাকে দয়া করিত। ধানগুলি পাকিয়াছে দেখিয়া সে কয়েকজন প্রতিবেশীকে তাহা কাটিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে আমরা সকলে মিলিয়া একদিন খাটিয়া তোমার ধান কাটিয়া দিয়া আসিব। যে দিন তাহাদের আসিবার কথা তাহার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালেই যাদবের মা দেখিল তাহার ক্ষেতে ধান কাটিতে মানুষ লাগিয়াছে। জমি বাড়ীর অতি নিকটে। সে মনে করিল গ্রামের লোকেরাই অবসর এবং সুবিধা পাইয়া একদিন আগে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাকে বলিয়া যায় নাই বলিয়া ভাবিল একবার যাইয়া দেখিয়া আসি। বিনা পয়সায় আর কারও ধান কেটে দিলে পাওয়াটা ত পেত। আমি কিছুই দিব না। ক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া যাদবের মা দেখিল যাহারা ধান কাটিতেছে তাহারা তাহার পরিচিত নহে। তাহার মনে খট্‌কা লাগিল। অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সে যাদবকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইল, তোমরা এ জমির ধান কাটিতেছ কেন? একজন উত্তর করিল. "কর্ত্তা হুকুম দেছেন। ধনঞ্জয় তার টাকা ধারিত সেই টাকার জন্য এই ধান কেটে নিচ্ছেন।"

কর্ত্তা বলিলে রামসুন্দরকে বুঝাইত। কর্ত্তা ধান কাটাইতেছেন শুনিয়া বিধবার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার লজ্জা পলায়ন করিল। যাহারা ধান কাটিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সে কহিল "আগে আমাকে কাট তারপর আমার ধান কাটিও।" যাহারা ধান কাটিতেছিল তাহারা দস্যু নহে। পারিশ্রমিকের লোভে রামসুন্দরের কাজ করিতে আসিয়াছিল।

তাহারা প্রথমে বুঝিয়াছিল বিধবা সম্মত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া হস্তস্থিত অস্ত্র ত্যাগ করিল এবং একজন কহিল, "যারে একজন যেয়ে কর্ত্তাকে খবর দে।"

রামসুন্দরের প্রাতঃস্নান হইয়া গিয়াছে। খড়ম পায়ে, মালা টপটপ করিতে করিতে আসিয়া জমির একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যাদবের মা তাঁহাকে দেখিয়াই নিকটে আসিল এবং চরণ ধরিতে গেল। "ছুঁসনে, ছুঁসনে," বলিয়া কর্ত্তা সরিয়া গেলেন। বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কর্ত্তা কি আমার এই ধান কাট্‌বার হুকুম দেছেন? কর্ত্তা টাকা পাবেন তা'ত একদিনও শুনি নি।" "তা আবার তুই শুনিবি কি? তা জান্‌ত ধনঞ্জয়" বলিয়া রামসুন্দর উত্তর করিলেন। রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "আজ্ঞে কত টাকা?" "তা কি তোর কাছে নিকেস দিতে হবে না কি" বলিয়া রামসুন্দর বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন "কাট্‌বে, ধান কাট্‌।" বিধবার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, সে পুনরায় বাধা দিল। যে স্থান পর্য্যন্ত ধান কাটা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে যাইয়া বসিয়া পড়িল। ধানকাটা লোকের মধ্যে দুএক জন উঠিয়া আসিল, দুএক জন অস্ত্র হস্তে বসিয়া রহিল। অর্দ্ধ বয়স্ক এক জন কহিল, "কর্ত্তা এ ধান আমি কাট্‌তে পার্‌ব না। সকলেরই ব্যাটাপুত আছে।"

রামসুন্দর তোমারও ত ব্যাটাপুত আছে। এই নিরক্ষর শ্রমজীবির যে ধর্ম্মভয় আছে, তাহা তোমার থাকিলে যথেষ্ট হইত।

রামসুন্দর দেখিলেন বেটীকে জমি হইতে সরাইতে না পারিলে সুবিধা নাই। দুতিনবার শ্রমজীবিদিগের উপর তম্বি করিলেন, "দেনা শালারা তুলে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে কেমন ন্যাকা হারামজাদী।" তাহারা কেহই কিন্তু তাহার গাত্র স্পর্শ করিল না। রামসুন্দর স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়াই আরম্ভ করিলেন, "সরে যা হারামজাদী, ধান কাট্‌তে দে। আমার পাওনা শোধ হয়ে যদি দু'চারি কাঠা থাকে তা তোকে দেব"। বিধবা তখন বিধাতা এবং মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া রোদন করিতেছিল। রামসুন্দরের চরণ নিকটে পাইয়া দুই হস্তে তাহাই ধরিল এবং পুনঃপুনঃ কাতরতার সহিত তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। রামসুন্দর কেবল "ছাড়্‌ পা, ওঠ্‌ বেরো জমি থেকে" এইরূপ বোল ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

জননীর অবস্থা দেখিয়া যাদব মাধব দুই পুত্র তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রমজীবিদিগের দুএক জনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। রামসুন্দর ছাড়িবার লোক নহেন। পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, "আয়না শালারা সংএর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন?" তাহারা দু'এক জন অগ্রসর হইতেই ধনঞ্জয়পত্নী পুনরায় জোরে কাঁদিতে ও চেঁচাইতে লাগিল। রামসুন্দরের আর সহ্য হইল না। "মর্ শালি," বলিয়াই তিনি পা হইতে খড়ম খুলিয়া লইয়া সেই অসহায়া বিধবাকে বিষম প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীর পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া গেল। কাণ হইতে রক্ত বাহির হইল। তথাপি সে ধানের কথা ভুলিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদব কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল ও কহিতে লাগিল, "মা ধানে কাজ নাই, চল্ আমরা বাড়ী যাই, যে মার মেরেছে তোকে।" যে অর্দ্ধ বয়স্ক শ্রমজীবি পূর্ব্বে কহিয়াছিল, এ ধান আমি কাট্তে পারিব না, সে এই দৃশ্য দেখিয়া অস্ত্র লইয়া পলায়ন করিল।

ধনঞ্জয়পত্নী দুএকবার প্রহার স্থানে হাত বুলাইয়া মাটী হইতে উঠিল এবং পুনরায় রামসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার দুই পুত্র আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং কহিতে লাগিল "ওদিকে যাস্নে মা, তোকে আবার মার্বে।" রমণী তাহাদিগকে সরাইয়া রাখিয়া আবার আসিয়া রামসুন্দরের পায়ের উপরে পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কর্ত্তা মেরেছেন বেশ করেছেন—ও মার নয়, আমার আশীর্ব্বাদ হয়েছে, আমার ধানগুলি নেবেন না—ধানক'টী গেলে আমি ছেলে দু'টীকে কি খাইয়ে বাঁচাব? একবার এদের মুখপানে চান্।"

রামসুন্দর এবার আর রমণীকে প্রহার করিলেন না কিন্তু পুনঃ পুনঃ শ্রমজীবিদিগকে ধান কাটিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামসুন্দরের বাড়ী হইতে তাঁহার পেয়াদা নৃশংস আবদুল আসিয়া উপস্থিত হইল। রামসুন্দর একজন মজুরকে দিয়া আবদুলকে ডাকাইয়াছিলেন। আবদুল আসিয়াই মজুরদিগের একজনের হস্ত হইতে এক অস্ত্র কাড়িয়া লইল এবং তাহাদিগের সকলকে ডাকিয়া ধান কাটিতে অগ্রসর হইল। অসহায়া রমণী পুনরায় বাধা দিতে গেল কিন্তু আবদুল তাহাকে

এমন অকথ্য ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং অস্ত্র হস্তে তাহার সমক্ষে এমন বীভৎস ও কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল যে ধনঞ্জয়পত্নী আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না। আবদুলের স্বভাব গ্রামের সকলেই জানিত। বিধবা একবার মাত্র রামসুন্দরের দিকে চাহিয়া "কর্ত্তা এই কল্লেন্" বলিয়া ছেলে দু'টীকে লইয়া বাড়ীমুখে চলিল। যাইবার সময়ে কহিতে কহিতে গেল "কাল আমি জমির ধান কাটাব, গ্রামের দশজনের দুয়ারে যাইয়া বলাতে সকলে ঘরের খেয়ে আমার ধানগুলি কেটে দিতে চেয়েছিল। আর আজ তাই এমন করে নিয়ে গেল। বাবা, ত্রৈলোক্যের নাথ, গরীবের তুমি বই আর কে আছে বাবা, তুমিই এর বিচার করো।"

জগদীশ! মানুষের প্রতি মানুষের এমন অত্যাচারে কি তোমার সিংহাসন টলে না? টলিলে মানুষকে তুমি তাহা বুঝিতে দাও না কেন? রামসুন্দর এবং আবদুলের মাথায় এই ধানের ক্ষেতেই বজ্রপাত হইল না কেন?

আবদুলকে উপদেশ দিয়া, রামসুন্দর মালা টিপিতে টিপিতে বাড়ী ফিরিলেন।

১৬শ অধ্যায়।

ধনঞ্জয়পত্নী গ্রামের অনেকের কাছে কাঁদাকাটা করিল এবং তাহার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে তাহাও জানাইল। কিন্তু গ্রামে এমন লোক কেহই ছিল না যে রামসুন্দরের বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করে। তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কথা কহে কাহার সাধ্য?

তমলুকের নিকটবর্ত্তী পায়রাচালি গ্রামে ধনঞ্জয়ের শ্বশুর-বাড়ী। তথায় ধনঞ্জয়ের এক শ্যালক ছিল। রমণী গত্যন্তর না দেখিয়া ভাইএর কাছে যাইয়া থাকিবে স্থির করিল, এবং যে দিন তাহার ধানগুলি অপহৃত হয়, তাহার তিন দিন পরেই সে পায়রাচালিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাই তাহার মুখে রামসুন্দরের অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়া এবং তাহার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইল। সে তমলুকের একজন মোক্তারের বাসায় চাকরি করিত। সেই দিনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এমন অত্যাচারের প্রতীকার আছে কি না। মোক্তার তাহার ভগিনীকে লইয়া

আসিতে বলিলেন। পরদিন ধনঞ্জয়ের স্ত্রী শিশুপুত্র দু'টীকে সঙ্গে লইয়া তমলুকে সেই মোক্তার বাবুর বাসায় আসিল।

মোক্তার বাবুর হৃদয় ছিল। রমণীর অঙ্গে প্রহারের দাগ দেখিয়া এবং তাহার কারণ শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ই লাগিল। তিনি কহিলেন "আজই দরখাস্ত দাও। তোমার একটী পয়সাও লাগিবে না। আমি, এ মোকর্দ্দামায় যাহা ব্যয় লাগে, সমস্ত দিব। "রমণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার অসহায় অবস্থা এবং নীরব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সেই দিনই ফৌজদারিতে নালিস হইল। হাকিম, রামসুন্দরের এবং আবদুলের নামে শমন দিলেন।

রামসুন্দর মনেও করেন নাই যে ধনঞ্জয়ের বিধবাপত্নী কখনও তাঁহার নামে নালিস করিতে পারে বা করিবে। সহসা শমন পাইয়া তাঁহার চমক লাগিল। দু'তিনবার শমনগুলি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন সত্যসত্যই তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের শমন। রামসুন্দরের ভয় হইল। পাপীর মনে ভয় সর্ব্বদাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার বোধ হয় মৃত্যু-কালে। কেন না মানুষকে অনেক সময়ে ফাঁকি দেওয়া যায়। অনেক দুষ্কার্য্য মানুষের অসাক্ষাতে করা সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর পরে যে রাজ্যে যাইবার কথা সেখানে ফাঁকির কারবার নাই। লুকাইবার যো নাই। তাই সেই সর্ব্বশক্তি-মানের দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া পাপী বড়ই ভীত হইয়া পড়ে। রামসুন্দরের ন্যায় লোকের কি মৃত্যুর পূর্ব্বেও অনেকবার এই ভয় মনে উদয় হয় না?

রামসুন্দরের এক ভরসা এই যে মাগী সাক্ষী পাবে কোথা? মোকর্দ্দামার প্রথম ধার্য্য দিনে তিনি আবদুলকে উপস্থিত করিয়া দিলেন, নিজে হাজির হইলেন না। কিন্তু বাদীর পক্ষের মোক্তার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করাইলেন। রামসুন্দর দেখিলেন গরহাজির থাকিয়া লাভ নাই। দ্বিতীয় দিনে তিনি উপস্থিত হইলেন। রামসুন্দর দেখিলেন বাদীর সাক্ষীস্বরূপে সেই অর্দ্ধবয়স্ক শ্রমজীবি আসিয়াছে। এই ব্যক্তি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া অস্ত্র লইয়া পলাইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই রামসুন্দরের বুক আধহাত বসিয়া গেল। কেমন করিয়া সে আসিয়া তমলুকে উপস্থিত হইল, রামসুন্দর ইহা বুঝিতে পারিলেন না। সে রামসুন্দরের প্রজা কিম্বা বাধ্য লোক নহে। তাঁহার মোক্তার তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে এমন মোকর্দ্দা-মায় হাকিমের বিশ্বাস হইলে এক বাদিনীর এজাহারে নির্ভর করিয়াই

আসামীকে দণ্ড দিতে পারেন। রামসুন্দর ইহাতেই বিলক্ষণ ভাবিত হইয়াছিলেন। সাক্ষী দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

মোকর্দ্দামা আরম্ভ হইল। বাদিনী তাহার এজাহার দিতে দিতে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পৃষ্ঠের খড়মের দাগ হাকিমকে দেখাইয়া, রামসুন্দরকে দেখাইয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য আসামীর মোক্তারেরও তাহাকে জেরা করিতে প্রাণ সরিল না। মক্কেলের অনুরোধে অবশেষে তিনি উঠিলেন কিন্তু যত জেরা করেন ততই দেখেন যে বাদিনীর উত্তরের দ্বারা তাহার অভিযোগের সত্যতা দৃঢ়ীভূত হইয়া আসে। মোক্তার বসিয়া পড়িলেন। ইহার পরে সেই শ্রমজিবী এবং ধনঞ্জয়ের ছ'বৎসর বয়স্ক পুত্র যাদব আসিয়া সাক্ষ্য দিল। হাকিম, রামসুন্দর ও আবদুলের নামে অভিযোগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কোন সাফাই সাক্ষী দিবে কি না। রামসুন্দরের মোক্তার পূর্ব্বেই তাহাকে সাফাই দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু রামসুন্দর তাহা শুনিলেন না। আবদুলের শ্রেণীর অনেক লোক তাঁহার বাধ্য ছিল। তিনি তাহাদের দশবার জনের নাম করিলেন। ইহারা অনেকেই তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। রামসুন্দরের মোক্তার ৪।৫ জন সাক্ষী দিয়াই আর দিলেন না। ইহার পরে বাদী আসামীর পক্ষে সওয়াল জবাব হইল। রামসুন্দর যতক্ষণ কাঠগড়ায় ছিলেন মনে মনে কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। ভগবান এবার বাঁচাইয়ে দাও এমন কাজ আর করিব না, মনে মনে এমন কথাও বলিয়াছিলেন কি না কে বলিবে?

সওয়ালজবাব শেষ হইলে হাকিম রায় লিখিতে বসিলেন। রামসুন্দর বিড় বিড় করিয়া জপ করিতেছেন। কিছুকাল পরেই হাকিম আসামীদিগকে বাঙ্গালায় রায় বুঝাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, এই মোকর্দ্দামায় একমাত্র বাদিনীর এজাহারই যথেষ্ট। তাহার সরল সাক্ষ্য এবং শরীরে প্রহারের চিহ্ন ছাপাই সাক্ষীদিগের ন্যায় সব সাক্ষীর উক্তি অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। ধান তাহার স্বামীর অর্জ্জিত সন্দেহ নাই। আসামীরা এক অনাথা বিধবার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, লঘু দণ্ডে তাহার শাস্তি হইতে পারে না। রামসুন্দরের সশ্রম তিন মাস কারাবাস ও পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ড, আর আবদুলের দেড় বৎসর কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

রামসুন্দর ক্ষণকালের জন্য ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা যেন শুকাইয়া গেল, ধানকাটা মোকর্দ্দামায় এমন শাস্তি হইবে, ইহা তিনি

মনে করেন নাই। আর সেই দণ্ড এক অনাথা বিধবার নালিসে। জেলে যাইতে যাইতে রামসুন্দর ভাবিতে লাগিলেন "শেষকালে ব্যাঙের মুতে আছাড় খেলাম"। ভগবানকে এত ডাকিলাম তা'তে কিছুই ফল হল না।

রামসুন্দর! অনাথা বিধবা কি ভগবানের বিশ্বরাজ্যের প্রজা নহে? সে যে নিষ্পাপ হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিয়াছে!

১৭শ অধ্যায়।

রামসুন্দর, তাঁহার এবং আবদুলের প্রতি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সেসনজজের সমীপে আপিলেও সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়া হাইকোর্টে মোসান করিলেন। কিন্তু সেখানেও কোন ফল হইল না। রামসুন্দরকে নির্দ্ধারিতকাল জেলে থাকিতে হইল। রামসুন্দর মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। মহকুমার জেলে কিছু-কাল অবস্থিতি করিয়াই রামসুন্দরকে মেদিনীপুর জেলে আসিতে হইল। সেখানে জাতি বাঁচাইবার অথবা ইষ্টদেবতার নাম লইবার সুযোগ অতি অল্প। জেলর বাবুর অনুগ্রহে অথবা রামসুন্দরের অর্থের জোরে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রমের কাজ করিতে হয় নাই। রামসুন্দর বাতি সাজাইতেন এবং পরি-ষ্কার করিতেন। যতদূর সম্ভব রামসুন্দর আবদুলের অসাক্ষাতে এই সমস্ত কর্ম্ম করিতেন। জেল হইতে বাহির হইবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রামসুন্দরের "কেমন করিয়া মানুষকে মুখ দেখাইব" এই লজ্জা ততই বাড়িতে লাগিল। দু'একবার বোধ হয় তাঁহার এমনও মনে হইয়াছিল যে একবারে দেশত্যাগী হইব, আর গৃহে ফিরিব না। শেষে ভাবিলেন দেশে এমন লোকই বা কে আছে যাহাকে দেখিয়া লজ্জা হইবে। সবই ত চাষা-ভুষা। যা'দের দেখে লজ্জা করবার কথা, তারা ত সব মরেছে। এক বরদা-কান্ত সে ত এখন প্রায় আমারই পোষ্যের মধ্যে।

জেল হইতে বাহির হইয়া রামসুন্দর বাড়ী ফিরিলেন। তিনি গৃহে আসিবার কিয়ৎকাল পরেই বরদাকান্ত আসিয়া দর্শন দিলেন। রামসুন্দর বরদাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। বরদা-কান্ত বসিলে রামসুন্দর আরম্ভ করিলেন—

গ্রহের ভোগ ভুগে এলাম আর কি?

বরদাকান্ত কহিলেন "গ্রহের ভোগ বই কি? গ্রহের হাত থেকে কাউকে

পারপাবার যো নাই। পরম ধার্ম্মিক নল রাজা শনির কোপে পড়ে কি ভোগটাই ভুগ্‌লেন।

রা। রোজ বৈকালে এসে আমাকে একটু করে পুরাণ শোনাবেন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

ব। তা আস্‌ব। পুরাণ শ্রবণ কীর্ত্তন দুয়েতেই ফল।

রা। আর—(চারিদিকে চাহিয়া) এখানে ত আর কেউ নাই—মনে করেছি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।

ব। উত্তম কথা।

রা। আমি ত জ্ঞানতঃ কোন অনাচরণ করি নাই। তবে জেল—কুস্থান—আর সংসর্গ দোষ হলেও হতে পারে।

ব। তা ত বটেই, আমার খুড়োমহাশয় বল্‌তেন, সংসর্গজাদোষাগুণা ভবন্তি। সংসর্গ দোষ হ'লেই তার প্রতি এ সব করা প্রয়োজন। তা' আমি ব্যবস্থা ঠিক করি—যে ক'পণ কড়ি লাগ্‌বে, যা' যা' লাগ্‌বে, যা'তে সংক্ষেপে হয় তাই কর্‌বো।

রা। আজ্ঞে হাঁ, সময়টা তত ভাল নয়। নিজের মনে একটা খুঁৎখুঁতুনী থাকে, সেই জন্যে, তা নইলে গ্রামের কার সাধ্য যে এ বিষয়ে কথা বলে—

ব। তা ত ঠিকই। তবে ওটা যখন মনে করেছেন, তখন শুভস্যশীঘ্রং করে ফেলাই ভাল।

রা। আপনি ফর্দ্দ দিলেই আরম্ভ করে দি।

ব। কাল প্রাতেই ফর্দ্দ দিব।

এইরূপ কথোপকথনের পরে বরদাকান্ত উঠিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিশ্রুত ফর্দ্দ আনিয়া রামসুন্দর সমীপে পেশ করিলেন। এষ্টিমেট মঞ্জুর হইল। প্রায়শ্চিত্তের জিনিসপত্র সমুদয় খরিদ হইতে লাগিল।

রামসুন্দরের প্রায়শ্চিত্তে প্রাপ্তি হইল, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বরদাকান্তের। গ্রামের স্বজাতীয় লোকগুলিও এক বেলা আহার পাইল।

রামসুন্দর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন বটে কিন্তু একবারও তাঁহার মনে আসিল না যে ধনঞ্জয়ের বিধবাপত্নী এবং তাহার নাবালক দু'টী পুত্রকে আনাইয়া তাহাদের জমি ও বাটী তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেই। বরদাকান্ত অথবা অন্য কেহও এমন পরামর্শ দিলেন না।

রামসুন্দর পুনরায় লোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন বটে কিন্তু

পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সতর্ক হইয়া এবং ফৌজদারী বাঁচাইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তবে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে ফৌজদারি বাঁচাইয়াও এমন কাজ করা যায়, যাহাতে অল্পদিনেই বড়মানুষ হওয়া যাইতে পারে। উত্তমর্ণরূপে রামসুন্দর অনেক কৃষককে নিরন্ন করিয়া তুলিলেন। তিনি হাতে না মারিয়া লোককে কেবল ভাতে মারিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকের জমিজমা, অনেকের গরুবাছুর, অনেকের ঘটীবাটী তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। বঙ্গের কৃষকের ন্যায় নির্দ্দোষ-নিরীহ ও সহিষ্ণু জাতি বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। ইহাদের পরিশ্রমেই দেশের সকল লোকের অন্নসংস্থান, অথচ ইহারাই নিরন্ন। ভূস্বামী, বিশেষতঃ উত্তমর্ণের শোষণে ইহাদের শরীরে রুধির বিন্দু থাকে না। তথাপি ইহারা কাঁদে না; নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে। বঙ্গদেশে রামসুন্দরের ন্যায় উত্তমর্ণ কোন্ স্থানে নাই? কিন্তু টাকার ঋণে শতকরা বার্ষিক ৩৭৷৷০ টাকা শুদ আর ধান্যে শতকরা বার্ষিক পঞ্চাশ হিসাবে চক্রবৃদ্ধির নিয়মে বৃদ্ধি আদায় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে বঙ্গীয় প্রজা মহাজনের বিরুদ্ধে একটী কথা কহিবে না! রামসুন্দরের ধান এবং টাকা দুই প্রকার কারবারই ছিল। যে বৎসর ধান্য মহার্ঘ্য হইত সে বারে তিনি তাহা বিক্রয় করিতেন। আর ধান সস্তা হইলে, সেবারে তাহা কর্জ্জ দেওয়া হইত। টাকার শুদেও তিনি সুযোগ পাইলে চক্রবৃদ্ধি আদায় করিতে ছাড়িতেন না। তিন মাস, ছ'মাস অথবা এক বৎসরের পরেই শুদের টাকা আসলের সহিত যোগ করিতেন, পুনরায় তাহার উপর শুদ চলিত। রামসুন্দর তাহার কাঁচা বাড়ী পাকা করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু পরকালের স্থান বোধ হয় ক্রমশঃই কাঁচা হইয়া আসিতেছিল।

১৮শ অধ্যায়।

রামসুন্দরের ধান বৃদ্ধি হইতেছিল বটে কিন্তু মনের শান্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল। শান্তি তাঁহার অন্তঃকরণে কোন দিন ছিল কি না সন্দেহ, এখন অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল, এইরূপ বলিলেই ঠিক হয়। রামসুন্দরের সর্ব্বদাই ভয়। জেল হইতে আসিবার পর এই ভয় আরও বাড়িয়াছিল। নিকটস্থ পুলিসের পার্ব্বনী বাড়াইয়া দিতে হইয়াছিল। গ্রামে একটী কন্‌ষ্টেবল দেখিলেই তাঁহার মনে হইত আবার বুঝি তাঁহার নামে কোন

মোকর্দ্দামায় ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ফলতঃ বাড়ীতে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা কয়েদীর ন্যায় শান্তিহারা অবস্থায় বাস করিতেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে অনুতাপও উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অনুতাপ ক্ষণিক। মনের যে অবস্থা হইলে অন্যায় আচরণ বা নিষ্ঠুর কার্য্যে বিরক্তি জন্মে রামসুন্দরের সে অবস্থা এখনও হয় নাই। মনের অশান্তিতে দুএক সময়ে ভাবিতেন আর এমন করিয়া মানুষকে ঠকাইব না বা পীড়ন করিব না। সুযোগ পাইলে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেন। রামসুন্দরের কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে বা তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিতে গ্রামে লোকই ছিল না। এই সময়ে ত্রিলোচনদাস থাকিলে বোধ হয় রামসুন্দর যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন এই অবস্থায় স্বভাব সংশোধিত হইতে পারিত। সম্মুখে সচ্চরিত্রের আদর্শ, অন্তরে শাসনভীতি থাকিলে মানুষের বড়ই উপকার দর্শে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাহাদের অর্থ আছে অথচ শাসক নাই, একবার তাহাদের চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে আর পরিবর্ত্তনের আশা থাকে না। ইহার কারণ এই যে, সংসারে অপদার্থ লোকের সংখ্যাই অধিক। এমন একটী লোক দেখিলেই ইহারা আসিয়া তাহাকে বেষ্ঠন করে এবং তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অসৎকার্য্যেও উৎসাহ দিয়া থাকে। গ্রামে আসিয়া, বরদাকান্ত গোপাল, আবদুল প্রভৃতির ন্যায় অনুচর না পাইলে রামসুন্দর বোধ হয় এমনভাবে এত লোকের সর্ব্বনাশ করিতে সাহসী হইতেন না। মধুমঙ্গল এবং ত্রিলোচনকে তিনি ভয় করিতেন। তাহাদিগকে সরাইয়া তিনি নিজের পায়েই কুঠার মারিয়াছেন, এ কথা রামসুন্দর বুঝিতে পারেন নাই। আমরা উপরে যে শাসনভীতির কথা বলিয়াছি তাহা কেবল নিজের গুরুজন অথবা সমশ্রেণীর লোক হইতেই হইয়া থাকে। জগতে চরিত্রের মূল্য এবং বল এতই অধিক যে সমকক্ষ লোক চরিত্রবান হইলে কদাচারী তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইতেও ভয় পায়। দুঃখের বিষয় এই যে নিম্নস্তরের লোক সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। রামসুন্দরের দরিদ্র প্রতিবেশী বা প্রজার মধ্যে অনেক চরিত্রবান্ লোক ছিল, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোক বলিয়া তাহারা রামসুন্দরের কার্য্যের আলোচনা কেবল গোপনে অথবা মনে মনে করিত। রামসুন্দরের তাহা গায়ে লাগিবে কেন?

ক্রমে দরিদ্রের অভিসম্পাতের ফল ফলিতে লাগিল। রামসুন্দরের ঐহিক উন্নতির স্রোতে চিরদিনের মত বাধা পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জেল

হইতে খালাস হইবার পর রামসুন্দর বড়ই সতর্কভাবে কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। পরবৎসর বর্ষাকালে রামসুন্দর মনে করিলেন এবার কিছু পাটের কারবার করিব। মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে পাটের কারবার তাঁহার দু'এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। পাটে বিলক্ষণ লাভ হয় দেখিয়া রামসুন্দর ব্যবসায়ে মন দিলেন। আর তাঁহার পাট অন্যের প্রায় অর্দ্ধমূল্যে খরিদ হইল। অনেক কৃষককে ফাঁকি দিয়া তিনি অল্প মূল্যে অধিক জিনিষ ক্রয় করিলেন। দশ সহস্র মুদ্রায় রামসুন্দরের অনুমান পঁচিশ সহস্র মুদ্রার পাট সঞ্চিত হইল। রামসুন্দরের বাড়ীর নিকটেই নদী। মহাজন আসিয়া তাঁহার বাড়ী হইতেই পাট খরিদ করিয়া লইয়া যাইবে, এই বিবেচনায় তিনি সমস্ত পাট বাড়ীর পার্শ্বেই এক গুদামে সজ্জিত রাখিলেন। পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই একদিন রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া রামসুন্দরের সেই সমস্ত পাট এবং তাহার বাড়ীর অধিকাংশ পুড়িয়া গেল। পাপার্জ্জিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইল। রামসুন্দর একবারে দমিয়া গেলেন।

এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। প্রায়শ্চিত্তের সময়েও তিনি স্ত্রীর সংবাদ লন নাই। কন্যাটীও তাহার মাতার সঙ্গে রহিয়াছে। গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া রামসুন্দরের চিত্ত একবারেই যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি স্ত্রীকে ও কন্যাকে আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে লোক পাঠাইলেন।

রামসুন্দর-গৃহিণী পতি কর্ত্তৃক একরূপ বিদূরিতা হইলেও ইতিপূর্ব্বেই স্বামীসদনে আসিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রামসুন্দর এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না লওয়ায় স্বাভাবিক অভিমান বশতঃ আসিতে পারেন নাই। সম্প্রতি রাম-সুন্দরের বিপদের কথা শুনিয়া তিনি অবিলম্বে যাত্রা করিলেন কিন্তু রাম-সুন্দরের ভাগ্যে আর সে সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সঙ্গলাভ সুখ ছিল না। রাম-সুন্দরের স্ত্রী নৌকায় আসিতেছিলেন। পথে প্রবল ঝটিকা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তরণী জলমগ্ন হইল। সন্তরণে অনভ্যস্তা সতীললনা পতি-পুত্র রাখিয়া কুমারী কন্যার সহিত চিরদিনের জন্য গঙ্গার গর্ভে আশ্রয় লইলেন।

রামসুন্দরের প্রেরিত লোকের প্রাণ বাঁচিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া রামসুন্দরকে এই শোকবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। কঠিন হৃদয় রামসুন্দরেরও বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রামসুন্দর সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার শোকাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিল। ঐ পুত্র মাতার প্রতি বড়ই ভক্তিমান্ ছিল। তোমার পাপেই আমার মাতা ভগ্নির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া সে রামসুন্দরকে জ্বালাইতে লাগিল। গৃহিণীর শ্রাদ্ধের দিন সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

১৯শ অধ্যায়।

রামসুন্দরের পুত্র শ্রাদ্ধের দিন বাড়ীতেই ফিরিল না। রামসুন্দর নিজেই তাঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ সারিলেন। বরদাকান্ত এইরূপই ব্যবস্থা দিলেন। রামসুন্দর অল্প অল্প বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছাই নাই কিন্তু ববদাকান্তের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরে পুত্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রামসুন্দর তাহাকে গোপনে শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে শাসনের বাহিরে গিয়াছে। পিতার প্রতি কথায় সে প্রতিবাদ করিতে লাগিল। রামসুন্দর এতদিন যাহা ভয় করিতেছিলেন, আজ তাহা পরিষ্কার জানিতে পারিলেন। তাঁহার পুত্রের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাই নাই। ইহাতে রামসুন্দরের মনে বড়ই লাগিল। মধুমণ্ডলের পুত্রের দু'একটী ক্রটীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বরদাকান্তের সহিত কতই হাসিয়াছেন। আর তাঁহার পুত্র ব্রজগোপালকে অনেক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রজগোপালের ন্যায় পুত্রকে আস্ত পুতে ফেলা উচিত। এখন নিজের পুত্রের বেলায় কি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া রামসুন্দর অস্থির হইলেন। পুত্রকে কেন অধ্যায়নার্থ কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম? এই বলিয়া নিজেকে, নিজে কতই ধিক্কার দিলেন। গৃহদাহ, পত্নীবিয়োগ, কন্যার মৃত্যু প্রভৃতি অপেক্ষা পুত্রের ধর্ম্ম ত্যাগই তাঁহার কাছে বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হইল। আবার গোল এই যে একমাত্র সুহৃদ বরদাকান্তের কাছেও ইহা লুকাইতে হইবে।

কিন্তু রামসুন্দর যতই লুকাইতে চেষ্টা করুন না কেন পুত্রের কিছুই গোপন করিবার ইচ্ছা ছিল না। রামসুন্দরের ঔরসে যে সন্তানের উৎপত্তি তাহাতে সদ্গুণের আশা করাই অন্যায়। মাতার মৃত্যুর পরেই পুত্র যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। যাহাতে পিতার মনে কষ্ট হয়, প্রতি কার্য্যই যেন সে সেই

ভাবে করিতে লাগিল। শাস্ত্রের কথা "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণং" অন্বর্থ হইল। রামসুন্দরের পুণ্যের লক্ষণ পুত্রে প্রকাশ পাইল। রাম-সুন্দর বড়ই বিপদে পড়িলেন। তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি হিন্দুধর্ম্মের ভান। ত্রিলোচনের ন্যায় প্রকৃত ধার্ম্মিক তিনি ছিলেন না। সেই ধর্ম্মের ভান্ রাখিতে গেলে সংসারের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে গৃহবহিস্কৃত করিতে হয়। না করিলে লোকের নিকটে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন? এই জন্যই বলিয়াছি যে রামসুন্দরের কাছে এ সমস্যা বড়ই বিষম বোধ হইল।

রামসুন্দর বাহিরে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বরদাকান্ত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামসুন্দরের পুত্রের কথাই উত্থাপিত হইল। রামসুন্দর আপনা হইতে বুঝাইতে লাগিলেন, দেখুন্ ওটা কিছু নয়, আমি দেখ্‌লাম্ ওর ধর্ম্মে মতি ঠিকই আছে, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। তবে এদের মৃত্যুতেই বড় শোকটা পেয়েছে। ভারী ভালবাস্‌ত তাদের। বল্লে যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বস্‌লেও আমি শ্রাদ্ধ কর্ত্তে পার্ত্তাম না। এখনও সমস্ত দিনই কাঁদে।

ব। আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে গ্রামের লোককেও সেটা বুঝ্‌তে দেওয়া উচিত। আপনার উপর লোকের যা' ভক্তি-শ্রদ্ধা আপনার ধর্ম্মভাবই অনেকটা তার মূল।

রা। সে কথা আর পাপ মুখে বল্‌ব না। ভালয় ভালয় সেরে যেতে পার্লে'ই বাঁচি। জগদীশ্বর শেষকালে যে দুঃখটা দিলেন।

ব। ও কিছু মনে কর্‌বেন না। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

রা। তা ত ঠিকই। হরিবোল, হরিবোল।

রামসুন্দরের পুত্র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছিল। সহসা কি মনে করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বাহিরের একটী চালা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন মুসলমান ঘরামি তখন ঐ ঘরটী ছাইতেছিল। রামসুন্দরের পুত্র যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে রামসুন্দর এবং বরদাকান্ত উভয়কেই দেখা যায় এবং তাঁহাদের সহিত কথা কওয়া চলে। সে সেই মুসলমান ঘরামিকে ডাকিল এবং সে চাল হইতে নামিলে তাহার পৃষ্ঠে এক হস্ত দিয়া দাঁড়াইল এবং অপর হস্তে আপ-নার জামার পকেট হইতে কতকগুলি ভাত বাহির করিয়া বরদাকান্তকে ডাকিল। সেই ভাত খাইতে খাইতে কহিল "খুড়ঠাকুর এই দেখো বাবার ধর্ম্মে আমার কেমন মতি আছে। চাপা দিলে কি হয়? আমি চাপা দিব না।"

পুত্রের কার্য্য দেখিয়া রামসুন্দরের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি কি বলিবেন বা কি করিবেন, কিছুকাল তাহা কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না।

বরদাকান্ত "রাম রাম; মহাভারত, মহাভারত;" বলিয়া উঠিলেন।

রামসুন্দর অমনি কহিলেন "আর রাম রাম, মহাভারত কচ্চেন কি? দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ও ক্ষেপে উঠেছে, বাঁধুন বাঁধুন।" গোলামালী ওরে বাঁধ্‌রে। যে ঘরামির গাত্রস্পর্শ করিয়া রামসুন্দরের পুত্র এই বিকট অভিনয় করিতেছিল, তাহার নাম গোলাম আলি।

গোলামালী তাহাকে সহসা বান্ধিতে সাহস পাইবে কেন?

রামসুন্দরের পুত্র কহিতে লাগিল, "ক্ষেপেছ তুমি, আমি কেন ক্ষেপ্‌বো?" রামসুন্দর বকিতে আরম্ভ করিলেন "ওরে নির্ব্বংশের ব্যাটা, সাম্‌নে থেকে দূর হ।" বরদাকান্তের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "মাথা যে খারাপ হয়েছে তা' আমি ক'দিন থেকেই টের পেয়েছি। আপনাদের আর বলি নাই। ভগবান শেষকালে যে এত কষ্ট দেবেন এ কখনও মনে ভাবি নাই।"

ব। উন্মাদের লক্ষণ ত বটেই। এখন রীতিমত চিকিৎসার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

রা। আর চিকিৎসা, অমন পুত্র থাক্‌লো আর না থাক্‌লো দুইই সমান।

ব। অমন কথা বল্‌বেন না। অত্যন্ত শোকেতে অমন মাথা খারাপ হয়। একটু জ্ঞান হলেই আমি এসে উপদেশটেশ দেবো।

বরদাকান্ত বিদায় হইলেন। রামসুন্দর দেখিলেন পুত্রকে পাগল বলিয়া প্রচার করা ভিন্ন আর লোককে মুখ দেখাইবার পথ নাই। সেই দিন রাত্রিতেই তিনি কিন্তু পুত্রের প্রতি প্রহার-ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন প্রভাতেই সে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল।

২০শ অধ্যায়।

১২—সালের ৭ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্ণে, তমলুকে দেবীবর্গ ভীমার বাড়ীর সম্মুখের রাজপথে এক অতি শোকাবহ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সংসারে মানবমাত্রের মৃত্যুই অল্প বা অধিক শোকাবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু একের মৃত্যুতে ও অন্যের মৃত্যুতে প্রভেদ আছে। এক দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু এক কথা, আর বহুলোকপূর্ণ বিস্তীর্ণ

সংসারের এক শিশুর মৃত্যু আর এক কথা। সংসারে এমন মৃত্যুও হয় যে কোন ধনশালী পরিবারের কর্ত্তা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তাহার পুত্র কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপনার হাতে কর্ত্তৃত্বভার আসিল, বিলাস, বিহার, উপভোগ করিবার পথ পরিষ্কার ও নিষ্কণ্টক হইল, ভাবিয়া মনে মনে যেন সন্তুষ্টই হইলেন। সদন্তঃকরণে আত্মীয়ের মৃত্যুতে সন্তোস আসিতে পারে না সত্য; কিন্তু রাজৈশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত অনেকে পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা প্রভৃতিকে হত্যা করিয়াছেন, মানবেতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। তবে সংসারে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের সংখ্যাই অধিক। পৃথিবীতে এমন লোকই অনেক যাহাদের মৃত্যু তাহাদের পরিবারস্থ কেহই কামনা করে না। অথচ হয়ত একটী মৃত্যুতেই একটী সংসার ধসিয়া যায়, সমগ্র পরিবার অনাথ ও অন্নহীন হয়। এইজন্য নিম্ন বা মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশ মৃত্যুই নিদারুণ শোকাবহ, বড়ই হৃদয় বিদারক। হৃদয় থাকিলে এমন মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়াও অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। কোন এক হিন্দু যুবক মধ্যবঙ্গ রেল-পথের এক ষ্টেষণে টিকেট সংগ্রহ করা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মাতা এবং স্ত্রী ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না। যুবক তাহাদিগকে লইয়া ষ্টেষণের নিকটে এক ক্ষুদ্র বাড়ীতে থাকিতেন। কয়েক বৎসর গত হইল, একদিন বেলা এগারটার সময়ে সেই ষ্টেষণে একখানি গাড়ি আসিয়া থামিল। উপরোক্ত যুবক তখন আহার করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভাত দিয়াছেন, জননী তাঁহাকে ডাকিতেছেন, এমন সময়ে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। অন্যান্য দিন তিনি ভাত খাইয়াই এ গাড়ীর টীকেট সংগ্রহ করিতেন। সে দিন ভাত হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আহারের পূর্ব্বেই গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। যুবক জননীকে কহিলেন, "মা আমি এই টীকেট কখানা কুড়িয়ে এসেই ভাত খাচ্ছি।" মাতা অন্ন কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন। যুবক যখন ষ্টেষণে আসিয়া পঁহুছিলেন তখনও গাড়ীর বেগ ছিল। তিনি এক-খানি গাড়ীর সোপানে পা দিতে যাইতেই তাঁহার পদস্খলন হইল। রেল-পথের উপর পড়িয়া গেলেন। পশ্চাৎবর্ত্তী গাড়ীগুলি তাঁহার শরীর হইতে দুইখানি পা বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। রুধিরের নদী ছুটিল। ষ্টেষণের কয়েকটী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কেহ বস্ত্র দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন। কেহ মস্তকে জলসেক করিতে লাগিলেন।

কেহ বা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু সুশ্রূষায় আর কি হইবে? পা কাটিবার পর হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যুবকের জীবনী-শক্তির লোপ হইতেছিল। প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বে তিনি যে দু'চারিটী কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার জননী এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে। অভাগিনী জননী তথনও ভাতের থালা সম্মুখে রাখিয়া পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন। সংসারের একমাত্র অবলম্বন, যুবকের পতন সংবাদে তাঁহারা স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা ভুলিয়া রাস্তায় আসিয়া ধূলায় পড়িয়া যথন কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, তথন মানুষ কেন, নিকটস্থ পশুপক্ষীরাও যেন ক্ষণেকের নিমিত্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল। অপরিচিত পথিকেরাও কিছুকালের জন্য পথ ভুলিয়া তথায় দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের যে হৃদয়বান্ প্রিয় সুহৃৎ এই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং যিনি উদ্যোগ, যত্ন ও সাহায্য করিয়া মৃত যুবকের অসহায়া জননী ও বিধবা রমণীকে দেশে পাঠাইয়াছিলেন, মুখে ইহা বিবৃত করিতে তাঁহার দুতিনবার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। আমরাও চক্ষের জলে কাগজ ভিজাইয়া চিত্রটী অঙ্কিত করিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা পাঠককে যেন কথনও এমন দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিতে হয়।

আমরা তমলুকের যে মৃত্যুটীর কথা বলিতেছিলাম তাহা ঠিক এইরূপ না হইলেও এই শ্রেণীর বটে। মানুষের সুখ সাচ্ছন্দ্য-বর্দ্ধন নিমিত্ত যতই নূতন নূতন কলকৌশলের আবিষ্কার হইতেছে, জগতে আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যাও ততই বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক তমলুকের পাকা রাস্তায় একটী রোলার টানিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে দুইটী বালক ছিল। একটীর বয়স দশ আর একটীর দ্বাদশ বৎসর মাত্র। ভীমার বাড়ীর নিকটে আসিতেই একটা বিষম শব্দ উঠিল। রোলার টানা বন্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেখানে শতাধিক লোক জমিয়া গেল। দশবৎসরের বালকটী টানিতে টানিতে হস্ত শিথিল হওয়ায় সহসা রোলারের দণ্ডটী ছাড়িয়া দিয়াছে। অন্যান্য লোকগুলি রোলারটী থামাইতে থামাইতেই বালক তাহার নীচে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছে। তাহার মস্তকটী একবারে পিশিয়া গিয়াছে। একথানি হস্তের অস্থি হইতে মাংস এবং চর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাইটীকে জন্মের মত হারাইয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক যথন উচ্চৈঃস্বরে

কাঁদিয়া উঠিল, তখন রাস্তার অনেক লোকেই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে অগ্রসর হইল। নিকটস্থ বিপণিগুলিতে ক্রয়বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। বালক যখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, "ওগো আমার মা'র আমরা দুটী ভাই ছাড়া আর কেহ নাই, আমি কেমন করে যেয়ে এ সংবাদ মাকে দেবো," তখন সমাগত সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল। গোল শুনিয়া বাজারের কতকগুলি বেশ্যা সেখানে আসিয়াছিল। বালকের কান্না দেখিয়া তাহারা সকলেই মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছিল। তাহারাও ত মানুষ। যতই কেন পাপপঙ্কে ডুবুক না স্ত্রীজন সুলভ কোমলতা হৃদয় হইতে একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে না।

যে লোকগুলি রোলার টানিতেছিল তাহাদের মধ্যে এক প্রৌঢ় শ্রমজীবি বালকটীর সঙ্গে সঙ্গে বড়ই কাঁদিতেছিল। সমাগত লোকেরা তাহাকে মৃতবালকের আত্মীয় জ্ঞানে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। "হাগা ও ছেলেটীর আর আছে কে?" সে উত্তর করিল, "থাক্‌বার মধ্যে এক মা, আর ঐ ভাই যাকে দেখ্‌ছেন। বাপ মরে যেতে ওদের মা ছেলে দুটীকে নিয়ে এসে আমাদের গ্রামে ভাইএর বাড়ীতে ছিল। কপাল ক্রমে সে ভাইটীও মারা গেছে—সে এখানেই বাবুর বাসায় চাকর ছিল। কিছু নাই মাটা লোকের বাড়ীতে ধানটান ভানে। বড়ছেলেটা আমার সঙ্গে সহরে এসে কাজটাজ করে, আজ ক'দিন ধরে ঐ ছোটটাকেও দিচ্ছে, সারাদিন খেটে আটটী পয়সা পেত। আজ জন্মের শোধ মাকে পয়সা দিয়ে গেল।" শ্রমজীবি আর স্পষ্ট কথা কহিতে পারিল না। "ওর মা এসে আমাকেই ধরবে এখন্" বলিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। অবস্থা শুনিয়া দর্শকদিগের অনেকেরই প্রাণ গলিয়া গেল। মৃত বালকের ভ্রাতাকে সাহায্যার্থে তাহারা সকলেই কিছু কিছু অর্থ দিতে চাহিল। বেশ্যারাই প্রথমে পথ দেখাইল। তাহাদের কেহ একটী সিকি, কেহ একটী আধুলি, কেহবা একটী টাকা লইয়া আসিল। বালককে দিতে গেলে সে "ওগো আমি টাকা পয়সা চাই না, তোমরা আমার ভাইকে বাঁচাইয়া দাও" বলিয়া ভূমে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। সেই শ্রমজীবি তাহার হইয়া সমস্ত কুড়াইল।

কিন্তু পরের জন্য, পরে আর কতক্ষণ কাঁদিবে? বালকের মৃত্যুতে তাহার মাতার এবং ভ্রাতার যাহা হইল অন্য লোকের তাহা হইবে কেন? ইহাতে

অন্তের যে ক্ষণিক কার্য্যক্ষতি বা সামান্য অর্থব্যয় সে কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া। ক্রমে ভিড় কমিয়া আসিল। বিপণিতে পুনরায় বিক্রয় আরম্ভ হইল। দর্শকেরা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। মনুষ্যত্ব বিহীন মিউনিসিপালিটীর মড়াবাহক আসিয়া তম্বি করিতে লাগিল, "হয় তোমরা মড়া তুলিয়া লইয়া যাও, না হয় সরে যাও, আমি নিয়ে ফেলে দি।" সেই প্রৌঢ় শ্রমজীবি তাহাকে বিনয় করিয়া কহিল "ওর মাকে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি, সে এসে একবার দেখুক, একটু অপেক্ষা কর, তোমাকে আর ছুঁতে দেবো না আমরাই ওকে নিয়ে যাবো এখন।"

ক্ষণকাল পরেই বালকের জননী পাগলিনীর বেশে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ক্রন্দনে পুনরায় লোক জমিতে আরম্ভ হইলে, শ্রমজীবিগণ তাঁহাকে তথায় থাকিতে দিল না। মৃতদেহ স্কন্ধে ফেলিয়া হরিবোল বলিতে২ শঙ্করাড়া পার হইয়া তাহারা সহরের দক্ষিণে শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল। জননী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। "ওরে বাবা, তুই আমার দুধের শিশু, আমার ঘরে কিছু থাক্‌লে কি আমি তোরে এমন কাজ কর্ত্তে পাঠাই রে বাবা? আজ যখন বাড়ী থেকে বেরুস্ তখনই বাধা পড়েছিল বাবা, আমার বারণ না শুনে তুই চলে এলি, বাবা, আর ত ঘরে ফির্‌লিনে বাবা, একবার মা বলে কোলে আয় বাবা, কেন এ রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলি বাবা, আমি পয়সার জন্যে তোকে মেরে ফেল্লাম বাবা," এমনই কত কথা বলিয়াই অভাগিনী জননী কাঁদিতে লাগিলেন—

মৃত বালক যে ধনঞ্জয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মাধব, ইহা পাঠককে বলিবার আর প্রয়োজন আছে কি?

অনাথা অসহায়া রমণীর সংসারের অবলম্বন ছিল, দুইটী পুত্র। তাহার একটী এইরূপে চলিয়া গেল। সংসারে কাহারও দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দাসদাসী নিযুক্ত। এখানে দরিদ্র বিধবার দশ বৎসরের পুত্রই উদরান্নের জন্য যুবাজনোচিত পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। দুঃখিনী জননী এই পুত্র হইতেই হয় ত কত আশা করিতেছিলেন। রমণী এ জীবনে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে সে পতিশোক, ভ্রাতৃশোক এবং পুত্রশোক পাইতে পারে? বিশ্বপিতার বিশ্বরাজ্যে এমন মৃত্যু কেন হয় কে

বলিবে? বালক সেই দিন মরিবে ইহা কে জানিত? মঙ্গলময়, মানুষের মঙ্গলার্থ ই তাহাকে মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করিবার ক্ষমতা দেন নাই।

২১শ অধ্যায়।

পাঁচ-ছয় বৎসরে রামসুন্দরের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বলিয়া দিতে হইবে না যে তিনি ক্রমশঃ অবনতির দিকেই যাইতেছেন। সে রামসুন্দর আর নাই। একমাত্র পুত্রকে পাগল বলিতে বলিতে তিনি পাগলই করিয়া তুলিয়াছিলেন। দু'তিন বৎসর হইল কলিকাতায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে! স্ত্রী পুত্র-কন্যাহীন রামসুন্দর এখন পৃথিবীতে একাকী। অল্পদিন হইল তাঁহার শরীরে কুষ্ঠরোগ দেখা দিয়াছে। রামসুন্দর পঞ্চতিক্ত ঘৃত প্রভৃতি কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন।

রামসুন্দরের প্রিয়ভৃত্য আবদুল, জেলেই মরিয়াছে। গোপাল এক জাল করা অপরাধে জেলে গিয়াছিল। কারাবাসে থাকিতে থাকিতে এক কুৎসিৎ অপরাধ করায় দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

রামসুন্দরের বাড়ীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। আত্মীয় বলিতে সংসারে তাঁহার কেহই নাই। গ্রামের লোকের সহানুভূতি পাইবেন এমন কাজ তিনি জীবনে করেন নাই। তাহাদের মধ্যে ত্রিলোচনের ন্যায় দেবচারত্র কেহ থাকিলে তিনি হয় ত এ সময়ে রামসুন্দরের ক্লেশ দেখিয়া ব্যথিত হই-তেন। অবস্থা বুঝিয়া ভৃত্যেরাও রামসুন্দরকে পূর্ব্বের ন্যায় ভয়-ভক্তি করিত না। মহা রোগগ্রস্থ বলিয়া কেহ সাধ্যমত তাঁহার নিকটস্থ হইত না। গ্রামের একটী দরিদ্র বিধবা স্ত্রীলোক রামসুন্দরকে দুটী রাঁধিয়া দিত। কিন্তু সেও যতদূর সম্ভব দূরে থাকিত। রন্ধনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রায়ই রাম-সুন্দরের বাড়ীতেই থাকিত না। ফলতঃ এক সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত, গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, রামসুন্দর আজি কালি যেমন অসহায় অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, কোন দরিদ্র গৃহস্থেরও তেমন অবস্থা নহে।

ক্রমে রামসুন্দরের আর্থিক অসচ্ছলতা হইয়া আসিল। রামসুন্দর নিজে এখন বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারেন না। অন্যায় উপার্জ্জনের পথ এক-বারেই বন্ধ হইয়াছে। লোকে এখন তাঁহার ন্যায্য পাওনাও অনেক সময়ে দেয় না। রামসুন্দর তাঁহার একটী প্রজাকে তিনবার ডাকিলে হয় ত সে

একবার আসিয়া দেখা করে। রামসুন্দরের মুখে জোরের কথা আর নাই। মিষ্ট কথায় একটী অনুরোধ করিলেও অনেকে তাহা অগ্রাহ্য করে। তাঁহার জীবনের একমাত্র মন্ত্রই ছিল অর্থ। মানুষেব প্রতি অত্যাচার করিয়া তিনি জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, গৃহদাহ, মোকর্দ্দামা ব্যয় প্রভৃতি না হইলে তাহাতেই তিনি রাজার মত কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু এ সময়ে সঞ্চিত অর্থ তাঁহার অল্পই ছিল। তাই প্রজা এবং অধমর্ণগণের নিকট টাকা আদায় না হইলে তাঁহাব আর্থিক অসচ্ছলতা হইবারই কথা। ফলতঃ অল্প দিনেই রামসুন্দরের অর্থের অনাটন হইল। তালুকাদি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামসুন্দরের গ্রামের লোক দেবস্বভাব নহে। রামসুন্দরের অত্যাচার অনেকের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছিল। এখন ঠিক বিপরীত আরম্ভ হইল। রামসুন্দরের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। পাঠক জানেন রামসুন্দর পাকাবাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরই তাঁহার উপর বিপদরাশি পতিত হওয়ায় বাড়ী শেষ হয় নাই। একটী মাত্র ঘর হইয়াছে। অট্টালিকার উপকরণ ইষ্টক, চূর্ণ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত ছিল। কড়ি, বরগা, কপাট, চৌকাঠ ইত্যাদি সকলই তৈয়ারি হইয়াছিল। রামসুন্দর একদিন চাহিয়া দেখেন ইটগুলির উপর ঘাস গজাইয়া গিয়াছে। চূণগুলি মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে। আর কাঠের জিনিষের অর্দ্ধেকেরও অধিক অপহৃত হইয়াছে। রামসুন্দর চাকরদিগকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কাঠ কি হইল?"

ভৃত্যেরা উত্তর করিল "আমরা কেমন করে বল্‌ব? রাত্রে রাত্রে বোধ হয় মান্‌ষে নিয়ে যায়।"

রা। তবে তোরা আছিস কি জন্যে?

ভৃ। আমরা কাউকে কিছু বল্লে গ্রামের লোকে আমাদিগকে ঠেঙ্গিয়েই মেরে ফেল্‌বে।

রামসুন্দরের চাকর দুটী অন্য গ্রামের। তাহাদিগকে গ্রামের লোককে ভয় করিয়াই চলিতে হইত। রামসুন্দর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, একটী ভৃত্যকে থানায় এজাহার দিতে পাঠাইলেন।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দারগাবাবু মোকর্দ্দামা তদন্ত করিতে আসিলেন। রামসুন্দর দারগাবাবুর আহারের বন্দোবস্ত যথেষ্ট করিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগ করিলে, দারগাবাবু আলবোলায় তাম্বুল

উপভোগ করিয়া শয়ন করিলেন। পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে চৌকীদার পা টিপিয়া দিল। দুতিন ঘণ্টা নিদ্রালাভের পর, অপরাহ্নে দারগাবাবু বার দিয়া বসিলেন। আর্থিক অসচ্ছলতানিবন্ধন রামসুন্দর তাঁহার পূজার আয়োজন বিশেষরূপে করিতে পারিলেন না। দু'এক কথাতেই দারগা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মোকর্দ্দমার কিনারা হইবে না নিশ্চিত বুঝিলেন। চৌকীদারকে চুরি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

চৌকীদার চতুর ছিল। দারগাবাবুর পূজার ব্যবস্থা হয় নাই, সে বুঝিতে পারিয়াছিল। গ্রাম থেকেই তাঁকে কিছু দেওয়াইয়া দিবে এইরূপ ইঙ্গিতও সে সঙ্গীর কনষ্টেবলকে করিয়াছিল। সে বলিল—

হুজুর, এ চুরির কি কিনারা হয়? এত বড় বড় কাঠ যদি কেউ নিয়েও থাকে তা কি আর আস্ত রেখেছে? এতদিনে পুড়িয়ে মেরে দিয়েছে। আর ওঁর গোনবারও ভুল হতে পারে।

রামসুন্দর কহিলেন "তুইই বল না, কত দোর, জানালা, কড়ি, বরগা এখানে দেখেছিস্।"

চৌ। সে ত দেখেছি। আপনি অমন দশজনের সর্ব্বনাশ করে গুছিয়েছিলেন, আবার সেই দশজনের বাড়ীতেই যেয়ে উঠেছে।

রামসুন্দর, দারগাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "শুন্লেন আপনার চৌকিদারের কথা।"

দারগা কিছু না বলিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিলেন। অর্থ এই যে, যা বলেছে ঠিকই বলেছে। তিনি রামসুন্দরের পূর্ব্বজীবন জানিতেন।

ক্ষণেক বাদে, দারগা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাউকে বিশেষ সন্দেহ করেন?

রা। আমি গ্রামের সকল লোককেই সন্দেহ করি।

দা। তা হ'লে আপনার মোকর্দ্দমা হয়েছে। ওঠ্‌রে ওঠ্, চল রাত্রে ভড়ভড়ার বদমাইষগুলির বাড়ী তদন্ত করে যেতে হবে।

'সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দারগা চলিয়া গেলেন। তদন্তের কি ফল হইল, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে কেন?

২২শ অধ্যায়।

পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন যাদবের কি হইল জানিবার জন্য পাঠকের ঔৎসুক্য থাকিতে পারে। মাধবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে যাদব গ্রামের একটী

লোকের সহিত কলিকাতায় আসিল। ঐ লোকটীর গঙ্গারধারে একটী ফলের দোকান ছিল। যাদব তাহাতেই কাজ করিতে লাগিল। আহারাদি ব্যতীত যাদব মাসিক দুইটী টাকা পাইত। সে তাহাই জননীকে পাঠাইয়া দিত। কাজকর্ম্ম করিয়াও যাদবের যে একটু সময় থাকিত, সে তখনই অনুসন্ধান করিত, কিসে জীবনের একটু উন্নতি করিতে পারে। কলিকাতায় আসিবার দু'বৎসর পরে যাদব এক নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিল। সে দেখিল তাহার পরিচিত দু'একটী লোক বড়বাজার হইতে খাবার কিনিয়া তাহা সহরে ফিরি করিয়া বেচিত এবং ইহাতে প্রতিদিন কম হইলেও আট আনা, দশ আনা লাভ করিত। যাদব তাহার অনুগ্রাহকের অনুমতি লইয়া এই কাজ করিতে লাগিল। ইহাতে অধিক মূলধনের আবশ্যকতা নাই। প্রতি-দিন পাঁচ, ছয় টাকার খাবার কিনিলেই যথেষ্ট হয়, একটাকার খাবার বিক্রয় করিতে পারিলে, তাহাতেই তিন চারি আনা লাভ হয়। আবার কিছু অবি-ক্রীত থাকিলে সন্ধ্যাকালে তাহা আনিয়া দোকানে ফিরাইয়া দেওয়া চলে। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই যাদব দেখিল মাকে রীতিমত সাহায্য করিয়াও তাহার হাতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা জমিয়াছে। যাদবের অপব্যয় ছিল না। পল্লী-গ্রামের যে সমস্ত সাধারণ লোক কলিকাতায় আসিয়া ফিরিওয়ালার ন্যায় নীচ কাজ করে, অল্পমাত্র বুদ্ধি থাকিলে তাহারাও প্রত্যেক মাসে ১৫।২০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তবে সহরের প্রলোভন অনেক অধিক। চরিত্রবল না থাকায় এই শ্রেণীর লোক সহজেই বাবু হইয়া যায়। দিনের বেলা বাবু-গিরি করিবার পথ না থাকায় রাত্রিতে ইহাদের পায়ে জুতা ওঠে, মাথায় চিরুণী পড়ে। ক্ষুদ্র খোলার ঘরের বাসাতেই তবলার চাঁটি শুনিতে পাওয়া যায়। ফল এই দাঁড়ায় যে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহা কলিকাতাতেই রহিয়া যায়। বাড়ী যাইবার সময় ইহারা কেবল বাবুগিরির ঝোঁকটুকু লইয়া পঁহুছে। অনেককে বাড়ী ফিরাইয়া লইতে পিতামাতা বা প্রতিবেশী কাহা-কেও কলিকাতা আসিতে হয়। যাদব এ শ্রেণীর লোক নহে। তাহার এক মাত্র সংকল্প যেরূপে পারি মানুষ হইব, মার কষ্ট ঘুচাইব। কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে একটী পয়সাও অনর্থক ব্যয় করে নাই।

দু'তিন বৎসর পরে, যাদব দেখিল সে নিজেই একটী খাবারের দোকান করিতে পারে। একটী ছোট ঘর ভাড়া লইয়া সে তাহাই করিল। অল্প

দিনেই তাহার দোকানের নাম বাহির লইল। যাদব লোককে ঠকাইত না। ইচ্ছা করিয়া সে খারাপ জিনিষ ব্যবহার করিত না। যে একবার তাহার দোকান হইতে খাবার লইত, আবশ্যক হইলে সে পুনরায় সেখানে আসিত।

পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই যাদবের আয় বেশ বাড়িয়া উঠিল। যাদব কারবারও বড় করিল। দোকানের সমস্ত কাজ নিজে পারে না বলিয়া এক-জন প্রথমে চাকর রাখিয়াছিল, এখন আরও দুইজন চাকর রাখিল। পার্শ্বের আরও দু'টী ঘর ভাড়া লইল। নিকটস্থ একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় মা'কে লইয়া আসিল। মাতা তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দেশের এক সম্ভ্রান্ত বংশের এক কন্যার সহিত যাদবের বিবাহ হইল। পুত্রের উন্নতি দেখিয়া ধনঞ্জয়পত্নীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

সৎপথে থাকিলে এবং অমিতব্যয়ী না হইলে অতি সামান্য উপার্জ্জনের পন্থা হইতেও মানুষ কেমন উন্নতি করিতে পারে, যাদবের জীবন তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। দোকান করিবার পর দশ বৎসরের মধ্যে যাদবের এমন অবস্থা হইল যে, তখন সে দশ সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছে। যাদবের মাতা অনুরোধ করিলেন "বাবা, সাবেক সেই ভিটাটা উদ্ধার করতে চেষ্টা কর।"

নৃশংস রামসুন্দর যাদবের মাতাকে যে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া-ছিলেন, যাদবের তাহা মনে ছিল। মা'র আদেশে যাদব গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার সন্ধান লইল। অল্পদিনেই সে জানিতে পারিল, রামসুন্দরের জীবনেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। জোতজমি তালুকাদি প্রায়ই গিয়াছে। মধুমণ্ডলের পুত্র ব্রজগোপাল ত্রিলোচনের জমাটী খরিদ করিয়াছেন। ব্রজ-গোপালের অপেক্ষাও যাদবের টাকা অধিক। অল্প দিনেই সে নিজের পৈত্রিক ভিটা এবং সঙ্গে সঙ্গে রামসুন্দরের অবশিষ্ট জমিজমা ও বাড়ী খরিদ করিল। সে জমিতে তাহার জননী পাপীষ্ঠ রামসুন্দরের নিষ্ঠুর পাদুকাঘাত সহ্য করিয়া-ছিলেন, কেবল সেই জমিটী খাসে রাখিয়া যাদব অন্য সমস্ত জমিই গ্রামের প্রজাদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যাদবের আর পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা নাই। যে রমণী দুইটী ধানের জন্য একদিন পাষাণ হৃদয় রাম-সুন্দরের চরণোপরি পতিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি পুত্রের পয়সায় নিত্য নিত্য প্রাতে গাড়ি করিয়া গঙ্গার-ঘাটে স্নান করিতে যান।

উপসংহার।

অতঃপর রামসুন্দরের কি হইল, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? রামসুন্দর এখন দয়ার পাত্র। তাঁহার শেষ জীবনের দুঃখ-দুর্গতি বর্ণনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা সংক্ষেপে দু'চারি কথা কহিব।

ক্রমে রামসুন্দরের পক্ষে জীবনের ভার বহন করা অসহ্য হইয়া উঠিল। জমিজমা-সমস্ত গেলে ভূস্বামী তাঁহার ঘরবাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় করিলেন। যাদব তাহা খরিদ করিল, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। জমিদারের প্রাপ্য শোধ হইয়া রামসুন্দর যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেন এবং তাহাই লইয়া কাশীতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

রামসুন্দরের অবস্থা দেখিয়া গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইলেন ব্রজগোপাল। ব্রজগোপাল কর্ম্মস্থলেই থাকিতেন। বৎসরান্তে বা দু'বৎসর পরে এক একবার বাড়ী আসিতেন। রামসুন্দর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কাশী যাত্রা করিবার কিছুকাল পূর্ব্বেই তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। ব্রজগোপালের অবস্থা এখন বেশ ভাল, তিনি মণ্ডলবাড়ীর পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছেন। রামসুন্দরের কাশীযাত্রার সময়ে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং নিজে তাহা না বলিতে পারিয়া এক তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রামসুন্দর তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

কাশীতে পঁহুছিয়াই রামসুন্দর ত্রিলোচনের দর্শন পাইলেন, উঁহাকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব ভাবিয়া তিনি অন্যত্র যাইতে চাহিতেছিলেন কিন্তু ত্রিলোচন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, পূর্ব্বকথা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন এবং একসঙ্গে থাকিবার জন্য এমনভাবে অকপট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে রামসুন্দর তাঁহার অনুরোধ এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না।

ত্রিলোচন এতদিন বাঁচিয়া আছেন এবং কাশীতে আছেন, রামসুন্দর ইহা জানিতেন না। দু'এক কথার পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে ত্রিলোচনের হস্তস্থিত সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হইবার পর হইতেই ব্রজগোপাল তাঁহার কাশীবাসের ব্যয় যোগাইতেছেন। রামসুন্দর মনে মনে ব্রজগোপালের মহত্ত্ব আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইলেন।

ত্রিলোচন ঠিক সহোদরের ন্যায় কুষ্ঠরোগগ্রস্থ রামসুন্দরের সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কথায় কিংবা কার্য্যে তিনি কখনও রামসুন্দরকে জানিতে দেন

নাই যে তাঁহার পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র মনে আছে। কাশীতে তাঁহার পরিচিত লোকের কাছে তিনি তাঁহাকে গ্রামসম্পর্কের ভাই বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু তিনি যেন বারাণসীধামে বসিয়া রামসুন্দরের আগমনই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হতভাগ্য রামসুন্দরের অদৃষ্টে ত্রিলোচনের ন্যায় সাধুর সংসর্গ লাভ অধিক দিন ছিল না। তিনি কাশীতে আসিবার পর এক বৎসর না যাইতে যাইতেই ত্রিলোচনের কাশী প্রাপ্তি হইল। ত্রিলোচনের সঙ্গ হারাইয়া রামসুন্দর যত কাঁদিলেন আপনার পুত্র-কন্যা-ভার্য্যা বিয়োগেও তিনি তত কাঁদেন নাই।

এদিকে রামসুন্দরের অর্থ ফুরাইয়া আসিল। তিনি যত শীঘ্র মৃত্যুর আশা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। রামসুন্দর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এখন রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। এমন সময়ে তিনি ব্রজগোপালের এক পত্র পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন (ত্রিলোচন) দাস জ্যাঠার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। আপনি কাশীতেই রহিয়াছেন। অর্থাভাবে পাছে আপনার কাশীবাসের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া লিখিতেছি যে, যদি আপনি গ্রহণ করিতে আপত্তি না করেন, তাহা হইলে আমি দাস জ্যাঠাকে যেমন মাসিক পাঁচ টাকা পাঠাইতাম তেমনি আপনাকে প্রতি মাসে পাঠাইয়া দিব। আপনি দেশে থাকিতে আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাই আমি ভয়ে ভয়ে লিখিলাম। আমি আপনার সম্পর্কিত, আপনার অগ্রজের জামাতা, অতএব আবশ্যক হইলে আমার এই সামান্য সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এই অযাচিত অনুগ্রহ উপেক্ষা করিবার দিন রামসুন্দরের আর নাই। তিনি পত্রোত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ব্রজগোপালকে লিখিলেন, যদি এ পরম পাপীর আশীর্ব্বাদে বা প্রার্থনায় কিছু ফল থাকে তাহা তুমি পাইবে।

আর লিখিবার কিছুই নাই। বঙ্গের পল্লীগ্রামে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী, দরিদ্রের শোণিত-শোষণকারী, ধর্ম্মের বাহ্যিক আবরণধারী রামসুন্দর অনেক আছেন। আমরা একজনের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। রামসুন্দরের ন্যায় লোকের, রামসুন্দরের ন্যায় পরিণাম প্রায়ই হইয়া থাকে। দু'একজন বাহিরে অত ক্লেশ ভোগ না করিলেও অন্তরে অবিরত অসহনীয় নরক-জ্বালা ভোগ করে, ইহা নিশ্চয়। রামসুন্দরকে শেষ জীবনে, অন্তরে বাহিরে সমান কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে কাশীতে রাখিয়াই গল্পের উপসংহার করিলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেদের কথাও বলিয়াছি, তন্ত্রের কথাও তুলিয়াছি, কিন্তু যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে দুইটি যেন দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। অনেক লোকে বেদের ধর্ম্ম বা ভাগবদীয় ধর্ম্মকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মকে শাক্তধর্ম্ম বলিয়া বুঝে—আর ইহাও বুঝে, আলোকে ও অন্ধকারে যত বিভিন্নতা এই দুইটিতে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রভেদ। এই মতে ভারতের যত অনিষ্ট হইয়াছে, এত আর কিছুতে নহে; উভয় দলের পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ, এত স্পষ্ট শত্রুতা, যে অহি নকুলের তত নহে, অগ্নি জলের তত নহে। বৈষ্ণব বলিবেন "গণেশ জননীর মাঠে তেকাকুড়া ভবানী বাবাজীকে এমন বানান বানাইয়াছে যে দানে দান।" তবু প্রাণান্তে বলিবেন না, যে কালীতলার মাঠে বেলতলায় পাটা কেটেছে। যাহা হোক উভয়ের কথা তুলিয়া, উভয়ের একত্ব বিষয়ে একটা মীমাংসা না করিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় লইলে প্রত্যবায় কেন পাপ হইবার সম্ভাবনা।

আপনি কলিকাতায় যাইবেন হুগলি হইতে। এখন আপনার যাইবার কতগুলি উপায় আছে? আপনি হুগলির পারের রেলে বা নৈহাটীর পারের রেলে যাইতে পারেন; উভয় তীরে যে পাকা রাজপথ আছে, তাহা দিয়া যাইতে পারেন; নৌকা, গো-যান, অশ্ব-যান প্রভৃতি অনেক উপায়ে যাইতে পারেন। শীঘ্র যাইবার উপায় আছে, বিলম্বে যাইবার উপায়ও আছে। ভগবানের নিকট যাইবার উপায়ও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। বেদ ও তন্ত্রে স্থূলত প্রভেদ এই যে বেদোক্ত বিহিত কার্য্যে ভগবানের নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হয়, তন্ত্রোক্ত বিহিত কার্য্যে ভগবানের নিকট শীঘ্র যাওয়া যায়। অপরাপর যুগে মানবের পরমায়ু অধিক ছিল, তাই বেদোক্ত-বিহিত কার্য্যে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইত না। কলিকালে মানবের পরমায়ু অল্প, তাই কলিতে তন্ত্র পন্থাই প্রশস্ত। এখন আমাদের এই কথার সমর্থনে শাস্ত্র বিধি প্রদর্শন করিলেই আমাদের কার্য্য হইল। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে এত অধিক প্রমাণ আছে যে তাহা উদ্ধার করিলে শব্দকল্পদ্রুমের ন্যায় এক খানি বৃহদাকার পুস্তক হইয়া উঠিবে। অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ কাজেই আমাদের দ্রষ্টব্য। তাই বলিয়া এমন মনে করিবেন না যে অপরাপর যুগে কেহ তন্ত্রানুসারে

সাধন করেন নাই। দেবর্ষি নারদ, দক্ষ, কুবের, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বৃহস্পতি, ভৃগু, দুর্ব্বাসা, অগস্ত্য, পরশুরাম, রামচন্দ্র, দ্রোণাচার্য্য, পুষ্পদন্ত, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, কৃষ্ণ, বলরাম, বেদব্যাস, ভরদ্বাজ, পরাশর, দক্ষিণা-মূর্ত্তি, মনু, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, কৌৎস, কুম্ভ, দত্তাত্রেয়, বৃষাকপি, মহাবুদ্ধ—তথা, সীতা, রেবতী, রাধিকা, রুক্মিণী, সত্যভামা, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, কুন্তী, যাজ্ঞসেনী, ইঁহারা সকলেই তন্ত্রানুসারে সাধন করিয়াছিলেন। কুল চূড়ামণিতে পাঠক পাঠিকা ইহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। বাহুল্য ভয়ে সংস্কৃত উদ্ধার করিলাম না।

যে সকল বৈষ্ণবেরা তন্ত্রের নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে, তাহাদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় হইতে নিম্নোক্ত সংবাদটি উদ্ধার করিলাম।

শ্রীরাজোবাচ। কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধুয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরং॥ ৪২
এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণ মুচ্যতাং॥ ৪৩

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ৪৪
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনং।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ ৪৫
নাচরেদ্‌যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥ ৪৬
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ৪৭
য আশুহৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবং॥ ৪৮
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ ৪৯
শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্যসন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং॥ ৫০
অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্যচাসনং॥ ৫১
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদয়াদি কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ॥ ৫২

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ॥ ৫৩
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎস্তবৈঃ স্তুত্বানমেদ্ধরিং॥ ৫৪
আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্মূর্ত্তিং সংপূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধান্নুদ্বাস্য সৎকৃতং॥ ৫৫
এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ॥ ৫৬

অর্থাৎ—ভক্তির কর্ম্মযোগাধীনতা প্রযুক্ত রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কর্ম্ম-যোগ দ্বারা পুরুষ সংস্কৃত হইয়া কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করেন, তাহাই আপনারা বলুন। ৪২ আর পূর্ব্বে আমার পিতা ইক্ষ্বাকুর সমক্ষে ব্রহ্মপুত্র ঋষিদের নিকট আমা কর্ত্তৃক এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কিন্তু ঋষিরা তাহার উত্তর দেন নাই বা কেন, তাহার কারণ বলিতে আজ্ঞা হয়। ৪৩

শ্রীআবির্হোত্র কহিলেন, বিহিত, অবিহিত ও নিষিদ্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম্ম, কেবল বেদ বাদ মাত্র, লৌকিক নহে, কিন্তু বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, সুতরাং তাহাতে দেবতারাও মুগ্ধ হয়েন অন্যের কথা আর কি বলিব, অতএব তুমি তখন বালক ছিলে, এপ্রযুক্ত ঋষিরা উত্তর দেন নাই। ৪৪

একরূপ অর্থকে অন্য প্রকার করিয়া বলার নাম পরোক্ষবাদ। অতএব যেমন পিতা খণ্ড লড্ডুকের প্রলোভন দেখাইয়া বালককে ঔষধ ভক্ষণ করান, তদ্রূপ অজ্ঞ লোকদিগের অনুশাসনরূপ এই বেদ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির নিমিত্ত পরোক্ষ-বাদে কর্ম্ম সকল বিধান করেন। ৪৫

যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত অজ্ঞ হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ না করে, সে বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান স্বরূপ অধর্ম্ম দ্বারা পুন পুন জন্মমরণরূপ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়। ৪৬

অপিচ, যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করত ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, ফলশ্রুতি কেবল রুচির উৎপাদনার্থ মাত্র। ৪৭

বৈদিক কর্ম্মযোগ উল্লেখ করিয়া, তান্ত্রিক কর্ম্মযোগ বলিতেছেন, মহারাজ, যে ব্যক্তি শীঘ্র আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদ বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধির সমুচ্চয় করিয়া তদনুসারে কেশবের পরিচর্য্যা করিবেন। ৪৮

আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং তাঁহা হইতে আগমার্থ অবগত হইয়া স্বীয় অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মর্ত্তি বিশেষকে অর্চ্চনা করিবেন। ৪৯

শুদ্ধচিত্ত হইয়া মূর্ত্তিবিশেষের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা স্বীয় দেহ সংশোধন করত ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবেন। ৫০

অর্চ্চনার পূর্ব্বে যথালব্ধ উপচার সহকারে জন্তু অর্থাৎ পুষ্প মধ্যস্থ কীটাদি শোধন দ্বারা পুষ্পাদি দ্রব্য, সম্মার্জনাদি দ্বারা ভূমি, অব্যগ্রতা দ্বারা আত্মা, অনুলেপন ও ক্ষালনাদি দ্বারা স্বীয় লিঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা কার্য্যের যোগ্য করিয়া, আসনে জল প্রোক্ষণ করিয়া। ৫১

পাদ্যাদি কল্পনা পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করত সমাহিত চিত্তে অঙ্গন্যাস, করন্যাস সহকারে মূল মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ৫২

অঙ্গ (হৃদয়াদি), উপাঙ্গ (সুদর্শনাদি) ও পার্ষদ সহিত অভিমত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় বস্ত্র, ভূষণ। ৫৩। গন্ধ, মাল্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নানা উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করত বিধিবৎ স্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবে। ৫৪

আপনাকে তন্ময়রূপে ধ্যান করত হরিমূর্ত্তি পূজা করিবে, এতদ্দ্বারা অহংগ্রহোপাসনা উক্ত হইল, পরে মস্তকে নির্ম্মাল্য লইয়া সৎকার পূর্ব্বক দেবতা মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করত পূজা সমাপন করিবে। ৫৫

যে ব্যক্তি এইরূপে তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসারে অগ্নি বা সূর্য্য বা জল বা অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। ৫৬ (রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ)

এখন ইহা দেখিয়াও যদি শাক্ত-বৈষ্ণবের ভ্রমান্ধকার না ঘুচে তবে যে কিসে ঘুচিবে তাহা [illegible] জানেন, আর হরিই জানেন। আর এ সমস্ত বিষয় শাস্ত্রে অতি বিশদভাবে বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও যে এতদূর টানাটানি হইয়াছে সে কেবল হরির ইচ্ছা, নচেৎ কলির মাহাত্ম্য যে নষ্ট হয়। নিত্য কলিতেই এই, আর কলিতে যে কি হইবে তাহা কে বলিবে?

মৃত্যুর পরের দুই কথা কহিতে গেলেই যোগের কথা কহিতে হয়, আর যোগের কথা কহিতে গেলেই বেদ ও তন্ত্রের কথা কহিতে হয়। বিষয়টীর গুরুত্বানুভবে আরো প্রমাণ দেওয়া উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যোগের কথা পরে আমাকে বলিতে হইবে ইহা নিশ্চয়।

তন্ত্র প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত—আগম ও নিগম। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৪৯ শ্লোকেও আগমের উল্লেখ রহিয়াছে, এখন আগম নিগম কি বুঝিলেই বুঝিবেন যে কৃষ্ণ ছাড়া তন্ত্র হইতে পারে না।

(১) আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতম্॥

(২) নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

আগম (১) শিববক্ত্রবৃন্দ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত, এই তিন কারণে, "আগত" "গত" ও "মত" এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নামান্তর "আগম"। যে অংশের প্রশ্নকর্ত্রী পার্ব্বতী উত্তরদাতা মহেশ্বর, সেই অংশের নাম আগম।

নিগম (২) গিরিজাবক্ত্র হইতে নির্গত, মহেশ্বরের পঞ্চমুখে গত এবং বাসুদেবের সম্মত। এ স্থলেও "নির্গত" "গত" ও "মত" এই শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর লইয়া নামান্তর নিগম। তন্ত্রশাস্ত্র এই আগম নিগম ভাগদ্বয়ে বিভক্ত, তন্ত্রের বক্তা এবং বক্ত্রী ভগবান্ ও ভগবতীর যেমন স্বরূপতঃ কোন বিভেদ নাই, তাঁহাদের উক্তরূপ আগম নিগমেরও তদ্রূপ স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, উভয়েরই জীবনিস্তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং দ্বৈত জগতের মধ্যদিয়া অদ্বৈত তত্ত্বে গতি বিধিই ইহার প্রক্রিয়া। (তন্ত্রতত্ত্ব)

কেহ বলিতে পারেন আগত, গত ও মত এই তিনটি কথার আদ্যক্ষর লইয়া আগম শব্দের উৎপত্তি এ কিরূপ? আমার বোধ হয় ইংরেজী উদাহরণ দিলে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরেজীতে News শব্দের উৎপত্তিও ত এইরূপ। North, East, West, South এই চারিটী শব্দের অদ্যক্ষর লইয়া হইয়াছে NEWS—that which comes from North, East, West and South. যাক্, গোল চুকিয়া গেল। এক্ষণে বাসুদেবের মত না হইলে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতে তন্ত্র মতে তথা ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস আদি দ্বারা হরির আরাধনার কথা থাকিবে কেন? আর মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নই বা কে? গীতায় ভগবান বলিয়াছেন।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ১০—৩৭

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনা কবি (শুক্রাচার্য্য)।

তন্ত্র অনুসারে কার্য্য করিলে যে শীঘ্র ফললাভ হয় তাহার প্রমাণ তন্ত্রেও আছে

কুলধর্ম্ম মহামার্গে গন্তা মুক্তিপুরীং ব্রজেৎ।
অচিরান্নাত্র সন্দেহ স্তস্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ॥

সংসারের যাত্রীজীব কুলধর্ম্মরূপ মহাপথে গমন করিলে অচিরাৎ মুক্তিপুরীতে প্রবেশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, এই জন্য কৌলধর্ম্মকে সম্যক্ আশ্রয় করিবে।

যখন তন্ত্র সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে, তখন তন্ত্র প্রামাণ্য বিষয়ে শাস্ত্রান্তর সম্মতি দর্শাইবার জন্য—তন্ত্র মতের বিরোধ কোথাও নাই দর্শাইহার জন্য, কতক পরিমাণে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করা সঙ্গত বিবেচনা হইতেছে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ "তন্ত্রতত্ত্ব" ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা হইতেই আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিরাকরণার্থ সারসংগ্রহ কবিলাম। পঞ্জিকার ন্যায় বাঙ্গালির ঘরে ঘরে "তন্ত্রতত্ত্ব" থাকা উচিৎ। ভরসা করি বিদ্যার্ণব মহাশয় আমাদিগকে স্বীয় ক্ষমাগুণে ক্ষমা করিবেন।

(১) উপনিষদ। উপনিষদের অনুবাদ।—পরম শিব ভট্টারক শ্রুতি—অষ্টাদশ বিদ্যা এবং সমস্ত দর্শনকে লীলা দ্বারা তত্ত্বদবস্থাপন্ন হইয়া প্রণয়ন করিয়া সবিমতি ভগবতী স্বাত্মাভিন্না কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পঞ্চ মুখের দ্বারা পঞ্চ আম্নায় পরমার্থ স্বরূপ প্রণয়ণ করিয়াছেন। ভট্টারক (সর্ব্বশাস্ত্র নিয়মকর্ত্তা) শ্রুতি-অষ্টাদশ বিদ্যা (শ্রুতি প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ বিদ্যা—যথা, ঋক্, সাম, অথর্ব্ব, যজুঃ এই চতুর্ব্বেদ, যথাক্রমে চতুর্ব্বেদের উপবেদ চতুষ্টয় যথা, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, দণ্ডনীতি, ধনুর্ব্বেদ ৪। বেদাঙ্গষট্—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ৬। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র)।

ষড়্দর্শন। (বেদান্ত, যোগ, সাংখ্য, মীমাংসা, বিশেষ, ন্যায়)।
তত্ত্বদবস্থাপন্ন। (তত্তৎশাস্ত্রকার ঋষিরূপে অবতীর্ণ)
সবিমতি। (উৎকণ্ঠিতা)। ভগবতী। (সচ্চিদানন্দরূপিণী)।
স্বাত্মাভিন্না। (নিজ পরমাত্মস্বরূপা)।

ষট্চক্রভেদ তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব। সেই ষট্চক্রভেদের আদিসূত্র উপনিষদ্ হইতে নিষ্ক্রান্ত। সেই বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—একাধিকশত নাড়ী (শিরা) পুরুষের হৃদয় মূল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল এক সুষুম্না-নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, মৃত্যুকালে সেই নাড়ীর অবলম্বনে সঞ্জীবনী-শক্তি ঊর্দ্ধগামিনী হইলে জীব, সূর্য্যলোকদ্বার ভেদ করিয়া অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। অন্যান্য সমস্ত নাড়ীই জীবের সংসারাবৃত্তির হেতু, একমাত্র সুষুম্নাই কেবল মুক্তিপথ।

প্রশ্নোপনিষদ্, কালীকোপনিষদ্, তারোপনিষদ্, নারায়ণোপনিষদ্, শিবোপনিষদ্ প্রভৃতিতে এই মন্ত্রই কথিত আছে।

(২) নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, নারদ পঞ্চরাত্র। ৩য় অধ্যায়ে

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য, এই ষট্চক্র বিভাবন পূর্ব্বক হৃদয়ে সহস্রদল পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিবেষ্টিত সস্মিত সুন্দর শুদ্ধ দ্বিভুজ নবীনজলদপ্রভ পীতকৌশেয়-বসন নিজ প্রভু(উপাস্য দেবতা) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। আবার ৪র্থ অধ্যায়।

দেবের সময়, পৌত্র দেবেন্দ্রদেবের সময় এবং তাহার কিছু পর পর্য্যন্ত স্বয়ং, জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। ইনি প্রসিদ্ধ ৺হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পৌত্রের মৃত্যুর ছয় মাস পরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাণী শঙ্করী বৈষয়িক কার্য্য বেশ বুঝিতেন। জমিদারী কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রত্যেক মহলে যাইয়া সকল প্রজার তত্ত্ব লইতেন। তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে ডাকাইয়া নিজে মিষ্টান্ন বিলি করিতেন। এখনও বৃদ্ধ প্রজারা প্রাতঃকালে উঠিয়া 'রাণী মা'র নাম স্মরণ করে, তাহারা বলে তাহাতে তাহাদের দিন ভাল যায়। সকল প্রজাই মনে করিত 'রাণী' আমাকে বেশী অনুগ্রহ করেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি সকলকেই সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রাণী শঙ্করী বড় মোটামুটী চালচলন ভালবাসিতেন। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি অতুলনীয় ছিল। কোনও ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, এরূপ কখনও শুনা যায় নাই। পুত্র কৈলাসদেব কিছু বেশী সৌখিন ও বিলাসী ছিলেন, রাণী তাহা আদৌ দেখিতে পারিতেন না। কোনও বিষয়েই অপব্যয় তিনি দেখিতে পারিতেন না। তা বলিয়া তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। তাঁহার মত 'দাতা' এদেশে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতিথি সেবা ত ছিলই, দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে দান ত চলিতই, তা ছাড়া পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে বিশেষ দোলযাত্রার সময় রাণী বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিত মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সরা আবির ও এক সরা টাকা দিয়া প্রত্যেককে প্রণাম করিতেন। এ সম্বন্ধে হণ্টার সাহেব Statistical Account of Bengalএ লিখিয়াছেন On the oc[illegible] of the festival of the goddess to whom the temple is dedicated, the Rani used to invite Pundits from all the neighbouring countries.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৈলাসদেব অপব্যয়ী ছিলেন। কাজেই মাতা ও পুত্রে বিবাদ বাধিল। তাহার ফলে বিষয় বাটোয়ারা হইল। রাণী স্বীয় সমস্ত জমিদারী মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এক উইল করিয়া ৺হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান ও নাবালক পৌত্র রাজা পূর্ণেন্দুদেব, সুরেন্দ্রদেব ও ভূপেন্দ্রদেবকে বংশানুক্রমিক সেবাইত নিযুক্ত করেন। নাবালকদের কাশীশ্বরী উইলে একজিকিউটার হন। রাণী শঙ্করীর

৺সুরেন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

দুর্বৎসর যায় যায় যায না। দুইটা অন্ন সংস্থান হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষম জলকষ্টে বাঙ্গালা শুষ্ক-কণ্ঠ। ভীষণ রৌদ্রের উত্তাপে বাঙ্গালার মাঠ, ঘাট খাঁই খাঁই করিতেছে, শুষ্ক কণ্ঠে নরনারী ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। কোথাও না কোথাও অগ্নিদাহে গ্রাম-গোষ্ঠ ছারখার হইতেছে। অন্যান্য বৎসর বসন্ত সমাগমে জীর্ণ রোগীরা নবমুঞ্জরিত তরু লতার ন্যায় ধীরে ধীরে গজাইতে থাকে, ক্ষীণ দেহে নবজীবনের নূতন শ্রী ধারণ করে; এ বৎসর বলিতে গেলে, বসন্তই হইল না; দক্ষিণাবাতাস বহিতে দেখিলাম না; দিনে দারুণ উত্তাপ, রাত্রিতে শীতের প্রাদুর্ভাব; এইরূপই ছিল, এখন দিন রাত্রিতে সমান দাহ চলিতেছে। জীর্ণ রোগী সকল, জীর্ণই রহিয়াছে; অধিকন্তু সুস্থ সবল লোকের অনেকে দেশ ব্যাপী ছর্দ্দি রোগে মহা কষ্ট পাইতেছেন। দুর্বৎসর যায় যায় যায না।

বৎসরের দুই মাস না যাইতেই সেই ভীষণ ভূমিকম্পের রাত্রিতে পূর্ণিমার প্রধান পরিচালক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন, আর বিগত ১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার আমাদের বাঁশবেড়িয়ার 'মধ্যম মহাশয়' সুরেন্দ্র দেব রায় মহাশয় অকালে কাল কবলে নীত হইয়াছেন। এই মৃত্যুতে শূদ্র-মণি বংশের আর এক পুরুষ শেষ হইল। দুর্বৎসর যায় যায় যায় না।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘের পূর্ণিমায় পাটুলীর এই শূদ্রমণি বংশের, তাহাদের বাঁশবেড়িয়ায় বসতির এবং রাজা নৃসিংহদেবের অনেক বিবরণ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, বংশের আরও অনেক পরিচয় তিনি প্রদান করিবেন। কিন্তু 'মধ্যম মহাশয়ের' অকাল মৃত্যুতে আমাদিগকে চৌধুরী মহাশয়ের অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে হইতেছে; তাঁহার অপেক্ষা না করিয়া, নৃসিংহদেব হইতে সুরেন্দ্রদেব পর্য্যন্ত কয় পুরুষের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে হইতেছে।

১২০৮ সালে, নৃসিংহদেবের মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র কৈলাসদেব ১২৪৪ [illegible]ের অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গত হন। কৈলাসদেবের পুত্র দেবেন্দ্র [illegible]লে, বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। নৃসিংহদেবের [illegible]নী; তিনি স্বা[illegible] মৃত্যুর পর হইতে, পুত্র কৈলাস

(৩) পুরাণ। ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, বরাহপুরাণ, আদিত্য বায়ু লিঙ্গ, নন্দিকেশ্বর, ভবিষ্য, মৎস্য, কুর্ম্ম, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত। কালিকাপুরাণ—শারদীয় অধিকারে। স্কন্দপুরাণ—ব্রহ্মোত্তরখণ্ড, শিবকবচ। পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড।

(৪) দেবী ভাগবতে। এইরূপে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীজপ তৎপর এবং তারও হৃল্লেখ মন্ত্রের জপে নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। হৃল্লেখ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র।

(৫) মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বণি দক্ষং প্রতি শ্রীমন্মহেশ্বর বাক্যং।

(৬) মহাভাগবত। ভগবান্ বেদব্যাস এই মহাপুরাণকে তন্ত্রেরই রূপান্তর বলিয়াছেন।

(৭) পাতঞ্জলদর্শন—যোগশাস্ত্র। জন্মৌষধি মন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। জন্মজ, ওষধিজ, মন্ত্রজ, তপোজ, সমাধিজ, এই পঞ্চ প্রকার সিদ্ধি। জন্মাবধি সিদ্ধ—কপিল, প্রহ্লাদ, শুক। ওষধিসেবনে সিদ্ধ—মাণ্ডব্যাদি ঋষি।
মন্ত্রজপে সিদ্ধি—সিদ্ধ সাধকবর্গ। তপোবলে সিদ্ধ—বিশ্বামিত্রাদি।
সমাধিবলে সিদ্ধ—যোগীগণ।
এই পাঁচ প্রকার সিদ্ধিই পূর্ব্ব জন্মকৃত যোগাভ্যাসের ফল। ইহজন্মে, জন্ম, ওষধি মন্ত্র প্রভৃতি কারণ মাত্র, সাহায্য লইতে হয়। মন্ত্রশাস্ত্র তন্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব। "তন্ত্র ছাড়া মন্ত্র নাই"।

(৮) আয়ুর্ব্বেদ। ধাতুঘটিত ঔষধ নিম্মাণ, পারদ ভস্ম প্রভৃতি ব্যাপার সমস্তই তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া ও তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রাদি অবলম্বনে বিহিত।

(৯) জ্যোতিষ। মলমাসাদি অশুদ্ধকালে বিদ্যারম্ভ, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, অনাবৃত্ত তীর্থে স্নান, অনাদি দেবতাদর্শন, পরীক্ষা, আরাম, কূপ, পুরশ্চরণ, দীক্ষা এই সকল কার্য্য বর্জন করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র নিত্য প্রমাণ না হইলে তন্ত্রসিদ্ধ দীক্ষা ও পুরশ্চরণ প্রমাণ হইল কি রূপে?

(১০) স্মৃতি। অগস্ত্যসংহিতা। মহা কপিল পঞ্চরাত্র। পিঙ্গলামত। মন্ত্র-মুক্তাবলী। নারদ-বচন।
মৎস্যসূক্ত, শিবরহস্য, শিবসংহিতা, ঈশানসংহিতা, শিবধর্ম্ম ইত্যাদি।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণং।

তারপর শাস্ত্র বলিয়াছেন—কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপাল কালিকা। কলিযুগে কেবল কালী, কলিযুগে কেবল কৃষ্ণ, গোপাল আর কালিকা রাই কলিযুগে জাগ্রত দেবতা।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে। ষষ্ঠ পটলে বলিয়াছেন—"দেবেশি! যতদিন পর্য্যন্ত নানা জীবে নানা আত্মার ভাবনা, ততদিন পর্য্যন্তই জগৎ পৃথক্‌বিধ। সেই পর্য্যন্তই ক্রিয়া সকল পৃথক্, ভাব সমস্ত নানাবিধ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাবৎকাল পর্য্যন্তই পরস্পর বিভিন্ন। গণেশ, দিনেশ, বহ্নি, বরুণ, কুবের, দিক্‌পাল এ সমস্তই ততদিন পৃথক্। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ভেদে সেই পর্য্যন্তই নানাবিধ চেষ্টা। দেবেশি। সেই পর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে বিল্বদল ভিন্ন, সেই পর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে ভূতলে জবা, দ্রোণ, অপরাজিতা ভিন্ন। সেই পর্য্যন্তই দিব্যভাব, বীরভাব, পশুভাব। সেই পর্য্যন্তই দেবতা ভেদে উপাসনা ভেদ। জগদম্বিকে! সেই পর্য্যন্তই হরি হরে ভেদ বুদ্ধি। শিবে! করালবদনা কালী, শ্রীমৎ একজটা (তারা) ষোড়শী, ভৈরবী ইঁহারাও সেই পর্য্যন্ত পরস্পর বিভিন্না; সেই পর্য্যন্তই, ভুবনেশ্বরী ভিন্না ছিন্নমস্তা ভিন্না, অন্নপূর্ণা ভিন্না, বগলামুখী, মাতঙ্গী, কমলাত্মিকা ভিন্না, সেই পর্য্যন্তই সরস্বতী এবং রাধিকা ভিন্না। ততদিনই চেষ্টা ভিন্না, ক্রিয়া ভিন্না, উপাসনার আচার ভিন্ন, যতদিন ভবানীর শ্রীপাদ পদ্মে ঐক্যজ্ঞান না জন্মে, হে চার্বঙ্গি, হে শঙ্করী সাধকের নির্ম্মল হৃদয়-সরোবরে পরম পবিত্র অদ্বৈত তত্ত্বতারিণী পাদপদ্মের সমুজ্জ্বল বিকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে (দেব দেবীর কথা দূরে থাক্) সংসারের সমস্ত জীবে ঐক্য হইয়া যায়।

এই সকল বিরোধের সামঞ্জস্যে মহিম্নঃ স্তবে পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ মদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথজুষাং
নৃণা মেকোগম্য স্ত্বমসি পয়সা মর্ণব ইব।

ত্রয়ী (বেদ), সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত (তন্ত্রশাস্ত্র) বৈষ্ণব (নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র) এই পরস্পর প্রভিন্ন পথে রুচিভেদে "এইটি সুপথ, কি ঐটি সুপথ" ইহা লইয়াই যতকিছু মতামত; কিন্তু প্রভো, সরল কুটিল নানা পথে ধাবিত নদ নদীর জল সকল যেমন পরিশেষে একমাত্র মহাসমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ যিনি যে পথেই কেন গমন না করুন, পরিণামে একমাত্র অদ্বৈত সমুদ্র তোমাতেই গিয়া সকলে মিলিত হইবেন। সাধক! বেদ বল, শল. নিশ্চয় জানিও, ইহাই সকল শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।